তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন

সম্পাদনা

ধনঞ্জয় রায়

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

কলকাতা

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০০০
কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২

প্রকাশক ঃ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২।

টাইপসেটিং ঃ অভিনব মুদ্রণ
৭২ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০৬৫৫।

মুদ্রক ঃ কর্মাসিয়াল প্রেস সার্ভিস
৪৫ মলাঙ্গা লেন, কলকাতা-৭০০০১২।

মুখবন্ধ

'তেভাগা আন্দোলন' সংকলনটি প্রস্তুত করার বেশ কয়েক বছর আগে 'উত্তর বঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন', 'রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন' এবং 'তরাই ডুয়ার্সের শ্রমিক কৃষক বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন' নামে তিনখানি বই আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। ওই বই তিনটি একত্রিত করে 'তেভাগা আন্দোলন' নামে প্রকাশিত হল। অসুবিধার জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ননীগোপাল দাস মহন্ত-এর 'তেভাগা আন্দোলনের ইতিকথা', দীনেশ লাহিড়ীর 'রংপুরের তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি' ও বীরেন্দ্রকুমার নিয়োগীর আরও একটি লেখা 'মাধব দত্ত স্মরণে' এবং তেভাগার গানগুলি সে সময় প্রকাশ করতে পারিনি, ওইগুলি এ সংকলনের বাড়তি সংযোজন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে আচার্য নীহাররঞ্জন রায় 'উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন' এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক অমলেন্দু দে 'রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন' বইয়ের জন্য ভূমিকা লিখেছিলেন। তাঁদের উভয়ের কাছে আমি ঋণী। সেই দুটি ভূমিকা বর্তমান সংকলনের প্রারম্ভে যুক্ত করা হয়েছে।

এই সংকলনের স্মৃতিচারকদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। এঁদের সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধ্য। এইসব আদর্শনিষ্ঠ, ত্যাগী, অসমসাহসী ও দরদী জননেতাদের স্মৃতি আশা করি দেশবাসীর মনে অম্লান হয়ে বিরাজ করবে। সম্পাদনার কাজে সাহায্য পেয়েছি সুষমা রায়, দেবলীনা রায়, শ্রীলেখা রায় ও সাত্যকি চক্রবর্তীর কাছে। তাঁদের সহায়তা সত্ত্বেও যে-সব ভুল-ত্রুটি থেকে গেল তার জন্য দোষী আমি।

ধনঞ্জয় রায়

‘উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন’ গ্রন্থের ভূমিকা

জমিদার-তালুকদার-জোতদার পরম্পরা-পীড়িত বঙ্গে প্রজা ও কৃষকদের ধূমায়িত ক্রোধের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ইতস্তত বিস্ফোরণ উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের সূচনা থেকে, অর্থাৎ গান্ধী-গণান্দোলনের সূচনা থেকেই এই ধরনের যত বিস্ফোরণ তা বৃহত্তর গণান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে আরম্ভ করে, এবং রাজনৈতিক দলগুলি প্রজা-কৃষকদের ভেতর তাদের যার যার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে কৃষক-সংগঠন ও কৃষকান্দোলন বর্ধনে ব্রতী হয়। কৃষকান্দোলনের এই গোড়ার ইতিহাস আজও অলিখিত বললেই চলে। যা হোক, এই সামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়ে উত্তরবঙ্গে, দিনাজপুর-রংপুর-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-মালদহ, এই পাঁচটি জেলার নানা জায়গায়, কৃষককুলের আক্রোশ স্থানীয় বিদ্রোহ ও বিরোধান্দোলনে পরিণতি লাভ করে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তখন ‘জনযুদ্ধে’ উৎসর্গীকৃতপ্রাণ; খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই রাজনৈতিক গোষ্ঠী এই বিরোধান্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম অধ্যায়, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পূর্বাহ্ন। তখনকার সাময়িক ইতিহাসে, এখনকার স্মৃতিতে এই বিরোধের প্রথম অধ্যায় আধিয়ার বিদ্রোহ, দ্বিতীয় অধ্যায় তেভাগা আন্দোলন নামে খ্যাত।

এই বিদ্রোহ ও বিরোধান্দোলনের বাতাবরণ ও তথ্যবিবরণ আজও ইতিহাসের পাতায় ওঠেনি; ওঠবার সময়ও বোধ হয় হয়নি। তবু, ভবিষ্যতে এই ইতিহাসও সুষ্ঠুভাবে রচিত হতে পারে, সে প্রয়োজনে যতটা সম্ভব সমস্ত তথ্য, সমস্ত বাতাবরণ এখনই ধরে রাখা উচিত, নইলে কালের স্থূল হস্তাবলেপে তা একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক ডক্টর সুনীল সান্যাল মহাশয় এই বিরোধান্দোলনের সুষ্ঠু, নাতিদীর্ঘ একটি বিবরণী প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বোধ হয় তা যথেষ্ট নয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এমন কিছু লোক আজও জীবিত এবং তাঁদের স্মৃতিশক্তি অব্যাহত।

শ্রীধনঞ্জয় রায় উত্তরবঙ্গবাসী, স্থানীয় ইতিহাস-পিপাসু, জনজীবননিবদ্ধচিত্ত একজন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত শিক্ষকমাত্র। তিনি এই কৃষক বিদ্রোহ ও বিরোধান্দোলন সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে তার ইতিহাস জানবার ঔৎসুক্যে, যাঁরা এই বিদ্রোহ ও বিরোধান্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন অনেককে অনুরোধ করেছিলেন তাঁদের নিজ নিজ জ্ঞাত তথ্য ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে তাঁকে দেবার জন্যে যাতে তিনি সেগুলো একত্র করে সম্পাদন ও প্রকাশ করতে পারেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বিনীত আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। ধনঞ্জয়বাবু পরমোৎসাহে, অপরিসীম কৃতজ্ঞতায়, নিজের দুঃখকষ্টার্জিত অর্থে এবং স্বার্থপ্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্যোগে তাঁদের এই লিখিত বিবরণগুলি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই প্রথম খণ্ডটি সেই দায়িত্ব পালনের সূচনা মাত্র।

এ গ্রন্থ ইতিহাস নয়, কিন্তু ইতিহাসের অমূল্য, অপরিহার্য উপাদান। স্বার্থলেশহীন ধনঞ্জয়বাবু সেই উপাদান আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের জন্য, এ জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদের সাধুবাদ অর্জন করেছেন। আমার এই সাক্ষ্য যদি তাঁর বাকি কয়েক খণ্ডের প্রকাশে ও বিজ্ঞাপনে কিছুমাত্র সহায়তাদানে সার্থক হয়, তা হলে আমি পরম পরিতোষ লাভ করবো।

ধনঞ্জয়বাবুর এই উদ্যোগ সর্বথা প্রশংসনীয়।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭৮
কলকাতা

নীহাররঞ্জন রায়

‘রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন’ গ্রন্থের ভূমিকা

১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলায় ক্রমান্বয়ে কৃষক আন্দোলন ব্যাপ্তিলাভ করতে থাকে, এই আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। তা সম্ভব হয়েছিল শিক্ষিত সমাজের ও কৃষক শ্রেণী থেকে আগত অসংখ্য কর্মীর ও নেতার প্রয়াসে। এমনকি জমিদার ও জোতদার পরিবারের আত্মত্যাগী যুবকেরাও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তখন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁরাই ব্রিটিশ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বিভিন্ন জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন; শ্রমিক, কৃষক, মহিলা ও ছাত্র ফ্রন্ট সংগঠিত করে সমাজ জীবনের আমূল রূপান্তরের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নেতারা ও কর্মীরা যেভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধে আবদ্ধ হন তাতে বাংলার বিভিন্ন শহরে, গ্রামে ও গঞ্জে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। একের পর এক গণজাগরণের ঢেউ বাংলার রাজনৈতিক তটকে প্লাবিত করতে শুরু করে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সংগ্রামী মানুষেরা কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে সমবেত হন। তার ফলে কৃষক আন্দোলন দুর্বার গতিবেগ লাভ করল। তুলনায় হিন্দু ও মুসলিম বুর্জোয়াদের শক্তি বেশি থাকায় সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি ইতিহাসের গতিধারা নির্ধারণ করতে পারেনি।

সেই সময়ের গণজাগরণের রূপটি কেমন ছিল তা নিয়ে গবেষণা চলছে। নানা সূত্র থেকে গবেষকরা তথ্য সংগ্রহ করছেন। সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা মূল্যবান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই জাতীয় কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তবুও বহু তথ্য এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। দেশভাগের বিপর্যয়ের ফলে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতারা ও কর্মীরা এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন যে, তাঁদের স্মৃতিকথা সংগ্রহ করা বেশ কষ্টকর। অথচ তাঁদের কথা জানতে না পারলে ‘এলিট’ বা ‘উচ্চবর্গে’র আত্মত্যাগী মানুষের সঙ্গে ‘সাবঅলটার্ন’ বা ‘নিম্নবর্গে’র অগণিত জনসাধারণের একাত্মতাবোধের চিত্রটি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে না। কতটা ব্যাপক পরিধি ও গভীরতা নিয়ে এই একাত্মতাবোধ সমাজ পরিবর্তনের পথটিকে প্রশস্ত করেছিল তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের জন্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর স্মৃতিকথা খুবই সহায়ক। সঙ্কলক শ্রীধনঞ্জয় রায় এমনি একটি মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন।

শ্রীরায় দীর্ঘকাল ধরে গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তাঁর বন্ধন অন্তরের। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের কাহিনীগুলো যাতে বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে না যায় তার জন্য তিনি অনলস পরিশ্রম করে চলেছেন। তিনি একক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষক সংগ্রামের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে কয়েকটি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন' এবং 'তরাই ও ডুয়ার্সের শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ও তেভাগা'। কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনায় তাঁর রচনাসমূহ যে যথেষ্ট সহায়ক হবে তা বলাই বাহুল্য।

অমলেন্দু দে

সূচিপত্র

কোনও সীমাসংখ্যা ছিল না। অশিক্ষিত কৃষকরা কে কত বড় জোতদার তা প্রকাশ করত কোন জোতদার কতগুলি হাতির মালিক বা কতগুলি গ্রামের মালিক সেই সংখ্যা দিয়ে। ফুলবাড়ির লালপুর ডাঙ্গায় জোতদারদের হাতির রেস খেলা হত। পঞ্চাশের মন্বন্তরে অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়। ওই সময় বহু কৃষক জমি হারিয়ে আধিয়ার ও খেতমজুরে পরিণত হয়।

১৯৪৬ সালে খুলনা জেলায় মৌভাগা-এ অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ' বিষয়ক প্রস্তাবে জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করা হয়। ওই সম্মেলন হতেই বর্গাদারদের জন্য তেভাগা আইন প্রণয়নের দাবিও করা হয়। ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে প্রাদেশিক কৃষক সভা তেভাগা সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি ও জেলা কৃষক সমিতির যুক্ত বৈঠকে জেলার তেভাগা আন্দোলনের বিস্তৃত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নেওয়া হয়। যে তিনটি দাবির ভিত্তিতে সংগ্রাম শুরু করা স্থির হয়, তা হল, 'নিজ খোলানে ধান তোলো', 'আধি নাই তে-ভাগা চাই', 'কজ্জা ধানের সুদ নাই'। পরিকল্পনার সময় নিজ খোলানে ধান তোলার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আন্দোলনের পরিকল্পনায় জেলাকে ছ'টি অঞ্চলে ভাগ করা হয় এবং প্রতি অঞ্চলের দায়িত্ব এক বা একাধিক জেলা নেতার উপরে দেওয়া হয়। অঞ্চলগুলি ছিল :

ঠাকুরগাঁও পূর্ব অঞ্চল—দায়িত্বে, কমরেড বিভূতি গুহ ও অজিত রায়।

ঠাকুরগাঁও পশ্চিম—দায়িত্বে, কমরেড গুরুদাস তালুকদার।

সেতাবগঞ্জ অঞ্চল—দায়িত্বে, কমরেড জনার্দন ভট্টাচার্য।

চিরির বন্দর অঞ্চল—দায়িত্বে, কমরেড সুধীর সমাজপতি ও শচীন্দু চক্রবর্তী।

ইটাহার অঞ্চল—দায়িত্বে, কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জি।

ফুলবাড়ি ও পতিরাম অঞ্চল—দায়িত্বে, কমরেড কালী সরকার ও রূপনারায়ণ রায়।

সুনীল সেন থাকলেন জেলা দপ্তরের দায়িত্বে। পরে তিনি ঠাকুরগাঁও পশ্চিম অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনা করেন।

কমরেড গুরুদাস তালুকদারের অঞ্চল, ঠাকুরগাঁও পশ্চিম এলাকাটি ছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত। কিন্তু ওই অঞ্চলেই ছিল পার্টির সবচেয়ে বেশি সংগঠিত ও শক্তিশালী ঘাঁটি। সে জন্য স্থির হল ওই অঞ্চল থেকেই ধান কাটার সংগ্রাম শুরু করতে হবে আর সেই দায়িত্ব দিয়ে পার্টির সম্পাদক অর্থাৎ আমাকে ওই অঞ্চলে পাঠানো হল।

কর্মীরা সব দায়িত্ব বুঝে নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে গিয়েছেন। শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রচার অভিযান। অসংখ্য সভা, বৈঠক। হাট প্রচার, মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বড় বড় সভাগুলি থেকে কৃষক আধিয়াররা হাত তুলে উৎসাহ ভরে দাবিগুলি সমর্থন করে চলেছে। লাঠিধারী ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরি হয়েছে। সর্বত্রই যেন বিরাট উৎসবের প্রস্তুতি। গ্রামের মাঠে মাঠে তখন পাকা ধানের শিসগুলিও কাঁপছে। সংগ্রামের দামামা বেজে চলেছে। 'কমরেড', 'ইনক্লাব'—ওই ধ্বনিতেই বজ্রমুষ্টি উঁচু করে কৃষকরা একে অপরকে সংগ্রামী সম্ভাষণ জানাচ্ছে ও অন্য গ্রামের প্রস্তুতির খবরাখবর নিচ্ছে। গ্রাম-গ্রামান্তরে ওই একই চিত্র। গ্রামগুলি হয়ে উঠেছে জমাট বাঁধা কৃষক ঐক্যের জ্বলন্ত প্রতীক। খেতমজুর, আধিয়ার, মাঝারি কৃষক, কিছুটা সচ্ছল অবস্থার কৃষক—সবাই আধিয়ারের পক্ষে লাঠি ধরেছে—ভলান্টিয়ার হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও পশ্চিম অঞ্চলের ঠুমনিয়া গ্রামে প্রথম ধান কাটা শুরু হয়। ধান কাটা চলছে।

একদল ভলান্টিয়ার লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছে ও মুর্হুমুহু শ্লোগান দিচ্ছে। গ্রামের মেয়ে পুরুষ সকলেই আজ মাঠে নেমেছে। সশস্ত্র পুলিশেরা মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে দেখল—কোনও বাধা দিল না। সেদিনের মতো ধান কাটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। ধান কেটে সেই ধান জমা করা হল আধিয়ারের বাড়িতে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সমস্ত গ্রামকে গ্রাস করেছে। পরদিন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে জেলা পার্টি সম্পাদক অর্থাৎ আমাকে এবং সেই সঙ্গে আরও বত্রিশ জন কৃষক কর্মীকে গ্রেফতার করল। ধান চুরির অভিযোগে আমাদের সকলকে ঠাকুরগাঁও চালান দেওয়া হল কিন্তু ধান কাটা বন্ধ হল না, যথারীতি চলতে লাগল। জামিনে মুক্তি পেয়ে ওই সব কর্মীরাও জামিন ভেঙে আত্মগোপন করেন এবং আবার সংগ্রামে সামিল হন।

সশস্ত্র পুলিশ এবার কৃষক ভলান্টিয়ারদের ধান কাটায় বাধা দিতে মাঠে নামল। কৃষক মহিলা কমরেড দীপশ্বরের সঙ্গে পুলিশের খণ্ড লড়াইয়ের ওই দুঃসাহসিক ঘটনা ও পুলিশের পিছু হটার কথা বিদ্যুৎ বেগে চারদিকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। সবখানেই প্রবল উদ্দীপনা, সব এলাকাতেই ধান কাটা শুরু হল ও জোরকদমে এগিয়ে চলল। পুলিশ মাঠে নেমে ধান কাটায় আর বাধা দিল না বটে, তবে সব এলাকাতেই কৃষক কর্মীদের নামে মিথ্যে ধান চুরির দায়ে হাজার হাজাব গ্রেফতারি পরোয়ানা বের করল। পুলিশ গ্রেফতারের জন্য গ্রামে গ্রামে হানা দিতে লাগল আর কর্মীরা গ্রেফতার এড়িয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করে চললেন। জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকদের কাছে জোতদাররা দল বেঁধে ছোটাছুটি করতে লাগল, কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক ও সন্ত্রাস সৃষ্টির নানা প্রচেষ্টা। ধান কাটা স্থগিত রেখে আপস আলোচনা চালানোর গালভরা প্রস্তাবের প্রচার সত্ত্বেও আধিয়াররা সবখানেই দ্রুত ধান কেটে নিজ নিজ খোলানে তুলতে লাগল। গ্রেফতার করার জন্য এবার পুলিশ গ্রামে প্রবেশ করলে তারা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করল।

৪ জানুয়ারি, ১৯৪৭ সাল। দিনাজপুর শহরের কাছে চিরির বন্দর এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ কৃষকদের উপর প্রথম গুলি চালনা করে। গুলিতে কমরেড শিবরাম ও সমিরুদ্দিন নিহত হন। তেভাগা সংগ্রামের প্রথম শহিদ শিবরাম ও সমিরুদ্দিন। সমিরুদ্দিন ছিলেন খেতমজুর আর শিবরাম ছিলেন গরিব সাঁওতাল আধিয়ার। ওই সংঘর্ষে একজন সশস্ত্র পুলিশও তিরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ধান কাটা শেষ হয়ে আসছে। সংগঠিত এলাকার সবখানেই আধিয়াররা ধান কেটে নিজ খোলানে তুলেছে। তাদের গ্রেফতার ও কোনও পুলিশি সন্ত্রাস দমন করতে পারেনি, সংকল্পে তারা ছিল অটল। তবে অসংগঠিত এলাকাগুলিতে আধিয়াররা নিজ খোলানেই ধান তোলে এবং আন্দোলনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ধান কাটা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। তখনও গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র পুলিশের হানা অব্যাহত। কৃষকরাও প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের দল গ্রামে প্রবেশ করলেই এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কাঁসর-ঘন্টা বেজে ওঠে। আর ধ্বনিত হয় 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান। কৃষক মেয়েরাই এর সংগঠক। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ি থেকে কৃষক মেয়েরা লাঠি, ঝাঁটা ও গাইন হাতে বাড়ির বাইরে সমবেত হয় এবং পুলিশ বাহিনীর গ্রামে প্রবেশের পথে অবরোধ সৃষ্টি করে। সব অঞ্চলেই তখন এই চিত্র। সবখানেই চলছে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। রাতদুপুরে দু জন ভলান্টিয়ার এসে ঠুমনিয়া অফিসে খবর দিল যে রানীশংকৈল-এ একটি বন্দুকধারী পুলিশ—মহিলা ভলান্টিয়ারদের প্রতি সম্মানহানিকর উক্তি করায় মহিলা নেত্রী কমরেড ভাগুনীর নেতৃত্বে মেয়েরা পুলিশটিকে গ্রেফতার করেছে এবং একটি ঘরে আটকে

রেখেছে। পুলিশটিকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ ঠুমনিয়া অফিস হতে না যাওয়া পর্যন্ত সারারাত কমরেড ভাণ্ডনী বন্দুকটি নিজ কাঁধে তুলে ওই পুলিশটিকে ঘিরে আটক রেখে পাহারা দিতে থাকেন অন্যান্য কৃষক মেয়েদের সঙ্গে। সেদিন ওই সব রাজবংশী কৃষক মেয়েরা অপূর্ব বীরত্বের নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

ওই সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে লিগ সরকার তেভাগা সংক্রান্ত একটি বিল আইন সভায় পেশ করতে যাচ্ছেন। ওই বিলের খসড়া ২২শে জানুয়ারির গেজেটেও প্রকাশিত হয়। তীব্র সংগ্রামের মুখে সরকার ওই ঘোষণা করতে বাধ্য হন। আগুনের মতো এ সংবাদ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। সংগ্রাম এবার নতুন মোড় নিল। এক নতুন জঙ্গি অধ্যায়। এই অধ্যায় 'খোলান ভাঙা' আন্দোলন নামে পরিচিত। তেভাগা সম্পর্কে সরকার আইন পাস করেছেন ওই সংবাদ, অসংগঠিত এলাকায় যেখানে আধিয়াররা ভয়ে জোতদারের খোলানেই ধান তুলেছিল সে সব আধিয়ারদের চঞ্চল করে তুলল। আইন হলেও জোতদারের খামার হতে তারা নিজেদের ন্যায্য অংশ পাবে না ওই আশঙ্কায় এবার তারা দলে দলে কৃষক সমিতির কাছে আসতে লাগল। তারা প্রস্তাব দিল যে, সমিতি নির্দেশ দিক যাতে ভলান্টিয়ারদের সাহায্যে জোতদারের বাড়ি হতে নিজ নিজ ধানের পুঞ্জ তারা ভেঙে নিজ খোলানে তুলতে পারে।

কৃষক সমিতির সাংগঠনিক শ্লোগান ছিল এক লাঠি, এক মানুষ, এক টাকা। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে একজন লাঠিধারী ভলান্টিয়ার, একজন কৃষক সমিতির সভ্য ও এক টাকা সংগ্রাম তহবিলের চাঁদা। পুঞ্জ ভাঙার অনুমতির জন্য ওই সব আধিয়াররা ওই সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেই সমিতির কাছে আসল। নতুন ওই অঞ্চলগুলির আধিয়ারদের এক বড় অংশ ছিল মুসলমান কৃষক। জেলায় মুসলিম লিগের নেতারা নোয়াখালি হতে কিছু মৌলভি আমদানি করে ওই সব মুসলমান কৃষকদের দিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে আন্দোলন পণ্ড করার চেষ্টাও করেছিল। কৃষক নেতা হাজি মহম্মদ দানেশকে তারা খুন করার ষড়যন্ত্রও করেছিল। ওই সব মুসলমান আধিয়ার কৃষকরাই এবার দলে দলে ছুটে যায় হাজি সাহেবের কাছে খোলান ভাঙার অনুমতির জন্য। স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'খোলান ভাঙা' আন্দোলন আগুনের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার ভলান্টিয়ার দিনের পর দিন লাল ঝান্ডা হাতে মিছিল করে জোতদারের খোলান থেকে নিজ নিজ ধানের পুঞ্জ ভেঙে নিয়ে আপন বাড়ির খোলানে মজুত করতে লাগল। বহু জোতদার এবার গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে আধিয়াররা জোতদারের বাড়ি গিয়ে নিজের ধান ভিন্ন অন্য কোনও জিনিস স্পর্শ করে নাই। সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে আধিয়ারদের দ্বারা কোনও হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটে নাই। আতঙ্কিত জোতদাররা হাজার হাজার টেলিগ্রাম পাঠাল সুরাবর্দি সাহেবের কাছে। ছোটাছুটি করল কলকাতায়। লুঠতরাজ ও ডাকাতির কাল্পনিক অভিযোগ আনা হল সংগ্রামী আধিয়ার কৃষকদের বিরুদ্ধে। জোতদারদের চাপে এবার লিগ সরকার পিছু হটলেন। গেজেটে প্রকাশিত হলেও তেভাগা বিলটি আইনসভায় উপস্থিত হল না। এর পরিবর্তে সরকার গ্রহণ করলেন নৃশংস দমন-পীড়নের পথ। জেলার বিভিন্ন স্থানে পঁয়ত্রিশটি সশস্ত্র পুলিশের ক্যাম্প বসল। তেভাগা সংগ্রাম দমন করার জন্য সেই সব ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে শুরু হল গ্রামে গ্রামে সামরিক কায়দায় ব্যাপক পুলিশি অভিযান। বালুরঘাট মহকুমার পতিরাম, খাঁপুর অঞ্চলেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শয়ে শয়ে লাঠিধারী ভলান্টিয়ার পতিরামে জোতদারের খোলান ভেঙে আধিয়ারদের ধান নিজ নিজ খোলানে তুলে দেয়।

পতিরামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম খাঁপুরে আন্দোলন শুরু হয়। খাঁপুরের সিংহ কাছারির জোতদার খুবই জবরদস্ত ও প্রতাপশালী। জোতদারের ধানের খোলান ঘেরা ছিল না। আধিয়ার কৃষকদের গোরু গিয়ে ধান খেলে জোতদার আধিয়ারদের শিক্ষা দেবার জন্য সব গোরু খোঁয়াড়ে দিতে গেলে ভলান্টিয়াররা তা কেড়ে নেয়। জোতদার রেগে গিয়ে পুলিশ ডাকে। সতেরো জন আধিয়ার কৃষকের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে দু গাড়ি সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে প্রবেশ করে এবং এলোপাতাড়ি গ্রেফতার শুরু করে। ওই সংবাদ আগুনের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ওই স্থানে ভলান্টিয়ারদের বিরাট সমাবেশ ঘটে। কৃষকরা অন্যায় গ্রেফতার প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায়। বিরাট কৃষকবাহিনীর সামনে পুলিশ একশো একুশ রাউন্ড গুলি চালায় ও বাইশ জনকে হত্যা করে। পুলিশের গুলিতে বহু সংখ্যক আহত হয়। ওই হত্যাকাণ্ডও কৃষকদের দমন করতে পারে নাই। ওই দিনই খাঁপুরের ঘটনাস্থলে গুলি চালনা ও হত্যার প্রতিবাদে বিরাট এক কৃষক সমাবেশ হয়। কমরেড কালী সরকার ও অবনী লাহিড়ী ওই সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

পুলিশ তখন খুনের নেশায় মেতে উঠেছে। সরকারও আধিয়ারদের ওই বিদ্রোহ দমন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুলিশের গুলি চালনার খবর আসতে থাকে। খাঁপুর কৃষক হত্যার পরদিনই ঠাকুরগাঁও পশ্চিম অঞ্চলের ঠুমনিয়ায় গুলি চলে। কমরেড শুকুরচাঁদ সিং ও তাঁর স্ত্রী সুনীমা সিং সহ চারজন কৃষক পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন। কমরেড সৌরী ঘটক ঠাকুরগাঁও শহরে সরকারি চাকরি করতেন। পার্টির গোপন মহকুমা কেন্দ্রটির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁকে জেলা থেকে বহিষ্কার করল। ঠাকুরগাঁওয়ের ওই কৃষক সমাবেশ উপলক্ষে দিনাজপুর শহর থেকে রানী মিত্র ও বীণা গুহ ঠাকুরগাঁও শহরে এসেছিলেন, তাঁদেরকেও শহর থেকে বহিষ্কার করল। কলকাতা থেকে ছাত্র, যুবক, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের যে সব সৌভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি ওই আন্দোলনকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে জেলাতে এসেছিলেন তাঁদেরকে ওই মহিলা নেত্রীরা শহর থেকে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যেতেন, পুলিশ তাও বন্ধ করে দিল। বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত জেলা ও সংগ্রামের অঞ্চলগুলিকে পুলিশ বিচ্ছিন্ন করে দিল। খাঁপুরে ডাক্তার বিজয় বসুর নেতৃত্বে পিপ্‌লস রিলিফ কমিটির যে মেডিকাল ইউনিটটি পাঠানো হয়েছিল তাকেও খাঁপুর গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হল না। সারা জেলায় দমন নীতির তাণ্ডব চলল। জেলা নেতা ও আঞ্চলিক কৃষক নেতাদের যারা জামিন ভেঙে বা গ্রেফতারি পরোয়ানা এড়িয়ে আত্মগোপন করে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন তাঁদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ তাঁদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকে উদ্যোগী হল। বাড়ি বাড়ি পুলিশের হানা চলতে লাগল। সেই সঙ্গে চলল মারপিট, লুঠপাট ও গ্রেফতার। তবুও পুলিশ কৃষকদের দিয়ে আধিয়ারদের খোলান হতে জোতদারের খোলানে ধান নিয়ে যেতে পারল না। এইবার পুলিশ নিজেই আধিয়ারের বাড়ি থেকে ধান কেড়ে নিয়ে জোতদারের বাড়িতে তুলে দিতে লাগল।

পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষকরা বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। সেই সঙ্গে চলল পুলিশের হাতে মেয়েদের অমানুষিক অত্যাচার। এবার কৃষকদের সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। দমন-পীড়নের সেই অন্ধকারময় দিনগুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে এল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট-এর সেই স্মরণীয় দিনটি। সেদিন আমরাও গ্রামের গোপন কেন্দ্র থেকে প্রকাশ্যে বের হয়ে আধিয়ার কৃষকদের নিয়ে বিরাট বিরাট মিছিল করে দেশের সমস্ত মানুষের সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের বিজয় উৎসব পালন করেছিলাম।

সেদিন তে-ভাগার দাবি আদায় করা যায় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ওই সংগ্রামকে কৃষকদের রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেয়। তবুও সেদিন ওই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট জমিদারি-জোতদারি শোষণ ও ভূমি ব্যবস্থাকে সমস্ত দেশবাসীর সামনে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আর ওই সংগ্রাম ছিল ইদানীং কালের সবচেয়ে বড় সংগঠিত কৃষক সংগ্রাম। কমিউনিস্ট কর্মীরাই তা পরিচালনা করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী কমিউনিস্ট কর্মীরা দিনাজপুর জেলাতে ১৯৩৭-৩৮ সাল থেকেই গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। দুর্গম গ্রামাঞ্চলে পশ্চাৎপদ, দারিদ্র্যপীড়িত, শোষিত ও নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে দিনের পর দিন পড়ে থেকে, তাঁদের দুঃখময় জীবনের ভাগীদার হয়ে তাঁদেরকে তাঁরা সংগঠিত করেছেন। রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে ওই কৃষকদের মধ্যে থেকেই তাঁরা এক বিরাট সুনিশ্চিত কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করে কমিউনিস্ট পার্টি গড়েছিলেন। ওই কর্মী বাহিনীই ছিল তেভাগা সংগ্রামের এলাকাভিত্তিক নেতা এবং সংগ্রামের মূল শক্তি।

তে-ভাগার দাবি সেদিন ওই জেলার নিপীড়িত আধিয়ার কৃষকদের মনে কত গভীর রেখাপাত করেছিল সে সম্পর্কে ছোট্ট একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। খাঁপুরে গুলি চালনায় যে সব কৃষক গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন তাঁদেরকে বালুরঘাট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালের মেডিকাল অফিসার মৃত্যু-পথযাত্রী একজন কৃষককে তাঁর শেষ ইচ্ছা জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কী চান?' ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে সংগ্রামী কৃষকটি উত্তর দিলেন—'তে-ভাগা চাই'। পর মুহূর্তেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

তেভাগার লড়াই

বিভূতি গুহ

তখন ইংরেজ আমল। গ্রাম-বাংলার জীবনে চলছে এক অন্ধকারময় যুগ। কৃষকের জীবন দুর্বিষহ। মাথার ওপর বিদেশি শাসন। সমাজে জোতদার জমিদার মহাজনের শোষণ পীড়ন। অনাহার অর্ধাহার জোর জুলুমের সঙ্গে অশিক্ষা, অজ্ঞতা হাজারো রকমের কুসংস্কারের নাগপাশ।

কিন্তু এক সময় ঝড় উঠল কৃষকের জীবনে। সারা বাংলা আলোড়িত হল। সে ঝড় প্রবল রূপ নিল উত্তর বাংলায। ধান, জমি, নূতন দিনের স্বপ্ন পাগল করে তুলল কৃষক সমাজকে। মূক কৃষক মুখর হল। যুগ যুগের ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠল। বিক্ষোভ ফেটে পড়ল বিদ্রোহের রূপে। এতকালের ভীত শঙ্কিত মানুষের দল অবলীলাক্রমে, নিঃশঙ্ক চিত্তে এগিয়ে এল। 'জান দিব তবু ধান দিব না'। হ্যাঁ, তারা রাজশক্তির হিংস্র আক্রমণে জান দিল। জান দিল হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী, সাঁওতাল, রাজবংশী নারী ও পুরুষ। কৃষক শহিদের রক্তে রচিত হল নূতন ইতিহাস।

এই হল তে-ভাগার লড়াই। এত বড় সংগঠিত কৃষক সংগ্রাম আর কোনওদিন দেখা যায়নি বাংলায়।

কিন্তু কৃষকদের এই বিরাট সংগ্রাম একদিনে ঘটেনি। এর মূলে ছিল এক দিকে বিদেশি শাসন ও জোতদারি জমিদারি সমাজ ব্যবস্থার অমানুষিক শোষণ ও জুলুম, আর অন্য দিকে শোষিত বঞ্চিত কৃষকদের জাগাবার, সংগঠিত করবার ও আন্দোলনে নামাবার এক সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা।

সমাজ ব্যবস্থাব কথাই ধরা যাক। দেশের শাসনের গদিতে ছিল বিদেশিরাজ। আর স্থানীয় শাসনকর্তা পুলিশ আমলারা গ্রামে জোতদার জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করত। কারণ এই সামন্ত প্রভুরাই ছিল বিদেশি শাসকদের তল্পিবাহক। এরাই ছিল গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। জোতদার, জমিদারের হাতে ছিল হাজার হাজার বিঘা জমি। তাদের গোলায় পুঞ্জীভূত হত কৃষকের হাড়ভাঙা খাটুনির ফল সোনার ফসল। আর জমিহারা কৃষক অনশনে দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। জমিদার জোতদার মহাজনের হাজারো পাওনার বোঝায় তাদের পিঠ ভেঙে যেত।

ইংরেজ সরকার সেকালে বাংলাদেশের জন্য যে ভূমি রাজস্ব কমিশন বসিয়েছিলেন সেই 'ফ্লাউড কমিশনের' রিপোর্টে যেটুকু সত্য প্রকাশিত হয়েছে তাও নিদারুণ। কমিশনের হিসাবে দেখা যায় তখন বাংলার শতকরা ৪৬ জনেরই জমি ছিল দুই একরেরও নীচে। তার ভেতর আবার ২২.৫ ভাগের কোনও জমিই ছিল না। আর ২৮.৬ ভাগের জমি ছিল ২ থেকে ৫ একরের ভিতর। অর্থাৎ গরিব চাষি ও জমিহীন চাষির সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৪ ভাগেরও বেশি। দিনাজপুরে এদের সংখ্যা ছিল ৫৪.৪ ভাগ আর রংপুরে ৬৪ ভাগ। দিনাজপুর, রংপুরে

এদের সংখ্যা গোটা বাংলার তুলনায় কম হলেও তারা এসে দাঁড়িয়েছিল সর্বনাশের শেষ সীমায়। খেতমজুরের অবস্থা যে কী ভয়াবহ ছিল তা দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্টে মারাত্মক ভাবে ধরা পড়ে।

কমিশন দেখেছেন ১৯৩৮-৩৯ সালে খেতমজুরদের দৈনিক আয় ছিল সাড়ে তিন আনা। যে দিন কপালে কাজ জুটত শুধু সেই দিনই ছিল এই আয়। আর একশো দিনের ভেতর বত্রিশ দিনই কাজ জুটত না। অর্থাৎ বছরে প্রায় চার মাসই তারা থাকত বেকার।

দেনার দায়ে কৃষকের মাথার চুল পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাবার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। সারা বাংলায় ১৯২৯ সালে কৃষকের দেনার পরিমাণ ছিল একশো কোটি টাকা।

চাষিদের মাথার ওপর ছিল নানা স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী। সে আমলের বিচারপতি মি. ফিল্ড একটা ছক কেটে দেখিয়েছিলেন, সকলের মাথার ওপর ছিল গভর্নমেন্ট। তার তলায় জমিদার। তার তলায় তালুকদার, জোতদার পত্তনিদার। তার তলায় পর পর নানা স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী। ফ্লাউড কমিশনের মতে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা ছিল পনেরো-কুড়ি। এদের সকলের পাওনার বোঝা জগদ্দল পাষাণের মতো চেপে বসত সবার নীচেকার চাষির ওপর। এই ছিল জমিদারি জোতদারি প্রথার অভিশাপ।

এই অভিশাপের ভয়ংকর শিকার ছিল ভাগচাষি বা আধিয়ার। ফ্লাউড কমিশনের মতে দিনাজপুরে ভাগচাষির সংখ্যা কৃষকদের শতকরা ১৩.৮ ভাগ হলেও আমরা দেখেছি কোনও কোনও অঞ্চলে ভাগচাষির সংখ্যা ছিল ৬০ শতাংশেরও বেশি। এদের বেশির ভাগই ছিল জমিহারা। যাদের বা সামান্য দু-এক বিঘা জমি ছিল তাদেরও দিন গুজরানের কোনও প্রশ্নই ছিল না। জোতদারের জমি চাষ করে ফসলের আধিভাগ তাদের পাবার কথা। কিন্তু জোতদারের বর্বর আইনি-পাওনা ও আরও বর্বর বেআইনি আবওয়াব মিটিয়ে বেশির ভাগ আধিয়ারকেই শূন্যডালা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হত। আবার এসে হাত পাততে হত জোতদার মহাজনেরই কাছে। ফলে গলার ফাঁস আরও শক্ত হত।

আরও শত রকমের জুলুম ছিল চাষিদের ওপর। হাটে-বাজারে মালিক, জোতদার, জমিদার, ইজারাদারেরা ছোট ছোট দোকানিদের ওপর জবরদস্তি করত। খুশিমতো পয়সা আদায় করত, তরি-তরকারি, শাক-সবজির একটা অংশ কেড়ে নিয়ে যেত তোলাবটি হিসেবে। উত্তরবঙ্গে বসত বিরাট বিরাট মেলা। সেই সব মেলা ছিল, জোতদার জমিদারদের লুঠের উৎস। তোলাবটি খাজনা তো চড়া হারে ছিলই, তার ওপর ছিল গোরু মোষ ভেড়া ছাগল বেচা-কেনার জন্য রসিদ লেখাই বাবদ পশু প্রতি দু টাকা থেকে চার টাকা বা কোথাও বেশি হারে একটা পাওনা আদায়। এমনকী মেলাতে প্রকাশ্যে বেশ্যাপল্লী বসিয়ে চাষিদের নৈতিক অধঃপতনের পথ সাফ করে টাকা লুটতেও সামন্ত প্রভুরা কসুর করত না।

বিদেশি শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ কী? জমিদারি জোতদারি প্রথার জুলুমবাজি থেকে কৃষকদের মুক্তি কোন পথে? এই চিন্তা জাগল একদল মধ্যবিত্ত বিপ্লবী তরুণের মনে। এই তরুণের দল এক সময় মনে করত দেশকে স্বাধীন করতে হলে চাই সশস্ত্র বিপ্লব। অবশ্য তাদের সে বিপ্লবের ধারণা ছিল গোপনে অস্ত্র জোগাড় করে কিছু রাজপুরুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে দেশে প্রেরণা জাগানো এবং একদিন পুলিশ মিলিটারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে মুক্ত করা। বিদেশি শাসকের নির্মম পীড়নে অনেক বিপ্লবী তরুণকে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হল। হাজার হাজার তরুণকে বন্দি শিবিরে আটক করা হল। এমনি এক বন্দি শিবিরে আমিও আটক হয়ে গেলাম ১৯৩০ সালে।

বন্দি শিবিরে বসে বসে আমরা অনেক চিন্তা করলাম। আলাপ-আলোচনা করলাম। অনেক বই-পত্র পড়লাম। চোখের সামনে এক নূতন পথের নিশানা দিল রাশিয়ার ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। দেখলাম পৃথিবীর বুকে একটা দেশ থেকে রাজা, জমিদার, ধনিক, বণিক, সাম্রাজ্যবাদের শাসন শোষণের অবসান হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কৃষক-মজুর রাজ। বুঝলাম বিপ্লবের প্রাণশক্তি, সর্বহারা মজুর আর তার সাথে শোষিত কৃষককুল।

তত দিনে দেশে ১৯২৫ সালে শ্রমিকের বিপ্লবী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। ভারতে গড়ে উঠেছে শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল নিখিল ভারত শ্রমিক কৃষক পার্টির প্রথম সম্মেলন। তখন থেকেই এখানে সেখানে কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা শুরু হল। ১৯৩৬ সালে লখনউ শহরে বসল সারা ভারত কৃষক সম্মেলন। ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল বাংলার কৃষক সমিতি। কৃষক সমিতি আওয়াজ তুলল, "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই, লাঙল যার জমি তার"।

১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে বহু বিপ্লবী তরুণ নূতন পথের নিশানা নিয়ে জেল থেকে বের হয়ে এলেন। যোগ দিলেন, শ্রমিক কৃষক আন্দোলন গড়ার কাজে। ১৯৩৮ সালে আমরা অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার দুজন, কালী সরকার ও আমি নব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বের হয়ে এলাম বন্দিশালা থেকে। এসে দেখি কয়েকজন তরুণ নতুন পথের সন্ধান করছেন। তাদের পুরোভাগে ছিলেন সুশীল সেন। আমরা একত্রিত হয়ে ঠিক করলাম ছড়িয়ে পড়তে হবে দিনাজপুরের অনশনক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষপীড়িত, বঞ্চিত কৃষকদের মাঝে। এই কাজে বড় সাথী হলেন গুরুদাস তালুকদার। এলেন শচীন্দু চক্রবর্তী, বসন্ত চ্যাটার্জি, অজিত রায়, সুনীল সেন, জনার্দন ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে। সবাই মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের সন্তান। আমাদের ভেতর কালী সরকারেরই নাড়ির যোগ ছিল কৃষকদের সঙ্গে। বসন্ত চ্যাটার্জিও থাকতেন গ্রামে আর সবাই আমরা শহরের বাসিন্দা। গ্রামের মানুষ আমাদের কাছে প্রায় অপরিচিত।

আমাদের উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে দিনাজপুর-রংপুরের আদত বাসিন্দা হচ্ছেন রাজবংশী ও মুসলমান। পরে এসেছেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ। এঁরাই হচ্ছেন কৃষক। উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকেরা বেশির ভাগই এসেছেন বাইরে থেকে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও কিছু জোতদার, জমিদার হচ্ছেন এই উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকেরা। অবশ্য দেশীয়দের ভেতরও অনেক জোতদার ছিল।

ভদ্রলোক ও কৃষকরা যেন ছিল দুটো আলাদা জাত। তাদের বলবার ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি আলাদা। তার ওপর নানাভাবে বঞ্চিত কৃষকরা এই ভদ্রলোকদের দেখত সন্দেহের চোখে। তাই কৃষকদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের পথে আমাদের অনেক বাধা ছিল। তখনকার দিনে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মফস্বলে, জেলায়-জেলায় প্রধান স্থান ছিল কংগ্রেসের। গাঁয়ের সাথে শহরের যেটুকু রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল তা গড়ে তুলেছিল কংগ্রেসই।

আমরাও কংগ্রেসে যোগ দিলাম। জনসংযোগ কর্মী হিসাবে গ্রামে যাতায়াত শুরু করলাম। সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে লাগলাম কৃষকদের সঙ্গে। সভা-সমাবেশের আয়োজন চলল গ্রামে। গড়ে উঠতে থাকল 'কৃষক সমিতি', কংগ্রেস থেকে আলাদা সত্তা নিয়ে।

পুঁথির পাতায় কৃষকদের যে দুর্দশার কাহিনী পড়েছিলাম, বাস্তব জীবনে তার চেহারা দেখে আঁতকে উঠলাম। কৃষকদের বাড়িতে যখন দিন কাটিয়েছি দেখেছি তাদের নিজেদেরই মাথা গুঁজবার স্থান নেই, বাইরের মানুষ এলে জায়গা দেবে কোথায়? তাই হামেশাই গোরু ছাগলের সঙ্গে একই গোয়ালঘরে রাত কাটাতে হত।

দেখেছি উত্তরবঙ্গে প্রবল শীতে তাদের দেহে কোনও বস্ত্র নেই। পাট-প্রধান অঞ্চলে কোনও কোনও ভাগ্যবান গরিব চাষি চট গায়ে দিয়ে শীত কাটাত। পরনে তাদের কাপড় জুটত না। মেয়েরা অতিকষ্টে লজ্জা নিবারণ করত 'বুকনি' পরে। বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটুকরো কাপড় জড়ানো। আর পুরুষরা আক্ষরিক অর্থেই পরত লেংটি। দেখতাম দু'বেলা তাদের খাবার জোটে না। যা জোটে তাও শুধু পাটশাকের ঝোল আর মোটা ভাত।

এই নির্মম বাস্তব জীবন কৃষকদের টেনে নিয়ে এল কৃষক সমিতিতে। কৃষক সমিতির পতাকাতলে একজোট হতে থাকল কৃষকরা। তারা শুনল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন ও দাসত্বশৃঙ্খলের কথা। শুনল জমিদারি প্রথার গোড়ার কথা। অবাক বিস্ময়ে তারা শুনল রাশিয়ার কৃষক-মজুর বিপ্লবের কাহিনী। শুনল, ভারতের বেশি দূরে নয়, হিমালয়ের ওপারেই এমন একটা দেশ আছে, যেখানে রাজা জমিদার নেই, কায়েম হয়েছে কৃষক-মজুর রাজ।

শুনল, এ সমাজ পালটানো যায়। ব্যাপক জাগরণ দেখা দিল কৃষকদের ভেতর। সভায় সভায় আওয়াজ উঠল, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। জমিদারি-জোতদারি প্রথা ধ্বংস হোক। লাঙল যার, জমি তার। প্রথমে কৃষকরা আমাদের বিশ্বাস করতে পারত না। ভাবত, কোনও মতলব নিয়ে আমরা এসেছি। হয়তো তাদের বঞ্চিত করবার এই আর একটা ফন্দি। কৃষকদের বাড়িতে থেকে, তাদের সঙ্গে দিন-রাত মিশে, তাদের দাবি নিয়ে সভা-সমিতি করে, আন্দোলনে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে, তবেই আমরা কৃষকদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছি। ভাষার ব্যবধান, জাতির ব্যবধান ঘুচে গেছে। তারা বুঝেছে এই কর্মীরা কৃষকদের সত্যিকারের বন্ধু।

শুধু কথা নয় আন্দোলন

ব্যাপক প্রচার অভিযানে, সভা-সমিতি সমাবেশে কাজ হল। কৃষকরা জাগ্রত হল। সমিতি গড়ে উঠল। কিন্তু শুধু কথায় চলে না, কাজ চাই। কৃষক সমিতি প্রথমে ছোট্ট দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামল। হাটে-বাজারে তোলাবটির জুলুমের বিরুদ্ধে চলল প্রথম আন্দোলন। দাবি উঠল, কৃষকের তোলাবটি নেই। অনেক হাটে কৃষকরা তোলাবটি দিতে অস্বীকার করল। জোতদার, জমিদার হাটের মালিকরা চুপ করে বসে রইল না। জোতদার, জমিদার পুলিশের জুলুম শুরু হল। কৃষকরা দমল না। কোথাও কোথাও কৃষকরা হাট ভেঙে নিয়ে কৃষকদের নিজেদের হাট বসাল। এমনি ঘটনা ঘটল লাহিড়ী হাটে ও আরও কয়েক জায়গায়।

তোলাবটি বন্ধ আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে এল আলোয়াখোয়া মেলার আন্দোলন। ঠাকুরগাঁর উত্তর অঞ্চলে বসত বিরাট মেলা। চলত এক মাস ধরে। এই বিশাল মেলায় তোলাবটি, খাজনা, পশু বেচা-কেনার লেখাই, বেশ্যা তাঁবু বসিয়ে পয়সা লোটা, সব মিলে চাষিদের লুণ্ঠনের বেশ একটা ব্যবস্থা হত জমিদার প্রভুর।

কৃষক সমিতি আঘাত হানল লুণ্ঠনের এই প্রাণকেন্দ্রে। তোলাবটি, লেখাইয়ের বিরুদ্ধে

চলল আন্দোলন। মেলায় কৃষক সমিতির ঘাঁটি বসল। ক্যাম্প বসল জমিদার পুলিশেরও। কিছু ছোটখাটো সংঘর্ষ হল। কৃষকরা পিছু হটল না। মেলার পাশে নদী। নদীর ওপারে জলপাইগুড়ি জেলা। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক সমিতির সাথে একযোগে লেখাইয়ের জুলুমের প্রতিবাদে গো-হাটি ভেঙে নিয়ে যাওয়া হল ওপারে মেলার এলাকার বাইরে। রদ করা হল লেখাই। প্রবল উৎসাহ দেখা দিল। জমিদার-প্রভু উপায় না দেখে শেষে একটা রফায় আসতে বাধ্য হল। কৃষকের সে জয় সাড়া জাগাল গোটা দিনাজপুর জেলায়। এটা ১৯৩৯ সালের কথা।

তোলাবটি বন্ধ আন্দোলনের পর আধিয়ার আন্দোলন। তখনকার দিনে অনেক অঞ্চলে নিয়ম ছিল, আধিয়ার যে ফসল বুনেছে সেই ফসল কেটে দিয়ে আসবে জোতদারের গোলায় বা খোলানে। ভাগচাষি নির্মম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জানে, জোতদারের কব্জায় একবার ধান চলে গেলে তার কপালে আধি তো জুটবেই না, নানা অজুহাতে, নানা পাওনার নাম করে সেই আধি থেকে মোটা অংশ কেটে নেবে জোতদার। শেষ পর্যন্ত তাকে শূন্য হাতে ফিরতে হবে।

তাই আওয়াজ উঠল, আর জোতদারের খোলানে ধান নয়, নিজ খোলানে ধান তোলো। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এই আওয়াজ। আধিয়াররা বহু স্থানে ধান তুলতে লাগল নিজ খোলানে। আন্দোলন একটা ব্যাপক সংগ্রামের রূপ নিল। হাজার হাজার ভলান্টিয়ার গড়ে উঠল গোটা দিনাজপুর জেলায়।

আধিয়ার আন্দোলন জোতদারদের আতঙ্কিত করে তুলল। তারা দেখল তাদের ধান হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তারা পুলিশ ডাকল। শুরু হল দমন-পীড়ন। শত শত লুঠের মামলা দায়ের হল। বহু কৃষক গ্রেফতার হল।

তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দেশ জুড়ে নামল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। চলল চোরাকারবারি মজুতদারের ব্যাপক তাণ্ডব। কৃষক সভা পিছিয়ে থাকল না। রিলিফ ও লঙ্গরখানার কাজে নেমে পড়ল। ফুড কমিটি গড়তে লাগল। মজুত বিরোধী অভিযান শুরু করল। আবার আন্দোলন মাথা তুলল। কৃষক ভলান্টিয়াররা হাটে বাজারে পাহারা দিত। সারারাত রাস্তায়-রাস্তায় টহল দিত। রাতের আঁধারে চলা চোরাকারবারির গাড়ি ধরত। মজুতদারের গোপন মজুত ধরে সস্তা দরে বিলি করত। এতেও সংঘর্ষ বাধল। আবার নেমে এল দমন নীতি।

এই দমন-পীড়নের ভেতর দিয়ে কৃষকদের জীবনে এল এক নতুন অভিজ্ঞতা। গ্রেফতার এড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে আন্দোলন চালাবার অভিজ্ঞতা। গোপন সংগঠন গড়ার অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছিল কৃষক কর্মীরা।

১৯৩৮ সাল থেকে পাঁচ বছরের আন্দোলনের ভেতর দিয়ে কৃষকদের বিপুল সংগ্রামী চেতনা সৃষ্টি হল। গড়ে উঠল শক্ত সংগঠন। সঞ্চিত হল বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যে কৃষক ঘর ছেড়ে কোনওদিন এক পা নড়েনি,—তারা কাটিয়ে এল ইংরেজের কারাগারে। যে কৃষক যুবক ছিল অজ্ঞ, নিরক্ষর, তারা লিখতে পড়তে শিখল। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের ক্লাসেও যোগ দিল। গড়ে উঠল অনেক কৃষক কর্মী। এই কৃষক কর্মীরা নিজেরাই গ্রামে গ্রামে প্রচার করত, কৃষক সমিতি গড়ত, জিলা অফিসে রিপোর্ট পাঠাত, স্থানীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিত।

কৃষক মেয়েরাও পিছিয়ে ছিল না। গোপন চিঠিপত্র আনা-নেওয়া করা, খবরাখবর দেওয়া, যাদের মাথার উপর গ্রেফতারি পরওয়ানা ঝুলছে সেই নেতা ও কর্মীদের সাবধানে লুকিয়ে

রাখা, এই সব কাজে কৃষক বধূদের অবদান ভুলবার নয়। শুধু তাই নয়, কৃষক মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে যোগ দিতে থাকল প্রকাশ্য আন্দোলনে। গড়তে লাগল কৃষক মেয়েদের 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'।

এর পরের বড় ঘটনা ১৯৪৬ সালের আইন-সভা নির্বাচন। দিনাজপুর জেলায় কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক করল এবার নির্বাচনে খাস কৃষক সন্তানকে দাঁড় করানো হবে। রূপনারায়ণ রায় হলেন কৃষকদের মনোনীত প্রার্থী। রূপনারায়ণ ছিলেন ফুলবাড়ি এলাকার কৃষক নেতা। কিছু লেখাপড়া জানতেন। প্রচারে-সংগঠনে ছিলেন দক্ষ। শুধু ফুলবাড়ি এলাকাতেই নয়, জেলার বিভিন্ন অঞ্চলেও কৃষক সমিতি ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ক্রমে জেলার নেতা হয়ে উঠেছিলেন।

রূপনারায়ণ রায়কে ঘিরে বিরাট নির্বাচনি অভিযান চলল। আওয়াজ উঠল, আর জোতদার, জমিদারের লোককে নয়, ভোট দাও কৃষক সন্তান রূপনারায়ণকে। এতদিন পশ্চাৎপদ—অনুন্নত সম্প্রদায় হিসাবে যাঁরা কৃষকদের ভোট কুড়াতেন, কৃষকদের স্বজাতি হলেও তাঁরা ছিলেন জোতদার, জমিদার। এবার জাতি, সম্প্রদায়ের গণ্ডি ভেদ করে এল শ্রেণী চেতনা। স্বজাতির জোতদার প্রার্থী আর কৃষকদের মনে দাগ কাটতে পারল না। যে সবার পিছে, সবার নীচে, সেই বঞ্চিত অবহেলিত কৃষক শ্রেণীর নামটাই উঠে এল সবার উপরে। শ্রেণীচেতনা কৃষকদের এককাট্টা করল। একই জাতের জোতদার প্রার্থীর বিরুদ্ধে কৃষক প্রার্থী রূপনারায়ণের জয়লাভ বাংলার কৃষক আন্দোলনে এক নূতন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল।

নয় বছরের এই বিরাট সংগ্রামী ঐতিহ্য মাথায় নিয়ে দিনাজপুরের কৃষক নেমে পড়ল তেভাগা সংগ্রামে।

তেভাগার মরণজয়ী সংগ্রাম

১৯৪৬ সাল। ভারতের পটভূমি তখন বিপুল সম্ভাবনাময়। নানা ঘটনায় উদ্বেল। ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার পথে পথে চলেছে রশিদ আলি দিবসের দুর্জয় অভিযান। বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ এক নতুন দিকের ইঙ্গিত দিল। ২৯ জুলাই কলকাতায় শ্রমিক শ্রেণী এল সংগ্রামের ময়দানে। হল সাধারণ ধর্মঘট। কিন্তু শত্রু চুপ করে বসে রইল না। সেও আঘাত হানল। আঘাত এল নির্মম দাঙ্গারূপে আগস্ট মাসে। মনে হল সেই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা গ্রাস করবে গোটা বাংলা দেশকে। স্বাধীনতার দাবি ডুবে যাবে নিজেদের রক্ত স্রোতে।

ঠিক এমনি এক সংকট মুহূর্তে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি ডাক দিল তেভাগা সংগ্রামের। তে-ভাগা দাবির ন্যায্যতা ফ্লাউড কমিশনও মেনে নিয়েছিল। মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভাও বিল প্রণয়নের কথা ভাবছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তে-ভাগার দাবি মেনে নেবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে রংপুর দিনাজপুরে কৃষকরা বিপুল উৎসাহে নেমে পড়ল তেভাগার অভিযানে। নেতারা বুঝলেন শাসকরা সহজে ছেড়ে দেবে না। তাই গা-ঢাকা দিয়ে গোপনে থেকে সংগ্রাম চালাবার ব্যবস্থা করা হল। নেতারা এক-একটি এলাকা বেছে নিয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি চালালেন।

'নিজ খোলানে ধান তোলো', আওয়াজ তুলে আন্দোলন শুরু হল। ভাগচাষিরা দল বেঁধে

ধান কেটে নিজ খোলানে তুলতে লাগল। তাড়াতাড়ি ধান কেটে ফেলার জন্য কৃষক ভলান্টিয়াররা সাহায্য করল ভাগচাষিদের। সকল স্তরের—বিশেষ করে খেতমজুর, গরিব চাষি, মাঝারি চাষি—ভাগচাষিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলাল। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল অল্পবিস্তর সর্বত্র দিনাজপুরে ও রংপুরে।

যে সব এলাকায় ধান খোলানে তোলা হয়ে গেল এবার সেখানে কী করা হবে? ঠিক হল, জোতদারকে আইনসঙ্গত নোটিশ দিয়ে ধান ভাগ করা হবে। ভাগচাষিরা তে-ভাগা কায়েম করবে। জোতদারকে যথারীতি নোটিশ দেওয়া হল। কিন্তু জোতদার সে-নোটিশ অস্বীকার করল। তখন ভাগচাষিরা গাঁয়ের দশজনকে সাক্ষী রেখে ধান ভাগ করল। ধান তিন-ভাগে ভাগ হল। ভাগচাষি দু ভাগ নিয়ে জোতদারের জন্য রেখে দিল এক ভাগ।

এই তে-ভাগা কায়েমের সংগ্রাম জোর বাঁধল দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমায়। তে-ভাগার কথা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। সমিতির সংগঠিত এলাকার বাইরেও তে-ভাগা কায়েমের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল কৃষক কর্মীদের অজ্ঞাতসারেই। দূর দূর গ্রাম থেকে কৃষকরা আসতে লাগল সমিতির কাছে। লাঠি হাতে তারা নিজে থেকেই কখন ভলান্টিয়ার হয়ে গেছে, সমিতির অফিসও খুলেছে। তারা অভিজ্ঞ কর্মীদের নিয়ে গেল তাদের এলাকায়।

শত শত গ্রাম্য 'কৃষক সমিতি' গড়ে উঠল। হাজার হাজার কৃষক সমবেত হল সমিতির লাল ঝান্ডার নীচে। আর সেদিন সমিতির প্রতিটি সদস্যই ছিল লাঠিধারী ভলান্টিয়ার। তে-ভাগা দাবির আওয়াজ তুলে কৃষকরা মিছিল করে জোতদারের বাড়ি ঘেরাও করতে লাগল। পরবর্তীকালে সংগ্রামের স্বীকৃত রূপ হিসেবে যে 'ঘেরাও' চালু হল, সেই ঘেরাও শুরু করেছিল তে-ভাগা সংগ্রামী কৃষকরা।

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার বহু অঞ্চলে, বিশেষ করে ঠাকুরগাঁয়ে গ্রামের পর গ্রাম লালঝান্ডার গ্রামে পরিণত হল। সর্বত্র উঠল লালঝান্ডার জয়ধ্বনি 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' আওয়াজ। তে-ভাগার আন্দোলন সামান্য দু মুঠো ধানের আন্দোলন হলেও তার পেছনে রাজনৈতিক চেতনা কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করল।

আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে। কিন্তু আন্দোলনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। পথে বাধা ছিল প্রচণ্ড। রাজবংশী ক্ষত্রিয় জোতদার জমিদারদের একটা জাতীয় সংগঠক ছিল 'ক্ষত্রিয় সমিতি'। মুসলমান জোতদার, জমিদার সমবেত হল মুসলিম লিগে। সাম্প্রদায়িকতার নাম করে এই দুটি কায়েমি স্বার্থের দল সাধারণ কৃষকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। তারা কিছুটা সফলও হল কোথাও কোথাও। বিশেষ করে লিগের প্রচার মুসলমান প্রজাদের দ্বিধাগ্রস্ত করল।

সন্দেহ নেই মুসলমান কৃষকরাও অনেক অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনে এসেছিল। বিখ্যাত মুসলমান নেতা হাজি মহম্মদ দানেশ মনে-প্রাণে যোগ দিয়েছিলেন কৃষক সংগ্রামে। মুসলমান কৃষকদের সংগঠিত করায় তাঁর অবদান কম ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান কর্মীও গড়ে উঠেছিল। তবু স্বীকার করতে হবে ব্যাপকভাবে মুসলমান কৃষকরা আন্দোলনে নামেনি। যেমনটি এসেছিল রাজবংশী, আদিবাসী সাঁওতাল কৃষকরা। এই সব বাধা সত্ত্বেও এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রাম সেদিন সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ধ্বসিয়ে দিয়েছিল। খেতমজুর থেকে মাঝারি কৃষক তো বটেই এমনকী ধনী কৃষকরাও অনেকে ভাগচাষিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের আশা, তেভাগা আন্দোলন হলে,

জোতদারের বিরুদ্ধে একটা লড়াইয়ে বিজয়ী হলে, পরবর্তী লড়াইয়ের পথ লাঘব হবে। তখন হবে জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই।

আন্দোলনের প্রথম দিকটায় জোতদাররা ঘাবড়ে গেল। ঘেরাওয়ের ভয়ে জোতদাররা গাঁয়ের বাড়ি ছেড়ে পালাল। পুলিশও মনস্থির করতে পারেনি। কর্মীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গ্রেফতারি পরওয়ানা। কিন্তু পুলিশ গ্রামে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। এ অবস্থা বেশিদিন চলল না। রাজশক্তি আঘাত হানার পরিকল্পনা নিল। প্রথম আঘাত এল আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থান চিরির বন্দরে।

সশস্ত্র পুলিশ চিরির বন্দরের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের গ্রেফতার করতে এগিয়ে এল। চারশত কৃষক একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানালেন। পুলিশ জবাব দিল গুলির মুখে। ১৯৪৭ সালের ৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শহিদ শিবরাম ও সমিরুদ্দিন। কলকাতার আত্মঘাতী দাঙ্গার প্রায়শ্চিত্ত করলেন এই দুই কৃষক সন্তান। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্ত নতুন ইতিহাসের দিগন্ত রচনা করল।

২রা ফেব্রুয়ারি এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল ঠাকুরগাঁও-এর রানী শংকৈলে। পুলিশ এল কর্মীদের গ্রেফতার করতে। বাধা দিল কৃষক মেয়েরা। হঠাৎ এক কৃষক বধূ পুলিশের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে পুলিশের ছোটকর্তাকে ঘরে আটক করে তালাবন্ধ করে দিল। মেয়েটির নাম ভাগুনী।

দিনাজপুরের যে অজ্ঞ কৃষক একদা পুলিশের লাল পাগড়ি দেখলে ভয়ে শিউরে উঠত, সেই কৃষককে অসীম সাহস জুগিয়েছে কৃষক আন্দোলন। তাই তো কৃষক মেয়েও পুলিশের বন্দুক কেড়ে নেবার স্পর্ধা রাখে। এমনি করেই তেভাগা আন্দোলনে সংগ্রামের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন কৃষক মেয়েরা। কৃষক মেয়েদের অনেকে পার্টির সর্বসময়ের কর্মীও হয়েছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সর্বসময়ের কর্মী এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পষ্টরাম সিং ও জয়মণি ছিলেন এমনি এক দম্পতি।

শুধুই কি দম্পতি? তেভাগা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ অনেক অজ্ঞাত কৃষক নারীকে মরণজয়ী সংগ্রামের পুরোভাগে এনে দাঁড় করিয়েছিল। এমনি বীর নারী ছিলেন খাঁপুরের যশোদারানি ও কৌশল্যা। ঠুমনিয়ার শুকুরচাঁদের স্ত্রী। পুলিশের নির্মম গুলিবর্ষণ তুচ্ছ করে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু পেছু হটেননি।

এবার পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল তেভাগা আন্দোলন দমনে। ২০ ফেব্রুয়ারী খাঁপুরের নির্মম হত্যাকাণ্ড ইংরেজ শাসকের বর্বরতার এক চূড়ান্ত নিদর্শন রেখে গেল। আর সেই সঙ্গে চির উজ্জ্বল হয়ে রইল বীর কৃষকদের অসীম শৌর্য ও আত্মাহুতি। গাড়ি বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ এল দমন-পীড়ন চালাতে। কয়েক শত সাঁওতাল ও রাজবংশী কৃষক প্রতিরোধে এগিয়ে এল। পুলিশ খুনের-নেশায় উন্মত্ত হয়ে ১২১ রাউন্ড গুলি চালাল। প্রাণ দিলেন যশোদারানি, কৌশল্যা সহ বাইশ জন মরণজয়ী বীর। শহিদের রক্তে সিক্ত হল খাঁপুরের মাটি। বালুরঘাট মহকুমার খাঁপুরের পর ঠাকুরগাঁও-এর ঠুমনিয়া। ২১ ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এল কৃষক নেতা কম্পরাম সিং ও ডোমা সিংকে গ্রেফতার করতে। ঘেরাও করল ডোমার বাড়ি। নেতাদের গ্রেফতারে বাধা দিলেন কৃষকরা। সামনে এগিয়ে এলেন শুকুরচাঁদ ও তাঁর স্ত্রী পুলিশের গুলি উপেক্ষা করে। তাঁরা রুখে দাঁড়ালেন। পুলিশ তাক করে গুলি ছুড়ল। লুটিয়ে পড়লেন বীর কৃষক-দম্পতি। শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এলেন শকটু সিং আর নেন্দেলি সিং। বর্বর পুলিশের গুলি তাঁদেরও বুক ছিন্নভিন্ন করে দিল। চার শহিদের রক্তে লাল হল

তেভাগার পতাকা।

এর পর ২৫ ফেব্রুয়ারি। বর্বর কৃষক-হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ও তে-ভাগার দাবিতে বিরাট সংহতি মিছিল চলল পূর্বাঞ্চল থেকে ঠাকুরগাঁ শহরে। এটা ছিল তেভাগা আন্দোলনের বৃহত্তম মিছিল। মিছিল ছিল শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল। কিন্তু রাজশক্তি তখন মরিয়া। খুনের নেশায় মত্ত। কোনও হুঁশিয়ারি দেওয়া হল না। বন্দুক গর্জে উঠল সেই বিশাল শান্ত কৃষকজনতার উপর। বেপরোয়া গুলি চলল। হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতালের বুকের রক্তে ঠাকুরগাঁ শহরের রাজপথ ভেসে গেল। দু জন সাঁওতাল, দু জন রাজবংশী ও এক জন মুসলমান কৃষক প্রাণ দিলেন।

কৃষকরা তবু দমলেন না। শত শত কর্মী চাইলেন আন্দোলনকে সশস্ত্র প্রতিরোধের দিকে এগিয়ে নিতে। কিন্তু তখন পুরোদমে পুলিশি আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। আন্দোলনকে উচ্চতর পর্যায়ে তোলার প্রচেষ্টা বৃথা। তাই পিছু হটার নীতিই গ্রহণ করা হল। চেষ্টা হল কর্মীদের গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচানো। কৃষক সাধারণকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা।

সশস্ত্র পুলিশ জোতদার, জমিদারের গুণ্ডাদলের সাহায্যে গ্রামকে গ্রাম চড়াও করতে লাগল। কৃষকের বাড়ি তল্লাশির নামে ভাঙচুর, লুঠতরাজ চলল। সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে ঢুকছে দেখলেই কর্মীরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ত। দিনের বেলায় পুরুষরা গ্রাম ছেড়ে বনে-জঙ্গলে, নিরাপদ গ্রামে চলে যেত। তবু দিনাজপুর জেলায় প্রায় পনেবশো কৃষক কর্মী গ্রেফতার হল। কৃষক বন্দিতে ঠাকুরগাঁ দিনাজপুর ও রাজশাহী জেল ভরে গেল। নেতাদের ভেতর রূপনারায়ণ রায়, সুনীল সেন, গুরুদাস তালুকদার, বসন্ত চ্যাটার্জি প্রমুখরা ধরা পড়ে গেলেন। বাকি নেতারা সেই কঠোর পিছু হঠার দিনগুলিতে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সঙ্গে তাদের সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে রইলেন।

এমনি করেই চলল কয়েক মাস। ওদিকে ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। ব্রিটিশ সরকার বুঝল বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আর দেশ শাসন করা চলে না। তবুও শেষ রক্ষাকবচ হিসেবে তারা ভারতকে দু' ভাগ কবে দিল। দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনের বিরাট এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। বন্দিরা মুক্তি পেলেন। বিদেশি রাজ স্বাধীনতার দাবিকে আর ঠেকাতে পারল না। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের শুভ দিনটিতে উড্ডীন হল স্বাধীনতার পতাকা।

শেষ হল কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়।

শেষ কথা

অনেকে প্রশ্ন করেন, তেভাগা আন্দোলন কি ব্যর্থ হয়েছে? আমার স্পষ্ট জবাব, না ব্যর্থ হয়নি। কৃষকদের এই বিরাট আন্দোলন দেশবাসীর সামনে ভূমি সংস্কারেব প্রশ্নটি বিশেষ ভাবে তুলে ধরতে পেরেছে। আর তারই ফলশ্রুতি পরবর্তীকালে তেভাগার স্বীকৃতি, জমিদার প্রথার অবসান ও কিছু ভূমি সংস্কার।

এ কথা ঠিক, তে-ভাগা আন্দোলন সেদিন তার সফল পরিণতিতে পৌঁছতে পারেনি। তার কারণ, এই আন্দোলনে কয়েকটি বড় ত্রুটি ছিল।

প্রথমত এই আন্দোলন দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র ভাবে

অগ্রসর হয়েছিল। দেশের সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষ এই আন্দোলনকে নিজেদের আন্দোলন বলে মনে করতে পারেনি। এর বিপ্লবী গণতান্ত্রিক চরিত্র উপলব্ধি করতে পারেনি। এই আন্দোলন যে মধ্যবিত্তদের টানতে পারেনি তার একটি কারণ শহরের উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, মধ্যবিত্তদের অনেকেরই গ্রামে অল্প-বিস্তর জমি ছিল এবং সে জমি ভাগচাষি দিয়ে চাষ করানো হত। তাই তারা অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে এবং অনেকে নির্বিকার থেকেছে। নেতৃত্বের দিক থেকে এই ছোট জোতদার ও স্বাধীনতাকামী মধ্যবিত্তদের টেনে আনার উপযুক্ত পথ গ্রহণ করা হয়নি।

প্রয়োজন ছিল তে-ভাগার দাবি যে ন্যায্য, এই আন্দোলন যে মূলত সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক প্রকৃতির, এটা যে স্বাধীনতা সংগ্রামেরই সহায়ক, সে বিষয়ে প্রদেশব্যাপী প্রচার অভিযান চালানো।

দ্বিতীয়ত আন্দোলনের প্রথম দিকে শ্রমিক নেতৃত্ব কৃষকদের এই আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানালেও কার্যক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। কৃষকদের দাবি নিয়ে প্রচার ও সংহতিমূলক সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারেনি। শ্রমিক কৃষকের মিলিত সংগ্রাম-অভিযানই এই আন্দোলনে প্রাণশক্তি জোগাতে পারত। আর শ্রমিক-কৃষক সংহতির জোয়ার মধ্যবিত্তদেরও টেনে আনতে পারত। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের মিলিত আন্দোলনই তেভাগা আন্দোলনকে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত।

তৃতীয়ত এই আন্দোলন দেশের স্বাধীনতাকামী অন্যান্য শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নানা অপপ্রচারের সুযোগ পেয়েছে, কমিউনিস্ট বিরোধিতার জিগির তুলেছে। আর তারই ফলে বিদেশি রাজের হাত শক্ত হয়েছে। তারা নির্বিবাদে দমন-পীড়ন চালাতে পেরেছে।

এই হল আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ত্রুটির দিক। কিন্তু ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের পথে তেভাগা আন্দোলন কয়েকটি উজ্জ্বল দিক তুলে ধরেছে।

প্রথমত তেভাগা আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে কৃষককুলের ভিতর কী প্রচণ্ড শক্তি নিহিত। এই শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারলে কী বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলতে পারা যায়!

দ্বিতীয়ত কৃষক আন্দোলন গড়তে হলে চাই, কৃষকদের নিজস্ব গণসংগঠন। গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির জাল বিস্তার করতে হয়। শুধু প্রচার অভিযানই নয়, সময়মতো উপযুক্ত দাবি নিয়ে আন্দোলনই কৃষকদের সংগঠিত করার শ্রেষ্ঠ উপায়। আবার সংকটের দিনে গঠনমূলক সংগ্রামও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে।

তৃতীয়ত এটাও দেখা গেছে বাইরে থেকে বিপ্লবী মধ্যবিত্ত কর্মীরা যদি গ্রামে এসে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পারে—কৃষকদের সাথে একাত্ম হয়ে উঠতে পারে—তবেই কৃষকদের আস্থা অর্জন করা যায়—তাদের সংগঠিত করা যায়।

চতুর্থত শুধু মধ্যবিত্ত কর্মী থাকলেই চলে না; কৃষকদের ভেতর থেকে কর্মী ও নেতা গড়ে তুলতে পারলে তবেই সে আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে ও সত্যকারের কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়।

পঞ্চমত আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলে কর্মীর অভাব হয় না। টাকা পয়সার অভাব হয় না, আর অনেক অজানা, অখ্যাত কর্মী অপূর্ব বীরত্ব দেখায়, দুর্জয় সাহসে এগিয়ে আসে, নির্ভয়ে প্রাণ দেয়। তাই কৃষকদের এই বিরাট আন্দোলন—এই অসীম আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়নি।

তেভাগা আন্দোলনের দাবি সামান্য অর্থনৈতিক দাবি ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু গোটা

পটভূমি, তার গতি ও পরিণতি নিছক অর্থনৈতিক প্রকৃতির ছিল না। তখনকার দিনের কৃষক আন্দোলনের প্রায় এক দশকের পরিণতিতে যে তেভাগার লড়াই শুরু হয়েছিল, সেই কালপর্ব জুড়ে কৃষকদের ভেতর এসেছিল এক নব জাগরণ, এক নব চেতনা, শ্রেণীচেতনা।

ইংরেজ আমলে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল দুটি। রাজনৈতিক দিক থেকে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করে দেশ স্বাধীন করা আর সামাজিক দিক থেকে মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীল জোতদারি, জমিদারি ব্যবস্থা, যা দেশের অগ্রগতির পথে ছিল প্রধান বাধা—সেই সামন্ত ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া।

আন্দোলন সফল হল, কি সাময়িকভাবে ব্যর্থ হল তাই দিয়ে কোনও আন্দোলনের বিপ্লবী ভূমিকার বিচার হয় না। যতদিন শোষণ ব্যবস্থা কায়েম থাকে—ততদিন নানা কারণে আন্দোলনের সাময়িক পরাজয় হতেই পারে। কিন্তু তাতে আন্দোলনের প্রকৃতি বদলে যায় না। আন্দোলনকে বিচার করতে হয় সে যুগের বিপ্লবের পটভূমিতে। কোন শ্রেণী প্রধান শত্রু, কোন শ্রেণী সেই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে,—আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাকে আঘাত করছে কিনা—প্রভৃতির নিরিখে সেই আন্দোলনের চরিত্র বিচার হয়। সেই বিচারে তেভাগা আন্দোলন ছিল সামন্ত শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

সে দিনের বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহ যেমন পরাজিত হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কাঁপিয়ে তুলেছিল—স্বাধীনতার আন্দোলনে তার ছিল বড় একটা অবদান, তেমনি তেভাগা আন্দোলন পরাস্ত হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার তল্পিবাহক সামন্ত প্রভুদের জোর ধাক্কা দিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অবদান পরোক্ষ হলেও নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য।

তেভাগা আন্দোলন সামান্য তে-ভাগার দাবিতে শুরু হলেও দাবিটা আধিয়ার বা ভাগচাষির দাবি হলেও—যেহেতু এই আন্দোলন, গোটা সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ছিল বিদ্রোহ, তাই প্রায় সর্বস্তরের কৃষকই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এই বিদ্রোহী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। বড় জোতদার, জমিদার দলও শ্রেণী হিসেবে এই আন্দোলনের প্রতিরোধে নেমেছিল। যাদের কৃপায় পুষ্ট এই শোষক শ্রেণী—সেই বিদেশি ইংরেজ প্রভুদের রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয় তারা নিয়েছিল।

ফলে সামন্তবাদ বিরোধী তেভাগার আন্দোলন কৃষকদের একেবারে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে, এই আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক রূপ দিয়েছিল।

তাই শেষ বিচারে তেভাগার লড়াই ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লবী প্রকৃতির।

তখনকার মতো পরাজিত হলেও শহিদের রক্তে স্নাত তেভাগা আন্দোলন ভাবীকালের জন্য রেখে গেছে এক গৌরবময় বিপ্লবী ঐতিহ্য।

দিনাজপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের গোড়ার কথা

জনার্দন ভট্টাচার্য

নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন হয় গয়াতে। সেখানেই কৃষক সমিতি থেকে প্রদেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় কতগুলি দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে কৃষক আন্দোলন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। দিনাজপুরেও আমরা যারা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন তারা বোধ হয় একুশ দফা দাবির ভিত্তিতে ঠাকুরগাঁও মহকুমার সর্বত্র, চিরির বন্দর, ফুলবাড়ি, ইটাহার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার চালাই। এই প্রচারে বিস্তর কৃষক আমাদের জমায়েতে হাজির হতেন এবং আমাদের দাবিদাওয়া যে ন্যায্য তা বুঝতেন। প্রচারের ফলে বিপুল সমর্থন পেয়েও আমরা কৃষকদের সক্রিয়ভাবে কোনও সাহায্য দিতে পারতাম না। কিছুদিন এইরূপ গত হবার পর প্রথম সক্রিয় সাহায্য দেবার উপায় পেলাম জলপাইগুড়ির কমরেডদের মারফত। তাঁরা তাঁদের সেখানকার হাটে তোলাবটি বন্ধ আন্দোলন করে কৃষকদের সাহায্য এবং সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিল। আমরাও তখন এই অঞ্চলের হাটে তোলাবটি বন্ধ আন্দোলন শুরু করি। তাতে ব্যাপক হতে ব্যাপকতর কৃষকদের সমর্থন পাই। ওই সময় দিনাজপুর জেলার মেলা (পশু মেলা) বিখ্যাত ছিল। তার মধ্যে আলোয়াখোয়া সবচেয়ে নামকরা। এইখানে হাজার হাজার গোরু কেনা-বেচা হত। বিহারের কতগুলি অঞ্চলেও এই মেলার জমায়েত হত। গোরু লেখাই হার অত্যন্ত বেশি থাকায় আমরা হাটে গোরু লেখাই কম করার দাবি করে আন্দোলন শুরু করি। এই আন্দোলনে সমস্ত কৃষক অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সমিতির পেছনে আরও সংঘবদ্ধ হতে লাগল। আমরা তখন কৃষক ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করি। কৃষকদের হাতে লাঠি দিই। তারপর আমরাও ওই মেলায় কয়েক হাজার লাঠিধারী ভলান্টিয়ার নিয়ে চড়াও করি। ইতিমধ্যে মেলার মালিক ডিভিশন্যাল কমিশনারকে জরুরি বার্তা পাঠান। সশস্ত্র পুলিশসহ ডিভিশন্যাল কমিশনার মেলার মালিকের আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমরা গোরুর লেখাই খরচ কম করবার জন্য কৃতসংকল্প। অপরপক্ষ আমাদের দাবি পূরণ না করার জন্য কৃতসংকল্প। এমতাবস্থায় তখনকার কমরেডরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মেলা ভেঙে নদীর ওপারে অর্থাৎ বিহারের মাটিতে নিয়ে যাব। শেষ পর্যন্ত তাই-ই করলাম। হাজার হাজার গোরু কৃষক সমিতির মিল দেওয়া কাগজের টুকরোয় বিক্রি পর্ব শেষ করলাম। এর পর অন্যান্য মেলাতেও এই উপায়ে গোরুর লেখাই কম করে দিলাম।

এর পরেই কৃষক প্রতিনিধিকে বিধানসভায় পাঠাবার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করি। তার জন্য ব্যাপকভাবে সমস্ত অঞ্চলে প্রচার চালাই। আমরা জানতাম যে, সমস্ত জেলাব্যাপী সমাজের সংগঠন নেই। কংগ্রেসের সংগঠন না থাকলেও তার নাম আছে। আমাদের ঘাঁটিগুলোতে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রত্যেক ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত রাখতে এবং ভোট দিতে বাধ্য করলাম। যার ফলে, ওই নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী জয়ী হয়ে বেরিয়ে এলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে তফশিলি কেন্দ্রে এই আমাদের প্রথম জয়। ভোট পর্ব শেষ। ভোট

কেন্দ্র থেকে আমরা সবাই এসে জড়ো হলাম শহরে। মুখে আমাদের বুলি, "ভোট শেষ, এবার লড়াই শুরু।"

১৯২৮ সালে রুহিয়া পর্যন্ত রেলগাড়ি স্থাপিত হয়। পূর্বেও ঠাকুরগাঁও মহকুমার সঙ্গে শহরের কেন্দ্রের কোনও সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। প্রথমে গো-যান। তারপর মোটরগাড়ি। তারপর ১৯২৮ সালে রেলওয়ে—রুহিয়া পর্যন্ত। সুতরাং ঠাকুরগাঁও মহকুমা এক কথায় বলতে গেলে, জোতদার, মহাজনদের এবং সরকারি আমলাদের তীর্থস্থান। এখানে ছোট ছোট কৃষকরা জমিহীন। বেশিরভাগ ধনী জোতদাবরাই অন্য রাজ্যের। সুতরাং তাঁদের শোষণে, নিষ্পেষণে এদের ন্যায্য পাওনা থেকে এরা শুধু বঞ্চিতই হয় নাই—এদের পারিবারিক জীবনের ওপরেও জোতদার, মহাজনদের আধিপত্য ছিল। জোতদারদের বিনা অনুমতিতে কৃষকরা তাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহ পর্যন্ত দিতে পারত না। আমরাও এই মহকুমাকেই আমাদের লড়াইয়ের কেন্দ্ররূপে বেছে নিলাম। আমাদের প্রথম আওয়াজ, 'নিজ খোলানে ধান তোলো।' নিজ খোলানে ধান তোলার আওয়াজ সর্বত্র দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। 'নিজ খোলানে ধান তোলো এবং তা নিজেদের লাঠিধারী ভলান্টিয়ার দ্বারা রক্ষা করো'। এই প্রচারে সর্বত্র ছোট ছোট কমিটি গঠিত হল। নিজ খোলানে ধান তোলার দাবি শুনেই জোতদাররা সচকিত হয়ে পড়ল। তারাও তাদের উপরের শাকরেদদের পুনঃ পুনঃ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের জন্য আবদার শুরু করল। পুলিশ বাহিনীও গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প বসাল। আমরাও আমাদের সংগঠন সেই অনুসারে গঠিত করলাম।

ধান নিজেদের খোলানে উঠতে লাগল। যারা স্বেচ্ছায় আমাদের এই ন্যায্য দাবি মেনে নিতে স্বীকৃত হল আমরা তাদের ন্যায্য অংশ দিতে কৃষকদের উপদেশ দিলাম। ছোট ছোট জোতদাররা এই অংশ নিয়ে আমাদের সঙ্গে রফা করল এবং আমাদের আন্দোলনের পেছনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু মাঝারি ও বড় জোতদাররা কিছুতেই আমাদের এ দাবি মানতে রাজি হল না। তারা কৃষকদের বিরুদ্ধে কোর্টে হাজার হাজার মামলা দায়ের করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আমরা আমাদের দাবি নিয়ে এগিয়ে চললাম। মাঝারি ও বড় জোতদাররা এ দাবি মেনে নিতে অসম্মত হওয়ায় এবং কোর্টে মামলা দায়ের করায় আমরা সর্বত্র অবিলম্বে ধান মাড়াই করার নির্দেশ দিলাম। জোতদার যদি এই দাবিতে রাজি হয়ে তার অংশ নিতে আসে তা হলে তার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দেবে—অন্যথায় একজন বিশ্বাসী লোকের নিকট তার অংশ জমা রেখে দেবে। জোতদাররা আপসে না এসে পুলিশ ও কোর্ট কাছারির উপর নির্ভর করে কৃষকদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা দায়ের করল এবং গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ পাঠিয়ে একটি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল। এর ফলে প্রায় হাজারের উপর কৃষক নেতাকে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হল। ওইখানেই দিনাজপুরের বিখ্যাত কৃষক নেতা কম্পবাম সিং গুলিতে মারা যান। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা যারা অ-কৃষক মধ্যবিত্ত কমরেড এই কাজকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম—তারা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মগোপন করে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করতাম।

আমরা কখনও এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। সবসময় পুলিশ ও জোতদারের দালালের চোখে ফাঁকি দিয়ে কৃষকদের ভেতর ঘুরে বেড়াই। কৃষকরাও (মেয়েসহ) আমাদের সবসময় চোখের মণি করে রাখত' আমাদের মহিলা ভলান্টিয়াররাও হাতে লাঠি, গাইন ইত্যাদি নিয়ে মিছিলে যোগদান করতেন। মহিলারাও ছিলেন এক একজন তেভাগা সৈনিক। সেই সৈনিক হিসাবে তাঁরাও তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। এখানে বলে

রাখা প্রয়োজন যে, আন্দোলনের চরম লগ্নে এস. ডি. ও. সাহেব জোতদার ও কৃষক আন্দোলনের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠকে বসে দাবিদাওয়ার সর্বসম্মত একটি ফর্মুলা বের করেন। ওই ফর্মুলা সর্বত্র প্রচারিত হবার জন্য মিটিং, সভা সমাবেশ ইত্যাদিও সংঘটিত হয়। এখানে জানিয়ে রাখি, সেই সময়ে যুদ্ধের অবস্থা। সভা-সমাবেশ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কিন্তু এই মিটিং-এর গরজে এস. ডি. ও. সাহেব তখন কৃষক প্রতিনিধিদের মিটিং-এ বসা ও ভাষণ দেবার দাবি স্বীকার করে নিয়ে মিটিং করার অনুমতি দিলেন। তিনিও ওই মিটিং-এ উপস্থিত হয়ে কৃষকদের দাবির যথার্থতা স্বীকার করে নিলেন। এই মিটিং-এ আন্দোলনের উপর একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং সেই প্রস্তাবের শর্তগুলি সর্বত্র প্রচারিত হয়। সবাইকে সেই অনুসারে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

আমরা আমাদের দাবি শান্তিপ্রিয় উপায়েই আদায় করার পক্ষপাতী ছিলাম। আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত। মহাত্মা গান্ধী আমাদের দাবি ন্যায্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। সুরাবর্দি সাহেবের সরকারও দাবির যথার্থতা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের জেলার কয়েকটি স্থানে সরকার গুলি চালিয়ে কৃষককে হত্যা করে। তার মধ্যে শিবরাম ও সমিরুদ্দিন অন্যতম। এই আন্দোলনে মহিলারাও যে পেছু-পা নয় তারও নিদর্শন পাওয়া যায় রানী শংকৈল-এর সংঘর্ষে মহিলা কমরেড জয়মণি কর্তৃক পুলিশের রাইফেল ছিনিয়ে নেবার ঘটনায়।

ফসল তোলা এবং ভাগ শেষ। কিন্তু আসল লড়াই সামনে। জোতদাররা মামলা করে জমির দখল হস্তগত করার ফিকিরে আছে। আমাদের নির্দেশ জমির উপর লাঠিধারী ভলান্টিয়ারসহ জমির দখল রাখা। কোনও অবস্থাতেই দখল ছাড়া হবে না। জমি দখলের লড়াইয়ে কয়েকটি স্থানে সংঘর্ষ হয়। তার ফলে রক্তপাত অবশ্যই হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা চলে—আধিয়ার তার জমির উপর দখল রাখতে সমর্থ হয়েছে।

হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, সাঁওতাল, রাজবংশী প্রমুখদের মিলিত সংগ্রাম সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের কূট চালে দেশ বিভাগ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমরা পরাজিত ও বিপর্যস্ত। যারা একদিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামের সাথী ছিল তারাই পরে হিন্দু মুসলমানরূপে পরিণত হল। ইংরেজ রাতারাতি দেশ ভাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কমরেডরাও হিন্দু মুসলমান বলে চিহ্নিত হলাম। আমরা আর কমরেড রইলাম না। সুতরাং দেশ ছেড়ে পালানোর হিড়িক পড়ল। সেই পালানোর হিড়িকে আমরাও নিজ নিজ স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হলাম।

স্মৃতিতে দিনাজপুর জেলার কৃষক সংগ্রাম

অজিত রায়

উনিশশো ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ সাল। আমার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মোহ কেটেছে। কংগ্রেস আন্দোলনের উপরও আস্থা নাই। রুশ বিপ্লবের জোয়ার আমাব মনে এনেছে নতুন আলোড়ন। রুশ বিপ্লবকে বুঝবার জন্য মার্কসবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু বই পডতে শুরু কবি। সরকার হতে নিষিদ্ধ করায় সে সময় ওইসকল বই পাওয়া খুবই মুশকিল ছিল। ওই সময় আটক রাজবন্দিরা মুক্ত হয়ে আসতে থাকে। কমরেড বিভূতি গুহও মুক্ত হয়ে আসে। কমরেড গুহ এবং আরও অনেক বন্দি জেলে থাকতে মার্কসবাদ সম্বন্ধে বেশ ভাল পডাশুনো করে এসেছেন। আমরা রোজ কংগ্রেস অফিসে বসে আড্ডা দিতাম। কমরেড গুহ এসেই সন্ধ্যায় কংগ্রেস অফিসে আলোচনাচক্র খুলে বসলেন। সেখানে হিউম সাহেবের কংগ্রেসের ইতিহাস হতে শুরু কবে, নানা বিষয়ে আলোচনা হত। ওই আলোচনায় যোগ দিতাম আমি, কমরেড সুশীল সেন, জনার্দন ভট্টাচার্য, কালিপদ ধর আর মুক্ত বন্দিরা। তা ছাড়া জিলা কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় শ্রীলোকেন সেন, রতন সেন, প্রভাত সেন ইত্যাদিও যোগ দিতেন। নানা বিষয় বুঝবার জন্য আমি কমরেড গুহর বাড়িতেও মাঝে মাঝে যেতাম। রুশ বিপ্লবের ও মার্কসীয় পুস্তকাদি পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম, দেশের প্রধান শক্তি—মজদুর ও তার সহগামী শক্তি কৃষক। কৃষক মজদুরকে সংগঠিত করে আন্দোলনে নামাতে না পারলে ভারত কোনওদিনই স্বাধীন হবে না। দিনাজপুর কৃষক-প্রধান জিলা। জিলার কৃষকদেব সংগঠিত করে আন্দোলনে নামাতেই হবে। কিন্তু কেমন করে? তখন পর্যন্ত আমাদেব দাঁড়াবাব ঠাঁই জাতীয় কংগ্রেস। যা কিছু করতে হবে কংগ্রেসকে নিয়েই করতে হবে। লখনউ-এর কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত গণসংযোগ প্রস্তাবকে ভিত্তি করে আমরা গ্রামে যাওয়া স্থির করি। জিলা কংগ্রেস নেতা লোকেন সেনকে (বাদলদা) নিয়ে আমি, কমরেড সুশীল সেন, জনার্দন ভট্টাচার্য গেলাম রায়গঞ্জের দিকে। বাদলদা আমাদের উপস্থিত করল জমিদার, জোতদারের বাড়িতে। গ্রামে কংগ্রেসের মাথাই ছিল জমিদার, জোতদার। তারা যেমন কংগ্রেসি ছিল আবার প্রয়োজন মতো ব্রিটিশের খয়ের-খা-গিরিও করত। সেখানে গিয়ে ভূরিভোজন ছাড়া কিছুই হল না। কমরেড বিভূতি গুহ রতনদাকে নিয়ে গেলেন ফুলবাড়ি থানায়। সেখানে সদ্যমুক্ত বন্দি কমরেড কালী সরকার থাকায় কমরেড গুহর সুবিধাই হয়েছিল। কারণ, কমরেড সরকারের বাড়ি ছিল গ্রামে এবং মুক্ত হয়ে এসেই তিনি কৃষকদের মধ্যে কিছু কিছু কাজ শুরু করেছিলেন। কিছুদিন পর স্থানীয় ঠাকুর পার্টি সৌমেন ঠাকুরকে এনে কংগ্রেস ময়দানে এক বড় সভা করে। চেহারা, কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গিতে সৌমেন ঠাকুর মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে মুগ্ধ করেন। সেইদিন রাত্রিতে বালুবাড়ির আশুবাবু উকিলের বাড়িতে সৌমেন ঠাকুরকে নিয়ে এক ঘরোয়া আলোচনা হয়। আলোচনায় উপস্থিত ছিলাম আমি, কমরেড বিভূতি গুহ, সুশীল সেন, জনার্দন ভট্টাচার্য, শচীন্দু চক্রবর্তী, দীনেশ রায় ইত্যাদি অনেকে।

সৌমেন ঠাকুর আমাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন, ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আস্থা নাই। এখানে একেবারে সর্বহারা বিপ্লব করতে হবে। এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈততা হয়। কারণ আমরা জানি ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী কংগ্রেস ও লিগের প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। কংগ্রেস ও লিগকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম হতেই পারে না। তারপর কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ ও আবদুল্লা রসুল পরপর দিনাজপুরে আসেন। সে সময়ে কোনও মুসলমানকে হিন্দু বাড়ির ভিতর-মহলে স্থান দেওয়া দুঃসাধ্য ছিল। আমাদের বাড়িতেই তাঁদের রেখেছিলাম, অবশ্য হিন্দু নাম দিয়ে। তাঁরা কৃষক সমিতির অফিস খুলে কৃষকদের মধ্যে সভা সমিতি ও সদস্য সংগ্রহের কথা বিশেষভাবে বলে যান। আমরা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জিকে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানাই। কিছুদিনের মধ্যে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি দিনাজপুরে আসেন এবং দিনাজপুর শহর, ফুলবাড়ি ও শহরের বারো মাইল দক্ষিণে প্রাণসাগরে তিনটি সভা করেন। কমরেড মুখার্জির বক্তৃতা শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মুগ্ধ করেছিল। বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল ফুলবাড়ির সভা। কমরেড মুখার্জির বক্তৃতা শুনে কমরেড রূপনারায়ণ রায় প্রমুখ বেশ কয়েকজন কৃষক যুবক অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষক সমিতির কাজে নেমে পড়ে। কিন্তু আমরা কৃষকদের মধ্যে কাজ করবার কোনও পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মাঝে মাঝে ওদের কাছে যাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তখন কোনও পাত্তাই পাই নাই। এরপর কমরেড গুহ ষোলো দফা দাবি সম্বলিত হাজার খানেক প্রচারপত্র ছাপিয়ে ফেলেন। ওই প্রচারপত্রগুলি নিয়ে শহরের আশেপাশে হাটে গিয়ে ষোলো দফা বিশ্লেষণ করে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতাম। প্রচারপত্র নেবার জন্য কৃষকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। তাতে আমবা উৎসাহিত হয়ে উঠতাম এবং ষোলো দফা দাবি বিশ্লেষণ করতে করতেই আমাদের বক্তৃতা দেবার অভ্যাস হয়। তারপর আমরা বেছে নিই কোতয়ালী থানার নসিপুর অঞ্চল ও চিরির বন্দর থানা। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে ওই দুই জায়গায় কয়েকটি সভা করে কিছু কৃষক সমিতির সভ্য সংগ্রহ করি। ওই সব সভায় কমরেড গুরুদাস তালুকদার হতেন মূল বক্তা। কণ্ঠ ও বক্তৃতার ঢঙে কমরেড তালুকদার কৃষকদের আকৃষ্ট করতে পারতেন। প্রাথমিক কৃষক সভার কাজে ওটা আমাদের বেশ কাজ দিয়েছিল। এরপর নানা জায়গা থেকে কিছু কিছু কৃষক আমাদের খোঁজ-খবর নিতে থাকে। একটি নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় বেশ অসুবিধা হয়। এই প্রয়োজন বোধে আমরা শহরে নিমতলা অঞ্চলে মাসিক পনেরো টাকা ভাড়ায় একটি ঘর নিয়ে জিলা কৃষক সমিতির অফিস খুলি। অফিসের সম্পত্তির মধ্যে একটি সাইনবোর্ড, কাস্তে ও হাতুড়ি মার্কা একটি লালঝান্ডা, একটি কেরোসিন কাঠের আলমারি এবং তার মধ্যে দুইখানা থাক, কয়েকশত প্রচারপত্র ও কৃষক সমিতির সভ্য রসিদ। এই পুঁজি সম্বল করে আমরা কাজে নামি। আগে আমরা বসতাম কংগ্রেস অফিসে, কৃষক সমিতির অফিস হবার পর সকাল-সন্ধ্যায় ওই অফিসেই পাকাপাকিভাবে বসতে শুরু করি। ঠাকুরগাঁও-এর উকিল কমরেড হাজি দানেশের শ্বশুরবাড়ি দিনাজপুর শহরে। শ্বশুরবাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। একবার শ্বশুরবাড়িতে এসে খবর পেয়ে হঠাৎ তিনি উপস্থিত হন আমাদের জিলা কৃষক সমিতির অফিসে। আগ্রহ সহকারে আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কিছু প্রচারপত্র ও কৃষক সমিতির সভ্যের রসিদ বই নিয়ে যান। ঠাকুরগাঁও-এর কমরেড সত্যেন রায় ছিলেন বামপন্থী ভাবাপন্ন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে কমরেড হাজি দানেশ কমরেড রায়কে নিয়ে ঠাকুরগাঁও ও বীরগঞ্জ থানায় কয়েকটি বড় সভা করে কয়েকশত কৃষক সমিতির সভ্য করেন। ওই

অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে যায়। পরে এই অঞ্চলটি ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চল নামে খ্যাত হয়। তারপর হঠাৎ একদিন আটোয়ারি থানার বালিয়াগ্রামের কমরেড রামলাল সিং ষোলো দফার একখানা প্রচার পত্র নিয়ে জিলা কৃষক সমিতির অফিসে এসে উপস্থিত হয়। হাত ঘুরতে ঘুরতে ওই প্রচারপত্র তার হাতে এসে পড়েছে। তার দাবি প্রচারপত্র চাই এবং সভা করবার জন্য নেতা চাই। তাকে প্রচারপত্র ও একটি লাল ঝান্ডা দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনে আমি ও কমরেড নরেশ চক্রবর্তী কৃষক সমিতির সভ্যের কতকগুলি রসিদ বই নিয়ে ট্রেনে চড়ে উপস্থিত হই রুহিয়া স্টেশনে। সেখানে কমরেড রামলাল সিং, পাথাল সিং, কিছু কৃষক কমরেডও লাল ঝান্ডা নিয়ে উপস্থিত ছিল। কমরেডদের শ্লোগান শিখাতে শিখাতে রামলালের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরেই গোরুর গাড়িতে রওনা হলাম বালিয়াডাঙ্গি থানার পারিয়া গ্রামে। আমাদের সাথী হয়েছিল কমরেড রামলাল সিং, পাখাল সিং আর কয়েকশত কৃষক। তারা আমার শেখানো শ্লোগান দিতে দিতে লাল ঝান্ডা নিয়ে মহা উৎসাহে গিয়ে উপস্থিত হয় পারিয়া গ্রামে। পারিয়ায় গিয়ে রাজকীয় পরিবেশ দেখে প্রথমটা আমরা হতবুদ্ধি হয়েছিলাম। বিরাট সামিয়ানা, তার নীচে চৌকি পাতা, তার ওপর টেবিল-চেয়ার পাতা। রঙিন কাগজের মালায় সাজানো মঞ্চ। মঞ্চ ঘিরে চারদিকে প্রচুর জনসমাবেশ। আমি ও কমরেড চক্রবর্তী বক্তৃতা দিয়ে সভার কাজ শেষ করে কয়েকশত কৃষক সমিতির সভ্য সংগ্রহ করি প্যান্ডেলে বসেই। প্যান্ডেলে বসেই পারিয়ায় কৃষক সমিতির কমিটি গঠন করি। কমরেড বিভীষণ সিং, পষ্টরাম সিং ইত্যাদির সঙ্গে সেই সময় পরিচয় হয়। সেখান থেকে চলে আসি শৌলা বন্দরে। সেখানেও কয়েকশত কৃষক সমিতির সভ্য করে একটা কমিটি গঠন করি। এই কমিটি গঠন করবার সময় একটু বিপদে পড়ি। কৃষক সমিতির গোড়ার দিকে অবস্থাপন্ন কৃষক ও জোতদারদের বাড়িতেই আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হত। গরিব কৃষকরা ধারণাই করতে পারত না শহরের ভদ্রলোক কমরেডদের তাদের বাড়িতে রাখবে এবং খাওয়াবে। কমিটি গঠন করবার সময় শৌলায় দুটি দল হয়ে যায়। আমরা যে বাড়িতে উঠেছি সেই বাড়ির অবস্থাপন্ন কৃষকের একদল, অপরদিকে কমরেড কম্পরাম সিং-এর দল। কমরেড কম্পরাম স্পষ্টই ঘোষণা করেছিল দালালদের কমিটিতে নিলে তারা সমিতির মধ্যে থাকবে না। আমি কমরেড কম্পরাম সিং-এর দলকেই কমিটিতে নিয়েছিলাম। পরবর্তী জীবনে দেখেছি আমার নির্বাচন ভুল হয় নাই। সে সময় গরিব কৃষকরা ধনী কৃষকদের বিরোধিতা করতে সাহস পেত না। সে সময় ধনী কৃষকদের দয়ার উপর নির্ভর করে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বাঁচতে হত। ওখান থেকে কমরেড তিলক সিং-এর বাড়ি, সেখানেও বড় সভা, সেখানেও শত শত কৃষক সমিতির সভ্য করে কমিটি গঠন। পরদিন ভোরে উঠেই কমরেড চক্রবর্তী ফিরে গেল দিনাজপুর শহরে। যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষক সমিতির রসিদ বই শেষ না হল ততক্ষণ পর্যন্ত বড় সভা করা এবং সমিতির সভ্য সংগ্রহ করে কমিটি গঠন করা চলেছিল। সেই সময় কমরেড অভরণ সিং, তেনসিং, রাজেন সিং ইত্যাদি প্রথম সারির কমরেডরা সমিতিতে আসে। সেবার কৃষক সমিতির সভ্যের চাঁদা বাবদ বেশ কয়েকশত টাকা নিয়ে ফিরে আসি। অফিস ভাড়া, প্রেস খরচ ইত্যাদি যাবতীয় খরচই আমাদের কৃষক সমিতির চাঁদার অংশ হতে চলত। থানায় থানায় কৃষক সমিতির কথা ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং নতুন নতুন জায়গা থেকে কৃষক সমিতির সভা করবার তাগিদ আসে। বোঁচাগঞ্জ থানা থেকে কমরেড গোপীমোহন সভার দিন ধার্য করে আমাকে নিয়ে যায়। নতুন এলাকা। কৃষকদের সমিতি করবার ইচ্ছা আছে কিন্তু

ভয় ভাবনাও প্রচুর। গিয়ে দেখি যে-বাড়িতে কৃষকেরা আমার থাকবার ব্যবস্থা করেছে সেই বাড়িতে দারোগা চেয়ারে বসে আছে মধ্যমণি হয়ে। পাশেই দুইজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে। দারোগা আমাকে সভা করতে দেবে না—কিন্তু আমি জোর করে সভা করি। দারোগার পেছনে অলক্ষ্যে ছিল ধনী জোতদার ও জমিদারের দল। তারা ওই অঞ্চলে কৃষক সমিতির গোড়াপত্তন করতে দেবে না। অথচ ওইখানে সমিতির গোড়াপত্তন করতে না পারলে কৃষকদের মনোবল ভেঙে যাবে এবং তা সংক্রামিত হবে অন্যান্য অঞ্চলে। এটাকে দৃষ্টান্ত ধরে ধনীর দল অন্যান্য অঞ্চলে আঘাত হেনে সমিতি ভাঙতে পারে। কাজেই মাঝে মাঝে আমাকে ওই অঞ্চলে সভা ও সমিতির সভ্য সংগ্রহ করে কমিটি গঠন করতে যেতে হয়েছে। দারোগার অত্যাচারে একবার পাশের অন্য থানায় সভা উঠিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। অবশেষে ধনী জোতদার, জমিদার, দারোগা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে জেলা হাকিমের নিকট নালিশ জানায় যে, আমি ওই অঞ্চলে গিয়ে বেআইনিভাবে কৃষকদের উত্তেজিত করে জোতদার, জমিদারদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছি। আমার নামে জিলা হাকিম শো-কজের নোটিশ জারি করেন। ওই সময় কমরেডরা আমাকে আত্মগোপন করতে বলেছিল। কিন্তু কমরেড বরদা চক্রবর্তীর (উকিল) পরামর্শ অনুযায়ী আমি হাকিমেব সঙ্গে দেখা করি এবং হাকিম সভা করবার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি কথা স্বীকার করে বলি, 'আমি বোঁচাগঞ্জে গিয়েছিলাম কংগ্রেসের ছাব্বিশে জানুয়ারি পালন করতে এবং সেই উপলক্ষে সভা করি।' হাকিম আমার কথা মেনে নেন। তারপরও বোঁচাগঞ্জে গিয়ে সভা করি এবং কৃষক সমিতির কমিটি গঠন করি। দারোগা আর উৎপাত করতে আসে নাই।

তেরোশো আটত্রিশ সাল। ফুলবাড়ি থানার লালপুর ময়দানে প্রথম জিলা কৃষক সম্মেলন হবে। ওই সম্মেলন সংগঠিত করবার ভার আসে আমার উপর। আমি ফুলবাড়ি যাই। সেখানে গিয়ে কমরেড কালী সরকার, রূপনারায়ণ রায় ও গণেন ডাক্তারের সঙ্গে মিলিত হই। হাতে প্রায় এক মাস সময়। লালপুরে কমরেড রূপনারায়ণের বাড়িতে ঘাঁটি করে কমরেডদের নিয়ে কাজে নেমে পড়ি। চাল, তরিতরকারি, টাকা সংগ্রহ, প্যান্ডেল করার জন্য প্রচুর বাঁশ সংগ্রহ, হাজারে হাজারে কৃষক সমিতির সভ্য করা এই উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় সভা করি। কমরেড রূপনারায়ণ আমার সঙ্গে প্রায় সময়ই থাকত। তার জানার আগ্রহ ছিল খুব। যখনই সময় পেত তখনই সে আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করত এবং তার রাজনীতি জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা করত। পরে সে একজন ভাল বক্তা ও সংগঠক হয়েছিল। ফুলবাড়ি থানার পাশে নবাবগঞ্জ থানা। সেখানে গিয়ে কয়েকটি বড় সভা করে কৃষক সমিতির কমিটি গঠন করি। ফুলবাড়ি থানা সম্পূর্ণ, আংশিকভাবে বালুরঘাট, হিলি, পার্বতীপুর, কুমারগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ থানায় কৃষক সমিতি প্রসার লাভ করে। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি আসতে পারেন নাই। প্যান্ডেল ও গেট তৈরি, শত শত লোকের থাকবার ও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, ডাক সরবরাহ করা, মিছিল পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজ কৃষক ভলান্টিয়াররা সু-শৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করে। সম্মেলনের সময় প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছিল। রংপুরের কমরেড দীনেশ লাহিড়ীর নিকট জানতে পারি রংপুরে সম্মেলন করে টাকা ঘাটতি হয়েছিল। আমাদের হয়েছিল উদ্বৃত্ত। জলপাইগুড়িতে সুভাষ বসুর সভাপতিত্বে যে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন হয়েছিল সেই সম্মেলনে কমরেড গুরুদাস ও মাধব যে কিষাণ ভলান্টিয়ার র‍্যালি করেছিল তা আমার কাছে

খুব ভাল লেগেছিল। ভলান্টিয়ারদের পোশাক, টুপি, কুচকাওয়াজ সব মিলিয়ে একটা জঙ্গিভাব ফুটে উঠেছিল। মালদহ প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে আমরা যখন যাই তখন কমরেড মুজাফ্‌ফর আহম্মদ কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জিকে আমাদের জিলায় কাজ করবার জন্য আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কমরেড চ্যাটার্জি ইটাহার অঞ্চলে থেকে কৃষক সভার কাজ শুরু করেন। ইটাহার, কুশমণ্ডি, বংশীহারী এই তিন থানায় তার কাজ প্রসার লাভ করেছিল। এর আগে আমরা ওদিকে কোনও নজরই দিতে পারি নাই। কমরেডরা জিলার চারদিকে বড় বড় সভা শুরু করে দেয়। আমি ও কমরেড বিভূতি গুহ যাই বালিয়াডাঙ্গি ও আটোয়ারি থানায় সভা করতে। সেই সময় অনেক মুসলমান কৃষক সভায় উপস্থিত হত। সভা শেষে হঠাৎ নোয়াখালির মৌলভি উঠে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলে সভা ভণ্ডুল করে দেবার চেষ্টা করত। যাতে মুসলিম কৃষকদের মনে কোনওরূপ সন্দেহ না আসে তার জন্য মৌলভিদের প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হত। আবার মৌলভি উঠে আমাদের কথার পৃষ্ঠে তার নতুন বক্তব্য রাখত। এর যেন শেষ নাই। যেখানেই সভা করতে যাই সেখানেই মৌলভিরা উপস্থিত থেকে উৎপাত করতে থাকে। এই সমস্যা দূর করবার জন্য অবশেষে কমরেড হাজি দানেশকে নিয়ে এসে কয়েকটি সভা করতে হয়। তবুও খুব কম সংখ্যক মুসলিম কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েছে।

এতদিন আমাদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল সভ্য, মিছিল ও কৃষক সমিতির সভ্য সংগ্রহ করে কমিটি গঠন করার মধ্যে। এখন আমরা কৃষকদের আন্দোলনে নামবার কথা চিন্তা করি। আন্দোলনের মাধ্যমেই কৃষক সংগঠন শক্তিশালী হবে এবং সঠিক নেতা বেরিয়ে আসবে। আন্দোলন করতে গেলে শক্তিশালী ভলান্টিয়ার দল গড়া প্রয়োজন। আমরা এদিকে মনোনিবেশ করি। কৃষক সমিতির জেলা কমিটি থেকে টুপি ও ব্যাচ সরবরাহ করা হয় এবং ভলান্টিয়ার দলভুক্ত কৃষকেরা লাঠি সংগ্রহ করে নেয়। আমরা প্রথমে হাটের 'তোলাবটি' বন্ধের আওয়াজ তুলে। হাটে যা যা বিক্রি করুক তাকে 'তোলাবটির' নাম দিয়ে জমিদারকে ট্যাক্স দিতে হত। কোনও দুঃস্থ কৃষক মহিলা এক টাকার শাক বিক্রি করলে তার মধ্যে চারি আনা তোলাবটি দিতে হত। আমাদের কৃষক ভলান্টিয়াররা মিছিল করে হাটে-হাটে ঘুরে তোলাবটি বন্ধ করতে সক্ষম হয়। এই কাজের মধ্য দিয়ে কৃষকেরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তারপর শুরু হয় মেলার 'লেখাই' ও 'তোলাবটি' বন্ধের আন্দোলন। দিনাজপুর মেলা-প্রধান জিলা। বাংলার বড় বড় মেলাগুলি দিনাজপুর জিলাতেই হত। তা ছাড়া মাঝারি ও ছোট মেলাও কম নাই। জমিদারেরা 'লেখাই' ও 'তোলাবটি' বাবদ হাজার হাজার টাকা ওই সকল মেলা হতে আদায় করত। কৃষক সমিতি হতে আওয়াজ তোলা হল মেলার লেখাই ও তোলাবটি নেওয়া চলবে না। প্রথমে ঠাকুরগাঁও মহকুমার কালীর মেলায় এবং পরে আলোয়াখোয়া মেলায় আন্দোলন শুরু হয়। কালীর মেলার জমিদার দাবি না মানায় গোটা মেলা ভেঙে অন্য জমিদারের এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পশু ক্রেতাকে কৃষক সমিতির সিল মারা সহি দিয়ে বিনা খরচায় বিক্রিনামার রসিদ দিয়ে দেওয়া হয়। জমিদারের লোকেরা ছাগল, গোরু, মহিষ ইত্যাদি বিক্রয়ের রসিদ লেখা বাবদ—যা নাকি ক্রেতা রক্ষা কবচ হিসাবে নিত (অর্থাৎ সে যে চুরি করে এই পশু আনে নাই তার প্রমাণ স্বরূপ) দুই টাকা থেকে কুড়ি টাকা পর্যন্ত দিতে বাধ্য হত। আলোয়াখোয়া মেলার জমিদারের সঙ্গে আপস আলোচনা করে তোলাবটি বন্ধ ও লেখাই-এর খরচ আংশিক কমাতে পারা গিয়েছিল। এই আন্দোলনের সময় মেলার নিকটে কৃষক সমিতির ক্যাম্প বসত। ওই সকল মেলার আন্দোলন পরিচালনা

করেছিল কমরেড সত্যেন রায়, হাজি মহম্মদ দানেশ ও জনার্দন ভট্টাচার্য। আমার উপর ভার পড়ে বালুরঘাট মহকুমার পতিরামের মেলা এবং ঠাকুরগাঁও মহকুমার বোঁচাগঞ্জের মেলার। আমি ফুলবাড়ি থানার লালপুর থেকে এক হাজার লাঠিধারী ভলান্টিয়ার নিয়ে পতিরামে যাই। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভলান্টিয়ারের দল লালপুরে আগেই এসে জমায়েত হয়েছিল। কমরেড রূপনারায়ণ রায় আমার সঙ্গে ছিল। বারো মাইলের ওপরের পথ শ্লোগান মুখরিত করে গভীর রাত্রিতে পতিরামে পৌঁছাই। সেখানে মিলিত হই কমরেড কৃষ্ণদাস মোহান্তের সঙ্গে। তার বাড়ি ওখানেই। আত্রাই নদীর ওপারে মেলা, এপারে আমাদের ক্যাম্প। সকাল হতেই ভলান্টিয়াররা প্রচারে নেমে পড়ে। আমাদের দেখেই জমিদার তরফের লোক সজাগ হয়ে ওঠে। একদিকে আপসের সুরে আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকে অপর দিকে লোক পাঠিয়ে থানার দারোগা পুলিশ আনবার ব্যবস্থা করে। দুপুরে দারোগা পুলিশ এসে মেলায় টহল শুরু করে এবং ভলান্টিয়ারদের শাসাতে থাকে। তাতে ভীত না হয়ে ভলান্টিয়ারের দল আরও জোর প্রচার চালাতে থাকে। আমাদের আন্দোলনে মেলার কেনাবেচা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিকেলের দিকে আমরা মেলা ভেঙে অপর জমিদারের এলাকায় নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করি। মেলার দোকানদারেরা আমাদের কথামতো অন্য জমিদারের এলাকায় যেতে রাজি হয়েছিল। বিপদ বুঝে জমিদারের তরফ থেকে, আবার আপসের প্রস্তাব আসে। এর আগে ওরা দুই-তিনবার আপসের কথা বলে মিথ্যা সময় কাটিয়েছে। কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা জানিয়ে দিই, আলাপ-আলোচনা করতে আমরা তোমাদের নিকট যাব না, দরকার হলে তোমরাই আমাদের ক্যাম্পে এসো। বাধ্য হয়ে ওরা আমাদের ক্যাম্পে আসে এবং আপসের লিখিত বয়ানে সহি করে দেয়। তোলাবটি বন্ধ এবং লেখাই খরচা অর্ধেক। কৃষক ভলান্টিয়ারেরা জয়ধ্বনির সঙ্গে এই সংবাদ মেলায় প্রচার করে। শেষের দিকে কমরেড জনার্দন ভট্টাচার্য এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এই মেলায় জমিদার তরফ থেকে আমাকে বৃথাই মোটা টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল। এরপর যাই বোঁচাগঞ্জ মেলায়। নাহার স্টেটের অধীন এই মেলা। লাঠিধারী হাজার ভলান্টিয়ার নিয়ে উপস্থিত হই মেলায়। মেলায় গিয়ে ভলান্টিয়ারের দল লেখাই ও তোলাবটি বন্ধের জোর প্রচার চালাতে থাকে। জমিদারের লোকেরা দারোগা পুলিশ নিয়ে ভলান্টিয়ারদের নানারকম ভয় দেখাতে থাকে। কিন্তু ভলান্টিয়ারেরা তাতে বিন্দুমাত্র দমে না। জমিদারের তরফ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে আমরা মেলা ভেঙে অপর জমিদারের এলাকায় নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করি। এমন সময় আপস আলোচনা চালাবার জন্য জমিদারের নায়েব জমিদারের কাছারি বাড়িতে আমাদের ডেকে পাঠায়। ভলান্টিয়ারদের নিয়ে কাছারি বাড়িতে উপস্থিত হওয়া মাত্র জমিদারের লোক আমাকে তাড়াতাড়ি গেট দিয়ে ঢুকিয়ে গেটের দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি একা কাছারির বাড়ির ভেতরে এবং বাইরে হাজার ভলান্টিয়ার। আমার দুই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বুলেট ভরতি ক্রসবেল্ট লাগানো রাইফেলধারী জমিদারের দুই সিপাহি। নায়েব আমাকে খুন করে গুম করবার ভয় দেখায়। আমি কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে আমাদের দাবি আঁকড়ে থাকি। দরজা খুলে আমাকে বের করে দেবার জন্য বাইরে ভলান্টিয়ারের দল চিৎকার করতে করতে হাজার লাঠির ঘায়ে গেটের দরজা ভেঙে ফেলবার উপক্রম করে। আমার অনমনীয় ভাব দেখে নায়েব মশাই তোলাবটি বন্ধ ও লেখাই খরচ অর্ধেক করতে রাজি হন। নায়েবের প্রস্তাব কাগজে লিখিয়ে নিয়ে কাগজে সহি করিয়ে নিই। দারোয়ান দরজা খুলে দিলে আমি

বাইরে বেরিয়ে আসা মাত্র ভলান্টিয়ারের দল আনন্দে জয়ধ্বনি দিতে থাকে। তারপর নায়েবের প্রস্তাব শুনে 'তোলাবটি বন্ধ, মেলার লেখাই অর্ধেক'—এই শ্লোগান দিতে দিতে সমস্ত মেলা পরিক্রমা করে। সেই সময় দিনাজপুর শহরের ভূপেশ ব্যানার্জি (গুলু) মেলায় উপস্থিত ছিল। সে আমাদের কাজে মুগ্ধ হয়ে কৃষক সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করে। অবশেষে সর্বক্ষণের কমিউনিস্ট কর্মী এবং কমিউনিস্ট পার্টির জিলা কমিটির সভ্য হয়ে গ্রামে কাজ করতে করতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এলে মারা যায়।

হাট ও মেলার সফল আন্দোলন কৃষকদের মনে এনে দেয় সাহস ও উৎসাহ। জিলা কৃষক সমিতির কার্য নির্বাহক কমিটির মিটিং ডেকে 'আধিয়ার আন্দোলন'-এর প্রস্তাব নিই। দিনাজপুর জিলার কৃষকদেব মধ্যে আধিয়ারেরা একটি বড় অংশ। বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও মহকুমায়। ঠাকুরগাঁও মহকুমাতেই ধনী জোতদারদের প্রধান ঘাঁটি এবং তারা খুব শক্তিশালী। যেমন, বড় খোদা, ছোট খোদা ইত্যাদি। গ্রামে কৃষকদের মধ্যে বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পার্বণ খোদাদের মর্জিমতো হত। তার হুকুম ছাড়া পাত্র-পাত্রী ঠিক করবার উপায় ছিল না। কে কতদিন তাদের বাড়িতে বেগার খাটবে, কার বউ কোন রাত্রিতে তাদের কাছে থাকবে সবই তাদের হুকুমেব অপেক্ষায় থাকত। আধিয়ারেরা ছিল ধনী জোতদারদের ক্রীতদাস। কেউ সামান্যতম প্রতিবাদ করলেই তাকে ভিটে ছাড়া করত। বলদ ও লাঙল জোতদারেরা সরবরাহ্ কবত। বীজধান ও সার আধিয়ারেরা দিত। অনেক সময় ক্ষুধার তাড়নায় আধিয়ারেরা বীজধান খেয়ে ফেলত। বীজধান কেনার সময় আধিয়ারেরা জোতদারদের নিকট হতে 'দেডিয়া সুদে' বীজধান কর্জ নিত। খোলান চাঁচা, সন্ন্যাসী বিদায়, আবওয়াব ইত্যাদি বাবদ জোতদার ধান সরিয়ে রেখে বাদবাকি ধান সমান দুইভাগে করত। আধিয়ারের ভাগ থেকে জোতদার 'দেড়িয়া সুদ', হিসাবে তার প্রাপ্য কর্জা-ধান কেটে নিয়ে বাদবাকি ধান, আধিয়ারকে দিত। সুদ সমেত কর্জা ধানের পরিমাণ বছরের পর বছর বাড়তে বাড়তে এত হত যে, তা আধিয়ারদের নাগালের বাইরে চলে যেত। শেষে এমন অবস্থায় দাঁড়াত যে, আধিয়ারের অংশের সব ধান দিয়ে দিলেও আসল তো দূরস্থান, সুদই শোধ হত না। যে সব জায়গায় আধিয়ারদের সংখ্যা বেশি সেখানে ধনী জোতদারেরা ইচ্ছামতো আধিয়ার বদল করত। সরকারি আইন যাই থাকুক না কেন, গ্রামে জোতদারদের ইচ্ছাই ছিল আইন। থানা পুলিশও ছিল তাদের হাতে। কোর্ট কাছারি না করেও ধনী জোতদারেরা আধিয়ারদের শাস্তি দিতে পারত এবং জরিমানাও করতে পারত। আধিয়ারেরা ধনী জোতদারদের সব কিছুই মেনে নিত। ভাবত, এটাই নিয়ম। আধিয়ারদের মধ্যে পূর্বে অনেকেরই জমি ছিল। হাল, বলদ সবই ছিল। হাল গেরস্তি করে সম্বৎসরের খোরাক চালিয়েও উদ্বৃত্ত ফসল থাকত। তাতে তেল, নুন, কাপড়, খাজনা ইত্যাদি খরচ চালিয়ে মোটামুটি সচ্ছলভাবেই সংসার চালাত। ধনী জোতদারেরা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের জমি গ্রাস করে নেয় এবং তারা আধিয়ারে পরিণত হয়ে তাদের জমিতে ধনী জোতদারদের হয়ে আধি চাষ করে। যেমন, কোনও কৃষক হয়তো ছেলের বিয়ে উপলক্ষে ধনী জোতদারের নিকট হতে একশত টাকা ধার নিয়েছে। ধনী কৃষক টাকা ধার দিয়ে একটা হ্যান্ডনোট লিখে কৃষকের টিপ সহি করিয়ে নিত। ধনী কৃষক হ্যান্ডনোটে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে লিখে রাখত। নিরক্ষর কৃষক তা জানতেও পারত না। সেই টাকার অঙ্ক সুদও চক্র-বৃদ্ধি হারে পর্বত পরিমাণ হত। কৃষকেব ক্ষমতার বাইরে চলে যেত সে টাকা শোধ করা। তখন ধনী জোতদার টাকা শোধের নামে কৃষকের সব জমি গ্রাস করে নিত। এমনি করে কৃষক পরিণত হত আধিয়ারে। পূর্বে দিনাজপুর জেলার অনেক

জায়গায় দীর্ঘ বন ছিল। জমিদার জোতদারেরা ওই বন থেকে বিশেষ লাভ পেত না। তাই তারা আদিবাসীদের লোভ দেখিয়ে আনত। তারা বন কেটে বসতি স্থাপন করত এবং চাষের যোগ্য জমি তৈরি করে চাষ-বাস করে সংসার চালাত। প্রথমে জমিদার অথবা জোতদার কোনও বাধার সৃষ্টি করত না। যখন কাটা শেষ হয়ে সম্পূর্ণ বনটি বাসযোগ্য জমিতে পরিণত হত তখন জমিদার অথবা জোতদারেরা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে আধিয়ারে পরিণত করত। গ্রামের অর্থনৈতিক কর্ণধার ধনী জোতদারেরা বিশেষ মূলধন না খাটিয়ে বছরে হাজার হাজার টাকা আয় করত। এর মধ্যে কোনও ঝক্কি-ঝামেলা ছিল না। উপরন্তু আধিয়ারদের তারা খেয়াল খুশিমতো খাটাতে পারত। অথচ জমিদারের জমিদারি চালাতে নায়েব, গোমস্তা, তহশিলদার ইত্যাদি অনেক লোক রেখে বহু খরচ করতে হত এবং তাতে ঝক্কি-ঝামেলাও ছিল অনেক। জমিদারি ঠাট বজায় রাখতেও কম খরচ হত না। এই সব দিক দিয়ে জমিদারের* চাইতে ধনী জোতদারদের সুবিধা ছিল বেশি। মুষ্টিমেয় হলেও গ্রামে একদল লোক ছিল তাদের পেশা ও প্রধান উপজীবিকা ছিল দালালি করা। দালালি করে তারা সচ্ছল জীবন যাপন করত। কৃষকদের ত্রাণকর্তা ভেবে ছলে বলে কৌশলে তাদের মামলা মোকর্দমায় ফেলে কৃষকদের টাকা পয়সা গয়নাগাটি আত্মসাৎ করত। দালালরা সুদেও টাকা খাটাত। এই দালালরা কৃষকের বন্ধু সেজে যেন তার উপকার করবার জন্যই টাকা ধার দিত। শেষে সুদ সমেত ওই টাকা আদায়ের নামে কৃষককে সর্বস্বান্ত করত। জমিদার, জোতদার, দালাল, উকিল, মোক্তার সবাই যেন অক্টোপাসের মতো কৃষকদের গ্রাস করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুষ্টিমেয় লোককে বানিয়েছিল রাজা এবং হাজার হাজার লোককে ভিক্ষুকে পরিণত করেছিল। কৃষকেরা মনে করত সবাই তাদের ঠকানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। তাই যখন প্রথম গ্রামে যাই তখন আমরা খুবই অসুবিধায় পড়েছিলাম। কৃষকেরা ধরেই নিয়েছিল শহরের বাবুরা কোনও কৌশলে তাদের ঠকাতে গ্রামে এসেছে। বাবুরা কৃষকদের দুঃখের কথা বলে—বাঁচবার কথা বলে—কৃষকদের ঠকানোর এ বোধ হয় নতুন কৌশল। জীবনে তারা যে সব বন্ধু দেখেছে তারা সবাই তাদের ঠকিয়েছে। তারা আর ভাল দেখতে চায় না। এই অবস্থা থেকে কৃষকদের আন্দোলনের অবস্থায় আনতে আমাদের বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক সমিতির প্রথম যুগে জোতদারেরা যখন সমিতির মধ্যে ছিল তখনও কৃষকদের অবিশ্বাস ছিল। কৃষকদের মধ্যে থাকা-খাওয়া-শোওয়া, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একাত্ম হতে পেরেছিলাম বলেই পরে ওরা আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে। কৃষকদের আমরা ভালবেসেছি, ওরাও আমাদের ভালবেসেছে। ওদের দুঃখকে আমারই দুঃখ, ওদের সুখকে আমারই সুখ বলে মনে করেছি। জনসাধারণকে ভালবাসতে না পারলে গণ-আন্দোলন করা যায় না।

এই সময় আমি সরকারি রোষে পতিত হই। সপ্তাহে একদিন থানায় হাজিরা দিতে হত। দিনাজপুর জেলা ছেড়ে অন্য জেলায় গেলে সেখানে থানায় গিয়ে আমার উপস্থিতির খবর দিতে হবে। দিনাজপুরে ফিরে এসে আবার থানায় জানাতে হবে। দূরে যেতে না পারলেও শহরের আশেপাশে সন্ধ্যায় গিয়ে বড় সভা বৈঠক মিটিং করতাম। এ খবর পুলিশের কর্ণগোচর হত না। এ অবস্থায় একদিন রংপুর জিলার ডোমারে যাই এবং সেখানে রংপুরের কমরেড শিবদাস লাহিড়ী, জলপাইগুড়ির কমরেড নরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে মিলিত হয়ে

* জোতদারদের এক পয়সাও খরচ ছিল না।

আধিয়ারি আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করি। তিন জেলাতেই একসঙ্গে আন্দোলন করার কথা ঠিক হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন দিনাজপুর জিলার ঠাকুরগাঁও মহকুমায় সীমাবদ্ধ থাকে। 'নিজ খোলানে ধান তোলো, খোলান ভাড়া, খোলান চাচা, সন্ন্যাসী বিদায়, আবওয়াব ইত্যাদি অতিরিক্ত আদায় চলবে না। কর্জার দেড়িয়া সুদ বন্ধ করো। ধানের আধাআধি ভাগ করে অর্ধেক কৃষক এবং অর্ধেক জোতদার লও।' এই আন্দোলন সবচাইতে জোরদার হয়েছিল ঠাকুরগাঁও মহকুমার ঠাকুরগাঁও ও বীরগঞ্জ থানায়। শতশত লাঠিধারী কৃষক পুরুষ ও মহিলা ধান কেটে নিজ খোলানে তুলতে শুরু করে। সঙ্গে-সঙ্গে জোতদারদের টনক নড়ে। কৃষক সমিতি যে তাদের শিরেও আঘাত হানবে তা তাদের ধারণা ছিল না। যাই হোক, তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল এই আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য। কারণ, ক্রীতদাসেরা রক্তের স্বাদ পেয়েছে, এখনই তাদের নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে তারা ধনে-প্রাণে মারা যাবে। জোতদারেরা মিলিত হয়ে পরামর্শ করে এক দিকে কৃষক কর্মীদের ওপর মামলা মোকর্দমা দায়ের করে অপর দিকে তাদের দোসর দারোগা-পুলিশের সাহায্য নেয়। দারোগা-পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে কিষাণ সভার প্রথম সারির কর্মীদের গ্রেফতার করতে শুরু করে, কৃষকদের মারধোর করে,—মেয়েদের ওপর বলাৎকার করে, ধান অন্যান্য ফসল একসঙ্গে মিশিয়ে আঙিনায় ছিটিয়ে দেয়। জোতদার ও পুলিশ মিলিতভাবে কৃষকদের ওপর অত্যাচার শুরু করে, যাতে ভবিষ্যতে তারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এতদিনের কৃষক আন্দোলন বেশ খানিকটা চোট খেয়ে যায়। এই আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোতদারেরা কৃষক সমিতির বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তারা আধিয়ারদের চাষ করার জমি, কর্জা-ধান দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে। যদিও বা দিত, আধিয়ারকে কান মলা, নাক মলা খেয়ে তাদের চরণ ধরে সমিতি বা আন্দোলন না করার প্রতিশ্রুতি দিতে হত। এদিকে আমাদের কয়েকজনের ওপর সরকারি আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে। প্রত্যেকদিন থানায় হাজিরা দিতে হবে, সূর্যাস্তের পর বাড়ি থেকে বের হতে পারব না ইত্যাদি। এই আইনের নাগপাশে পড়ে স্বভাবতই গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কমরেড বিভূতি গুহ কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকেন। কমরেড জনার্দন ভট্টাচার্য ও সত্যেন রায় চলে যান দেশে। আমি ভোলাদার সঙ্গে একত্রে 'সন্ধানী' নামে একটি পত্রিকা চালাতে থাকি। এই সময় কমরেড সুনীল সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। দিনাজপুর জেলার ভার নিয়ে আসেন কমরেড অবনী লাহিড়ী। আমাদের কিষাণ আন্দোলন সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা দেখে খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি অবিলম্বে কমরেড সুশীল সেনকে গ্রামে পাঠিয়ে দেন। কমরেড সেন ফুলবাড়ি এলাকায় গিয়ে আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকেন। এক মাস পর কমরেড সুশীল সেন ধরা পড়েন এবং তখন আমি চলে যাই গ্রামে। ফুলবাড়ি অঞ্চলে আছে কমরেড কালী সরকার ও রূপনারায়ণ। ইটাহার, কুশমণ্ডি ও বংশীহারী থানা নিয়ে আছে কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জি। ঠাকুরগাঁও মহকুমায় কেউ নাই। অথচ ঠাকুরগাঁও মহকুমা আন্দোলনের পীঠস্থান। আমি গোপনে চলে যাই ঠাকুরগাঁও, বালিয়াডাঙ্গি থানায়। সেখানে গিয়ে প্রথমে যোগাযোগ করি কমরেড বিভীষণের সঙ্গে। তারপর কমরেড পষ্টরাম সিং, তিলক সিং, নেন্দেলি সিং, মাকটু সিং ও আটোয়ারি থানায় কমরেডদের সঙ্গে। উপস্থিত এই দুই থানাকে আমার প্রধান কর্মস্থল হিসাবে গ্রহণ করি। দুই থানায় গোপন আশ্রয়স্থল, পত্রবাহক, গোপন অফিস, পোস্টবক্স ইত্যাদি তৈরি করতে থাকি। আমি নিয়ম করে দিয়েছিলাম কেউ সোজাসুজি এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। সংবাদ

দেওয়া-নেওয়াব ঘাঁটিতে আগে সংবাদ দিতে হবে। তারপর কতকগুলি ঘাঁটি পার হয়ে আমার কাছে সংবাদ অথবা জিনিসপত্র আসবে। জোতদারেরা আমাদের শত্রু। সুযোগ পেলেই তারা আমাদের ধরিয়ে দেবে। তাই আমাদের চলাফেরা করতে হত অতি সতর্ক হয়ে। রাত্রিতে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বৈঠকি মিটিং করি, প্রথম সারির কমরেডদের নিয়ে ক্লাস করি, কিছু কমরেডকে গোপন কাজকর্মের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং কিছু কমরেডকে প্রকাশ্য কাজের ভার দিই। প্রকাশ্য কমরেডদের দূরে পাঠিয়ে বৈঠকি মিটিং করাতে থাকি। ইউনিয়নে-ইউনিয়নে কৃষক সমিতির অফিস খুলে তা আবার চালু করবার চেষ্টা করি। পুরাতন ঠাকুরগাঁও ও বোঁচাগঞ্জ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করি। ঝিমিয়ে পড়া কৃষকেরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে থাকে। ঠাকুরগাঁও শহরে কমরেড হাজি দানেশের সঙ্গে যোগাযোগ করি। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বালিয়াডাঙ্গি থানায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। জোতদারেরা ধান-কর্জা দেওয়া বন্ধ করায় খাদ্যাভাব আরও বেড়ে যায়। এই সমস্যা থেকে কৃষকদের রক্ষা করবার চেষ্টা করতে হবে। প্রথম সারির কর্মীদের নিয়ে বৈঠকি মিটিং করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। প্রথমে থানায় পাঠানো হয় খাদ্য মিছিল, তারপর ধনী জোতদারদের বাড়িতে ক্রমাগত মিছিল পাঠানো হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জোতদারেরা ধান-কর্জা না দেবে ততক্ষণ ছাড়া নাই। দিন-দিন মিছিলের লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। অবশেষে জোতদারেরা ধান-কর্জা দিতে বাধ্য হয়। আবার লাহিড়ী হাটে তোলাবটি বন্ধের আন্দোলন হয়। এই সব আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বেশ কিছু নবীন উৎসাহী কর্মী বেরিয়ে আসে। যেমন, ডোমা সিং, নব সিং, ঝারু সিং ইত্যাদি। কমরেড কম্পরাম সিং আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলত এবং সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে অনেকদিন হল কোনও যোগাযোগ নাই। অথচ ওই অঞ্চলেই আধিয়ারি আন্দোলন সব চাইতে জোরদার হয়েছিল।

ওই অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠি। ঠাকুরগাঁও শহরে সত্যেন রায়ের বাড়িতে গিয়ে আস্তানা গাড়ি। কমরেড সত্যেন রায় না থাকলেও তার ছোট ভাই হরি তখন উৎসাহী তরুণ। তাকে পূর্বাঞ্চলে পাঠিয়ে কমরেড যুগল বর্মণের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং অবশেষে এসে উঠি কমরেড যুগল বর্মণের বাড়িতে। সেখান থেকে যোগাযোগ করি কমরেড নবচাঁদ, বীরনারায়ণের সঙ্গে। ওই অঞ্চলে কিছুদিন থেকে কতকগুলি বৈঠকি মিটিং করে চলে যাই দিনাজপুর শহরে। কমরেড হাজি দানেশ ও হরির মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করি। এর আগেই কৃষক কমরেডদের দিয়ে কমরেড বরদা চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। বরদা চক্রবর্তী ছিলেন দিনাজপুর শহরের উকিল। মক্কেল হিসাবে কৃষক কমরেডদের বরদা চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করায় অসুবিধা হত না। বার কয়েক আমাকে দিনাজপুর শহরে যেতে হয়। একবার পুলিশ আমার আস্তানা ঘিরে ফেলেছিল, কিন্তু তার আগেই আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। শহরে ও গ্রামে পুলিশ বহু খোঁজাখুঁজি করেও আমাকে ধরতে পারে নাই। ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে গিয়ে কমরেড অবনী লাহিড়ী মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে মিলিত হতেন। তারই মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হত। এক বার কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জির সঙ্গে তার এলাকায় গিয়ে কয়েক মাস থেকে কৃষকদের মধ্যে কাজকর্ম করি। ১৯৪১ সালে কমরেড অবনী লাহিড়ী রংপুর থেকে কমরেড মহী বাগচীকে এবং ঢাকা থেকে কমরেড সুবোধ সেনকে আমাদের জিলায় কাজ করবার জন্য নিয়ে আসেন। সেই সময় অসুস্থ অবস্থায়

আমি জেলার বাইরে গিয়েছিলাম। এর আগে অসুস্থ হয়ে এক মাস আমি মালদহ শহরে থাকি। আমি এলাকায় ফিরে আসবার পর পুলিশ মালদহে আমার আস্তানায় হানা দিয়েছিল। আমার গোপন অবস্থার সময় দিনাজপুর জিলার এগারোটি থানায় কিছু না কিছু কৃষক সমিতির কাজ চালু হয়েছিল।

১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং কমরেড সুশীল সেন জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসেন। সেই সময় একটি ঘর ভাড়া করে দিনাজপুর শহরে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস খোলা হয়। ওই সময় জিলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন হয়। কমরেড সুশীল সেন ট্রেনিং-এর জন্য বোম্বে যাওয়ায় সম্মেলনের সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে পড়ে। সম্মেলন উপলক্ষে জিলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষক প্রতিনিধিরা আসেন। তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, সম্মেলনের জায়গা জোগাড় করা, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি রিপোর্ট লেখা সমস্ত কাজই আমাকে করতে হয়। সম্মেলন করা নিয়ে জেলা হাকিম ও আই বি. ইন্সপেক্টরের নিকট দৌড়োদৌড়ি করতে হয়। এই সময় শহরে দুইটি পার্টি সেল গঠিত হয়। একটি পুরুষের এবং একটি মেয়েদের। সেলের সভ্যরা সম্মেলনকে সফল করবার জন্য খুব খাটাখাটুনি করেছিল। স্থানীয় থিয়েটার হলে সম্মেলনের স্থান ঠিক করা হয়। সম্মেলনের পূর্বদিন থিয়েটার হল সাজাবার সময় পুলিশ হামলা করে বলে আমাদের সব জিনিসপত্র নিয়ে পার্টি অফিসে চলে আসতে হয়। পার্টি অফিসের পিছনে খোলা জায়গায় সম্মেলন করা স্থির হয়। সম্মেলনের দিন কমরেড সুশীল সেন, সরোজ মুখার্জি, অবনী লাহিড়ী এসে উপস্থিত হন। এই সম্মেলনে কমরেড সুশীল সেনকে সম্পাদক ও আমাকে সহ-সম্পাদক করে প্রথম দিনাজপুর জিলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় এবং জিলা কমিটিতে মধ্যবিত্ত কমরেড ছাড়া কৃষক কমরেড রূপনারায়ণ রায় ও কম্পরাম সিংকে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে আরও কৃষক কমরেড জিলা কমিটিতে স্থান পায়। এরপর আমরা আরও একটি ভাল বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস সরিয়ে নিই এবং একটি বাড়ি ভাড়া করে কমিউনিস্ট পার্টির 'কমিউন' গঠন করি।

আগস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি যোগ না দেওয়ায় সেই সময় দিনাজপুর শহরে বেশ কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব ছিল। আমরা তিন-চার জন কমরেড পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিশিষ্ট লোক ও স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করে ওই মনোভাব অনেকাংশে দূর করি। তা ছাড়াও আমরা পাড়ায়-পাড়ায় সভা করি এবং কংগ্রেস ময়দানে বড় সভা করি। এই সব কাজের ভিতর দিয়ে দিনাজপুর শহরের অবস্থা অনেকটা আমাদের অনুকূলে আনতে পেরেছিলাম। তারপর শহরে আরও কয়েকটা পার্টি সেল গঠিত হয়। এই সময় কমরেড রূপনারায়ণ সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলে কাজ করতে যায়। শহরে কোনও ছাত্র সংগঠন ছিল না। আমি অনেক চেষ্টা করে শহরে একটি ছাত্র ফেডারেশন সংগঠন গড়ে তুলি। কমরেড মণিকুন্তলা সেন ও কনক মুখার্জি পর পর শহরে এসে মহিলা সমিতি গঠন করে যান। এই উপলক্ষে শহরে একটি সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে গ্রামের কৃষক মহিলারাও উপস্থিত ছিল। কমরেড বীণা সেন, রানী মিত্র, অলকা মজুমদার, বউদি* (বরদা চক্রবর্তীর স্ত্রী) মহিলা সমিতি গড়ার জন্য খুবই পরিশ্রম করেছিলেন। কৃষক মহিলাদের নিয়ে গ্রামেও মহিলা সমিতি গঠিত হয়। এই কাজের ভিতর দিয়ে গ্রামের কৃষক মহিলাদের সঙ্গে শহরের মহিলাদের পরিচয় হয়। কিছুদিন পর কলকাতা

*আশালতা চক্রবর্তী

থেকে কমরেড সুনীল সেন পার্টির কাজ করার জন্য দিনাজপুরে আসেন এবং তাকে পেয়ে দিনাজপুরের পার্টি অনেক শক্তিশালী হয়। কমরেড সুনীল সেনকে পেয়ে আমার খুব সুবিধা হয়। দুইজনে মিলে শহরের কমরেডদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় কাজ শুরু করে দিই। খাদ্য আন্দোলনকে ভিত্তি করে পাড়ায় পাড়ায় সভা করে খাদ্য কমিটি গঠন করি। পার্টি পত্রিকা 'জনযুদ্ধ'-এর বিক্রয় শহরে ক্রমশ বাড়তে থাকে। পার্টির সভ্য সংখ্যা কিছু কিছু বাড়তে থাকে। কিছুদিন শহরে কাজ করবার পর আমাকে চলে যেতে হয় ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলে। সেখানে ছিল কমরেড রূপনারায়ণ রায়। প্রথমে আমি ও রূপনারায়ণ ঠাকুরগাঁও থানার ষোলো, সতেরো এবং আঠারো নম্বর ইউনিয়ন; বীরগঞ্জ থানার এক, পাঁচ ও ছয় নম্বরে কর্মী সন্ধানে ঘুরি। ওই অঞ্চলে পুরাতন কর্মীদের মধ্যে কিছু বসে পড়েছিল। আমাদের চেষ্টা হল নতুন অল্পবয়সি জঙ্গি কর্মী বের করা। কাজকর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টা ক্রমশ সফল হয়েছিল। নতুন কর্মীদের মধ্যে ছিল কমরেড বিনোদ ঘোষ, অখিল সরকার, বালা বর্মণ, দোলগোবিন্দ বর্মণ, আমিরচাঁদ বর্মণ, হেমন্ত বর্মণ, নেন্দু বর্মণ প্রমুখ অনেকে। ওই অঞ্চলে কয়েকটি কমিউনিস্ট সেল গঠন করি এবং পরে গঠিত হয় লোকাল কমিটি। গোটা এলাকায় কৃষকদের পরিচালনার ভার নেয় পার্টি ইউনিটগুলি। এরপর আসে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে ধান চালের দাম বাড়তে থাকে। নানা দিকে ধানের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয়। এর সুযোগ ধনী জোতদারেরা গ্রহণ করে। তারা শত শত মন ধান পাচার করে অতিরিক্ত মুনাফা লুটতে থাকে। তার ফলে কৃষকদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। তখন কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে আসে। ইউনিয়নে-ইউনিয়নে কৃষক সমিতির বড় বড় সভা করে যেখানে সেখানে সম্ভব ধর্মগোলা স্থাপন করা হয়, ধনী জোতদারদের চোরাইচালানি বন্ধ করবার জন্য ইউনিয়নে-ইউনিয়নে গড়ে তোলা হয় লাঠিধারী ভলান্টিয়ারের দল। জোতদারেরা বহু গোরুগাড়িতে ধান বোঝাই করে রাত্রির অন্ধকারে অন্য জেলায় চালান দিত। তারা ধান চালান দিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা লুটত। অপর দিকে হাটে ধানের দাম অতিরিক্ত বাড়িয়ে দিয়ে বিক্রয় করত। ওই দরে বেশির ভাগ কৃষকই ধান কিনতে পারত না। কৃষক সমিতি আওয়াজ তুলেছিল ধানের চোরাইকারবারি বন্ধ করো এবং ন্যায্য দরে কৃষকের নিকট ধান বিক্রয় করো। ইউনিয়নে-ইউনিয়নে কৃষক সমিতির ভলান্টিয়ার মোতায়েন হয়। বিশেষ করে জেলার সীমানা অঞ্চলে ভলান্টিয়ার জোরদার করা হয়। যাতে চোরাইকারবারিরা একটি ধানও জেলার বাইরে নিয়ে যেতে না পারে। অনেক সময় চোরাইকারবারিদের সঙ্গে সমিতির ভলান্টিয়ারদের সংঘর্ষ হত। কিন্তু ভলান্টিয়ারদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও চোরাইকারবারিরা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হত। ভলান্টিয়ারেরা গোরুর গাড়ির চোরাই ধান কৃষকদের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করে লিখিত রসিদ নিয়ে টাকা দিয়ে দিত জোতদারের লোকদের। অনেক সময় ধনী জোতদারদের দোসর থানা-পুলিশ কৃষকদের ওপর হামলা করত এবং প্রথম সারির কিছু কর্মীকে গ্রেফতার করে কৃষকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করবার চেষ্টা করত। তাতে ভীত না হয়ে কৃষকেরা চোরাইকারবারিদের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাটে-হাটে সমিতির ভলান্টিয়ারেরা উপস্থিত থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান বিক্রয় করে। যারা গ্রেফতার হত তাদের মামলা চালাবার জন্য ফান্ড তৈরি করি। কৃষক সাধারণ ওই ফান্ডে যথাসাধ্য দান করত। গ্রেফতারি কমরেডদের চাষ-আবাদ, বাজার-হাট, অন্য কমরেডরা করে দিত। দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে ঠাকুরগাঁও শহরে একটি সভা করি এবং কৃষক কর্মীদের নিয়ে মহকুমা হাকিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরকার থেকে সাহায্য

দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় করি। আধিয়ারি আন্দোলনের পর যে কৃষকরা ঝিমিয়ে পড়েছিল এবং যাদের মনোবল ফিরিয়ে আনবার জন্য কিছু সংখ্যক কৃষক ভলান্টিয়ার নিয়ে হাটে, মেলায় ও গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বিশেষ ফল পাইনি, তারা এই সব আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মনোবল ফিরে পায়। এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে অনেক নতুন নতুন কর্মী বেরিয়ে আসে। এরপর ইউনিয়নে-ইউনিয়নে সরকার থেকে ফুড কমিটি গঠনের প্রস্তাব আসে। আমরা আমাদের এলাকায় ফুড কমিটিগুলি প্রায় সবই দখল করি। ধুতি, শাড়ি, কেরোসিন বিতরণের মধ্য দিয়ে কৃষক সমিতি আরও জনপ্রিয় হয় এবং সমিতি আরও প্রসার লাভ করে। ওই সময় ওই অঞ্চলে পার্টি-তহবিলে ভাল টাকা আদায় হয়।

ধনী জোতদারেরা প্রতি বছর ইচ্ছামতো আধিয়ার বদল করত। জমি পাবার জন্য আধিয়ারেরা জোতদারদের তোয়াজ করে চলত। ধনী জোতদারেরা এই সুযোগ ষোলো আনা আদায় করত। আধিয়ারদেব মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলে তাদের পরস্পরের মধ্যে 'সাপ-বেজি সম্বন্ধ' গড়ে তুলত। ক্রীতদাস আধিয়ারদের দিয়ে যা খুশি তাই করাত। কৃষক সমিতি হতে আওয়াজ তোলা হল—'পুরনো আধিয়ারদের জমি-ছাড়া করা চলবে না।' কৃষক সমিতির তরফ থেকে লালঝান্ডা নিয়ে মিছিল করে এক দিনেই আধিয়ারের জমি চাষ করে দেওয়া হত। জোতদারেরা দারোগা পুলিশ এনে ভয় দেখিয়ে মামলা দায়ের করে এই আন্দোলনকে দমন করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু আন্দোলন মোটেও দমে নাই। মহিলারাও সব আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চল থেকে চলে যাই ঠাকুরগাঁও পশ্চিমাঞ্চলে। অর্থাৎ বালিয়াডাঙ্গি আটোয়ারি থানায়। সেখানে গিয়ে পার্টি-সেল গঠন করি এবং কৃষক সমিতির অফিস খুলি। ওদিকে তখন চলছিল প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। আমি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে কর্মীদের নিয়ে বৈঠকি মিটিং করি এবং বড় সভা করি। তারপর শুরু হয় আমাদের অভিযান। আমরা মিছিল নিয়ে গিয়ে ধনী জোতদারের বাড়ি থেকে কর্জা-ধান আদায় করি। ওখানেও চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে ভলান্টিয়ার মোতায়েন করি। পাচার করবার জন্য গাড়ি বোঝাই ধান ভলান্টিয়ারেরা পাকড়াও করে গরিব কৃষকদের মধ্যে সস্তা দরে বিক্রয় করে দেয়। সেই সময় আমি গরিব কৃষকদের বাড়িতে থাকতাম। দিনের পর দিন ওদের সঙ্গে উপবাসে থেকে সন্ধ্যায় নুন দিয়ে ছাতু খেয়েছি। কোনওদিন কচু সিদ্ধ ছাড়া আর কিছু জোটে নাই। ওদের ভাল খাওয়া মানেই জলের মতো বিউলি ডাল ও ভাত, না হয় মারুয়া পাটের ঝোল-ভাত। আমাদের জঙ্গি কমরেডরা ছিল দরিদ্রতম। আটোয়ারি থানার বলিয়া গ্রামের রাজেন সিং আধিয়ারি আন্দোলনের পর বসে গিয়েছিল। আমার গোপন অবস্থার সময় মাঝে মাঝে সে আমার সঙ্গে দেখা করেছে কিন্তু তাকে কাজে নামাতে পারিনি। এই সময় সে আবার উৎসাহ নিয়ে কাজে নামে। কমরেড কম্পরাম সিং সহ কিছু কৃষক কমরেড সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করতে থাকে। ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলে থাকতেই জঙ্গি কর্মীদের বড় সভায় বক্তৃতা করানো এবং গ্রুপ মিটিং পরিচালনা করানো শিখাই। এখানে এসেও তাই করি। সমিতি যত বাড়তে থাকে এ সবের প্রয়োজনও তত বাড়তে থাকে। এখানেও কোনও কোনও জায়গায় আধিয়ারদের জমি রক্ষার আন্দোলন হয়। সমিতির নির্দেশে জোতদারেরা হাজার লোভ দেখালেও কোনও আধিয়ার পুরনো আধিয়ারের জমি চাষ করতে যেত না। কৃষকেরা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে নতুন বলে বলীয়ান হয় এবং ক্রমশ শ্রেণীসচেতন হয়ে ওঠে।

কৃষক মহিলারাও পিছিয়ে ছিল না। গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি গড়ে ওঠে। সাপ্তাহিক

মিটিং-এ যোগ দিয়ে তারা নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করত। পূর্বে স্বামীরা কৃষক মহিলাদের প্রচণ্ড প্রহার করত। মহিলা সমিতি তা বন্ধ করে দেয়। কোনও স্বামী যদি তার স্ত্রীকে প্রহার করত তা হলে মহিলা সমিতির ভলান্টিয়ারেরা সেই স্বামীকে ধরে এনে বিচার করে জরিমানা করত এবং শাস্তি দিত। অনেক কুসংস্কার ও পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মহিলা সমিতি সেগুলি দূর করবার চেষ্টা করত। আন্দোলনের জোয়ারে কৃষকদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ বেড়ে যায়। তারা ছিল চরম অশিক্ষিত। পার্টির কাগজে কী লেখে তা তারা পড়তে পারে না। লেখাপড়া-জানা লোককে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়। তাতে তারা তৃপ্তি পায় না। বয়স্ক কৃষকেরা নতুন করে বর্ণ-পরিচয় শিখতে আরম্ভ করে। কোনও কোনও মহিলা কৃষক কর্মীর হাতেও দেখা যায় 'বর্ণপরিচয়' বই। আন্দোলনের পটভূমিতে কৃষকেরা গান রচনা করে, কবি গান, পালাগান তৈরি করে, আসর বসিয়ে গাইত। হাটে হাটে গানের স্কোয়াড নিয়ে দোতারা বাজিয়ে সমিতির গান গেয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করত। নির্বাচনের সময় ওইগুলি খুব কার্যকরী হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির নির্দেশে আমাকে কিছু দিনের জন্য শহরে গিয়ে কাজ করতে হয়। সেখানে কমরেড সুনীল সেনের সঙ্গে একত্রে কাজ শুরু করি। আমি ও কমরেড সেন শহরের রাজনৈতিক অবস্থা পালটে দিই। পাড়ায় পাড়ায় সভা, পাড়ার লোকদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা, কংগ্রেসের ময়দানে বড় সভা প্রভৃতি কাজের ভিতর দিয়ে শহরের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ গরম করে তুলি। কমরেড দুর্গা সেন সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে শহরে কাজ করতে থাকে। কমরেড অরুণ সেন ছাত্রদের মধ্যে কাজ করে। ওই সময় শহরে পার্টির সভা-সংখ্যা বেড়ে যায়। আমি আসবার আগে শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। শহর আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

১৯৪৬ সালে আইন সভার নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে আমাদের জেলার কৃষক সন্তান কমরেড রূপনায়ারণ রায় নির্বাচিত হয়। নির্বাচন উপলক্ষে কৃষকদের মধ্যে সভা সমিতি মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে জোর আন্দোলন হয় এবং নতুন নতুন এলাকায় কৃষক সমিতি বিস্তার লাভ করে। নির্বাচন উপলক্ষে আমি ও কমরেড বিভূতি গুহ যাই ঠাকুরগাঁও পূর্ব এলাকায়। জঙ্গি কৃষক কর্মীদের এলাকা ভাগ করে দেওয়া হয়। তারা বাড়ি ঘর ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় থাকত। বৈঠকি সভা, বড় সভা, ভলান্টিয়ার সংগ্রহ—সবই তারা করত। যেখানেই কোনও সভা হত সেখানেই শুধু সেই ইউনিয়নের নয়, অন্যান্য ইউনিয়নের মিছিল এসে জমায়েত হত। এই সব কাজের ভিতর দিয়ে জঙ্গি কৃষকদের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা বেড়ে যায়। আগে পীরগঞ্জ থানার সামান্য অংশেই কৃষক সমিতি ছিল। এই সময় সমিতি ওই থানায় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। নতুন খানসামা থানাতেও সমিতির ঘাঁটি গড়ে ওঠে। ভোটের দিন আমরা সব কৃষক পুরুষ ও মহিলাদের মিছিল করে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাই। ঠাকুরগাঁও শহর কেন্দ্রে এবং বীরগঞ্জ থানা কেন্দ্রে কংগ্রেসিরা আমাদের বিরোধিতা করেছে এবং চেষ্টা করেছে গণ্ডগোল পাকিয়ে ভোট দেওয়া ভণ্ডুল করতে। সেই সময় আমাদের ভলান্টিয়ারেরা অশেষ ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে এবং কংগ্রেসিদের ফাঁদে পা দেয় নাই। আমাদের এলাকায় ধনী কৃষক ছাড়া একটি কৃষকও সমিতির বাইরে ভোট দেয় নাই। কমরেড রূপনারায়ণের জয় যেমন দিনাজপুরের কৃষকদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে তেমনি সারা বাংলার কৃষকদের মধ্যে আশার আলো তুলে ধরে পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে।

হিটলারের ফ্যাসিস্ট শক্তি পরাজিত হয়েছে। দুনিয়ার কৃষক মজদুরের আশা-ভরসার স্থল

সোভিয়েট ইউনিয়নের জয় হয়েছে। বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষক সমিতি পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়েছে। ওদিকে নৌ-বিদ্রোহ, ডাক ও তার কর্মীদের ধর্মঘট, উনত্রিশে জুলাই, ট্রাম ধর্মঘট ইত্যাদি ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে করে তুলেছে সুনিশ্চিত। কৃষক কর্মীদের মধ্যে দেখা যায় এই সব সংবাদ জানবার আগ্রহ। পূর্বে কৃষকদের চিন্তাধারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নীত হয়েছে। গ্রামে পার্টি-পত্রিকা বিক্রয় অনেক বেড়ে যায়। জায়গায়-জায়গায় গড়ে ওঠে পাঠচক্র। একজন পার্টি-পত্রিকা পড়বে— অপরেরা তা শুনবে। ভারতে যখন শেষ সংগ্রাম শুরু হবার সূচনা হয়েছে সেই সময় ইংরেজ বাহাদুর আত্মরক্ষার শেষ অস্ত্র হিসাবে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু করে দেয়। অথচ কিছুদিন আগে রসিদ আলি দিবস উপলক্ষে কলকাতার বুকে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিল। কলকাতার নৃশংস দাঙ্গা, এতদিনের গড়ে তোলা রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তিকে চুরমার করে দেয়। সেই সময় কংগ্রেস-লিগ ঐক্য ওই দাঙ্গা বন্ধ করতে পারত। এই সময় আমরা গ্রামে গ্রামে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও শান্তি সভার আয়োজন করি। কারণ, আমাদের ধারণা হয়েছিল, কংগ্রেস ও লিগের উপরের স্তরের নেতাদের নিয়ে আলোচনা করে কিছুই হবে না। নিচু স্তর থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। আমাদের শান্তি সভাগুলিতে মুসলমান কৃষক সমাগম কমই হত। লিগের প্রচার ছিল 'কৃষক সভা হিন্দু প্রতিষ্ঠান।' যে সকল মুসলমান কমরেড কৃষক সভায় ছিল তাদের তারা খাঁটি মুসলমান বলে গণ্য করত না।

ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের পূর্বে আঞ্চলিক কৃষক সভার সম্মেলন হয়। ঠাকুবগাঁও পূর্ব এলাকার ধনগাঁওতে ওই সম্মেলন হয়েছিল। হাজার-হাজার কৃষক দূর-দূরান্তর থেকে ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। সম্মেলনে তে-ভাগার আওয়াজ তোলা হয়েছিল। হাজার-হাজার কৃষক দৃঢ় মুষ্টি তুলে তেভাগা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল। সভা, মিছিল, হাট প্রচারের মাধ্যমে তেভাগা আন্দোলনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। সেই সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে ভলান্টিয়ার দল ও ধানকাটার স্কোয়াড তৈরি হয়। আমি ছিলাম ঠাকুরগাঁও পূর্ব অঞ্চলে। পরে কমবেড বিভূতি গুহ এসে আমার সঙ্গে যোগ দেন। ধানকাটার মরশুম এসে গিয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের সূচনা হিসাবে আটোয়াবি থানায় কমরেড সুশীল সেনের নেতৃত্বে ধানকাটা শুরু হয় এবং কমরেড সেন গ্রেফতার হন। পরদিন ওই জমিতে আবার ধানকাটা শুরু হলে আধিয়ারদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। রাজবংশী মহিলা দীপশ্বরীর নেতৃত্বে আধিয়ারের দল মারমুখী হয়ে পুলিশকে ধাওয়া করলে পুলিশ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তেভাগা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি কী হবে তা জেলার নেতাদের নিকট অস্পষ্ট ছিল। আটোয়ারি থানার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে জেলার নেতৃত্বকে পথ দেখিয়েছিল। এর মধ্যে কমরেড সেন জামিনে মুক্ত হয়ে আসেন। জেলার নেতারা গোপনে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য আত্মগোপন করে বিভিন্ন এলাকার ভার গ্রহণ করেন। ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলের ভার গ্রহণ করি আমি ও কমরেড বিভূতি গুহ। ঠাকুরগাঁও পশ্চিমাঞ্চলের ভার নেন কমরেড সুনীল সেন ও গুরুদাস তালুকদার। বোঁচাগঞ্জের ভার গ্রহণ করেন কমরেড জনার্দন ভট্টাচার্য। চিরির বন্দর ও কোতয়ালি থানার ভার গ্রহণ করেন কমরেড শচীন্দু চক্রবর্তী ও সুধীর সমাজপতি। বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জ থানার ভার গ্রহণ করেন কমরেড কৃষ্ণদাস মোহান্ত ও তাঁর পুত্র ননী দাস।

ইটাহার, বংশীহারী, কুশমণ্ডি থানার ভার গ্রহণ করেন কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জি। রানী শংকৈল থানার ভার গ্রহণ করেন কমরেড অনিল চক্রবর্তী ও তাঁর সঙ্গে কমরেড পষ্টরাম সিং ও তাঁর স্ত্রী কমরেড জয়মণি। দিনাজপুর শহুরের ভার নেন কমরেড সত্যব্রত চক্রবর্তী, দীনেশ দাস, বরদা চক্রবর্তী। ঠাকুরগাঁও শহরের ভার গ্রহণ করেন কমরেড মহম্মদ হাজি দানেশ ও ভূপেন পালিত। তা ছাড়াও কমরেড দুর্গা সেন ঠাকুরগাঁও, বোঁচাগঞ্জ, দিনাজপুর শহরের সঙ্গে যোগাযোগের ভার নেন। ওই সময় প্রথম সারির কৃষক কমরেডরা বাড়িঘর ছেড়ে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে তেভাগা আন্দোলনে যোগ দেয়। কৃষক কমরেড সহ আমরা এলাকা ভাগ করে নিয়ে বৈঠকি সভা শুরু করে দিই। তারপর শুরু হয় ধানকাটা। মহিলা সহ কৃষক মিছিল জমিতে উপস্থিত হয়ে লাল ঝান্ডা পুঁতে ধান কাটা শুরু করে দেয়। কিছু মহিলা ভলান্টিয়ার গ্রাম পাহারা দেবার জন্য গ্রামেই থাকে। নতুন নতুন এলাকার কৃষকেরা এসে তাদের এলাকায় যাওয়ার জন্য আমাদের ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকে। সেই সব এলাকায় আমরা কৃষক কর্মীদের পাঠিয়ে দিয়ে কাজ শুরু করি। হঠাৎ একদিন শিবরামপুর অফিসে কমরেড নিয়ামত ও নসিরুদ্দিন কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তেভাগা আন্দোলনের ওপর ছাপানো বিজ্ঞাপন ও কৃষক সমিতির রসিদ বই নিয়ে যায়। তারপর থেকে তারা আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে শুরু করে। তারা শত শত মুসলিম কৃষককে সমিতির সভ্য করে লাঠিধারী মুসলিম ভলান্টিয়ার তৈরি করে। আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বেশ কিছু মুসলিম কর্মী বেরিয়ে আসে এবং তারা মুসলিম এলাকাগুলিতে ভাল কাজ করতে শুরু করে। সমিতির তরফ থেকে তাড়াতাড়ি ধান কেটে নিজ খোলানে তুলবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ, জোতদারেরা চুপচাপ থাকলেও আন্দোলনের ওপর আঘাত আনবার প্ল্যান তলে তলে করছিল। বিশেষ করে সরকারি সাহায্য ওরা পাবেই। তাড়াতাড়ি ধান কেটে নিজ খোলানে তুলে মাড়াই করে জোতদারদের অংশ জোতদারদের দিয়ে দিতে পারলে তেভাগা আন্দোলন সফল হবে। যাদের ধান কাটা হয়ে গিয়েছিল তারা এসে সাহায্য করতে শুরু করে—যাদের ধান কাটা বাকি আছে তাদের। এই সময় 'ইনক্লাব' ধ্বনি খুবই প্রচলিত হয়। বিপদ-আপদ উপস্থিত হলে জোর গলায় 'ইনক্লাব' ধ্বনি মুখে মুখে অনেক দূরে চলে যেত এবং স্ত্রী-পুরুষ যারাই ওই ধ্বনি শোনে তারাই লাঠি হাতে ছুটতে ছুটতে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হত। হয়তো কোনও সময় হাজার লোকের জমায়েত হত। এই জমায়েতের কাছে শত্রুপক্ষ পালাবার পথ পেত না। সেলাম দেওয়া উঠে গিয়ে মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে 'ইনক্লাব' জানানো সব কৃষকদের মধ্যেই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাতে মহিলারাও বাদ ছিল না। তেভাগা আন্দোলনের সময়ে হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী সব কৃষকই কৃষক সমিতির পতাকাতলে এসেছিল। মুসলমান কৃষকদের কৃষক সমিতি থেকে সরিয়ে নেবার জন্য মুসলিম লিগ তৎপর হয়ে ওঠে। লিগের তরফ থেকে শহরের হোমরা-চোমরা নেতাদের এনে বিভিন্ন জায়গায় সভার আয়োজন করা হয়। সে সব সভায় একটি মুসলমান কৃষকও যোগদান করে নাই। দশ-বারো জনের বেশি লোক সভায় উপস্থিত হত না। ফলে সভা ভণ্ডুল হয়ে যেত। পেটের দায়ে যে সকল কৃষক জোতদারদের বাড়িতে কাজ করত তারাই জোতদারদের গতিবিধি আলোচনার সব খবর আমাদের এনে দিত। এই আন্দোলন প্রায় চরমে ওঠে এবং সামান্য কয়েকটি থানা বাদে প্রায় সম্পূর্ণ জেলাই উত্তাল হয়ে ওঠে। কুখ্যাত জোতদারদের মধ্যে এক অংশ ভয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং যারা ছিল তারাও দিনের বেলায় বাড়ি থেকে বের হতে সাহস পেত না। দফাদার, চৌকিদার

সবাই সমিতির অনুগত হয়ে পড়ে। বোঁচাগঞ্জে জোতদারদের এক বৈঠক হয়। জেলার সব থানার বড় বড় জোতদারেরা ওই বৈঠকে যোগ দেয় এবং তেভাগা আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্য নানারকম প্ল্যান করে। সেই প্ল্যান অনুযায়ী তারা এই আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য তাদের সমগোত্রীয় লিগ মন্ত্রিসভার উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চুরি ডাকাতি ধান লুঠ ইত্যাদি মিথ্যা সাজানো ঘটনা জানিয়ে তারা মন্ত্রীদের নিকট ক্রমাগত টেলিগ্রাম পাঠায়। মন্ত্রিসভা জোতদারদের আবেদন নিবেদনে ভালভাবেই সাড়া দেয়। তারপরই দেখা যায় দিনাজপুর জেলায় কলকাতার সশস্ত্র পুলিশের ক্যাম্প। জোতদারেরা কোর্টেও অনেক মিথ্যা মামলা দায়ের করে। সরকারি আঘাত প্রথম আসে দিনাজপুর শহর থেকে ছয় মাইল দূরে চিরির বন্দর থানায়। ধান লুঠের মিথ্যা মামলার অজুহাতে সশস্ত্র পুলিশ ওই থানায় তালপুকুর গ্রামে গ্রেফতার করতে যায়। তখন পুলিশের সঙ্গে কৃষকদেব লড়াই হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় শিবরাম ও সমিরুদ্দিন। আহত হয় অনেকে। এক জন সিপাই পেটে তিরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। চিরির বন্দরের ঘটনা জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃষকেরা বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। জানুয়ারি মাসে জেলার হাকিম ঠাকুরগাঁও শহরে জোতদার ও আধিযারদের মধ্যে এক আপস আলোচনার সভা ডাকেন। হাকিম সাহেব ওই সভায় যোগ দেবার জন্য কমরেড হাজি দানেশ ও সুনীল সেনকে আমন্ত্রণ লিপি পাঠান। এমন সময় আপস আলোচনার প্রস্তাব আসে যখন পুলিশের গুলিতে নিহত ও আহত কৃষকের রক্তে দিনাজপুরের মাটি লাল হয়েছে। দিনাজপুরের কৃষকেরা শপথ নিয়েছে 'হয় তেভাগা, নয় মৃত্যুবরণ।' কমরেড সুনীল সেন আত্মগোপন অবস্থায় হাকিমের আমন্ত্রণ লিপি গ্রহণ করেন। সভার দিন সন্ধ্যায় তিনি হাজার হাজার কৃষকের নিকট উপস্থিত হয়ে তে-ভাগা দাবিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে আবার কৃষকদের মধ্যে মিলিয়ে যান। দিনাজপুরের জোতদারেররাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল তে-ভাগা দাবি না মানায়। ভূমিরাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট ও সিরাজগঞ্জে ভূমি রাজস্বমন্ত্রীর বক্তৃতায় তেভাগাকে সমর্থন করায় আমরা খানিকটা আশাবাদী হলেও জোতদারেরা তেভাগার বিরুদ্ধে ছিল অনমনীয়। কয়েকশো মন ধান কর্জা দিয়ে হাজার হাজার টাকা মুনাফা করা, শত শত আধিয়ারকে ক্রীতদাস করে রাখা, দশ গাঁয়ের কৃষকদের উপর হতে শুরু করে আইন সভা পর্যন্ত কর্তৃত্ব করা, দারোগা পুলিশকে হাতের মুঠোয় রেখে গ্রামের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে থাকা—এত সুখ-সুবিধা কি বিসর্জন দেওয়া যায়! গ্রামে তাদের কার্যকলাপ দেখা না গেলেও ভিতরে ভিতরে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। জোতদারদের নির্দেশে লিগ মন্ত্রিসভা অবিলম্বে কৃষকদের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করবার জন্য জেলার হাকিমদের নির্দেশ দেয়। ধনী জোতদাররা মরিয়া হয়ে উঠলেও মাঝারি জোতদারদের মধ্যে অনেকে তেভাগা আন্দোলনের প্রবল জোয়ার দেখে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। সব হারানোর চাইতে তেভাগা মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ—এইরূপ একটা চিন্তাধারা তাদের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু ধনী জোতদারেরা সব সময় তাদের টেনে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে। জোতদার এ্যাসোসিয়েশনের মতামত না নিয়ে তারা যেন কোনও কাজ না করে। আরও কিছুদিন তাদের অপেক্ষা করতে হবে। এই সময় ছোটখাটো জোতদারদের নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। তাদের কিছু জমি নিজেরা চাষ করলেও বাদবাকি জমি আধিয়ারদের দিয়ে চাষ করাত। বিধবাদের জমিও আধিয়ারেরা চাষ করত। তেভাগা আন্দোলন অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রকম নানা সমস্যা দেখা দিতে লাগল। সেইজন্য আমরা ইউনিয়নে-ইউনিয়নে বিচার কমিটি করি। বিচার কমিটির রায় সকলকে মেনে নিতে

হবে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আধা-আধি ভাগও হতে পারে।

তেভাগা আন্দোলনের পূর্বে আমি, কমরেড জনার্দন ভটাচার্য ও হাজি দানেশ রানী শংকৈল থানায় গিয়ে কয়েকটি বড় সভা করে কৃষক সমিতির গোড়াপত্তন করেছিলাম। ওই থানায় বিশেষ কোনও আন্দোলন হয় নাই। যদিও কমরেড অনিল চক্রবর্তী, পষ্টরাম সিং ও জয়মণি আছে তবুও তুলনামূলকভাবে অন্যান্য এলাকার চাইতে দুর্বল। জোতদারদের প্ররোচনায় ধান চুরির দায়ে দারোগা পুলিশ ওই থানায় কৃষক কর্মীদের গ্রেফতার করতে গেলে ভান্ডনী নামে এক কৃষক মহিলা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের বন্দুক কেড়ে নেয় এবং দারোগা পুলিশকে সারাদিন ধরে আটকিয়ে রাখে। পরে কমরেড গুরুদাস তালুকদারের পরামর্শে তাদের মুক্ত করে দেয়। তারপর গ্রেফতার এড়াবার জন্য ওই কমরেডরা আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকে। এরপর খবর আসে, বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত খাঁপুর গ্রামের চারিদিকে আধিয়ারেরা নিজ খোলানে ধান তুলছে, কিন্তু খাঁপুরে আধিয়ারেরা তুলছে চিরাচরিত জোতদারের খোলানে। তেভাগা আন্দোলন সফল হলে জোতদারের খোলানে ধান রাখার দরুন হয়তো তারা ন্যায্য ফসল পাবে না। সেই ভয়ে তারা জোতদারদের খোলান থেকে ধান নিজেদের খোলানে আনতে থাকে। জোতদারেরা ধান লুঠের সংবাদ থানায় জানায় এবং ধান লুঠের ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। বালুরঘাট থেকে ট্রাক বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ আসে খাঁপুরের কৃষক কর্মীদের গ্রেফতার করবার জন্য। সেই সময় বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে কমরেড চিয়ার সাই, যশোদারানি ও আরও অনেকে নিহত ও আহত হয়। তারপর আসে বালিয়াডাঙ্গি থানার ঠুমনিয়া গ্রামের সংবাদ। ঠুমনিয়ায় জোতদারেরা বন্দুক নিয়ে কৃষকদের উপর আক্রমণ চালায়। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে কমরেড মাকটু সিং নিহত হয়। কমরেড মাকটু সিং ও নেন্দালি সিংকে আমি প্রথম কৃষক সমিতিতে আনি। আত্মগোপন অবস্থায় একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম; ওদের সেবাযত্নে আমি সুস্থ হয়েছিলাম। ঠুমনিয়াতে পিপলস রিলিফ কমিটির শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এরপরে ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলে পুলিশের হানা শুরু হয়। বীরগঞ্জ থানার পাঁচ নম্বর ইউনিয়নের একটি গ্রামে দারোগা পুলিশ হানা দিলে কৃষক মহিলারা ঝাঁটা নিয়ে আক্রমণ করে দারোগা পুলিশকে ঘরে আটকিয়ে রাখে। কমরেড বিনোদ ঘোষ ওই গ্রামে হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং ঘটনা জানতে পেরে দারোগা পুলিশকে মুক্ত করে দেয়। ছয় নম্বর ইউনিয়নের কমরেড মকরচাঁদের বাড়ি সশস্ত্র পুলিশ এসে থানা তল্লাশি করে যায়। পুলিশ আসতে দেখে কমরেড মকরচাঁদ পালিয়ে গিয়েছিল। সে সময় কমরেড মকরচাঁদের পাশের বাড়িতে আমি আত্মগোপন করেছিলাম। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পুলিশের হামলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরাও মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা দারোগা, পুলিশ, বন্দুক কোনও কিছুতেই ভয় পায় না। এই আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র লড়াই যেন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কমরেড অনন্ত সিং কৃষকদের স্পেশাল ট্রেনিং দেবার জন্য ঠাকুরগাঁও-এর দিকে রওনা হয়েছিলেন। সে সময় ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলে শিবরামপুর গ্রামে কমরেড ভবানী সেন, অবনী লাহিড়ী, আমি, বিভূতি গুহ, সুশীল সেন ইত্যাদি উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে অনন্ত সিংকে ফেরত পাঠানো সাব্যস্ত হয়। কমরেড অবনী লাহিড়ী গিয়ে কমরেড অনন্ত সিংকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। শিবরামপুর ময়দানে এক বিশাল সভায় কমরেড ভবানী সেন তেভাগা আন্দোলন জয়যুক্ত করার সঙ্গে 'লাঙল যার জমি তার' ধ্বনি তোলেন। কৃষকেরা বিপুল হর্ষধ্বনির সঙ্গে সেই আওয়াজ

সমর্থন করে। এরপর দিনাজপুর শহরে কমরেড ইসমাইল সভা করতে আসেন। আমরা আমাদের এলাকা হতে ওই সভায় যোগ দেবার জন্য বিরাট এক মিছিল পাঠাই। চিবির বন্দর থেকেও মিছিল আসে। ওই মিছিলে রাজবংশী, মুসলমান তির-ধনুক সহ আদিবাসী কৃষক ছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণে যোগ দিয়েছিল রাজবংশী ও আদিবাসী মহিলারা। ওই সভায় কমরেড ইসমাইল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, তেভাগা আন্দোলন দমন কববার জন্য সরকার যদি সৈন্য পাঠায় তা হলে আমরা মজদুরেরা গাড়ির চাকা বন্ধ করে দিব। কৃষক মিছিল সারা শহর ঘুরে স্কুলে ও কলেজের ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করেছিল। অনেক ছাত্র স্বেচ্ছায় মিছিলে যোগ দিয়েছিল। ওই সময় কিছু নতুন ছাত্র কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হয়। কমবেড ইসমাইলের বক্তৃতায় কৃষকেরা উল্লসিত হয়েছিল এই ভেবে যে, শুধু তারা একা নয়; মজদুররাও তাদের সঙ্গে আছে। এরপর শিবরামপুর মাঠে সভা করতে আসেন প্রাদেশিক কৃষক সভাব সভাপতি কমরেড আবদুল্লা রসুল। ওই সভায় হাজার হাজার কৃষক পুরুষ ও মহিলা যোগ দিয়েছিল। মুসলমান কৃষকও ছিল প্রচুর। কৃষক কমরেডবা আমাদের এত ভালবাসত যে কমরেড রসুলের বক্তৃতাব পর আমার বক্তৃতা শুনবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়। আমার বক্তৃতার সময় হাজার হাজাব হাতের কবতালি ও বিভিন্ন শ্লোগানে সভাস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে। ওই সভায় মুসলিম এলাকায় সভা করবার অনুরোধ আসে। কমরেড বিভূতি গুহকে নিয়ে আমি সভা করতে যাবার প্রতিশ্রুতি দিই। ওই সভা চলতে থাকাকালীন সন্দেহজনক এক জন লোকের হঠাৎ আগমন হয়। সভার শেষে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট দিনে আমি ও কমরেড বিভূতি গুহ মুসলিম এলাকায় সভা করতে যাই। সভায় এত মুসলিম কৃষকের সমাবেশ আমি আর কোনওদিন দেখি নাই। ওরা আশেপাশের সব ইউনিয়নের মুসলিম কৃষকদের খবরাখবর দিয়ে জমায়েত করেছিল। প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সভা শেষ হয়। কমরেড গুহ ফিরে যান। মুসলিম কমরেডরা আমাকে নিয়ে যায় তাদের এলাকায়। সেখানে মুসলিম কমরেডদের নিয়ে বৈঠকি মিটিং করি। এই প্রথম শুধু মুসলিম কমবেডদের নিয়ে মিটিং হয়। নিকটেই ধনী মুসলিম জোতদারদের বাড়ি। তাই মুসলিম কমরেডরা আমাকে অন্দর মহলে কড়া পাহারায় রেখেছিল। ভোরের দিকে শত্রুপক্ষের চর আমার সম্বন্ধে খবরাখবব নেবাব জন্য ওই দিকে আসবাব চেষ্টা করেছিল কিন্তু সজাগ প্রহরী কমবেড নসিরুদ্দিনের 'ইনক্লাব' ধ্বনি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে শত শত লাঠিধারী মুসলিম কৃষক জমায়েত হয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষের চর পালিয়ে যায়।

দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের নিরীহ কৃষকদের ওপর পুলিশি জুলুমেব প্রতিবাদ জানানোর জন্য, ওই দিনই ঠাকুরগাঁও শহরে মিছিল যাবে। ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, বোঁচাগঞ্জ অর্থাৎ ঠাকুরগাঁও মহকুমায় সব জায়গা থেকে মিছিল যাবে। ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলের জমায়েতের জায়গা ছিল বৈরাগী আখড়ার হাট। ওখান থেকে ঠাকুরগাঁও শহর চার-পাঁচ মাইল। মুসলিম এলাকা থেকে এক বিরাট মিছিল নিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে বৈরাগী আখড়া হাটে উপস্থিত হই। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিলের পর মিছিল এলে বৈরাগী আখড়ার হাট জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বিরাট বাসুকি সাপের মতো গর্জনশীল মিছিল ঠাকুরগাঁও শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এক দল সুসজ্জিত আর্মড পুলিশ উপরে একবার ফাঁকা আওয়াজ করেই কৃষক মিছিলকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কমরেড হীরামন বর্মণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আহত হয় আরও কিছু। কমরেড

নিয়ামত গোরুর গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কৃষকদের উৎসাহিত করছিল, পায়ে একটি গুলি লাগলে সেও মাটিতে পড়ে যায়। পরে হাসপাতালে পায়ের অর্ধেকটা কেটে বাদ দিতে হয়। অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল ঠাকুরগাঁও পশ্চিমাঞ্চলের মিছিল। তারা অক্ষত দেহেই ফিরে যায়। কৃষকদের ওপর গুলি চালাবার সময় নেতৃত্ব দিয়েছিল বোঁচাগঞ্জের সেই মুসলিম দারোগা। তখন তিনি ইনসপেক্টর পদে উন্নীত হয়েছেন। আমি ও কমরেড গুহ অপেক্ষা করছিলাম সিঙ্গিয়া গ্রামে। শত শত কৃষক কর্মী আমাদের নিকট এসে রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। 'কমরেড, আমাদের বন্দুক দাও, এরকমভাবে আমরা মরতে পারি না। মরলে লড়াই করে মরব।' দুই-একদিনের মধ্যে লোকাল কমিটির জরুরি সভা ডেকে এ বিষয়ে আলোচনা করে উপস্থিত কার্যক্রম ঠিক করতে হবে। সে খবর কমরেডদের জানিয়ে দিই এবং যাতে ইউনিয়নের কর্মীরা সভায় আসে তার জন্য বিশেষ ভাবে বলে দিই। কারণ, এখন যে পরিস্থিতি হয়েছে তাতে হঠাৎ কিছু বলা উচিত হয়। বেশ ভেবে চিন্তে পথ ঠিক করতে হবে। আমি ও কমরেড বিভূতি গুহ আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করি। বাংলার বেশির ভাগ জেলায় কৃষক আন্দোলন নাই। যাও বা আছে তা সামান্য এলাকায় সীমাবদ্ধ। দিনাজপুর জেলার মতো ব্যাপক কৃষক আন্দোলন কোনও জেলাতেই হয় নাই। মজদুর আন্দোলন কিছু কিছু হলেও ততটা জোরদার নয়। শহরের মধ্যবিত্তরা আন্দোলনে নামে নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলকাতার ছাত্র আন্দোলনও প্রচণ্ড মার খেয়েছে। কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে কোটি কোটি মানুষ লড়াইতে নামে নাই। এ অবস্থায় সশস্ত্র লড়াই-এর প্রশ্ন আসে না। তা হলে সরকার আমাদের পিষে মারবে। অথচ দিনাজপুরের কৃষক আন্দোলন সশস্ত্র লড়াইয়ের পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হতে হলে আমাদের শক্তি যথাসম্ভব অটুট রেখে এক পা পিছিয়ে যেতে হবে। তার জন্য প্রথম সারির কর্মীদের গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ফসল ও অন্যান্য জিনিস যথাসম্ভব লুকিয়ে ফেলতে হবে। পুলিশি আক্রমণের সময় বয়স্কা মহিলা ছাড়া যুবতীদের লুকিয়ে পড়তে হবে। কৃষকদের মনোবল অটুট রাখবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম প্রথমে ত্রাসের সঞ্চার করে পুলিশ এখন গ্রামে গ্রামে ঢুকে কর্মীদের গ্রেফতার করবে ও নানারকম অত্যাচার করবে। পুলিশকে সাহায্য করবার জন্য জোতদারের দল এখন এগিয়ে আসবে। বর্ধিত লোকাল কমিটির মিটিং-এ সব এলাকায় কমরেড এলে মিটিং-এর আকার বেশ বড় হবে এবং তখন যদি হঠাৎ পুলিশি আক্রমণ হয় বে-কায়দায় পড়তে হবে। তাই লোকাল কমিটির মিটিং দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আমি ও কমরেড বিনোদ ঘোষ চলে যাই বীরগঞ্জ থানার পাঁচ নম্বরে। ওখান থেকে যাব মুসলিম এলাকায়। পাঁচ নম্বরে কমরেড হেমন্ত বর্মণের বাড়িতে কর্মীদের নিয়ে মিটিং করে আমার বক্তব্য বিশদভাবে বুঝিয়ে দিই। পরের দিন যাব মুসলিম এলাকায়। পাশের গ্রামে এক কৃষকের বাড়িতে আমি ও কমরেড বিনোদ ঘোষ রাত্রি যাপন করি। ভোরে উঠেই শুনি, কমরেড হেমন্ত বর্মণের গ্রামে পুলিশের হামলা শুরু হয়েছে। পুলিশের হামলার সংবাদ পেয়ে আমাদের বাড়িওয়ালা আতঙ্কিত হওয়ায় আমি ও কমরেড ঘোষ চলে আসি বীরগঞ্জ থানার এক নম্বর ইউনিয়নের বনগাঁ গ্রামে। পরদিন কমরেড আমিরচাঁদকে নিয়ে আবার পাঁচ নম্বরে যাই। যখন একচেটিয়া আক্রমণ চলে এবং প্রতিরোধ বলতে কিছুই থাকে না, তখন নেমে আসে হতাশা ও ভয়। পাঁচ নম্বরে গিয়ে তাই দেখতে পাই। বেশ কিছুক্ষণ খাটা-খাটুনির পর কর্মীদের জমায়েত করি। তাদের মধ্যে কিছু অংশ তাড়াতাড়ি মিটিং শেষ করে সরে পড়তে পারলেই বাঁচে। মুসলিম এলাকার খবর

পেলাম ভাল কমরেডরা প্রায় সবাই গ্রেফতার হয়ে গিয়েছে। যারা আছে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। একটি বছর ওই এলাকায় কাজ করতে পারলে আমাদের এ ভাবনা ভাবতে হত না। মুসলিম এলাকায় অধিক পরিমাণে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য করতে পারলে দেশ বিভাগের পরও দিনাজপুরে কাজ করা অসুবিধা হত না। আমি ও কমরেড আমিরচাঁদ পাশের গ্রামে এসে রাত্রি কাটাই। ভোরের দিকে এক দফাদার আমাকে দেখে ফেলায় মনে একটু উদ্বেগ বোধ করি; যদিও আন্দোলনের সময় এলাকার সমস্ত চৌকিদার ও দফাদার কৃষক সমিতিতে এসে গিয়েছিল। পুলিশ হামলার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আবার সমিতি ছেড়ে সরকারের পক্ষে গিয়েছে। দফাদার আমাকে দেখে বলেছিল, 'কমরেড, আমি আপনাকে চিনি, আপনার আসবার খবর আমি রাত্রিতেই পেয়েছি। পুলিশ হামলার পর দিনকাল খারাপ হয়েছে। প্রাণের ভয়ে কেউ কেউ জোতদারের দালাল হয়েছে। খোলা ঘরে আছেন, কোনও দালাল দেখে ফেলবে। তাই আমি সারা রাত অন্ধকারে বসে আপনাকে পাহারা দিয়েছি।'

তারপর আমি ও কমরেড আমিরচাঁদ ফিরে আসি। সেইদিন সন্ধ্যায় শিবরামপুরে লোকাল কমিটির সভা। সন্ধ্যার অন্ধকারে কমরেডরা সব জমায়েত হয়েছে। কমরেড বিভূতি গুহ অবস্থা বিশ্লেষণ কবে বক্তৃতা করছিলেন। ওই মিটিং-এ আমিও কিছু বক্তব্য রাখি। পাশে বেড়ার ওধারে শব্দ শুনে বোঝা গেল শত্রুর চররা ওত পেতে বসে সব কথাই শুনছে। আজকের মিটিং-এর খবর ওরা পেয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগ গ্রামেও প্রবেশ করেছে। তাড়াতাড়ি মিটিং শেষ করে আমরা চলে যাই। গ্রামের কিছু ছেলে ঠাকুরগাঁও শহরে পড়তে যেত। ওই ছেলেদের সাহায্যে শহরের কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। পুলিশ সন্দেহ করে ওই ছেলেদের এক জনকে খানাতল্লাশি করে। কাজেই আমরা বাধ্য হয়ে মহিলা কমরেডদের পাঠাতাম শহরে। তারা ডিম অথবা তরকারি বিক্রেতারূপে গিয়ে যোগাযোগ করত। ইতিমধ্যে কমরেড সুধীর সমাজপতি, সুনীল সেন, বসন্ত চ্যাটার্জি, শচীন্দু চক্রবর্তী ইত্যাদি অনেকেই গ্রেফতার হয়ে যান। কমরেড বিভূতি গুহ চলে যান শহরে। ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলে কমরেড বিনোদ ঘোষ, বালা বর্মণ ইত্যাদি কিছু প্রথম সারির কমরেড গ্রেফতার হয়ে যান। আমি এলাকায় থেকে বাদ বাকি কমরেডদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যাই। আমার প্রধান কাজ হয় কমরেডদের মনোবল অটুট রাখা ও সংগঠনগুলিকে রক্ষা কবা। বিস্তৃত এলাকায় ঘুরে ঘুরে যোগাযোগ রাখা অসুবিধা। কিছুদিন পর কমরেড বিনোদ ঘোষ মুক্ত হয়ে এলে আমার সুবিধা হয় অনেকখানি। কিছুদিন দিনাজপুর শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থা পাকা করবার জন্য দিনাজপুর শহরে যাই। সেখানে কয়েকদিন আত্মগোপন অবস্থায় থেকে জানতে পারি আমাদের উপর থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা উঠে গিয়েছে। আমি বেরিয়ে এসে কমরেড বরদা চক্রবর্তীর সহযোগে বন্দি কর্মীদের মুক্তির চেষ্টা করি। কিছুদিনের মধ্যে সব কমরেড মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন ও বিভাগ হয়। ঠাকুরগাঁও মহকুমা ও দিনাজপুর শহরসহ জেলায় বেশির ভাগ অংশ পাকিস্তানে পড়ে যায়। এরপর আমি চলে যাই বীরগঞ্জ থানার পাঁচ নম্বর ইউনিয়নে। সেখানে আমি ও কমরেড হাজি দানেশ এক সভা করি। সভায় আগের মতো লোক না হলেও কয়েকশো লোক হয়েছিল। কমরেড মনসুর হাবিব কাজ করবার জন্য আসেন আমাদের জেলায়। তাঁর সঙ্গে কিছুদিন কাজ করি। কিছুদিন পর পার্টি থেকে নির্দেশ আসে 'ডিরেক্ট অ্যাকশনের'। ঠাকুরগাঁও মহকুমার রুহিয়া স্টেশনে রেল লাইন তুলবার চেষ্টা হয়। ওইরূপ আরও কিছু কিছু অ্যাকশন হয়। ডিরেক্ট অ্যাকশন করতে গিয়ে আমাদের

লাভের চাইতে ক্ষতি হয়েছে বেশি। অনেক ভাল কমরেড ধরা পড়েছে। তার মধ্যে কমরেড কম্পরাম সিং ও সুশীল সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। কমরেড কম্পরাম রাজশাহী জেলে প্রহরীর গুলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে আমি কলকাতায় চলে আসি। একটা আন্দোলন শুরু করতে গেলে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। আমাদের শক্তি কতখানি এবং শত্রুপক্ষের শক্তির সঙ্গে সমান তালে যুঝতে পারব কিনা। বিশেষ করে সরকার যখন শত্রুপক্ষকে সব রকমের সাহায্য করবে। আন্দোলনে বাধা কী কী আসতে পারে, সেই সব বাধা আমরা কেমন করে কাটিয়ে উঠব। আন্দোলনের জয় যেমন আমাদের শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে এবং তার প্রচণ্ড ধাক্কা গিয়ে পড়বে অন্যান্য জেলায়—সেই সঙ্গে মজদুর, ছাত্র, মধ্যবিত্ত হিন্দু, মুসলমান সকলকেই টেনে টেনে নিয়ে আন্দোলনে সামিল করবে—অপর দিকে তেমনি অকৃতকার্য হলে আমাদের সংগঠন দুর্বল হয়ে যাবে এবং হতাশা ও ভয় ঢুকে জনসাধারণকে করে তুলবে আন্দোলন-বিমুখ। বেশ কিছুদিনের জন্য আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে। আধিয়ারি আন্দোলনে আমরা দেখেছিলাম ব্যাপক গ্রেফতার, মহিলাদের উপর বলাৎকার, কৃষকদের ঘরে শস্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা। ওই সবের বিরুদ্ধে আমরা যথাসাধ্য রক্ষাকবচ গ্রহণ করেছিলাম। গ্রেফতার হয়ে যাবার পর যাতে কমরেডদের জমি চাষ হয়, হাট-বাজার হয়, তার জন্য আমরা স্কোয়াড গঠন করেছিলাম। শস্য ইত্যাদি লুকিয়ে ফেলা, যুবতী কৃষক মেয়েদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকা, প্রায় সব ব্যবস্থাই আমরা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আন্দোলন দমন করবার জন্য যেগুলি বর্ষণ হতে পারে সে ধারণা আমাদের ছিল না। ছিল না বলে—মুখে শেষ লড়াই শুরু হয়েছে বললেও তার জন্য আমাদের কোনও প্রস্তুতি ছিল না। ধর্মঘট, নৌ-বিদ্রোহের খবর শুনে আমাদেব ধারণা হয়েছিল সর্বত্রই শেষ লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। তেভাগা আন্দোলন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বুঝাতে পারি নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণী তেভাগা আন্দোলনকে কৃষকদের অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসাবে দেখেছে এবং দেখেছে বলে তাদের স্বার্থের দিক দিয়ে এই আন্দোলনকে ক্ষতিকর মনে করেছে। কারণ, গ্রামাঞ্চলে তাদেরও কিছু কিছু জমিজমা ছিল এবং সেগুলি তারা আধিয়ারদের দিয়েই চাষ করাত। তেভাগা সফল হলে তাদের আর্থিক ক্ষতি হবে। আন্দোলন সামান্য কয়েকটি জেলায় সীমাবদ্ধ থাকায় ব্যাপকতা ছিল না। মজদুর শ্রেণীর আন্দোলন অনেক দুর্বল ছিল। দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য গড়ে তুলতে পারি নাই। আন্দোলনের ভেতর দিয়ে নিচু থেকে যে ঐক্য গড়বার প্রচেষ্টা হয়েছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। তারই সুযোগ নিয়েছে কংগ্রেস ও লিগের নেতৃস্থানীয়েরা। আমাদের 'ডিরেক্ট অ্যাকশনের' শ্লোগান হঠকারী শ্লোগান ছিল। দেশ বিভাগ আমাদের সকল কর্মধারায় ছেদ এনেছিল।

দিনাজপুর জেলার কৃষক আন্দোলন : শুরু থেকে তেভাগা পর্যন্ত

কালী সরকার

গত ১৯৩৮ সালে আমরা কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দি বিভিন্ন জেল অথবা বন্দিশিবির থেকে বেরিয়ে আসি। বন্দিশিবিরে থাকা অবস্থাতেই আমরা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা এবং চিন্তা ভাবনা করেছি। বন্দিশিবির থেকে বেরিয়ে এসেই শ্রীযুক্ত বিভূতি গুহর নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একত্রিত হয়ে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়বার সিদ্ধান্ত নিই।

এইবার তদানীন্তন অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সাধারণ কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক পটভূমিকার একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন—যার ভিত্তিতে আমরা কৃষক সমিতি গড়বার ও কৃষক আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে আশ্রিত দেশীয় সামন্তবাদ তখন প্রকটরূপ ধরে জেলার সর্বত্র বিরাজমান। জমিদার মহাজন আর সরকারি আমলার অত্যাচারে কৃষক সমাজ জর্জরিত, অতিষ্ঠ। জমিদারি অত্যাচারের কথাই ধরা যাক। এক টাকা খাজনায় কৃষককে ওই এক টাকার সঙ্গে আরও দুই টাকা বাজে আদায় দিতে হত। সরকারি ভাষায় যাকে বলা হত 'আবওয়াব'। কৃষকদের ভাষায় বলা হত বাজনা। বলা হত, 'এক টাকা খাজনায় দুই টাকা বাজনা।' বিভিন্ন খাতে এই আবওয়াব বা বাজনা আদায় করা, যেমন: নজরানা,—কাছারি বাড়িতে খাজনা দিতে গেলে মহামান্য জমিদার স্বয়ং বা প্রতিভূ নায়েব গোমস্তার সঙ্গে দেখা হবে—নিশ্চয় এই দর্শনের মহাপুণ্য লাভের খরচ; অথবা, জমিদারের অন্য প্রতিভূ পাটোয়ারি, গ্রামে গিয়ে গ্রাম্য মণ্ডলের বাড়িতে খাজনা আদায় করবেন তার দর্শনি বা নজরানা। অবশ্য এই নজরানা নায়েব গোমস্তা বা পাটোয়ারির প্রাপ্য ছিল না। এই পাওয়া খোদ জমিদারের পার্বণী—জমিদার বাবুর বাড়িতে যে বারো মাসে তেরো পার্বণ হত—অবশ্য কোনও পার্বণে সাধারণ প্রজাদের, বিশেষ করে মণ্ডলদের ডাক পড়ত পার্বণের কাজকর্ম করার জন্য। যেমন, খড়িফাড়া, পাতা সংগ্রহ, জল আনা ইত্যাদি। এই উপলক্ষে ভূরি-ভোজনের সামান্য অংশ তাদের ভাগ্যে জুটত। এই খরচের অংশ প্রতিটি প্রজাকে দিতে হত 'পার্বণী' নামে।

লাঠিধারী বরকন্দাজ আমদানি করা হত সাধারণত বাংলার বাহিরের ব্রাহ্মণ, ছত্রী অথবা মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। এদের প্রয়োজন হত জমিদারের বাড়ি ও কাছারি বাড়ির জৌলুস বৃদ্ধি, তাদের নিরাপত্তা রক্ষা এবং অবাধ্য প্রজাদের লাঠিপেটা করা। আর পাটোয়ারি বাবু গ্রামে গ্রাম্য মণ্ডলের বাড়িতে বসে খাজনা আদায় করবেন তার নিরাপত্তা রক্ষা এবং স্টাফের (পাটোয়ারি, বরকন্দাজ, কোতোয়াল) রান্নাবান্না করা। এই বরকন্দাজ-প্রবরেরও মাস মাহিনা সহ খাওয়া খরচ পর্যন্ত দিতে হত প্রজাদের, যা বরকন্দাজি নামে খ্যাত ছিল।

কোতোয়ালের কাজ ছিল পাটোয়ারি বাবুর সঙ্গে মফস্বলে বাবুর দপ্তর বহন কয়া, খাজনা আদায়ের জন্য মণ্ডলের বাড়িতে প্রজাদের ডাকানো এবং পায়োটারিবাবুর অন্যান্য ফরমাশ খাটা। এ খরচও দিতে হত প্রজাদের। ফারগানা—চেক ছাপানোর এবং চেক লেখাই খরচ। এই সমস্ত খরচ দিতে হত প্রজাদের আবওয়াবের নামে। সাধারণত তিন বা চার কিস্তিতে খাজনা আদায় হত। প্রতি কিস্তিতে আবওয়াব সহ বাৎসরিক খাজনা আদায় দিতে হত। এক কিস্তি খেলাপ হলে, পরের কিস্তির সময় কিস্তি খেলাপি সুদ দিতে হত। প্রতি কিস্তিতে আবওয়াব দিতে হত। একাদিক্রমে তিন বৎসর খাজনা দিতে না পারলে, প্রজার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে ডাকা হত। কিস্তি খেলাপ বা এক বৎসর দুই বৎসরের খাজনা না দিতে পারার জন্য খোদ জমিদার বাড়ি বা কাছারি বাড়িতে প্রজার ডাক পড়লে প্রজার জীবন উড়ে যেত। সেখানে তার মান, সম্মান, ইজ্জত মায় জীবনের দাম পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে যেতে হত। এই সমস্ত ছাড়াও জমিদার বা তার স্টাফের কেউ যদি কোনও কারণে কোনও প্রজার প্রতি বিরূপ হতেন, তবে সে প্রজার আর রেহাই ছিল না। শারীরিক নির্যাতন তো ছিলই, তা ছাড়া মিথ্যা খাজনা বাকি বা 'মিথ্যা দেনার খতে' তাকে 'উপেন' হতে হত। এই সমস্ত অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক কোনও কোর্টের আশ্রয় নিত না। কারণ, জমিদারের প্রতিটি কাজই ছিল আইন সঙ্গত। শতকরা একশোটি 'কেসেই' জমিদারের পক্ষে রায় হত। তা ছাড়া সর্বশক্তিমান জমিদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে কে! কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে!

জমিদারের সর্বশেষ প্রতিনিধি গ্রামদেশে গ্রামের মণ্ডল। সে একাধারে জমিদারের প্রতিনিধি, অন্য দিকে সমাজপতি। কাজেই তার প্রভাব প্রতিপত্তিও কৃষকদের উপরে কম ছিল না। এই তো গেল কৃষক সাধারণের এক নম্বর শোষক জমিদারের কথা। তারপর মনে আসে জোতদারের কথা। কৃষক সাধারণকে অত্যাচার ও শোষণের দিক থেকে এর আর জমিদারের মধ্যে বিশেষ কোনও তারতম্য নাই। অঢেল জমির মালিক তারা। একশো বিঘা থেকে দুই হাজার বিঘার মালিক দিনাজপুর জেলায় ছিল, এ আমার জানা কথা। দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমায় বালিয়াডাঙ্গি থানায় দুই জন জোতদার ছিলেন। তাদের আসল নাম বিশেষ কেউ জানত না। সাধারণের নিকট তারা পরিচিত ছিলেন 'বড় খোদা' আর 'ছোট খোদা' বলে। খোদা কথাটা ব্যবহার করা হত এই অর্থে যে, অগাধ সম্পত্তির মালিক তারা, অসীম তাদের ক্ষমতা। তারা নিজেরাও মনে করতেন বুঝি তারাই একমাত্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কৃষক সাধারণও এদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবেই মনে করত। দুই-একখানা থেকে আরম্ভ করে দশ-বারোখানা করে হালের মালিক ছিলেন এক একজন জোতদার। আনুপাতিক হারে পাঁচ থেকে কুড়ি জন পর্যন্ত বা বাৎসরিক বন্দোবস্তে খতবন্দি চাকর থাকত এক একজন জোতদারের অধীনে। এতেও তারা নিজেদের জমি চাষ করতে পারতেন না। নিম্নসংখ্যা দশ থেকে শুরু করে পঞ্চাশ-ষাট পর্যন্ত খতবন্দি বর্গাদার ছিল এক একজন জোতদারের অধীনে। তা ছাড়াও কিছু কিছু জমি থাকত তাদের চুকানি অর্থাৎ চুক্তি বন্দোবস্তে। খতবন্দি প্রজা জমিদারি খাজনার চেয়ে পাঁচ থেকে দশ গুণ পর্যন্ত খাজনা দিতে বাধ্য হত। এই সমস্ত জমির খাজনার ব্যাপারে চুকানিদার প্রজাদের সঙ্গে জমিদারদের সরাসরি কোনও যোগাযোগ থাকত না!

জোতদারদের সম্পর্ক প্রধানত বর্গাদারদের সঙ্গে। এ ব্যাপারেও আবওয়াব ছিল। জমি বর্গা নিতে গেলে বিঘা প্রতি একটা বড় রকমের নজরানা দিতে হত। এটা কোথাও ছিল নগদ

টাকায়, কোথাও বা হত খালি পাঁঠা খাওয়ার ভিতর দিয়ে। তা বাদেও ছিল 'বরকন্দাজি', আধিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। তারপর পাহারাদারি, ধানের খোলান পাহারা দেবার খরচ। ছিল মহলদারি, ধান যে মেপে দেবে তার খরচ। জোতদার, বার্গাদার-কে কেবলমাত্র বীজ ধান ছাড়া চাষের জন্য আর কোনও সাহায্য করত না। খোলানে ধান উঠলে বীজ ধানের দ্বিগুণ কেটে নেওয়া হত। বৎসর অন্তে জোতদারের খোলানে ধান ভাগের সময়, বর্গাদারের অর্ধাংশের ভিতর থেকে বীজধান ও অন্যান্য আবওয়াব দেওয়ার পর ধানের সামান্য অংশই সে ঘরে তুলতে পারত। তাতে তার সম্বৎসরের পারিবারিক খরচ চলত না। কাজেই তাকে ধান কর্জের জন্য জোতদারের শরণাপন্ন হতে হত। এর নাম ছিল 'বাড়িয়া' অর্থাৎ যা বেড়ে যায়। বাড়িয়া ধানের দেড়িয়া সুদ। এক মন ধানে বাড়িয়া বর্গাদারকে দেড়গুণ ধান দিতে হত। এক বছরে শোধ দিতে না পারলে চক্রবৃদ্ধি সুদসহ পরের বছর দিতে হত। এইভাবে বছরের পর বছর বর্গাদার সর্বস্বান্ত হতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত বৎসরান্তে বর্গাদারকে তার অংশের সমস্ত ধান দিয়ে জোতদারের দেড়িয়া কর্জের উপর নির্ভর করতে হয়। ধীরে ধীরে বর্গাদারকে জোতদারের খেতমজুরে পরিণত হতে হত। তাতেও রেহাই নাই। বর্গাদারের নিজস্ব সামান্যতম জমি থাকলে সমস্তই যেত জোতদারের ঘরে। দেনার দায়ে অনেক ক্ষেত্রে বংশপবম্পরায় খেতমজুরি করতে হত।

কৃষক প্রজাগণ জমিদার জোতদারের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাধ্য হয়ে মহাজনদের শরণাপন্ন হত। মহাজন মানে হচ্ছে যারা চক্রবৃদ্ধি সুদের উপরে টাকা কর্জ দিত। মহাজনগণ অবশ্য বিভিন্ন নামে অর্থাৎ কট, বন্ধক, রেহান ও খাইখালাসি ইত্যাদিতে জমি লিখে নিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের শর্তে টাকা কর্জ দিতেন। মেয়াদ মধ্যে চক্রবৃদ্ধি সুদসহ টাকা শোধ দিতে না পারলে, মহাজনগণ আদালতে নালিশ করে প্রজার ভিটে-মাটি-বাড়ি পর্যন্ত নিলামে তুলে নিজেরাই ডেকে নিতেন। এতেও টাকা শোধ না হলে মহাজনগণ ইচ্ছা করলে জেলে পাঠাতে পারতেন। এতে কিন্তু টাকা শোধ হত না। ঋণ শোধের একমাত্র উপায় ছিল খাতকের অবশিষ্ট স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে অথবা বংশপরম্পরায় অল্প মাহিনায় জনমজুর খেটে ঋণ শোধ দেওয়া। অনেক সময় দেখা যেত, জমিদারের কর্মচারী নায়েব অথবা খাজনা আদায়কারি পাটোয়ারি নিজেরাই জোতদার এবং মহাজন। তা হতে পারলে তো তাদের পোয়াবারো। তাই দেখেছি, এই সমস্ত লোক কয়েক বছর জমিদারি সেরেস্তায় চাকুবি করে এক একজন পাঁচশো বা হাজার বিঘা জমির মালিক হয়ে বসে আছেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে ফজলুল হকের আমলে ঋণ সালিশি বোর্ডের সাহায্যে পুরাতন ঋণ থেকে খাতক কৃষকদের বাঁচবার খানিকটা ব্যবস্থা হল অবশ্য—কিন্তু মূল ব্যবস্থার থেকে বাঁচবার কোনও উপায় হল না। কাজেই জমিদার মহাজন জোতদারদের অনাচার অত্যাচার সমানে চলতে থাকল কৃষকদের উপরে। তাদের অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হল না। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার এই অর্থনৈতিক পটভূমিকার উপর দাঁড়িয়ে কয়েকজন জেলফেরত বিপ্লবী যুবক ইংরাজি ১৯৩৮ সালের শেষার্ধে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে লেগে পড়েন।

প্রথমেই তাঁরা ১৪ দফা দাবি সংবলিত একটি প্রচারপত্র ছেপে দিনাজপুর জেলার প্রায় বড় বড় হাট এবং গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেন। দিনে দিনে কর্মী সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করে। ১৪ দফার সব দফার কথা আজ আর মনে নাই। যা দু-চারটি মনে আছে তা হচ্ছে: সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক, জমিদারি প্রথা ধ্বংস হউক, লাঙল যার জমি তার, বেআইনি

আদায় বন্ধ করো, গ্রামে গ্রামে নলকূপ চাই, বিনা পয়সায় কৃষকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা চাই, শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। কৃষকদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি হয়। গ্রামে গ্রামে বড় বড় জনসভা হতে থাকে। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি থানার লালপুর ডাঙ্গায় এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতা স্বর্গত বঙ্কিম মুখার্জি সেই সভায় বক্তা হিসাবে এসেছিলেন। সভায় জন সমাগম দেখে তিনি তো অবাক। সভার উদ্যোক্তাকে তিনি বলেই ফেললেন, "এত লোক জমা করলেন কী করে"? গ্রাম দেশে কৃষক সভার ডাকে এই প্রথম সভায় প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল।

প্রথম শুরু হয় সুদ বিরোধী—বিশেষ করে ধানের এক মনে দেড়মন নেওয়ার বিরুদ্ধে এবং 'নাগার' বিরোধী ও 'ঈশ্বরবৃত্তি' বিরোধী আন্দোলন। 'নাগার' কথার অর্থ হচ্ছে কৃষকেরা হাটে বাজারে চাল, ধান, পাট পাইকারদের বা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করতে গেলে চালে মন প্রতি এক সের, ধানে দুই সের এবং পাটে তিন সের বিনা পয়সায় দিতে হত। এই ব্যাপারে স্থানবিশেষে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। ঈশ্বরবৃত্তির অর্থ ছিল স্থানীয় কোনও বড় পূজা উপলক্ষে মন প্রতি কিছু পয়সা কেটে নেওয়া। আন্দোলন হত সাধারণ হাট-মিছিল, গ্রামমিছিল এবং সক্রিয় প্রতিরোধ। বেশ কয়েক মাস আন্দোলনের ফলে 'নাগার' এবং 'ঈশ্বরবৃত্তি' উঠে যায়। কর্জা ধানের সুদ হয় দেড়িয়ার স্থানে সোয়াইয়া, এক মন ধানে আধ মন সুদের স্থানে দশ সের সুদ।

এইবার শুরু হয় তোলাবটি ও হাটে মেলায় গোরু মহিষের অত্যধিক লেখাই বা ছাপা বিরোধী আন্দোলন। হাটে হাটে বিশেষ করে বড় বড় হাটে ইজারাদার এবং জমিদারদের অত্যাচার ছিল চরম। হাটে-বাজারে যে সমস্ত চাষি আনাজ, তরকারি, ফল মূল বিক্রয় করতে যেত—তাদের একই বিক্রেতার নিকট থেকে একবার করে জায়গার খাজনা হিসাবে নগদ পয়সা আর একবার আনাজ, তরকারি, ফল-মূল, ধান-চালের খানিকটা অংশ। এই নেওয়ার নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। দুই হাত একত্র করে তাতে যা ওঠে। কেউ দিতে অস্বীকার করলে, তার বাটখারা পাল্লা তুলে নিয়ে যাওয়া হত কাছারিতে। কাছারি থেকে ওই সমস্ত আনতে গেলে তাকে তার দেয় তো দিতেই হত—উপরন্তু অপমানও হতে হত। মেলায়-মেলায় গোরু মহিষের লেখাইও ছিল অস্বাভাবিক।

যাই হোক, তোলাবটি আন্দোলন অচিরেই ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপ নিতে আরম্ভ করে। হাটে-হাটে মেলায়-মেলায় হাজার-হাজার মানুষের মিছিল হতে আরম্ভ করে। মিছিলের আওয়াজ আর দাপটে হাট মেলা তোলপাড় হয়ে যেত। বড় বড় মেলায় পনেরো-কুড়ি মাইল দূর থেকেও হাজারে হাজারে মিছিল আসত। পুলিশপক্ষ অনেক সময় মালিকের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করতে আসত—অনেক সময় মালিকপক্ষ ভয় দেখাত। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের মিছিলের সামনে পুলিশ পাত্তা পেত না। পুলিশ বা মালিকপক্ষ অশালীন ব্যবহার বা কথাবার্তা বললে অনেক সময় তাদের খুবই বে-কায়দায় পড়তে হত। হয় তাদের পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হত, নয়তো মিছিলের সামিল হয়ে শ্লোগান দিয়ে হাটে ঘুরতে হত। কৃষক সভার কর্তৃপক্ষ এই সময় নতুন করে নতুন কায়দায় শিক্ষিত ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়বার প্ল্যান নেয়। শ্লোগান ছিল ভলান্টিয়ার হতে হলে লাগবে এক লাঠি (কানকাসা), এক টুপি, এক টাকা। নিয়ম ছিল প্রতি দশ জন ভলান্টিয়ারে এক জন ক্যাপ্টেন। দশজন ছোট ক্যাপ্টেন এক জন বড় ক্যাপ্টেন বা কমান্ডার। খানিকটা মিলিটারি কায়দায় ভলান্টিয়ারদের সুশিক্ষিত করে তোলা হত। এক সময় এই দিনাজপুর জেলায় (অবিভক্ত) দশ হাজার সুশিক্ষিত লাঠি ও

তির-ধনুকধারী ভলান্টিয়ার ছিল। চৌত্রিশ হাজার কৃষক সভার সভ্য ছিল।

প্রথম সংঘর্ষ বাধে ঠাকুরগাঁও মহকুমায়; বোধ করি বালিয়াডাঙ্গি থানার কালীর মেলায়। কালীর মেলা তদানীন্তন দিনাজপুর জেলায় একটি বিখ্যাত মেলা। হাজার হাজার গোরু মহিষ উঠত সে মেলায়। সারা বাংলা থেকে বড় বড় দোকান আসত সে মেলায়। সার্কাস, ম্যাজিক ইত্যাদি রং-তামাশাও ছিল প্রচুর। কয়েক হাজার ভলান্টিয়ার মেলায় নামে তোলাবটি বন্ধ ও গোরু মহিষের ছাপাই কমানোর শ্লোগান দিয়ে। মালিকপক্ষের হয়ে পুলিশ বাধা দেয়। মেলায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ভলান্টিয়ার বাহিনী তখন তেমন কিছু না বলে মেলা থেকে উঠে আসে। রাত্রিতে কৃষকরা মেলার গোরু-মহিষ দোকান-পত্র সহ সমস্ত মেলা, প্রায় এক মাইল দূরে নিজেদের জমিতে বসিয়ে দেয়। কৃষক সমিতির সিল দিয়ে বিনা ছাপায় গোরু মহিষ ইত্যাদি বিক্রয় হতে থাকে। তোলাবটি সম্পূর্ণ উঠে যায়। সকাল বেলায় দেখা গেল মেলার পূর্বস্থান একদম ফাঁকা, জনমানবশূন্য। এইভাবে 'কৃষক সমিতি হাট' নামে নতুন কয়েকটি হাটও সেদিন দিনাজপুর জেলায় বসে। তার মধ্যে একটি ছিল দেশ ভাগের আগে পর্যন্ত। সেটি থানা কালিয়াগঞ্জ এবং কোতোয়ালির সীমানায় সুরলে। এই আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত লিখতে চাই না, কিন্তু এর শেষ পর্যায়টুকু লেখার প্রয়োজন আছে। এটি ঘটে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানা ও পার্বতীপুর থানার মধ্য সীমানায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড়া শিবের পূজা উপলক্ষে একমাসব্যাপী মেলা হত সেখানে। বিক্রয়ের জন্য বহু গোরু মহিষ আসত। বড় বড় দোকান বসত। বহু রকম আনাজ তরকারি ইত্যাদি উঠত প্রচুর। তোলাবটি বন্ধ, গোরু মহিষের লেখাই কমানোর দাবিতে বহু লাঠিধারী ভলান্টিয়ার উঠল সেখানে। পুলিশপক্ষ বোধ হয় প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪ ধারা জারি হল। মেলায় ভলান্টিয়ার উঠা বন্ধ। সেদিন ভলান্টিয়ারগণ মেলা থেকে চলে আসে—কিন্তু পরের দিন ১৪৪ ধারা অমান্য করে আবার মেলায় ভলান্টিয়ার আসে। সে দিনই রাত্রে তিনটার সময় নবাবগঞ্জ থানাব এ. এস. আই দলবল সহ গ্রামে এসে সাত জন স্থানীয় কৃষক নেতাকে গ্রেফতার করে। আরও কয়েকজনের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল। পুলিশ তাদের খুঁজে পায় না। পুলিশ তখনও আসামিদের নিয়ে গ্রাম থেকে বের হতে পারে নাই। কিন্তু খবর হাওয়ার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লাঠি ও তিরধনুকধারী ভলান্টিয়ার ইনক্লাব ধ্বনি আর নাগরা বাজাতে বাজাতে ছুটে আসতে আরম্ভ করে। আসামিদের নিয়ে ছুটতে ছুটতে কোন রকমেও আবতাবগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে দুইজন আসামি কৃষক নেতাকে ভলান্টিয়ার বাহিনী ছিনিয়ে নেয়। তারপর চতুর্দিক থেকে হাজার হাজার ভলান্টিয়ার জমায়েত হয়ে বোর্ডের ঘর ঘেরাও করে শ্লোগান দিতে থাকে। তাদের একমাত্র শ্লোগান ছিল—'আমাদের কমরেডদের বিনা শর্তে এখনই ছেড়ে দিতে হবে'। ওদিকে নবাবগঞ্জ থানার এস. আই. নিখিল চক্রবর্তী যখন দেখলেন, বেলা ১০টা বাজে এ. এস. আই. এখনও পর্যন্ত আসামিদের নিয়ে থানায় এল না। তিনি অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই কিছু অঘটন ঘটেছে। তিনি নিজেই ছুটলেন ঘোড়ায় চড়ে ঘটনাস্থলে। গিয়ে দেখেন কঠিন পরিস্থিতি! আসামিদের ধরে সদলবলে এ. এস. আই. বোর্ডের ঘবে বন্দি। তবু দারোগার মেজাজ যাবে কোথায়! তিনি মেজাজ গরম করে শাসান—গর্জন করতে থাকেন ভলান্টিয়ারদের। আর যাবে কোথায়! 'ধর শালাকে মার শালাকে' বলে ভলান্টিয়ার বাহিনী দারোগাবাবু-কে আক্রমণ করে। দারোগা বাবু ঘোড়া ছুটিয়ে কোনওরকমে প্রাণে বাঁচলেন—কিন্তু ছুড়ে মারা লাঠির ঘায়ে তার মাথার টুপি উড়ে গেল বিশ হাত দূরে! তিনি নবাবগঞ্জ

থানায় ঘুরে না গিয়ে নিকটবর্তী ফুলবাড়ি থানায় গিয়ে, জেলা সদরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ট্রাঙ্ককলে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে, পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সাহায্য চেয়ে ওই থানাতেই আশ্রয় নিলেন। ঘটনাস্থলে তখন অন্য ঘটনা ঘটছে। পাঁচ-ছয় হাজার ভলান্টিয়ার বোর্ডঘর ঘেরাও করে বসে আছে। তাঁদের প্রতিজ্ঞা ধৃত কমরেডদের না ছাড়িয়ে নিয়ে তারা ফিরবে না। তাদের খাবার জন্য গ্রাম থেকে গাড়ি গাড়ি পাকা কাঁঠাল আর খই আসতে আরম্ভ করল। এত খই জমা হয়েছিল—শুনেছি, খই যখন এক জায়গায় জমা করা হল, তখন কোনও লোক পলার এপারে দাঁড়ালে ওপার থেকে তাকে দেখা যায় নাই। যাই হোক, ওই খই-কাঁঠাল খেয়ে খোলা ময়দানে জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্র মাথায় নিয়ে তারা সারাদিন কাটিয়ে দিল। বৈকাল বেলা তাদের অজ্ঞাতে জোতদার পুলিশের ষড়যন্ত্রে প্রায় পঞ্চাশ জন দালাল ভলান্টিয়ার তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। শেষরাত্রে ভলান্টিয়ারদের মধ্যে সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে কেউ ঝিমাচ্ছে, কেউ বা মাটির উপর পড়ে ঘুমাচ্ছে; এমন সময় কিছু সশস্ত্র পুলিশ, চৌকিদার, দফাদার, জোতদার নিঃশব্দে ভলান্টিয়ার বাহিনীর উপর চড়াও হয়। পূর্ব ষড়যন্ত্র মতো ওই পঞ্চাশজন দালাল প্রস্তুত ছিল। তারা হঠাৎ 'পুলিশ, বন্দুক, পালাও পালাও' বলে ছুটতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় অন্যান্য ভলান্টিয়ারও ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটতে শুরু করে। পুলিশ বাহিনী পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। কিছুদূর যাওয়ার পর ভলান্টিয়ার বাহিনীর একটি অংশ ঘটনা খানিকটা অনুমান করে লাঠি হাতে রুখে দাঁড়ায়। খণ্ডযুদ্ধ হয়। কিন্তু অসংগঠিত ভলান্টিয়ারগণ হেরে যায়। তারপর প্রায় এক মাস ধরে চলে গ্রামের পর গ্রামে পুলিশ আর জোতদার-দালালদের অত্যাচারের তাণ্ডব! গ্রামকে গ্রাম মানুষ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তিনশো জন গ্রেফতার হয়। তিন, চার মাস পর সকলে ছাড়া পায়। তিন জন জেলখানায় মারা যায়। কিন্তু আন্দোলন এখানেই থেমে যায় না।

এরই সম-সময়ে বা পরে-পরেই আবওয়াব বিরোধী আন্দোলন নতুন করে জোরদারভাবে শুরু হয়। সংগঠন তখন ব্যাপক ও জোরদার। জমিদারের বাড়ির চাকর, কোতোয়ালসহ কিছু কিছু বরকন্দাজ পর্যন্ত কৃষক সমিতির লোক। কাজেই জমিদারের বাড়ির সমস্ত খবরাখবর পূর্বাহ্নেই সমিতির অফিসে পৌঁছাত। আবওয়াব বিরোধী আন্দোলন কার্যত খাজনা বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। কৃষকদের আওয়াজ খাজনা দিব কিন্তু আবওয়াব দিব না। জমিদার পক্ষের কথা আবওয়াব সহ খাজনা দিতে হবে। আবওয়াব ছাড়া খাজনা দেওয়া চলবে না। জমিদার পক্ষ আদালতে মামলা দায়ের করল। যথারীতি এক তরফা ডিক্রিও পেল—কৃষকের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে নিলাম ডেকে খাজনা আদায় করার। বাস্তবে জমিদার পক্ষ কিন্তু কিছুই করতে পারল না। আগেই বলেছি, জমিদার পক্ষের ভিতরের খবর পূর্বাহ্নেই কৃষক-সমিতি জানতে পারত। কোনদিন কোন কৃষকের বাড়িতে পুলিশ, পেয়াদা, বরকন্দাজ যাবে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে; আগেই তা জানতে পেরে সে বাড়ির থালা, ঘটি, বাটিসহ গোরু বাছুর পর্যন্ত সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি অন্য স্থানে সরিয়ে রাখা হত। বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ থাকত না। থাকত শুধু পাড়ার কয়েকজন দজ্জাল মহিলা। ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে গাইন হাতে আর অন্য স্থানে ঝাঁটা হাতে পুলিশ পেয়াদার সঙ্গে বচসা হলে সুবিধা মতো দুই এক ঘা মেরেও দিত মহিলাগণ। এখানে বলা দরকার কৃষক মহিলাদের মধ্যে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' তখন বেশ জোরদার। কাজেই অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে খাজনা আদায় কার্যকর হল না । স্থাবর অর্থাৎ জমি ক্রোক করতে গিয়েও ওই একই অবস্থা। কৃষকের জমি নিলাম ডাকবার কেউ খরিদ্দার নাই। ক্বচিৎ কারও

ইচ্ছা থাকলেও সাহস নাই। কাজেই পূর্বাপর যার জমি সেই চাষ আবাদ করতে থাকল। এইভাবে অনেক টানাপোড়েনের পর জমিদার পক্ষ শেষে বাধ্য হয় আবওয়াব ছাড়া খাজনা নিতে। কৃষক সমিতি আর এক দফা জয়লাভ করে। আবওয়াব আদায় বন্ধ হয়।

তারপরেই শুরু হয় গঠনমূলক আন্দোলন ও বয়কট আন্দোলন। চাষ আবাদের সুবিধার জন্য কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে বেশ কিছু খাল কাটা ও বাঁধ বাধা হয় এই সময়ে। তার মধ্যে নাম করা হচ্ছে কালিয়াগঞ্জ থানার খুটাখাড়ির বাঁধ। কিছু নতুন রাস্তাও তৈয়ারি হয় এই সময়ে। এই আন্দোলনটিও জঙ্গি। হাটে-গঞ্জে গ্রামে-গ্রামে বিরাট-বিরাট জঙ্গি মিছিল সংগঠিত হচ্ছিল তখন আন্দোলনের প্রচার-প্রপাগান্ডার জন্য। কোনও জোতদার, জমিদার বা তাদের কোনও দালাল যে কোনও প্রকারে আন্দোলনের এতটুকু বিরোধিতা করলে বা অন্য কোনও উপায়ে আন্দোলনকারীদের কারও উপরে কোনও বদলা নেওয়ার চেষ্টা করলে তার শাস্তি হত কঠিন বয়কট। তার জন-মজুর, দাসী-চাকরানি, হাট-বাজার, রাস্তাঘাট সব বন্ধ করে দেওয়া হত। অনেক সময় তার বাড়ির চারিধারে ড্রেন কেটে দেওয়া হত। যাতে সে বা তার বাড়ির কেউ বের হতে না পারে। দেখেছি, সেদিন অনেক জোতদার জমিদারের গোয়াল থেকে গোরু, মহিষ, ঘোড়া বের হয় নাই। গোয়াল পরিষ্কার হয় নাই। উচ্ছিষ্ট থালাবাটি মাজা হয় নাই। জোতদার জমিদারের ছেলেরা অনভ্যস্ত হাতে মাঠে কাজ করতে গিয়ে হাত-পা কেটে বাড়িতে ঘুরে এসেছে। সমিতির দরবারে নতজানু হয়ে ক্ষমা চেয়ে সব দাবি মেনে তার পর রেহাই পেয়েছে।

কৃষক পঞ্চায়েত

এই সময়ের পরেই যে সমস্ত অঞ্চলে সংগঠন শক্তি জোরদার সেই সমস্ত অঞ্চলে কৃষক সমিতির তরফ থেকে গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়। সমাজের যে কোনও বিরোধের—যেমন চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জমি-সংক্রান্ত বিরোধ ইত্যাদির সমস্ত বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করা। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ এলে, সমিতির ভলান্টিয়ার দ্বারা আসামিকে ডেকে যে কোনও মামলার এক দিনেই বিচার মীমাংসা হয়ে যেত। কারও গোরু মহিষ অন্য কারও খেতের ক্ষতি করলে তার জন্য পঞ্চায়েতের অধীনে খোয়াড় ছিল। সেখানে সম্পূর্ণ নতুন কায়দায় বিচার হত। প্রথম দিন কারও গোরু খেতে পড়লে বলে কয়ে ফেরত দেওয়া হত। দ্বিতীয় দিন আবার ওই ব্যক্তির গোরু কারও খেতে পড়লে তাকে জিজ্ঞাসা করা হত; দ্বিতীয়বার তার গোরু খেতে পড়ার কারণ কী? সে যদি বলত, গোরু বাঁধবার জন্য দড়ি বা পাটের অভাবে এই কাণ্ড হচ্ছে—এই কথা প্রমাণিত হলে পঞ্চায়েত তাকে দড়ি বা দড়ি তৈয়ারির জন্য পাট দিয়ে দিত। তৃতীয় দিন আবার একই ব্যক্তির গোরুর পঞ্চায়েতের খোয়াড়ে আসলে আর রেহাই নাই। কঠোর শাস্তি হত তার! নদী এপার ওপার হওয়ার জন্য পঞ্চায়েতের নিজস্ব ঘাটও ছিল; যে ঘাট দিয়ে কৃষকগণ বিনা পয়সায় পার হতে পারত। হাটে বাজারে বিশেষ করে সমিতির সভা মিটিং-এ লোকজনকে নদী এপার ওপার হতে গেলে সরকারি ঘাটে পয়সা লাগত। একবার সরকারি ঘাটে ইজারাদারের সঙ্গে ভলান্টিয়ারদের মারামারির মতো হয়ে যায়। এরই প্রতিকারের জন্য পঞ্চায়েতের এই ঘাটের ব্যবস্থা।

এইবার এসে পড়ল ইংরাজি ১৯৪৩ সাল। দেশে মহা দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই

বারই অভিধানে দুটি নতুন শব্দ সংযোজিত হল। 'চোরাবাজারি' আর 'মজুতদারি।' অভিধান পড়ে মানুষকে এ কথা শিখতে হল না। এ কথা শিখল মানুষ তার বাস্তব জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। শহর বন্দরে বিশেষ করে রেলওয়ে স্টেশনের আশেপাশের শহর বন্দরে, হাজারে হাজারে মানুষ অনাহারে মরতে আরম্ভ করল কুকুর বিড়ালের মতো। মা তার বুকের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আঁস্তাকুড়ের ও নর্দমার ভাত খুঁটে খায়! স্বামী তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে বিক্রি করে—মা তার একমাত্র সন্তানকে বিক্রি করে অতি নগণ্য মূল্যে এক দিন এক বেলা পেটে একটু অন্ন দেওয়ার জন্য! ভাত নয় একটু ফেনের জন্য হাহাকার। শহরে বন্দবে কঙ্কালের মিছিল । অবস্থা প্রতিকারের জন্য কৃষক সমিতি নামল লড়াইয়ের ময়দানে! গ্রাম দেশে সমিতির ভলান্টিয়ার বাহিনী চাল, ডাল, তরকারি সংগ্রহ করে বন্দরে বন্দরে দুটি-তিনটি করে লঙ্গরখানা খুলে নিজে হাতে রান্না করে হাজার মানুষকে খাওয়াতে লাগল। দুর্গত মানুষকে অন্তত এক বেলা দুটো খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায়! ভলান্টিয়ারগণ দিনের প্রথমার্ধে লঙ্গরখানার জন্য চাল, ডাল, সংগ্রহ করত। দ্বিতীয়ার্ধে লঙ্গরখানায় রান্না করে দুর্গত মানুষকে খাওয়াত আর রাত্রে চোরাচালানি এবং মজুতদার সম্পর্কে সতর্ক থাকত। সংগৃহীত পণ্য কোথাও বা সরকারি সাহায্যে, কোথাও বা নিজেরাই জনসাধারণের মধ্যে বিলি করত।

ওদিকে জোতদারদের পোয়া বারো। তারা ধানচাল মজুত করে চোরাবাজারে বিক্রয় করে হাজার-হাজার লাখ-লাখ টাকা কামাতে লাগল! এত টাকা তারা করবে কী! তাই তারা হাতি কিনতে শুরু করল। প্রায় প্রতিগ্রামে দুই-একটি হাতি দেখা গেল। দুর্ভিক্ষের অবস্থা তখন চরম। অবিভক্ত দিনাজপুরের ফুলবাড়ি বন্দরে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে তিন তিনটি লঙ্গরখানা চলছে, তারই মাইল দুই দূরে লালপুর ডাঙ্গায় চলছে জোতদারদের হাতির বাইচ খেলা! কার হাতি আগে ছুটতে পারে!

এই সময় বড় বড় মজুত বিরোধী আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে। তার অন্তত একটি ঘটনার উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজন। ঘটনা ঘটে খাঁপুরে। ঘটনা খাঁপুরের খ্যাতনামা জমিদার ও জোতদার মৃত অসিতমোহন সিংহরায়কে নিয়ে। যিনি তেভাগার সময় পুলিশ এনে গুলি চালিয়ে বাইশ জন কৃষককে মারেন—নিজেও গুলি চালান। খেতমজুর চিয়ার সাই শেখ ছিল সিংহরায় কাছারির মাস-মাহিনার চাকর। সে ছিল খাঁপুর সমিতির নেতৃস্থানীয় একজন। গ্রামে শেষপ্রান্তে রাস্তার পাশেই তার বাড়ি। সিংহরায় কাছারি থেকে গাড়ি বের হতে গেলে এই রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা নাই। চিয়ার সাই সবই জানত—দেশের অবস্থার কথা, আন্দোলনের কথা। তা ছাড়া নিজেও সে ভুক্তভোগী—দুর্ভিক্ষের শিকার। কিছুদিন পূর্বে তাদেরই নেতৃত্বে হাজার পনেরো লোকের এক বিরাট ভুখা মিছিল হয়ে গেছে বালুরঘাট সদরে। সেই থেকে তার সজাগ দৃষ্টি জমিদার জোতদারদের উপরে। সে দিন শেষরাত্রে সে শুনতে পেল অনেক গোরুর গাড়ির কিচির মিচির আওয়াজ। সন্দেহে সে তড়াক করে লাঠি হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এল। দেখে সিংহরায় কাছারি থেকে সারবন্দি ধান বোঝাই গাড়ি চলেছে 'হিলি'-তে চোরা বাজারে বিক্রয়ের জন্য। লাঠি বাগিয়ে সে রুখে দাঁড়াল 'খবরদার দাঁড় কর গাড়ি। একটি গাড়িও না যায়!' চিয়ার সাইকে ডিঙিয়ে যায় এমন সাহস ওই অঞ্চলে কারও ছিল না!

তারপর শুরু হল চিয়ার সাইকে কখনও হুমকি; কখনও তোয়াজ স্তুতি। কিন্তু টলবার পাত্র চিয়ার সাই নয়! এদিকে সকাল হয়ে এল। খাঁপুর, কৈ-গ্রাম, গুটিন আশেপাশের গ্রাম

থেকে সংবাদ পেয়ে চিয়ার সাই-এর দলবল সব লাঠি হাতে এসে দাঁড়াতে আরম্ভ করল তার পাশে। জমিদার অসিতমোহন সিংহরায়ের রাতের অন্ধকারে ধান পাচার করা আর হল না; স্থানীয় নেতা—পতিরামের কৃষ্ণদাস মোহান্তর নিকট সংবাদ গেল । তিনি এলেন। জমিদারবাবু তাঁকে ডেকে পাঠালেন কাছারি বাড়ির দো-তলায় তাঁর খাসকামরায়! জমিদারবাবুর আঙুলে হিরার আংটি ঝলমল করছে। কৃষ্ণদাস মোহান্তকে দেখে জমিদারবাবু ক্ষোভে-দুঃখে-অভিমানে একেবারে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'চিয়ার সাই আমার চাকর! সে কি না আমার গাড়ি আটকাল'! মোহান্ত বললেন, 'দেশে দুর্ভিক্ষ, মানুষ না খেয়ে মরছে! এ ধান আপনার বিক্রি হবে সরকারি দরে জনসাধারণের মধ্যে'। সমস্ত দিন ওই ধান বিলি করে সন্ধ্যার পর তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। আন্দোলনে আন্দোলনে কেটে গেল ১৯৪৩ সাল। সমস্ত ধকল সামলিয়ে ক্ষমতা পুনরায় সংহত ও সংগঠিত করতে কেটে গেল ১৯৪৪ সাল ও ১৯৪৫-এর খানিকটা। শুরু হল রূপনারায়ণের বিধান সভায় নির্বাচন!

সারা দিনাজপুর জেলার কৃষকদের মধ্যে এই নির্বাচনও এক বিরাট জাগরণ, বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই প্রথম মাত্র। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন অশিক্ষিত পাঁচ-ছয় বিঘা জমির মালিক দিনাজপুরের অজ পাড়াগাঁয়ের পলিয়া গরিব কৃষক, বিধান সভার নির্বাচনে দাঁড়াল দিনাজপুরের সমস্ত জাঁদরেল শিক্ষিত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জোতদার জমিদারদের বিরুদ্ধে। আজ সঠিক অনুমান করা যাবে না, কিন্তু সেটি ছিল সেদিন বিরাট স্পর্ধা—অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচায়ক! চলল সারা দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে বৈঠক, বড় বড় সভা। হাটে-হাটে লাঠিধারী ভলান্টিয়ার বাহিনীর বিরাট-বিরাট মিছিল—প্রচার প্রপাগান্ডা। গ্রামে-গ্রামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা বাদ দিয়ে লাল নেকড়া পাটকাঠির আগায় বেঁধে আওয়াজ দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে লাগল। সাধারণ আওয়াজ ছিল, 'কৃষকের ছেলে রূপনারায়ণকে ভোট দাও'। 'গোরুর গাড়ি মার্কা বাক্সে ভোট দাও'। 'লাল ঝান্ডাকে ভোট দাও'! তখন সরকারি আইন ছিল—আট জনের বেশি প্রার্থী দাঁড়ালে একটা প্রাথমিক ভোট হত। তাতে ভোট সংখ্যা হিসাবে আটজন টিকত। আর সমস্ত প্রার্থী নাকচ হয়ে যেত। এই আটজনের মধ্যে তিনজন আবার সাধারণ ভোটে নির্বাচিত হত। রূপনারায়ণ প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই ভোটেই প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলার বিধান সভায় নির্বাচিত হয়। সেদিন সেটি কম কৃতিত্বের কথা ছিল না।

১৯৪৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধ। শুরু হল তেভাগার উদ্যোগ পর্ব। রংপুরে—দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ির সমস্ত কৃষক কর্মীদের আলোচনা বৈঠক চলল সাত দিন ধরে। বৈঠক পরিচালনা করলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতা প্রয়াত কমরেড ভবানী সেন। দিনাজপুর সম্বন্ধে স্থির হয় জেলার সর্বত্র তেভাগা সংগ্রাম হবে না। হবে শুধু জোতদার বর্গাদার অধ্যুষিত ঠাকুরগাঁও মহকুমায়, বিশেষ করে বালিয়াডাঙ্গি থানায় । যেখানে 'বড় খোদা', 'ছোট খোদার' প্রভাব প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি।

তে-ভাগা কার্যকরী করতে হলে তার প্রথম শর্তই হচ্ছে নিজ খোলানে ধান তুলতে হবে। তে-ভাগার পূর্বপর্যন্ত নিয়ম ছিল—বর্গাদারদের জোতদারদের বাড়িতে তার নিজস্ব খোলানে ধান তুলতে হত। সেখান থেকে জোতদারগণ তাদের সমস্ত আবওয়াব, সুদসহ কর্জাধান ইত্যাদি কেটে নিত। কাজেই সামান্য ধানই বর্গাদারদের ভাগ্যে জুটত। তাই নিয়েই বর্গাদারদের ঘরে ফিরতে হত।

তাই স্থির হল, বর্গাদারগণ এবার নিজ খোলানে ধান তুলবে। বর্গাদারগণ ভলান্টিয়ার

বাহিনীর সহযোগিতায় দলবদ্ধভাবে ধান কেটে নিজ নিজ খোলানে ধান তুলতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় জনসভা, মিছিল, প্রচার-প্রপাগান্ডা চলতে থাকল। এই আন্দোলনে প্রায় প্রথম থেকেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এল। ঠাকুরগাঁও শহরে এক মিছিলের উপরে গুলি চলল। কৃষকের প্রথম রক্ত ঝরল দিনাজপুরের মাটিতে। মাটি লাল হয়ে গেল! চারজন কৃষক শহিদ হল। আন্দোলনের গতিবেগ থামল না, শ্লথ হল না। সমস্ত বাধা ঠেলে ফেলে দুর্দাম দুরন্ত বেগে আন্দোলন এগিয়ে চলল! 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে?' সমস্ত দিনাজপুর জেলা ফুটছে যেন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি!

ঠাকুরগাঁও থেকে শুরু করে থানা কালিয়াগঞ্জ পর্যন্ত আন্দোলন ছিল প্রথম পর্যায়ে। থানা পার্বতীপুর, নবাবগঞ্জ, ফুলবাড়ি ও বালুরঘাটে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হল। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। স্থির ছিল এই সমস্ত থানায় তে-ভাগা হবে না। তে-ভাগার সমর্থনে চলে শুধু প্রচার অভিযান। সুতরাং রেওয়াজ অনুযায়ী বর্গাদারগণ জোতদারদের খোলানে ধান তুলে ফেলেছে। কিন্তু উপায় নাই, আন্দোলনের শরিক হতে হবে। রক্তের বদলা নিতে হবে। জোতদারি প্রথা খতম করতে হবে। অবস্থা বিবেচনায় জেলা কমিটিকে সিদ্ধান্ত বদলাতে হল। শুরু হল জোতদারদের খোলান ভাঙা। তে-ভাগার জন্য জোতদারের খোলান ভেঙে বর্গাদারের নিজ খোলানে ধান তুলতে হবে। সশস্ত্র (লাঠি আর তির-ধনুক) মিছিলে মিছিলে শহর বন্দর রাস্তাঘাট গ্রামকে গ্রাম তোলপাড়। মুসলমান কৃষকগণ এর পূর্ব পর্যন্ত আন্দোলনে নামতে একটু যেন ইতস্তত করছিল। সে বাঁধ ভেঙে গেল । শয়ে শয়ে হাজার হাজার বিঘা জোতদারের খোলান মুহূর্তে সাফ হতে লাগল। জোতদাররা গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল। কোথাও বা মহিলার শাড়ি পরে মহিলা সেজে জোতদার পালাতে লাগল। দেখেছি কয়েকস্থানে জোড়া জোড়া বন্দুক জোতদারের সদর দরজায়। বন্দুক চালাবার লোক নাই। বাড়ি জনমানব শূন্য! এই তোড়ের মুখে মুসলিম লিগের তরফ থেকে বৃথাই চেষ্টা হল একটা মৃতদেহ নিয়ে পার্বতীপুর শহরে বিশেষ করে মুসলমানদের দরজায় দরজায় ঘুরে সাম্প্রদায়িক জিগির তোলার। কিন্তু মানুষের মনে এতটুকু দাগ কাটতে পারল না। এই সময় সরকারি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একটা মিটমাটের চেষ্টা হল। পুলিশের এস. পি., ডি. এস. পি., এস. ডি. ও. এলেন ফুলবাড়ি থানায়, কৃষক নেতাদের খবর দিলেন আলোচনার জন্য। অধিকাংশ নেতা তখন পর্যন্ত আত্মগোপন অবস্থায়। যাই হোক, দুই জন নেতা সহ কয়েক হাজার ভলান্টিয়ারকে ফুলবাড়ি থানায় পাঠানো হল! ভলান্টিয়ার বাহিনী থানা চত্বরে অফিসের চারদিক ঘেরাও করে বসে থাকল। কর্তৃপক্ষ নেতাদের ধরে থানা অফিসে তুললেন আলোচনার জন্য। বেলা বারোটা থেকে ছয়টা—তবু আলোচনা শেষ হয় না। শেষে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভলান্টিয়ারগণ যখন অফিসের জানলায় আঘাতের পর আঘাত করতে শুরু করল—তখন বাধ্য হয়ে সকলে বেরিয়ে আসলেন। আলোচনা ফলপ্রসূ হল না। আন্দোলন চলতে থাকল। বালুরঘাট থানার পতিরাম পর্যন্ত চলল খোলান ভাঙা আন্দোলন। একদিন স্থানীয় এক জোতদারের খোলান ভাঙার সময় পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত হয়ে এল গুলি চালানোর জন্য। কিন্তু আমাদের ভলান্টিয়ার বাহিনী তিরধনুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গাছের আড়ালে, পুকুরের পাড়ে, ড্রেনের ধারে এমন পজিশন নিল যে গুলি চালালে পুলিশকেই নিশ্চিহ্ন হতে হত। কাজেই তর্জন গর্জন করে পুলিশকে সেদিনের মতো ঘুরে যেতে হল।

খাঁপুরে ঘটনাটা ঘটল একটু অন্যভাবে। অসিত সিং-এর নেতৃত্বে খাঁপুরের জোতদার গোষ্ঠী এক নতুন যুক্তি আঁটল। আন্দোলনের অংশটি যেন তাদের হাতেই থাকে। এই অঞ্চলে

সাধারণত পৌষ মাসেই ধানকাটা হয়ে যায়। ধান ঝাড়াই মাড়াই হতে হতে মাঘ ফাল্গুন মাস কেটে যায়। মাঠে আর অন্য আবাদ থাকত না বলে, কৃষকগণ মাঘ মাস থেকে গোরু ছেড়ে দিয়ে রাখত। আর জোতদারগণও ধানের খোলান ঘিরে রাখত যাতে ছেড়ে দেওয়া গোরু খোলানের ধান খেতে না পারে। জোতদাররা যুক্তি করল, এবার তারা খোলান ঘিরবে না। কৃষকদের ছেড়ে দেওয়া গোরু নিশ্চয়ই খোলানে ধান খেতে আসবে, তখন তারা গোরু খোঁয়াড়ে দেবে বা পুলিশ দিয়ে হামলা করাবে। হলও তাই। আদিবাসী কৃষকের এক গোরু প্রবেশ করল অসিতমোহন সিং-এর খোলানে। বরকন্দাজ গোরু ধরে নিয়ে বালুরঘাট সদরে চলল মামলা করতে। আদিবাসীর মেয়ে গেল বরকন্দাজের নিকট গোরু আনতে। বরকন্দাজ গোরু তাকে ফেরত তো দিলই না পালটা তাকে করল অপমান। আর যাবে কোথায়! কৃষক-দলটা কাছেই ছিল। তারা ছুটে এসে লাঠির ঘায়ে বরকন্দাজের মাথা ফাটিয়ে গোরু কেড়ে নিল। অসিতবাবু কোর্টে মামলা করল।

ওদিকে ঘটনার তিন-চার দিন পূর্বে একদিন পুলিশ রাত্রির অন্ধকারে এসে, স্থানীয় নেতা কৃষ্ণদাস মোহান্তকে পতিরামে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল । পরের দিন থেকে পতিরাম মোড়ে রাত্রে ভলান্টিয়ার পাহারা বসল। হাতে তির-ধনুক আর চোঙ নিয়ে দুইজন করে ভলান্টিয়ার সারারাত্রি পাহারা দেয়। সমিতি আশঙ্কা করেছিল অচিরে একটা বড়রকম আক্রমণ আসতে পারে। ঘটনার দিন রাত্রি বারোটার কিছু পরেই সজাগ ভলান্টিয়ারের চোখে পড়ল তিনটি ট্রাক পতিরামের দিকেই আসছে। তিনটি ট্রাকের মধ্যে একখানি সশস্ত্র পুলিশ ভরতি, অন্য দুটি খালি। ভলান্টিয়ার চোঙে ফু দিল—'ইনক্লাব! হুঁশিয়াব: পুলিশ!' পুলিশের ট্রাক পতিরামে প্রবেশ করল না। ডান দিকে মোড় নিয়ে খাঁপুরের দিকে ছুটল। ভলান্টিয়ারগণ চোঙে ফু দিতে দিতে ট্রাকের পিছনে পিছনে ছুটল। দেখতে দেখতে ট্রাকগুলি তাদের নাগালের বাইরে চলে গেল।

খাঁপুরে ঢুকে পুলিশ ট্রাক দাঁড় করাল জমিদার অসিত মোহনের কাছারি বাড়ির সামনে কৃষ্ণসাগরের (জমিদারের বড় একটি পুকুর) পাড়ে—খোলা ময়দানে। কৃষকদের বাড়ি বাড়ি ঢুকে পুলিশ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে ট্রাকে ধরে রেখে, আবার বিভিন্ন বাড়িতে চড়াও হল কৃষকদের গ্রেফতারের জন্য। এবার আর কাউকে পাওয়া গেল না। জানাজানি হয়ে গেছে। এদিকে পুলিশ-ট্রাকের সামনে পিছনে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সশস্ত্র মানুষ জমা হতে লাগল। আওয়াজ তাদের: 'আমাদের কমরেডদের বিনা শর্তে ছেড়ে দিতে হবে'। সময় যাচ্ছে জমায়েত বাড়ছে। ওদিকে কিছু শিক্ষিত ভলান্টিয়ার ঘটনাস্থলের একটু দূরে পুলিশের দৃষ্টির বাইরে চিয়ার সাই-এর বাড়ির সংলগ্ন রাস্তার উপরে ব্যারিকেড রচনা করেছে। একটি গাছ কেটে রাস্তার উপরে ফেলেছে; একটি ট্রেঞ্চ খুঁড়ে রেখেছে। অবস্থা ভাল নয় দেখে পুলিশের ট্রাক পিছু হটতে লাগল ধীরে ধীরে। ইচ্ছা, বোধ হয় চিয়ার সাইয়ের বাড়ি পার হয়ে একটু প্রশস্ত স্থানে গিয়ে ট্রাক ঘুরিয়ে ফিরে যাবে বালুরঘাটে। কিন্তু ট্রাক পিছু হটতে হটতে ভলান্টিয়ার রচিত ব্যারিকেডে ধাক্কা লেগে গর্তে পড়ে গেল। আর যাবে কোথায়! আতঙ্কে শিউরে উঠে পুলিশ বাহিনীর অধিনায়ক বলে ফেলল, 'ফায়ার—ফায়ার।' শুরু হল অসম যুদ্ধ। এক দিকে বত্রিশটা আগ্নেয় অস্ত্রের ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি, অন্য দিকে তির-ধনুক, লাঠি, দা, শাবল, কুড়াল, বল্লম, ঝাঁটা বালি। গুলির আঘাতে দলে দলে কৃষক মাটিতে আছড়ে পড়তে আরম্ভ করল! কৃষকের রক্তে মাটি লাল হয়ে গেল! মরতে মরতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল কৃষক। ট্রাক আটকাবে, শত্রু ধ্বংস করবে! পিছন থেকে জমিদারও এই সময় গুলি

চালাতে থাকে । মরণযজ্ঞে মেতে উঠল কৃষক। তিন তিনটি গুলি খেয়ে তবে চিয়ার সাই পড়ে যায়। প্রথমে সে এসেছিল লাঠি নিয়ে। ট্রাকের উপরে লাফিয়ে উঠে পুলিশকে পিটাতে থাকে। হাতে গুলির আঘাত খেয়ে ছুটে বাড়ি গিয়ে লাঠি রেখে শাবল এনে ট্রাকের চাকা কাটতে চেষ্টা করে। আবার পর পর দুইটি গুলি খেয়ে তবে চিয়ার সাই পড়ে যায়।

এই অসমযুদ্ধ আর কতক্ষণ চালানো যায়। অনেক হত আহত হওয়ার পর শেষে কৃষকেরা রণে ক্ষান্ত দেয়। পুলিশ তখন আশেপাশের মৃত, অর্ধমৃত সবাইকে ট্রাকে গাদাগাদি করে নিয়ে পতিরাম দিয়ে সোজা রাস্তায় না গিয়ে ত্রি-মোহিনী হয়ে অনেক ঘোরা রাস্তায় বালুরঘাটে পালিয়ে যায়। ট্রাক যে দিক দিয়ে যায়—আশ পাশের গ্রামের মানুষ শুনেছে ট্রাকের ভিতর থেকে অর্ধমৃত কৃষকের আওয়াজ 'আধি নয়, তে-ভাগা চাই! জান দিব তবু ধান দিব না'। সংবাদ চারদিকে ছড়াতে না ছড়াতে জমায়েত হতে লাগল দূর-দূরান্তের থেকে নেতা, কর্মী, ভলান্টিয়ার, সাধারণ মানুষ! শুরু হল আহতদের খুঁজে বের করে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও হাসপাতালে পাঠানো। এই করতে করতে সারাদিন কেটে গেল। বৈকালে সেদিন খাঁপুরে জনসভা হবার কথা ছিল। বিশ মাইল দূর ফুলবাড়ি থেকে দলে দলে কৃষক আসতে লাগল। পথে জোতদার আতঙ্ক ছড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু ফেরাতে পারল না কাউকেই। পাঁচ-ছয় হাজার কৃষকের জনসভা হল ঘটনাস্থলে। সভা থেকে আওয়াজ উঠেছিল, 'কমরেড, হুকুম দাও খাঁপুর আজ শেষ করে দিই।' সেদিন সেটি সম্ভব হয় নাই।

সন্ধ্যার পর বালুরঘাট থেকে শ্রদ্ধেয় ধীরেন ব্যানার্জি, কালীনারায়ণ সান্যাল প্রমুখ কয়েকজন যাচ্ছিলেন খাঁপুরের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে ট্যাক্সি করে। যাবার সময় তাঁরা পতিরাম থেকে একটি লাল পতাকা সহ কৃষ্ণদাস মোহান্তর স্ত্রী-কে সঙ্গে নেন। দূর থেকে মটরের হেড লাইটের আলো দেখে জনসভার উৎক্ষিপ্ত জনতা মনে করল আবার বোধ হয় মিলিটারির গাড়ি আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা পজিশন নিল তির ধনুক তাক করে গাছের আড়ালে, বড় রাস্তার পাশে, দেয়াল ঘরের আড়ালে। এবার আর একটিও মিলিটারিকে তারা জ্যান্ত ফিরে যেতে দেবে না। ধীরেন দা'-দের ট্যাক্সি ঘটনাস্থলের নিকটে গেলে তাদের সন্দেহ হল, এতবড় একটা ঘটনা অথচ ঘটনাস্থল জনমানবশূন্য অন্ধকার কেন? তখন তারা বুদ্ধি খরচ করে কৃষ্ণদাস মোহান্তের স্ত্রীকে লালঝান্ডা হাতে রাস্তায় নামিয়ে দেন। পতাকা উর্ধ্বে তুলে তিনি বলতে থাকেন—'আমি কৃষ্ণদাস মোহান্তর স্ত্রী, ননীদাসের মা; তোমাদের শত্রু নই।' তখন সকলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। পরের দিন খাঁপুরে মিলিটারি ক্যাম্প বসে। পতিরাম থেকে শুরু করে খাঁপুর এবং আশেপাশের গ্রামের প্রায় তিনশত জনকে গ্রেফতার করা হয়। আরও প্রায় একশো জনের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকে।

ঘটনাটি ঘটে স্বাধীনতা লাভের ছয় মাস পূর্বে ইংরাজি ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, বাংলা ১৩৫৩ সালের ৭ ফাল্গুন। বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে সেদিন শহিদ হন—যশোদারানি সরকার, কৌশল্যা কামারিনী, চিয়ার সাই শেখ, হপন মার্ডি, গুরুচরণ বর্মণ, কৈলাস ভুঁইমালি, গহনুয়া মাহাতো, খেতো হেমব্রম, ভাদু বর্মণ—প্রমুখ বাইশ জন। প্রায় একশোজন অল্পবিস্তর আহত হন।

জেলা কৃষক সমিতির তরফ থেকে ঘটনাস্থলে যেখানে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পুলিশের লরি আটকিয়ে দেওয়া হয়েছিল—তার ঠিক পাশেই পাকা শহিদবেদি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবছর ৭ ফাল্গুন সেখানে শহিদ দিবস পালন করা হয়—শহিদদের প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন

জানাতে এবং তাঁদের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করাব প্রতিজ্ঞা নেওয়াব জন্য। তেভাগাব জন্য বীব শহিদগণ বুকেব রক্ত ঢেলেছেন, আজ চাব-ভাগা কায়েম হয়েছে। একদিন সমস্ত ভূ-সম্পত্তি বাষ্ট্রায়ত্ত হবে—সমাজতন্ত্র কাযেম হবে। কিন্তু খাঁপুব শহিদদেব নাম সোনাব অক্ষবে ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে। অমর শহিদ জিন্দাবাদ।

দিনাজপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের এক অধ্যায়

বসন্তলাল চট্টোপাধ্যায়

হাট ও মেলার জমা তোলা আন্দোলন

জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য থাকলেও কৃষক নিজস্ব দাবি আদায়ের জন্য নিজস্ব সংগঠন 'কৃষক সমিতি' মারফত হাট ও মেলার জমা তোলা আন্দোলন আরম্ভ ও পরিচালনা করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ওই হাট ও মেলায় দারুণভাবে কৃষকের উপর চলতে থাকে। হাট ফসলের ন্যায্য দর কৃষক পায় না, অভাবের তাড়নায় কম দামে পাইকার বা ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া, জমির খাজনা ছাড়া আলাদাভাবে ঝাড়ুদার ও জমাদারকে খাজনা বাবদ বিভিন্ন প্রকারের ফসলের একটি অংশ দিতে বাধ্য হয়। যে সব কৃষক গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, পায়রা ইত্যাদি বিক্রি করতে আসে বা কিনতে আসে অত্যধিক চড়া দরে পশু বিক্রি বা কেনা বাবদ উভয় পক্ষকে (ক্রেতা ও বিক্রেতা) জমা দিতে হয়। মেলায় পশু বিক্রি বাবদ বা হালবলদ, গাইগোরু, ছাগল-খাসি, পাঁঠা, কবুতর ইত্যাদি বিক্রি ও কেনার সময় ক্রেতা-বিক্রেতাকে জমার নামে অত্যধিক অর্থ দিয়ে বিক্রি রসিদ নিতে হয়। এর ফলে, ওই শাসন ও শোষণের তাড়না সহ্য করতে অপারগ হয়ে কৃষকরা আন্দোলন করতে বাধ্য হয়।

আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহ কবতে হয়। কৃষকরা বুঝতে পারে—নিজেদের উপর জুলুম-অত্যাচার বন্ধ করতে হলে শক্ত সংগঠন প্রয়োজন। তাই, কৃষক সমিতির সভ্য হয়ে তারা লাল নিশানের তলে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়। বৈঠক, সভা ও মিছিলের মাধ্যমে দাবি প্রচার ও তার যথার্থতা স্বীকার করা হয়। হরিরামপুর. পতিরাম, ইটাহাব, দুর্গাপুর, কুনোর, ধনকৈল, কালিকামোরা, সরলা প্রভৃতি ছোট ও বড় হাটগুলিতে জমা তোলার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়।

হরিরামপুর ও পতিরাম হাটে কৃষক সরাসরি আন্দোলন শুরু করে। আওয়াজ ওঠে হাটের জমা ও তোলা কম করো, পশু লেখাই চার্জ ও জমা কম করো। হরিরামপুর হাটের মালিক বাহিন জমিদারের রায়গঞ্জ অফিসে দু ঘণ্টা ঘেরাও এবং অবস্থান করার পর ওই জমিদার কৃষকদের আংশিক দাবি মানতে বাধ্য হয় এবং জমা ও তোলার অত্যাচার সেখানে কমে যায়। এরপর বিরাট মিছিলসহ পতিরাম হাটের মালিক জমিদার মশায়ের কাছে দাবি পেশ করা হয়। তিনিও শেষপর্যন্ত কৃষকদের দাবি মানতে বাধ্য হন। দীর্ঘ ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পায়ে হেঁটে ওই সব মিছিল গিয়েছিল। সারা রাস্তায় জয়ধ্বনি, বক্তৃতা, লালনিশান ও চোঙসহ বাদ্যসহকারে মিছিলের আওয়াজ চারদিকের গ্রাম থেকে কৃষক, কৃষকবধূ ও ছেলেরা এসে মিছিলের শোভাবর্ধন করে ও নিজ দাবির যথার্থতা স্বীকার করে ওই আন্দোলনে যোগ দেয়।

আলোয়াখোয়ামেলা, লাহিড়ীহাট, সরলামেলা ও জিনপীর মেলায় ক্যাম্প করে

স্বেচ্ছাসেবকবা অবস্থান করেন এবং মেলার জমা ও তোলা কমিয়ে ফেলেন। দীর্ঘদিনেব শোষণ ও শাসনে আঘাত লাগতে আরম্ভ করে। অনেকক্ষেত্রে কিছুদিন জমা আদায কবা সম্ভব হয় নাই।

জমিব খাজনা সবাই জমিদারকেই দিয়ে থাকে, তা সত্বেও জমিদাব আবাব ফসল বিক্রিব সময় তার কাছ থেকে জোর করে অত্যধিক জমা আদায় করে। হাল-বলদ ছাড়া কৃষক জমি আবাদ করতে পারে না, কিন্তু ওই হাল-বলদ কেনা ও বিক্রির সময় জমিদাব আবার উভয় পক্ষের (ক্রেতা-বিক্রেতা) কাছ থেকে জমা আদায় করে। এ সব ছিল কৃষক শোষণেব নতুন নতুন কৌশল। হরিরামপুর হাট আন্দোলনে মোহনলাল ভক্ত, কৃষ্ট বর্মণ, পতিবাম হাট আন্দোলনে রঙ্গলাল প্রধান, তুফানু প্রধান, বাঙ্গরু প্রধান, চৈতু সরকাব প্রভৃতি কৃষক নেতাবা স্বেচ্ছাসেবকসহ সংগ্রাম করে ওই অঞ্চলে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪০-৪১ ও ৪২ সালেই ওই আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। পতিরাম হাটের রাস্তায় বাঁশের পুলপাড়ানি (শ্রীমতী নদীর উপব) জমা বা পয়সা আদায়েব অত্যধিক জুলুম করাব জন্য কুশমণ্ডি থানাব কৃষক সম্প্রদায় ও জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে জয়যুক্ত হন।

তেভাগা আন্দোলন

কুশমণ্ডি, কালিযাগঞ্জ, ইটাহাব ও বংশীহারী থানায তেভাগা আন্দোলনে কারাবরণ কবেছেন ও বিভিন্ন ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করেছেন—ওইসব নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

নাম	থানা
বাংরু প্রধান	কুশমণ্ডি
ধনবর সরকার	,,
চৈতু সরকার	,,
মতম প্রধান	,,
ভগীরথ সরকাব	,,
শশী প্রধান	,,
নারিয়া প্রধান	,,
ভজু টুডু	কালিয়াগঞ্জ
লক্ষ্মী বর্মণ	,,
ব্রজমোহন সরকার	,,
বসন্ত দেবশর্মা	,,
রঙ্গলাল প্রধান	ইটাহার
তুফানু প্রধান	,,
মুমুয়া প্রধান	,,
ঝাবনলাল ভক্ত	,,
বনমালী সরকার	,,
মোহনলাল ভক্ত	বংশীহারী

১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনে খাঁপুর, ঠাকুরগাঁও পূর্ব-পশ্চিম ও চিরির বন্দরে গুলি চালনায় যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রতিও জানাই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রথমস্তর: রাজনৈতিক ও আর্থিক চিন্তা

দীর্ঘদিন পরাধীন থাকায় গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক ভাব প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। বড় বড় জোতদার ও মহাজনদের শাসন ও শোষণ ইংরেজের খুঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষকদের উপর জুলুমের বোঝা অত্যধিকভাবে দেখা দেয়। এর ফলে কৃষকেরা ধনী, মাঝারি, বর্গাদার, গরিব এবং খেতমজুর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দিনাজপুর জেলার পশ্চিম অংশে আবাদি জমির ছত্রিশ শতাংশ বর্গাদার দিয়ে চাষ আবাদ হত। চাষ আবাদে খরচ ক্রমে বৃদ্ধি পাবার ফলে এবং শোষণের মাত্রা অধিক হওয়ায় তেভাগা আন্দোলন দেখা দেয়।

ফ্লাউড কমিশন তে-ভাগা দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হন। ঠাকুরগাঁও, বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ মহকুমায় বড় বড় জোতদারদের জমির অধিকাংশ ওই বর্গাদারদের দিয়ে আবাদ করা হত। নানান ধরনের শোষণ থাকায় ভাগের ফসল দেওয়ার পর বর্গাদারদের খাদ্য দু-তিন মাস ছাড়া চলত না। তার উপর চাষের অধিকাংশ খরচ বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। জমিতে সার, জল, বীজধান, হালবলদ, ফসল তোলার যাবতীয় খরচ ওই বর্গাদারদের করতে হত। তার উপর কর্জা ধানের সুদ দেড়িয়া ও দুনা দিতে হত।

প্রাণে বাঁচার তাগিদে এবং বেশি করে ফসল উৎপাদনের বিষয় চিন্তা করে, বর্গাদাররা স্থানীয় তেভাগা আন্দোলনে 'কৃষকসমিতি'র ডাকে নেমে পড়লেন। প্রস্তুতি হিসেবে ছোট ও বড় সভা, কর্মী সংগঠন, অর্থ সাহায্য, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ হতে থাকে। ছোট জোতদার বা মধ্যবিত্তদের সঙ্গে আপস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপরদিকে ধনী চাষি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে নিরপেক্ষ করার উদ্যোগ শুরু হয়। মাঝারি কৃষক, গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের, বর্গাদারদের ন্যায্য দাবি তেভাগা সমর্থনের জন্য মিটিং, মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। ইটাহার থানার দক্ষিণ অঞ্চলে এবং বংশীহারী থানার কিছু অংশে 'দুনা' ধান প্রথার প্রচলন ছিল। ধানকাটা, মাড়াই ও ঝাড়াই বাবদ পারিশ্রমিক পৃথকভাবে দেওয়া হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবখানে আন্দোলনের চিত্র একরকম ছিল না। অঞ্চল বিশেষে মাঝারি চাষি বা গরিব চাষির সংখ্যাও ছিল বেশি। কোথাও কোথাও বিঘা প্রতি এক পণ খড় জোতদার পেত আবার কোনও কোনও অঞ্চলে খড়ও অর্ধেক হত।

তেভাগা আন্দোলনেব প্রথম স্তরে নিজ খোলানে ধান তোলার আন্দোলন শুরু হয়। জোতদাবের খোলানে ধান উঠলে বর্গাদার ন্যায্য ভাগ বা তে-ভাগা পাবে না বলে তারা নিজ খোলানে ধান তুলতে আরম্ভ করে। দীর্ঘদিনের নিয়ম ভঙ্গ করে জোতদারের খোলানে ধান তোলার বিরুদ্ধে ব্যাপক জাগরণ দেখা দেয়। সর্বত্র হাট-বাজারে মিছিল শুরু হয়। পতিরাম, ধনকৈল, কুনোর, দুর্গাপুর, ইটাহাট, দুর্লভপুর, সরলা, কুশমণ্ডি, রুহানগর, হরিরামপুর, সরাই প্রভৃতি বড় বড় হাটে মিছিল চলে। এক আওয়াজ—'নিজ খোলানে ধান তোলো' 'তে-ভাগা চাই', 'কৃষকের হাতে জমি চাই' ইত্যাদি। আন্দোলন ক্রমশ বিস্তার লাভ করে এবং গ্রামের মেয়েরাও আন্দোলনে অংশ নেয়। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে ধানকাটা ও ধান বর্গাদাবদের খোলানে তোলা আরম্ভ হয়। এর ফলে, গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রবল আকারে

দেখা দেয়। জোতদাররা ওই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দমননীতির সাহায্য নিতে থাকে। তারাও দলবদ্ধভাবে আন্দোলন নষ্ট করার জন্য কর্মীদের উপর অত্যাচার শুরু করতে থাকে। কৃষক ও কৃষক নেতাদের নামে নানান ধরনের কুৎসা প্রচার করে। কিন্তু আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

জোতদারের প্রচুর ধান জমি থেকে সরাসরি বর্গাদারের খোলানে তোলা হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে শেষে জোতদারের খোলানে তোলা ধানের পুলা ভেঙে বর্গাদাররা নিজ খোলানে ধান তুলতে শুরু করে। ভেউর, তরঙ্গপুর, বড়াইল এলাকায় জোতদারের খোলানের ধান বর্গাদারের খোলানে আনার জন্য প্রচুর গোরুর গাড়ি ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠিত হয়। বীর যোদ্ধার মতো কৃষকরা ওই ধানের বেশিরভাগই বর্গাদারের খোলানে আনতে সমর্থ হয়। সমস্ত কৃষককে সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিতভাবে মহানন্দে আন্দোলন পরিচালনা করে থাকে। তাদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাতে পারলে গ্রাম থেকে সামন্ততন্ত্রের শাসন ও শোষণ নির্মূল করা সম্ভব। ওই আন্দোলন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হিসেবে দেখা দেয়। নিবক্ষর ও সহায় সম্বলহীন কৃষকদের উপর ইংরেজ ও তার সৃষ্ট ওই জমিদার-জোতদার শ্রেণীর মাত্রাহীন শোষণ চালানোর এই পরিণাম।

১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ওই অঞ্চলে কৃষকরা ব্যাপকভাবে আন্দোলনে নেমে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। দীর্ঘদিন পর আবার ১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগার লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সে চিত্র ফুটে উঠল। কৃষকরা শোষকদের পরাজিত করবে এই ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। জোতদাবরা চুপচাপ বসে নেই, তারাও কোথাও কোথাও থানার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং আদালতে প্রচুর মামলা দায়ের করতে থাকে। তা সত্ত্বেও 'কৃষকদেব হাতে জমি চাই', 'কৃষকদের উপর শোষণ শাসন বন্ধ হোক'—এই ছিল কৃযকের দাবি এবং ওই দাবি নিয়েই তারা মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে অংশ নেয়; কর্মী ও নেতা হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে। দমন পীড়ন চালাবার পর দেখা যায় কৃষকরা একটি ধানও নষ্ট করে নাই, এমনকী শত অভাব সত্ত্বেও ক্ষুধায় তাড়নায় এই ধান লুকিয়ে নিজের জন্য ব্যবহার করে নাই। সমস্ত ধানই সঠিক মতো পাওয়া যায়। আন্দোলন সারা দিনাজপুর জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের মাধ্যমে বহু স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী পাওয়া যায়।

ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ ও ডহরোলে মিলিটারি ক্যাম্প বসে এবং গ্রামে গ্রামে গ্রেফতার শুরু হয়। ওই ক্যাম্পগুলিতে চার হাজারের বেশি কৃষককে গ্রেফতার করে। রাজশাহী, বহরমপুর, দিনাজপুর বিভিন্ন জায়গায় এখান থেকে বহু গ্রেফতারি কৃযকদের পাঠানো হয়। তাদেব উপর কোর্টে বহু মামলা দায়ের করা হয়। নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয় এবং যাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নাই তাদের নামে হাটে ঢোল দেওয়া হয়। কৃষকরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পুকুরে, মাঠে, জঙ্গলে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে থাকে। অত্যাচার চরমসীমায় দেখা দেয়। যে সব কৃষক কর্মীরা গ্রেপ্তার হয়ে অন্যত্র কারাগারে গিয়েছিল—চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত আটক থাকার পর তাদের কোর্টে জামিন দেওয়া হয় এবং মামলা চলতে থাকে। ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হবার দুদিন আগে কিছু কৃষক ও নেতা জামিনে মুক্ত হন। কিন্তু কারাগারে আটক থাকে আরও কিছু কর্মী। দেশভাগ হওয়া সত্ত্বেও তারা মুক্তি পান নাই। দীর্ঘ দিন মামলা চলার পর প্রায় সকলেই মুক্তি অথবা জামিন পান।

এতবড় আন্দোলন চললেও ধান নিয়ে কোনওখানে গোলমাল হয় নাই। তেভাগা আদায় হয় নাই, ফসলের অর্ধেক জোতদারের ঘরে গেল। কৃষক চিহ্নিত করতে পারল কারা তাদের পক্ষে ও বিপক্ষে। এভাবেই কৃষকের শ্রেণীচেতনা জাগ্রত হয়, কর্মীরা বিরাট অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস জন্মায় যে শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমেই মুক্তি সম্ভব। ওই সময় বিভিন্ন স্থানে কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে এরকম শিশুদের নাম তেভাগু রাখা হয়। এখনও পর্যন্ত ওই নামেই তারা পরিচিত।

আমেরিকায় কৃষিতে কুড়ি শতাংশ আর শিল্প বা কলকারখানায় আশি শতাংশ মানুষ প্রতিপালিত হয়। আর ভারতে কৃষিতে আশি শতাংশ এবং শিল্পে কুড়ি শতাংশ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। সামান্য জমিতে সেচ ব্যবস্থা আছে। কৃষিতে উৎপাদন হার কম। জুলুম অত্যধিক থাকায় শোষণ ও শাসন সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায়। কৃষি মজুর কাজের গ্যারান্টি পায় না, মজুরি অনিশ্চিত। পরিবেশ সৃষ্টি না হলে তেভাগা বা আর্থিক দাবি আদায় ও স্থায়ী সমস্যার সমাধান অনিশ্চিত, সেজন্য প্রয়োজন শোষক শ্রেণীর জমি হতে অন্যত্রে আয়ের কর্মসংস্থান করা। কৃষকদের মধ্যেও জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক, এরও সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। অঙ্গাঙ্গীভাবে সমস্ত ব্যবস্থাই জড়িত বলে সামগ্রিক চিন্তাধারার প্রয়োজন।

তেভাগা আন্দোলন একটি উজ্জ্বল গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু ওই দাবি আদায় বা স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা। ওই পথেই যাত্রা শুরু হোক—তাই হল ভবিষ্যতের একমাত্র পথ।

তেভাগা আন্দোলনের আলোচনা

শচীন্দু চক্রবর্তী

১৯৪৬-৪৭ সালে অর্থাৎ প্রাক স্বাধীনতা যুগে উত্তরবঙ্গে বিশেষত দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলন এক স্মরণীয় ঘটনা। এই আন্দোলন এত ব্যাপক, বিস্তৃত ও জঙ্গি ছিল যে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন সিপাহি বিদ্রোহের পর এত ব্যাপক আলোড়ন কৃষকদের মধ্যে পড়ে নাই।

তখন উত্তরবঙ্গে কৃষক আন্দোলন বুঝতে এই তিন জেলার কৃষক আন্দোলনকে বুঝাত। সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের পুর্বে ছাড়া ছাড়া কৃষক আন্দোলন হয়েছে। শোনা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে এই জেলায় ক্ষত্রিয় বিদ্রোহ হয়েছিল। ওই আন্দোলনের পরে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংস্কার হয়। মালদহে সাঁওতাল বিদ্রোহ, পাবনায় পল বিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলন হয়। যার মূল দাবি ছিল কৃষকের অধিকারকে রক্ষা করা। শোনা যায়, এই সমস্ত আন্দোলনের মূল দাবি ছিল প্রচলিত খাজনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রজার গাছকাটা অধিকার নিয়ে আন্দোলন হয়। শোনা যায়, বিখ্যাত আইনজীবী মৃত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন।

সংগঠিত কৃষক আন্দোলন ১৯৩৬-৩৭ সাল হতে দিনাজপুর জেলায় আরম্ভ হয়। দিনাজপুর জেলার কৃষক সাধারণের মধ্যে প্রধানত রাজবংশী, মুসলমান ও সাঁওতাল এই তিন সম্প্রদায় নিয়ে কৃষক সমাজ গঠিত। রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকেরা এই কৃষক আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া দেয়। যদিও এরা তদানীন্তন সমাজ জীবনে অবহেলিত ও নিষ্পেষিত ছিল। তবুও তাদের আঞ্চলিক অবস্থা, পরিবেশ, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, পালা-পার্বণ, ছড়া, যাত্রাগান, বাদ্যযন্ত্র, নিজেদের কথিত ভাষা প্রভৃতির প্রভাবে এক সুস্থ চেতনা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল। দরিদ্র জীবনের দুঃখ এবং বিত্তবানের সুখ ও আরাম—সামাজিক বৈষম্য তাদের চোখে নিয়ত ধরা পড়ত। 'ধনীর স্বার্থই দেশের স্বার্থ' এই ভ্রান্ত মতাদর্শ এদের ভুলপথে চালিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এদের মধ্যে যে অজস্র প্রবাদ, ছড়া, রচনা ও গান প্রচলিত ছিল তার মূল বক্তব্য ছিল ধনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ। এই অনুভূতিই এক ব্যাপক জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের বাস্তব ক্ষেত্র তৈরি করেছিল।

এই অঞ্চলে এক দিকে যেমন নিঃস্ব ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল তেমনি অন্য দিকে হাজার হাজার বিঘা জমির মালিকের সংখ্যা কম ছিল না। প্রাক স্বাধীনতা যুগে দিনাজপুর জেলায় চার-পাঁচ হাজার বিঘা জমির মালিকও ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ধানের দর মন প্রতি বারো আনা থেকে এক টাকা ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ধানের দর আরও কম ছিল। শোনা যায়, গত শতাব্দীতে ধানের দর মন প্রতি ছয় আনা থেকে আট আনা ছিল এবং খাজনার হার নির্দিষ্ট ছিল।

ফসলের দরের সঙ্গে বা কৃষকের সাংসারিক প্রয়োজনের সঙ্গে এর কোনও সঙ্গতি ছিল

না। ফলে, কৃষকের সাংসারিক খরচ জোগাড় করতে তার সব নিঃশেষ হত। তখন চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করত, যার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই মোকর্দমা, জমি থেকে উচ্ছেদ, জমি নিলাম হত। আর এই হতভাগ্য কৃষক নিজের জমিতে বর্গাদারে পরিণত হত। খাজনা না দিতে পারায় প্রতি বৎসর শত শত কৃষক জমি থেকে উচ্ছেদ হত। সেদিন দেশের চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ এই সমস্যাকে আদৌ কোনও গুরুত্ব দেন নাই। এই অঞ্চলের কৃষক সমাজ, রাজবংশী, সাঁওতাল, মুসলমান চাষিরা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিল। সহজেই তাদের প্রতারণা করা যেত। কৃষকদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রামীণ জোতদার ও মহাজন পুরোপুরি নিত।

সংগঠিত কৃষক আন্দোলন যখন আরম্ভ হল তখন এই কৃষকদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ সৃষ্টি হল। 'জমিদারি প্রথা ধ্বংস হউক', 'খাজনার হার অর্ধেক করো', 'বাকি ঋণ মকুব করো', 'বে-আইনি আদায় বন্ধ করো', 'লাঙল যার জমি তার'—কৃষক আন্দোলনের এই সমস্ত দাবিতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত কৃষক সাড়া দেয়। মুসলমান, রাজবংশী, সাঁওতালি কৃষকগণ অগ্রণী হয়ে কৃষক সমিতি গঠন করতে লাগল। কৃষক সমিতি গঠিত হতে না হতেই সংঘর্ষ শুরু হল। কোনও ছোট জমিদারের এক হাটে ইজারাদারের অত্যাচারের প্রতিবাদে সেই অঞ্চলের কৃষকরা এক দিন ওই হাট ভেঙে কৃষকের এক হাট লাগাল। বহুদিন পর্যন্ত কৃষকের হাট চলেছিল। কয়েকশো বিঘা জমি বর্ষাতে একেবারে ডুবে যেত। প্রতিবারই ফসলহানি হত। ফলে, এই অঞ্চলের কৃষকদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। জমিদার, ইউনিয়ন বোর্ড, সার্কেল অফিসারদের নিকট অনেক তদ্‌বির করাতেও যখন কিছু হল না, তখন কৃষক নেতৃত্বে কয়েকটি গ্রামের কৃষক একত্রিত হয়ে মস্ত এক বাঁধ দেয়। আর একটি খাল কেটে কিছু দূরের একটি বড় খালের সঙ্গে যোগ করে দেয়। ওই বড় খালের সঙ্গে আত্রাই নদীর যোগ থাকায় জল বের হওয়ার রাস্তা হয়। এইভাবে কয়েকশো বিঘা জমি উদ্ধার করা হয়। আন্দোলনের ফলে ছোট ছোট জোতদার মহাজনেরা খুব ভীত হয় এবং বে-আইনি-আদায় বন্ধ করে দেয়।

রাজবংশী আর সাঁওতাল কৃষকদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ হয়। রাজবংশী ও সাঁওতাল কৃষকরা বাড়ির ভেতরে কৃষক কর্মীদের আশ্রয় দিত এবং তাদের নিজেদের পরিবারভুক্ত লোক বলে গণ্য করত। মুসলমান চাষিরা যদিও বেশ ভালভাবেই আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল, তবু এত ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সামাজিক সমস্যা জানার সুযোগ হয় নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই ১৯৩৯-৪০ সালে এই তিনটি জেলাতে হাট-বাজারে 'তোলাবন্ধ' আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। এর সূত্রপাত হয় জলপাইগুড়ি জেলার কালীর মেলা থেকে। দেখতে দেখতে সারা দিনাজপুর জেলাতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে গেল। হাজার হাজার কৃষক ভলান্টিয়ার লাঠি কাঁধে নিয়ে মেলাতে ও হাটে নামল। আলোয়াখোয়া মেলাতে প্রায় তিন হাজার কৃষক ভলান্টিয়ার নামে। কৃষকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা। জেলা ও মহকুমা শহরে লাঠি কাঁধে নিয়ে দলে দলে কৃষক ভলান্টিয়ার মিছিল করত। কৃষক মেয়েরাও পিছিয়ে ছিল না। এই রাজবংশী এবং সাঁওতাল কৃষক ঘরের মেয়েরাও যে দলে দলে লাঠি কাঁধে নিয়ে শহরে মিছিল করবে, একটা কল্পনাতীত ব্যাপার। এই আন্দোলন এত ব্যাপক ও তীব্র হয়েছিল যে অবশেষে রাজশাহী বিভাগের ইংরেজ কমিশনার ঠাকুরগাঁও শহরে এসে পনেরো হাজার কৃষক সমাবেশের নীচে দাঁড়িয়ে

হাট-বাজারে 'তোলা লেখাই' সম্বন্ধে নতুন 'রেট' বেঁধে দিলেন। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের এটাই হল এক বড় রকমের জয়। 'তোলা বন্ধ' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই 'বে-আইনি আদায় বন্ধ' আন্দোলন শুরু হল। আধিয়ার (বর্গাদার) জোতদারের জমি চাষ করে ফসলের অর্ধেক পায়। ফসল উৎপাদন খরচ, যেমন—হাল, বলদ, বিচন, সার এবং নিজেদের খাটুনি—এই সব মিলেই ফসলের অর্ধেক পেত। ধান কাটার পর জোতদারের বা জোতদারের নির্দিষ্ট খামারে ধান তুলতে হত। অংশ ভাগের সময় আধিয়ারের অর্ধেক অংশ থেকে জোতদার তার পাওনা বাবদ আরও আদায় করত। যেমন, শ্রাবণ ভাদ্রমাসে যদি এক মন ধান কর্জা দেয় তবে ধান ভাগের সময় সুদ ও আসল হত দেড় মন। বিচন ধান যদি কর্জা দিত, তবে সুদ ও আসল দ্বিগুণ হত। এর উপর ছিল মহলদারি, বরকন্দাজি, গোলাপূজারি, মুরগি খাওয়া বা হাঁস খাওয়া (জোতদারের বাড়ির হাঁস মুরগির খাওয়ার জন্য ধান), থিয়েটার (জোতদারের বাড়িতে থিয়েটার যাত্রা হবার খরচ) ইত্যাদি। এই সমস্ত আদায়ের পর কোনও কোনও আধিয়ার দুই-তিন কাঠা ধান (আড়াই সেরি কাঠা) পেত। আবার কোনও কোনও আধিয়ার কিছুই পেত না। একেবারে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরত।

এই বে-আইনি আদায়ের বিরুদ্ধেও বিপুল আন্দোলন চলল। কর্জা ধানের সুদ দেড়িয়া থেকে সোয়াইয়া, বিচন ধানের সুদ নাই, নিজ খামারে ধান মাড়াই হয়ে অংশ ভাগ হবে। আন্দোলন শুরু হতেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বহু এলাকায় কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু করল। রাজবংশী, সাঁওতাল ও মুসলমান কৃষকরা এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেক ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে আংশিক সাফল্য হয়।

পুলিশ নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিল না। তখন ভারত রক্ষা আইন বলবৎ ছিল। সভা মিছিল করা বে-আইনি ছিল। ধরপাকড়, জেল, লাঠি সর্বদা লেগেই ছিল। প্রায় চার-পাঁচশো কৃষক গ্রেফতার হন। সত্তর বছরের মুসলমান কৃষক জাল মোহম্মদ আন্দোলনের এক জ্বলন্ত প্রেরণা ছিল। গরিব চাষি কলাইয়ের ডাল আর পাটের শাক দিয়ে কোনও মতে দুবেলা ভাত খেত। 'কৃষক সমিতি'র আন্দোলনের শুরু থেকেই জাল মোহম্মদই বৃদ্ধ বয়সেও প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে সাড়া দেয়। চৌদ্দ-পনেরো মাইল রাস্তা মিছিল করে শতশত কৃষক ভলান্টিয়ার নিয়ে দিনাজপুর শহরে আসত। তাঁর নিকট জানা যায় বাংলা ১৩১৯ সালে কেদার ব্যানার্জি প্রজার 'গাছকাটার স্বত্ব'-র দাবিতে আন্দোলন করে। সে সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। জাল মোহম্মদের ছয় মাসের জেল হয়। তারপর প্রায় দেড় বৎসর অন্তরিন ছিল। কৃষকের সঙ্গে পুলিশের এক বড় রকমের সংঘর্ষ হয়। কয়েকজন কৃষক আহত হয়। জেলে দুই জন মারা যায়। ইং ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি থেকে অর্থাৎ বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। তখন পুলিশি সন্ত্রাস চলছে। বহু কর্মী জেলে বা অন্তরিন হয়ে আটকে আছে। প্রকাশ্যে সভা মিছিল নিষিদ্ধ। এই সময় কৃষকদের মধ্যে গোপন সংগঠন তৈরির কাজও আরম্ভ হল। এই আন্দোলনে কৃষকের ঘরের মেয়েদের ভূমিকা কৃষক আন্দোলনের এক অপূর্ব অবদান। জোতদার ও পুলিশের সন্ত্রাসে তারা আদৌ ভীত হয় নাই। আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মীদের আশ্রয় দিতে তারা আদৌ শঙ্কিত হত না। নিজের ছেলের মতো যত্ন করত। অসুখ হলে সেবা শুশ্রূষা করত। এই কৃষক কর্মীদের বেশির ভাগ ছিল শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু জোতদারদের—'এরা ভাটিয়া' এই অপপ্রচার সত্ত্বেও নিজেদের ছেলে আর মেয়েদের সঙ্গে এই কর্মীদের পৃথক করে দেখত না।

খাওয়ার মান রাজবংশী ও সাঁওতালদের খুব নিচু ছিল। অন্যান্য জেলার কৃষকদের

খাওয়ার মান বোধ হয় এত নিচু ছিল না। উত্তরবঙ্গের এই তিনটি জেলা পূর্ব বঙ্গের মতো নদীমাতৃক বা পশ্চিমবাংলার মতো খনিজ শিল্প ভিত্তিক ছিল না। উত্তরবাংলার কৃষক প্রধানত বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল । তাই এদের জীবনযাত্রা অনিশ্চয়তায় ভরা ছিল । শিক্ষার দিক থেকে এরা অনুন্নত ছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালেও একটি ইউনিয়নে দুইটি কি তিনটি প্রাথমিক স্কুল ছিল। লেখাপড়ার আগ্রহ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশি ছিল। এই কৃষক আন্দোলন কৃষক মেয়েদের মধ্যে এক জাগরণ এনে দেয়। লেখাপড়ার আগ্রহ বেড়ে যায়। নিজেরা অগ্রণী হয়ে লেখাপড়া শিখতে লাগল। রাজবংশী সম্প্রদায়ের বয়স্কা মহিলা 'কণ্ঠমণি'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেরোসিনের অভাবে কোনও কোনওদিন সিংটে (পাটকাঠি) জ্বালিয়ে তারা পড়ত। সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ' এলেই মেয়েরা দল বেঁধে এসে পড়ত এবং আলোচনা করত।

গোপন সংগঠন মারফত ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে গোপন আন্দোলন চলল। চৌকিদারি ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অভিযোগে কৃষক নেতা কম্পরাম সিং সহ প্রায় বারো চৌদ্দ জন কৃষক কর্মীর ছয় মাস জেল হয়। কয়েক বছর পর ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলে গুলিতে কৃষক নেতা কম্পরাম সিং মারা যায়। দুর্ভিক্ষ মহামারীর বিরুদ্ধে কৃষকরা আন্দোলন করে। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে রিলিফ কিচেন খুলে দুঃস্থদের রিলিফের ব্যবস্থা করা হয়। কলেরা, বসন্ত, যক্ষা রোগের প্রতিষেধক টিকা নেবার ব্যাপক আন্দোলন হয়। এই তিন সম্প্রদায়ের কৃষকরা খুব অতিথিপরায়ণ ছিল। এই কৃষক আন্দোলন কৃষকদের সামাজিক জীবনকেও স্পর্শ করে। কৃষক মেয়েরা তাদের সামাজিক ও আর্থিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করে।

জোতদার ও কৃষকদের মধ্যে এতকাল যে চাপা এবং অঘোষিত সংঘর্ষ ছিল এই আন্দোলন তাকে প্রকাশ্যে মাঠের লড়াইতে পরিণত করে। এর ফলে মাতব্বর বলতে কৃষক আন্দোলনের কর্মীদের বুঝাত এবং পরবর্তীকালে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দিত তার সমাধানের জন্য কৃষকেরা জোতদারের পরিবর্তে কৃষক কর্মীদের কাছে যেত। এই ভাবে কৃষক সমাজ থেকে জোতদাররা বিচ্ছিন্ন হতে লাগল।

এল নির্বাচনের লড়াই। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে দিনাজপুর জেলাতে তপশিলি কেন্দ্রে কৃষকের ছেলে এবং কৃষক আন্দোলনের কর্মী রূপনারায়ণকে দাঁড় করানো হয়। কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে সাধারণ কৃষকের লড়াই। যেহেতু রূপনারায়ণ রায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী, সেই কারণে এই নির্বাচন অসাধারণ গুরুত্ব পায়। কংগ্রেস তার সমস্ত শক্তি নিয়ে নামল । কংগ্রেসের সঙ্গে তখনকার কংগ্রেসভুক্ত বিভিন্ন দল, ছাত্র, অধ্যাপক, উকিল, মোক্তার, শহর অঞ্চলের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী একত্র হল রূপনারায়ণকে হারানোর জন্য। ওই জোতদারশ্রেণী এতদিন পর যেন মুক্তির পথ পেল। কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এতদিনের আক্রোশ এবার তারা মেটাবে। কংগ্রেস ও অন্যান্য দল কমিউনিস্ট বিরোধী এক ফ্রন্ট তৈরি করল। আর জোতদার শ্রেণী কৃষক আন্দোলন বিরোধী ফ্রন্ট করতে চাইল। সেদিনকার কংগ্রেস তাদের রাজনীতি বিসর্জন দিয়ে জোতদার এমনকী জমিদারের সঙ্গে মিলে রূপনারায়ণকে হারানোর জন্য এক বৃহৎ কৃষক বিরোধী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করল। মুসলমানদের নির্বাচন পৃথক। কিন্তু সাধারণ মুসলমান চাষিরা দলে দলে রূপনারায়ণের পক্ষে প্রচারে নেমে গেল। বড় বড় মুসলমান জোতদার এবং মুসলিম লিগের পাণ্ডারা কংগ্রেসের পক্ষে নামল। নির্বাচনে রূপনারায়ণ জয়ী হল। এই নির্বাচন লড়াইয়ের মাধ্যমে কৃষকদের অনেকেই বক্তৃতা দিতে শিখল। কংগ্রেস ও জোতদারদের যুক্তির বিরুদ্ধে পালটা যুক্ত দেওয়া

শিখল। আর তারা জানল যে, কৃষকদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও জোতদাররা একত্রিত হয়েছে।

নির্বাচনের সাফল্য যেমন এক দিকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল তেমনি অন্য দিকে হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করল। উত্তরবঙ্গের কৃষকদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল মুসলমান কৃষক। প্রায় দশ বৎসর আন্দোলন করেও মুসলমান কৃষক শ্রেণীকে টানতে পারা যায় নাই। এতে হতাশা দেখা দিল। কৃষক আন্দোলনে অনেক মুসলমান কর্মী ও নেতা এসেছিলেন কিন্তু আন্দোলন তাদের যেন মুসলমান সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। অথচ, মুসলমান কৃষকেরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে রাজবংশী ও সাঁওতাল কৃষকদের থেকে উন্নত। এরা স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, অধিকতর বৈষয়িক জ্ঞানসম্পন্ন, উদার ও দরদী মন। এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও এই মুসলমান কৃষক শ্রেণীকে আন্দোলনে টানতে পারা যায় নাই। মনে প্রাণে সহানুভূতিশীল ও সমাজসেবী হওয়া সত্ত্বেও মোল্লা-মৌলভিদের ভয়ে সাহস করে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করত। তবু প্রচুর মুসলমান কৃষক বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে কিন্তু মুসলমান সমাজের উপর তার প্রভাব পড়ে নাই। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলমান কৃষকরা এসে অভিযোগ করেছে যে মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্রে কেন মুসলমান কৃষককে দাঁড় করানো হয় নাই। অনেক গবেষণা হয়েছে কিন্তু এর প্রকৃত কারণ কী তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। অনেক সময় মনে হত যে, মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বহু বিবাহের ও পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন—এইরকম কিছু সমাজ সংস্কার আন্দোলন করা প্রয়োজন। কিন্তু তা কেবল জল্পনাতেই থেকে গেল। কারণ, মুসলমান কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ধনী কৃষকের প্রভাব রাজবংশী ও সাঁওতালদের চাইতে বেশি ছিল। ধানের দর যখন মন প্রতি বারো আনা থেকে এক টাকা ছিল তখন তাদের মধ্যে বিক্ষোভ ছিল । সেই বিক্ষোভকে তারা প্রকাশ করত 'কৃষক প্রজা সমিতি'র ভিতর দিয়ে। যুদ্ধের সময়ে যখন ধানের দর এক ধাপে আট-দশ টাকা উঠে গেল তখন তাদের বিক্ষোভ দূর হল। সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলোপ হল। তখন অবশ্য কৃষি আয়কর প্রবর্তিত হল। বর্তমান অবস্থা আরও শোচনীয়। খাজনার হার যা ছিল তার চাইতে এখন শতকরা পঁচিশ ভাগ বেড়ে গেছে। জোতদার ও ধনী কৃষকের দল বর্তমান বাজারে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা করে ধান বিক্রি করে প্রভূত অর্থ রোজগার করছে অথচ তার জন্য তাদের কোনও বাড়তি ট্যাক্স দিতে হয় না। এইভাবে কালো টাকার সঞ্চয়ে এক উন্নতশীল বাজার সৃষ্টি হয়েছে। নতুন নতুন সাইকেল আর তার সঙ্গে ট্র্যানজিস্টার রেডিয়োর ছড়াছড়ি। ধনী কৃষক আর জোতদারদের টাকার অঙ্ক বছরে বছরে ফেঁপে উঠছে। এই প্রক্রিয়া যুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ হয়েছে।

এই সময় তেভাগা আন্দোলন আরম্ভ হয়। যুদ্ধের সময় থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর ক্রমেই বেড়ে চলছিল। তার উপর চাষের সমস্ত খরচ আধিয়ারকে বহন করতে হয়। এই কারণে উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগ হবে—দুই ভাগ আধিয়ার পাবে আর যদি জোতদার চাষের খরচ দেয় তবে ভাগ অর্ধাংশ হবে।

দেখতে দেখতে এই তিন জেলাতেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। তেভাগা আন্দোলনের তীব্রতা দিনাজপুর জেলাতে সবচেয়ে বেশি ছিল। ধান কেটে নিজ খোলানে উঠাত। 'জান দিব, ধান দিব না'—এই ধ্বনি চারিদিক ছেয়ে ফেলল। লিগ সরকার থেকে আপসের প্রস্তাব এল দশ আনা ছয় আনা অর্থাৎ আধিয়ার দশ আনা পেলে জোতদার পাবে ছয় আনা। কৃষক সমিতির প্রস্তাব ছিল তে-ভাগা অর্থাৎ আধিয়ার দশ আনা আট পাই আর জোতদার পাঁচ

আনা চার পাই। এর এক পাই কম হবে না। আলোচনা আর এগোল না।

তেভাগা আন্দোলন অতি দ্রুত ব্যাপকতা লাভ করেছিল। এরূপ আর কোনও আন্দোলনের ক্ষেত্রে হয় নাই। সরকার ও জোতদারের নিষেধ সত্ত্বেও আধিয়াররা ধান কেটে নিজ নিজ খোলানে উঠাল। জোতদার ও পুলিশ একযোগে কৃষকদের উপর চড়াও হল। গুলি, লাঠি, জেল, আগুন লাগানো, মারপিট, গুণ্ডামি, খুন-জখম এই সব চলা সত্ত্বেও কৃষকদের লড়াইকে দমানো গেল না।

যে সমস্ত অঞ্চলে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন, সেইখানেই তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ লাগল। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ আসতেই মুসলমান কৃষকরা এক অভিনব উপায়ে তেভাগা আন্দোলন শুরু করল। ধান কেটে তারা জোতদারের খোলানে পাঁজা করে বরাবরের মতো রেখেছে কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের কথা এসে পৌঁছোতেই মুসলমান কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমান জোতদারদের খোলান থেকে পাঁজা করা ধান ভেঙে আনল। জোতদারের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস একযোগে তেভাগা আন্দোলনের বিরুদ্ধে নেমে পড়ল। দুই হাজারের উপর কৃষক গ্রেফতার হল— তাদের মধ্যে কমপক্ষে তিন-চারশো মুসলমান কৃষক, পঞ্চাশ-ষাট জন কৃষক মেয়ে ছিল। তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভ্যগণ ও সম্পাদক তেভাগা আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারে নামল কিন্তু তারা একেবারে হতাশ হল। বড় বড় মুসলিম নেতারাও 'ইসলাম বিপন্ন' ধুয়া তুলে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করল কিন্তু যখন তারা সফল হল না তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করল। তবু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। শুরু হল নির্যাতন, কৃষকের বাড়ি বাড়ি হানা দেওয়া, মারপিট, বাড়িতে আগুন দেওয়া এবং অবশেষে বেপরোয়া গুলি করা। হিন্দু-মুসলমান, সাঁওতাল কৃষক মেয়ে পুরুষ মিলে চল্লিশ জন নিহত হল। জোতদারের খোলান থেকে ধানের পাঁজা ভাঙার আন্দোলন বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। জোতদাররা শঙ্কিত হল। কংগ্রেস তখন দেশকে স্বাধীন করার জন্য দিল্লি, সিমলা ও বিলাতে নতুন কায়দায় আন্দোলন করছিল। তারা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে উত্তরবাংলার এই জাগ্রত গণ আন্দোলনকে দমন করার জন্য উঠেপড়ে লাগল। মুসলিম লিগ তেভাগা ও কৃষক আন্দোলনের বিরোধীতা করাকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচি বলে মনে করল। এই বিরাট গণ আন্দোলনকে দমন করার জন্য যে হিংস্র ও পাশবিক নির্যাতন চলছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীও প্রতিবাদ বা কোনও প্রতিরোধ আন্দোলন করে নাই। যদিও আন্দোলনের শুরু হওয়ার সময় বিখ্যাত শ্রমিক নেতা কৃষক জনসমাবেশে আশ্বাস দিয়েছিল—'যদি কৃষকের উপর গুলি চালানো হয়, তবে রেলের চাকা বন্ধ হবে'। পরে কৃষক কর্মীরা অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে। তারা নিজেরা ছড়া বানাল—'আল্লা খ্যাম দে পানি দে; খোদা তুই এ্যালের চাকা বন্ধ কইরা দে'। নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাসের সুর উচ্চারিত হল।

কৃষকদের অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হল, অনেক কৃষক আত্মগোপন করে আন্দোলন চালিয়ে গেছে। যে সমস্ত এলাকায় আন্দোলন খুব তীব্র হয়েছে সেখানে পুলিশ ও মিলিটারির ঘাঁটি বসল। যারা আত্মগোপন করে আছে তাদের গ্রেফতার করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হল। তাদের বাড়ির মেয়েদের তীক্ষ্ণ নজরে রাখা হল। জঙ্গলে লুকিয়ে আছে সন্দেহে জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। এই সময়কার অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন ভোরে দুই জন সিপাহি রাইফেল কাঁধে

নিয়ে টহল দিতে দিতে একটি ভাঙা জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির সামনে একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল—'এ বাড়ি কার'? লোকটি উত্তর দিল—'আজ্ঞে নয়ান বর্মণের'।

সিপাহি—'সে কোথায়?'

লোকটি—'সে তো আপনাদের ভয়ে পালিয়ে গিয়াছে।'

সিপাহি—'কেন পালিয়ে গিয়াছে?'

লোকটি—'ওকে দেখলেই তো ধরে নিয়ে যাবেন।'

সিপাহি—'পালিয়ে বেড়ানোর দরকার নেই, ওকে বলো, যে যেন হাজির হয়ে কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে আসে। বাড়ি তো একেবারে ভেঙে গেছে, এখন যদি মেরামত না করে তবে চৈত্র-বৈশাখের ঝড়ে বাড়ি পড়ে যাবে।'

কিছু দূর যেতেই তারা দেখল জোতদারের লোক তাদের দিকে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। কাছে আসতেই—'ওকে ধরো, ওকে ধরো, ওই তো নয়ান বর্মণ।' সিপাহি দুই জন আর জোতদারের লোক ছুটে এসে দেখে নয়ান বর্মণ উধাও।

তখন দেশে গভীর রাজনৈতিক সংকট। এই রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের পথ কী? কংগ্রেস ও লিগের ঐক্য? সারা দেশে তখন শ্রমিক বিক্ষোভ। অধিকাংশই হল আংশিক অথবা আঞ্চলিক লড়াই। সেই সময় কলিকাতায় ট্রাম শ্রমিকগণ প্রায় দুই মাস ধর্মঘট করে। সর্বনিম্ন দাবির অনেক কমে রফা করে তারা আংশিক সাফল্য লাভ করে। অর্থাৎ আপস ও লড়াই এই দুটো একইসঙ্গে চলবে। আর কৃষকদের ক্ষেত্রে হল আপসহীন লড়াই। এই তিন মতের প্রভাবে রাগান্ধ উন্মাদনার অনিশ্চয়তা এক অস্বস্তিকর বিমূঢ় ভাবের সৃষ্টি করল। আর তখনই এল দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা। কৃষক আন্দোলনের এক অধ্যায় শেষ হল। এক যুগের পরিসমাপ্তি। সেই সঙ্গে বাস্তব বিবর্জিত ভাবাবেগ ও উল্লাস, অভিজ্ঞতাশূন্য বক্তব্যের উপর বিশ্বাস রাখা অথবা নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্য অন্যের উপর দোযারোপ করার অসুস্থ রুচির যুগেরও কি পরিসমাপ্তি হল? সংকীর্ণ জীবনবোধের পরিবর্তে নতুন জীবনবোধের অনুভূতি আর পুরনো অকেজো মূল্যায়নের বদলে কি নতুনভাবে মূল্যায়ন করার যুগ শুরু হল?

১৯৩৯-৪০ সালে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন সরকারের আইনকে প্রকাশ্যে অমান্য করে সশস্ত্র পুলিশের সম্মুখীন হয়। এর পূর্বে কেউ ধারণা করতে পারে নাই দিনাজপুর জেলার অবহেলিত রাজবংশী কৃষকেরা ও মুসলমান সাঁওতাল চাষিরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। এতে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ১৯৪০ সালের প্রথম ভাগে সেতাবগঞ্জ হাটে প্রায় দুইশো-তিনশো কৃষক ভলান্টিয়ার পুলিশ কর্ডন ভেঙে হাটে নেমে তোলাবন্ধ আন্দোলন করে। দারোগা কৃষক নেতা জাল মোহম্মদকে বলে—'১৪৪ ধারা জারি আছে। তোমরা কেউ আইন ভেঙো না।' তাতে জাল মোহম্মদ উত্তর দেয়—'দারোগাবাবু, এতকাল আইন করে আসছেন, এবার আমাদের আইনটা শোনেন, আপনারা ১৪৪ করলেন—আমরা কৃষকরা ১৪৫ করলাম'—বলেই দারোগার মাথার টুপি খুলে নিজের মাথায় পরে সমস্ত কৃষক ভলান্টিয়ার নিয়ে ১৪৪ ধারা ভেঙে হাটে ঢুকে পড়ল এবং তোলা বন্ধ করে দিল। এর জন্য জাল মোহম্মদ সহ অনেকের ছয় মাসের জেল হয়। এই সময়ে ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি থানায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিটিং করতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য—আইন ও শৃঙ্খলা যাতে ব্যাহত না হয়। তখন কৃষক নেতা রামলাল

সিং, বাধাল সিং প্রভৃতির নেতৃত্বে বিরাট কৃষক বাহিনী মিটিং-এ উপস্থিত হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তারা প্রশ্ন করেন, 'যখন জোতদাররা বে-আইনি আদায় কর ও চক্রবৃদ্ধি সুদ আদায় করত, তখন আপনার কোথায় ছিলেন? এবার যখন কৃষকেরা এই বে-আইনি আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে—আপনারা আসছেন। কাজেই আপনারা জোতদারদের স্বার্থে আসছেন'। পরে গোলমালে মিটিং ভেঙে যায় এবং রামলাল সিং, বাধাল সিং প্রভৃতি নেতাদের ছয় মাস করে জেল হয়। এর কিছুদিন পরে পার্বতীপুর থানার চাঁদের হাটে তোলাবন্ধ আন্দোলন চলছিল। ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে পুলিশ ক্যাম্প বসেছিল। পুলিশ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করতে লাগল। কৃষক মেয়েদের সঙ্গে পুলিশের গণ্ডগোল হয়। কয়েকজন মহিলাসহ কৃষক কর্মীকে গ্রেফতার করে ইউনিয়ন বোর্ডে নিয়ে আসে, এই খবরে তিন-চারশত কৃষক কর্মী এসে ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ঘেরাও করে রাখে। পুলিশ বেয়নেট নিয়ে তাড়া করে। খণ্ডযুদ্ধ হয়। সারা রাত সংঘর্ষ হয়। অনেক কৃষক আহত হয়। তার মধ্যে রজনী বর্মণ ও মহেশ বর্মণ জেলে মারা যায়। বহু কর্মী গ্রেফতার হয় ও ছয় মাস করে জেল হয়। এইভাবে কৃষকদের সাহস ও সংগ্রামী চেতনা বেড়ে যায়। কাজেই তেভাগা আন্দোলনের কথা উঠতেই এই সব কৃষক আবার জাগ্রত হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং নির্বাচনে কৃষকের ছেলে রূপনারায়ণ জয়লাভ করায় কৃষকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ সৃষ্টি হল।

তেভাগা আন্দোলন আরম্ভ হতেই গ্রামে গ্রামে আওয়াজ উঠল—তে-ভাগা চাই। নিজ খোলানে ধান তোলো। এই আওয়াজ সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। উপেক্ষিত নিভৃত গ্রামগুলি মুখরিত হল। জোতদার সম্প্রদায় ভীত হল। অপর দিকে লিগ মন্ত্রিসভা আস্থা রাখতে পারল না। সরকার এক প্রেস নোট বের করে সরকারের নীতি ঘোষণা করল।

এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিঘ্নিত হয়। আড়ি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়। সরকার বর্গাদারের সমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছে। সুতরাং সরকার আশা করে যেন প্রতি বৎসর যেভাবে ধান কাটাই ও মাড়াই হত এবং যেভাবে ধান উঠত এবারও যেন তাই হয়। সরকারি প্রেস নোট কৃষকদের উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলল। কৃষকেরা জানেন যে, তাঁদের দাবিকে সরকার একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছে। সুতরাং লড়াই ভিন্ন অন্য পথ নাই।

নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে গ্রামে গ্রামে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়া হল। কৃষক মেয়েরাও ভলান্টিয়ার হল। দিন-রাত ধান পাহারা দেওয়া চলল—জোতদারের দল যেন অসতর্ক মুহূর্তে ধান কাটতে না পারে। ঠাকুরগাঁও মহকুমার অধীন আটোয়ারি, বালিয়াডাঙ্গি ও রানী শংকৈল থানার লাগালাগি পূর্ণিয়া জেলার চোপড়া, ইসলামপুর এবং গোয়ালপোখর থানায় (বর্তমান থানাগুলি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার অধীন) হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বড় বড় জোতদারের দল বিহার অঞ্চল থেকে গুণ্ডা এনে জোর করে ধান কাটবে এই গুজব রটতেই দলে দলে কৃষক মেয়ে-পুরুষ ভলান্টিয়ার পাহারা দেওয়া আরম্ভ করল। কৃষক কর্মীর আত্মীয়রা বিহার অঞ্চলের এই সমস্ত জায়গায় থাকায় তাদের সঙ্গে দেখা করে তেভাগা আন্দোলনে যাতে তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যায় তার চেষ্টা চলতে থাকে।

দুরন্ত শীতের রাত্রে পাহারা দেওয়া চলল। আরও ঠিক হল, যে আধিয়ারের ধান কাটার উপযুক্ত হবে তখন দলে দলে ভলান্টিয়ার গিয়ে ধান কেটে আধিয়ারের খোলানে উঠিয়ে

জোতদারকে সংবাদ দেবে আধিয়ারের খামারে ধান মাড়াই হবে। ধান তিন ভাগ হয়ে দুই ভাগ আধিয়ার আর এক ভাগ জোতদারকে দেওয়া হবে। জোতদারের দল এস. ডি.ও-র কাছে কৃষক কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১০৭/১৪৪ ধারায় দরখাস্ত দায়ের করতেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হল। বালিয়াডাঙ্গি থানায় যখন ভলান্টিয়াররা আধিয়ারের ধান কাটছে তখন পুলিশ গিয়ে উপস্থিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলকে গ্রেফতার করল । পরদিন যথারীতি অন্য ভলান্টিয়াররা এসে অবশিষ্ট ধান কেটে আধিয়ারের খোলানে উঠাল। এই ঘটনার পর ঠিক হল, গ্রেফতার এড়াতে হবে। যদি পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তবে আন্দোলনে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে । সুতরাং গ্রামে প্রবেশের রাস্তার মুখে ভলান্টিয়াররা পাহারা বসাল—পুলিশ দেখলেই খবর পাঠাবে। অপরিচিত লোক গ্রামে আসলেই তার উপর নজর রাখতে হবে। পরিচিত অপরিচিত ঠিক হবে কী করে? অন্য অঞ্চলের কৃষক কর্মীও তো আসতে পারে! ১৯৩৯-৪০ সালে যে রীতি চালু করা হয়েছিল সে রীতিই প্রবর্তন করা হল। 'কমরেড ইনক্লাব' বলে মুঠি তুলে সকলে অভিনন্দন জানাবে—এই পরস্পরের পরিচিতির সংকেত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তেভাগা আন্দোলন যখন পুরোদমে চলছিল তখন লন্ডন থেকে 'ডেইলি টেলিগ্রাফে'র বিশেষ সংবাদদাতা দিনাজপুর জেলায় যে সমস্ত অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন বিশেষ তীব্র হয়েছিল সেই সমস্ত অঞ্চলের কয়েকটি জায়গা ঘুরে ঘুরে যে রিপোর্ট দেয়, তাতে উল্লেখ আছে যে, কৃষকদের মধ্যে এই ধারণা এত ব্যাপক ও বদ্ধমূল ছিল যে তাকে কিছুটা সংস্কার-প্রবণ বললেও চলে। 'কমরেড ইনক্লাব' মুষ্টি তুলে এই অভিবাদনে যে সাড়া দেবে না সে কৃষক আন্দোলনের সমর্থক নয়। এর কয়েকদিন পরেই আবার এক দল সশস্ত্র পুলিশ রানী শংকৈল থানার এলাকায় হানা দিয়ে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কৃষক কর্মীকে গ্রেফতার করে। এক জায়গায় এসে কৃষক কর্মীদের মারধর করে। সঙ্গে সঙ্গে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে কৃষক ভলান্টিয়ার এসে জুটল।

এক কৃষক মেয়ের নেতৃত্বে ভলান্টিয়ার দল পুলিশকে ঘিরে ফেলে তাদের হাত থেকে বন্দুক, লাঠি আর দারোগার রিভলবার কেড়ে নিয়ে দারোগাকে এক ঘরে আটকিয়ে রাখে এবং ভাণ্ডনী বর্মণী নিজে পুলিশের রাইফেল কাঁধে নিয়ে পাহারা দেয়। প্রায় দুই ঘণ্টা পুলিশকে আটকে রেখে তারা ধৃত কর্মীদের ছাড়িয়ে নেয়। যাওয়ার সময় পুলিশের বন্দুক, লাঠি, রিভলবার ফেরত দেয়। সন্ধ্যার আগে আগেই দলে দলে পুলিশ বাহিনী আসে। সারা রাত ধরে গ্রেফতার আর খানা তল্লাশি চলল। কিন্তু যাদের প্রথমে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের কাউকেই পুলিশ ধরতে পারল না। চল্লিশ জন লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। 'জান দিব তবু ধান দিব না', 'তে-ভাগা চাই'! জোতদারেরা ভীত হল। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হতেই ব্যাপক ধান কাটা শুরু হল। জোতদারদের গোলায় ধান উঠল না। দলে দলে জোতদারেরা সেদিন কোর্ট, এস. ডি. ও., ম্যাজিস্ট্রেট এবং থানা-পুলিশের কাছে অনবরত ধরনা দিতে লাগল। তফশিলি ফেডারেশনের জনৈক নেতার উক্তি—'পঙ্গপালের মতো ভলান্টিয়ারের দল ধান খেতের উপর পড়ছে আর ধান কেটে তুলছে।' ১৯৪৭ সালে জানুয়ারি মাসের কয়েকদিন থাকতেই পুলিশ চিরির বন্দর থানার তালপুকুরে কৃষক নেতাদের উপর চড়াও করে। পুলিশ এসেছে খবর রটতেই শীতের সেই ভোররাত্রেই দলে দলে হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল ভলান্টিয়াররা এসে পুলিশকে জিজ্ঞাসা করল—'কৃষক নেতারা কী করেছে যে তাদের গ্রেফতার করছ?' এক বাড়ির ষোলো-সতেরো বৎসরের একটি ছেলে কুয়ার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। গুলি ছুড়ল পুলিশ—সেই গুলি তার বুকে এসে

লাগল। গুলি থামতেই পুলিশ লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কৃষকেরা বুঝতে পারল জোতদারদের সুবিধার জন্যই তাদের ধরা হচ্ছে। 'আমরা ধরা দিব না।' তাতে কথা কাটাকাটি থেকে উত্তেজনা বাড়তে লাগল। লোকও ক্রমশ বাড়তে লাগল। মুহুর্মুহু শ্লোগান—'পুলিশি জুলুম বন্ধ করো', 'জোতদারের দালাল পুলিশ', 'কৃষকের শত্রু পুলিশ', 'জান দিব, তবু ধান দিব না', 'তে-ভাগা চাই'। বাঁধের উপর রাইফেল হাতে পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল—যে পুলিশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র ভরসা! সুরাবর্দি লিগ সরকারের একমাত্র ভরসা আর সেদিনকার কংগ্রেস ও লিগের মিলিত ইনটেরিম গভর্নমেন্টেরও ভরসা। তাদের পিছনে জনসমর্থন নাই—তাই তারা চায় তাজা রক্ত। যখন জায়গায় জায়গায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা হচ্ছে আর তখন কিনা এই অবহেলিত উপেক্ষিত উত্তরবাংলার গ্রামে রাজবংশী, মুসলমান, সাঁওতাল কৃষক মেয়ে পুরুষেরা একত্রিত হয়ে বিরোধিতা করছে। হত্যার উৎসবে মেতে উঠল। কৃষকদের মৃত্যুর মুখে পাঠাব। রাইফেল উঠল। কয়েক রাউন্ড গুলি চলল। অনেকেই আহত হল। সাঁওতাল যুবক শিবরাম ও মুসলমান কৃষক কর্মী সমিরুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল । পুলিশের এই উন্মত্ততার থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাঁওতালরা তির ছুড়তে লাগল। তাতে একজন পুলিশ মারা গেল। পুলিশ যাদের গ্রেফতার করতে এসেছিল তাদের অধিকাংশকেই তারা ধরতে পারে নাই। তারা আহত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গেল। উত্তেজনা বাড়তে লাগল। জোতদাররা ভীত হল। তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে উঠল। গুলি চালিয়ে এবং বেপরোয়া গ্রেফতার করেও কৃষকদের দমানো গেল না। উপরন্তু, কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। যাদের ধরে নিয়ে গেল তাদের জমির ধান যাতে জোতদার না পায় তার জন্য সেদিন থেকে দলে দলে ভলান্টিয়ার এসে ধান কেটে আধিয়ারের খোলানে পাঁজা করল। আহতদের মধ্যে পোহাতু বর্মণ কোনওমতে বেঁচে উঠল তবে তার একটি পা কেটে ফেলতে হল। তালপুকুরে গুলি ও কৃষক হত্যার সংবাদ যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগল ততই আন্দোলনের পরিধি বাড়তে লাগল। নতুন নতুন জায়গায় কৃষকরা একত্র হয়ে সেদিন তে-ভাগা জারি করে ধান কেটে নিজেদের খোলানে উঠাল। পার্বতীপুর থানা মুসলমান অধ্যুষিত জায়গা। সেখানকার অধিকাংশ জোতদার আধিয়ার মুসলমান—মুসলিম লিগের প্রভাবিত অঞ্চল। ধান কাটার কয়েকদিন আগে বায়কানা হাটে যে বিরাট কৃষক-সভা হয় তাতে আধিয়াররা (যারা অধিকাংশই মুসলমান) তে-ভাগা দাবি করে। তারা আন্দোলন করবে বলে ঘোষণা করে। জোতদারের দল 'মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ড' দেয়। নানারূপ হুমকি ও ভয় দেখায়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক প্রচার শুরু করে। তাতে নতুন মুসলমান কর্মীরা আদৌ ভীত হল না।

ছোট মিঞাজান, বড় মিঞাজান, হাকিমুদ্দিন, গিয়াসুদ্দিন প্রভৃতি কৃষক কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বিশেষত—মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করল। মুসলমান নেতারা আর 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডরা'ও তাদের বিরুদ্ধে প্রচারে নামল। এক দিকে শ্লোগান চলল 'তে-ভাগা চাই', 'নিজ খামারে ধান তোলো'। অন্য দিকে লিগের নেতারা ও 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড'-রা 'তে-ভাগা নয়, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'—এই শ্লোগান আরম্ভ করল। এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হল। এর সুযোগ জোতদাররা নিল অর্থাৎ ধান তাদের গোলায় উঠল।

দেখতে দেখতে এই পুঁজভাঙা আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল। এই নতুন পরিস্থিতিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জোতদার,মুসলিম লিগের নেতারা এক অভাবনীয় পরিস্থিতির

সম্মুখীন হল। আর কোনও উপায় না দেখে মুসলিম লিগ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য প্ররোচনা দিতে লাগল। গ্রামাঞ্চলে এই হিন্দু মুসলমান কৃষকের অভূতপূর্ব মিলিত লড়াইয়ের সামনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক প্রচার কাজে তো লাগলই না বরং এই সাম্প্রদায়িক জিগির যে জোতদাররা তুলল তাদের বিরুদ্ধেই তো এই আন্দোলন।

যুদ্ধে পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তারা প্রাক যুদ্ধকালীন অবস্থার দিকে যেতে চায় না। তাদের এই নবচেতনাকে মুসলিম লিগের নেতারা আদৌ বুঝতে চায় নাই। কিন্তু এর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পথ কী? মুসলিম কৃষকদের কাছে মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদ-ঘেষা জাতীয়তা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র প্রকাশ হতে চলেছে তাই তারা মরিয়া হয়ে শহরে দাঙ্গা লাগাতে চেষ্টা করতে লাগল। উত্তেজনামূলক সাম্প্রদায়িক জিগিব তুলে খোলা তরবারি নিয়ে 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড' মিছিল করতে লাগল। উত্তেজনা বাড়িয়ে এক সন্ধ্যায় মিছিলের কয়েকজন খোলা তরবারি নিয়ে সদর রাস্তায় অবস্থিত মন্দিরের বারান্দায় উঠে পড়ল—কিন্তু এতেও দাঙ্গা হল না। গোটা জেলাতে তীব্র জঙ্গি কৃষক আন্দোলন চলছে। সমস্ত লোকের মনে এক সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। এই সঙ্গে বহুকালের অপ্রকাশিত ঘটনা ও তথ্য প্রকাশিত হল। কীভাবে কৃষকদের বঞ্চনা করা হয়েছে। জালখত লিখে মিথ্যা মামলা করে—সাদা কাগজে টিপসহি নিয়ে জমি বিক্রয়ের কবলা তৈরি করে। মিথ্যা ঋণ দেখিয়ে এমনি করে আরও কত রকমের জুয়াচুরি করে থানা-পুলিশ কোর্ট-কাছারির সাহায্যে কৃষকদের জমি থেকে ছিন্নমূল করে। একশত বৎসরের ধারাবাহিক তথ্য প্রকাশ হল। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রকাশ পেল যে আজকাল যাবা বড় বড় জোতদার কি হিন্দু মুসলমান—তিন পুরুষ আগে তাদের কেউ দারোয়ান ছিল, কেউ কেউ ডাকাত ছিল। ডাকাতি করে, চুরি করে, চোরাই মালের মজুতদার হয়ে প্রচুর টাকা করে কৃষকদের ছিন্নমূল করে নিজেরা মালিক হয়েছে। এর সঙ্গে আরও প্রকাশ হল কীভাবে কৃষকদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাদের মেরে ফেলে জমি গ্রাস করেছে। কীভাবে তারা গুণ্ডা লাগিয়ে কৃষক মেয়েদের জোর করে লুঠ করে বর্বরোচিত অত্যাচার করেছে। কিন্তু এর প্রতিকারের কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। এই সমস্ত ঘটনা প্রকাশিত হল এবং জোতদারদের অন্যায় জুলুম ও অত্যাচারে স্বভাবতই সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি কৃষকদের উপরে পড়ে। শহরের সাধারণ মুসলমান বাসিন্দারা ন্যাশনাল গার্ডদের এই উস্কানি সমর্থন করল না বরং সমালোচনা করল। এ ছাড়া এমন একটি ঘটনা ছিল যে—তেভাগা আন্দোলনের জন্য অন্যান্য জেলা থেকে প্রচুর পুলিশ আনতে হয়েছে। এদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশ হিন্দু পুলিশ ছিল। অনেক পুলিশ অফিসারকেও আনতে হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক হিন্দু অফিসারও ছিল। এই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার ফলে যদি দাঙ্গা লাগে তখন এই পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও বিভাজন আসতে পারে। এই আশঙ্কায় স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ এই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিতে চাইল না। ফলে, মুসলিম লিগের এই চেষ্টা ব্যর্থ হল। দলে দলে মুসলমান কৃষক আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় মুসলিম লিগের নেতারা আতঙ্কিত হল। কংগ্রেস নেতারা কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসার অভিযানে মেতে উঠল। কিন্তু কয়েক মাস আগে নির্বাচনের সময় বুদ্ধিজীবীদের বৃহৎ অংশকে তাদের পক্ষে পেয়েছিল—কিন্তু তারা এবার তা পেল না। প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতারা এলেন এবং শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডাকলেন; তাদের কাছে কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসা প্রচার করে এক কুৎসিত দৃষ্টান্তের পরিচয় দিলেন। কিন্তু সে বৈঠকেও কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন—কৃষকদের তে-ভাগা দাবি সম্বন্ধে কংগ্রেসের কী মত?

সুরাবর্দি মন্ত্রিসভার দমন নীতির বিরোধিতা কংগ্রেস করল না কেন? কংগ্রেস নেতারা এর সদুত্তর দিতে পারেন নাই। আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল। ধানকাটা শেষ হয়ে গেল। জোতদারদের নির্দিষ্ট খোলানে ধান উঠল না। অনেক অঞ্চলে যেখানে প্রথম দিকে আন্দোলন হয় নাই এই আন্দোলনের ঢেউ আসতেই কৃষকরা নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে জোতদারদেব পুঁজ থেকে ধান ভেঙে আনল।

মিলিটারি ও পুলিশ আমদানি হল। যে সমস্ত অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন তীব্র সে সব এলাকায় পুলিশ ও মিলিটারির ঘাঁটি বসল। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে পুলিশি অভিযান আরম্ভ হল। অনেক কৃষক কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হল। তাদের ধরার নাম করে বাড়ি বাড়ি পুলিশি হানা চলল। ঠাকুরগাঁও মহকুমার বালিয়াডাঙ্গি থানা জুড়ে তেভাগা আন্দোলন চলছিল। পুলিশ বিখ্যাত কৃষক কর্মী ডোমারাম সিং-এর বাড়িতে হানা দিন। পুলিশের সঙ্গে জোতদার আর তাদের ভাড়া করা গুণ্ডারা থাকত। কোন কোন বাড়ি হানা দিতে হবে, কারা স্থানীয় কৃষক কর্মী, কাদের বাড়িতে কৃষক সমিতির বৈঠক হয়—এই সমস্ত তথ্য জোগাড় করে দিত। কমরেড ডোমা সিং, কাজবর সিং এই অঞ্চলের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। এদের বাড়ির মেয়ে পুরুষরা 'চল্লিশ'-এর আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। তাদের পুলিশ ধরতে পারে নাই। তাদের উপর জোতদারদের সবচাইতে বেশি আক্রোশ ছিল। এক দিন ভোরবেলা সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল। যে কৃষকদের পুলিশ খোঁজ করছিল, তাদের কেউ কেউ সে রাত্রে ওই বাড়িতে ছিল। পুলিশ আসছে সংবাদ পেয়ে তারা আগেই সরে পড়ল। পুলিশ গিয়ে তাদের কাউকেই পেল না। পুলিশ বিরক্ত হয়ে বাড়ির লোকেব উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে এক জন মহিলাসহ চার জন মাবা গেল আব আট-দশ জন আহত হল। দলে দলে অসংখ্য পুলিশ আসতে লাগল। বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে আধিয়ারদের বাড়ি থেকে জোর কবে ধান, চাল, গোরু-বাছুর, ছাগল, হাঁস, মুরগি নিতে লাগল। দেখতে দেখতে পুলিশ আর জোতদারদের এই সম্মিলিত অভিযান গোটা জেলাতে ছড়িয়ে পড়ল। পুলিশের এই নগ্ন হিংস্রতার তাণ্ডব চলল। জঙ্গলে কৃষক কর্মীরা পালিযে আছে সন্দেহে গ্রামের জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যখন পুলিশের তাণ্ডব চলছিল সেইসময় একদিন দুপুরে একজন কৃষক প্রতিনিধি মোটরে দিনাজপুর থেকে ঠাকুরগাঁও যাওয়ার পথে এই ঘটনা নিজ চোখে দেখে যায়। কৃষক কর্মীদের বাড়িতে হানা দিয়ে যখন তাদের খোঁজ পেত না তখন পুলিশের সামনেই জোতদারের দল বাড়ির লোকদের উপর মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে লাঠি ও লোহার ডাণ্ডা দিয়ে অমানুষিক মারধোর করত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শক হত। কখনও কখনও পুলিশ এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লুঠের ভাগ নিত। চিরির বন্দর থানা এলাকার মধু বর্মণকে প্রচণ্ড মার দিয়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। মধু বর্মণ মরে গেছে মনে করে ঝোপের ভেতর ঠেলে দিয়ে পুলিশ ও জোতদারের গুণ্ডারা পালিয়ে যায়। পরে গ্রামের মেয়েরা ওই ঝোপের থেকে তাকে নিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে। এরপর এক কৃষক আন্দোলনের সমর্থক দীর্ঘদিন তাকে চিকিৎসা করে। মধুর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ছিল কিন্তু এই ঘটনার পর পুলিশ তাকে চালান করার সাহস পায় নাই। এই হিংস্র অত্যাচার ও বর্বরতার বিরুদ্ধে ঠাকুরগাঁও-এর এস. ডি. ও.-র কাছে এর প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে এক কৃষক মিছিল শহরে ঢোকার আগেই পুলিশ সেই নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় মিছিলের উপর গুলি চালায়। চার জন সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। নিয়ামত সহ কয়েক জন মুসলমান কর্মী গুরুতর আহত হয়।

পরে নিয়ামতের একটি পা কেটে ফেলতে হয়।

এক দিকে পুলিশ আর জোতদারেরা নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে আর অন্য দিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতারা সভা করে সুরাবর্দি মন্ত্রিসভায় এই দমন নীতিকে সমর্থন করে কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসার অভিযান চালায়। এই সময় সুরাবর্দি মন্ত্রিসভা তেভাগা আইনের খসড়া বিল প্রকাশ করল। ফেব্রুয়ারি মাসের কুড়ি তারিখে পুলিশ বালুরঘাট থানার খাঁপুর গ্রামের কয়েকজন কৃষক কর্মীকে গ্রেফতার করে ট্রাকে উঠাল। মুহূর্তে শত শত হিন্দু মুসলমান কৃষক মেয়ে পুরুষ এসে যায়। তারা এই কৃষক কর্মীদের মুক্তির দাবি করে। পুলিশ তাদের দাবিতে কর্ণপাত করে না। ট্রাক চালানোর চেষ্টা করতেই কৃষকেরা ট্রাক ঘিরে ফেলে; তখন পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালাতে লাগল। চিয়ার সাই শেখ ও যশোদাদেবীর নেতৃত্বে একদল কৃষক কর্মী এই গুলির মধ্যে ট্রাকের টায়ার নষ্ট করার জন্য বল্লম ছুড়তে থাকে। পুলিশের গুলিতে যশোদাদেবী মারা যায়। চিয়ার সাই শেখ পড়ে গেল এবং বল্লম হাতে মাটির উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে চলল। টায়ার লক্ষ্য করে বল্লম ছুড়তেই বুকে তার গুলি লাগে। সে মারা যায়। বারো জন হিন্দু মুসলমান কৃষককে পুলিশ গুলি করে হত্যা করল। গুলির আঘাতে ওই বারো জন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। পরে আহতদের মধ্যে আট জন হাসপাতালে মারা যায়। এইভাবে তে-ভাগা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হল। বড় জোতদার ও পুলিশের চাপে ছোট ছোট জোতদার ও মাঝারি কৃষকগণ প্রথম দিকে নিরপেক্ষ ছিল। পরে তারা বড় জোতদারদের সঙ্গে যোগ দিল। তার ফলে, তাদের উপর খেপে গিয়ে কৃষকরা তাদের ধান তে-ভাগ করল। ছোট জোতদার ও মাঝারি কৃষকের ধান তে-ভাগ করা হবে না—এই নীতি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যায় নাই।

এই বিরাট আর ব্যাপক কৃষক আন্দোলন অতীতে আর এত বড় হয় নাই। আভিজাত্যের উপর এত বড় প্রচণ্ড আঘাত যে আসতে পারে, আভিজাত্যাভিমানীগণ ও বুদ্ধিজীবীগণ আদৌ ধারণা করতে পারে নাই। বুদ্ধিজীবীদের এক বড় অংশ সাংবাদিক, সাহিত্যিকেরা কৃষকদের বিরুদ্ধে জোতদারদের কাজে সায় দিল । মুক্ত মন দিয়ে আন্দোলনের বিচার করবার চেষ্টা তারা আদৌ করে নাই। এক প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে কৃষকরা একাই লড়াই করল অথচ ধনিক কৃষকরাও কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ায় নাই! শ্রেণীগত চেতনা উদ্ভূত হয়ে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করার অনুভূতিও সেদিনকার শ্রমিক শ্রেণীর ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী এতবড় গণ-আন্দোলন হল। বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ এর মূলকথা বিশ্লেষণ করে বুঝবার চেষ্টা না করে নিজেদের সংস্কৃতির দীনতার পরিচয় দিল। ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস বাদ দিয়ে এতবড় প্রচণ্ড আন্দোলন সবরকম সামাজিক কুসংস্কারের মূলে আঘাত হেনে, এক তপ্ত আলোড়ন সৃষ্টি করে, অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। তার কৃষ্টিগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন ছিল। এটা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন যে তীব্র ক্ষিপ্র গতিতে বেড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গণচেতনামূলক সংস্কৃতি গড়ে উঠে নাই। আভিজাত্যের শাসনে বাঁধা সাংস্কৃতিক প্রভাব মুক্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থাৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে চেতনা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি না হওয়ায়—বুদ্ধিজীবীদেব মধ্যে—দিশেহারা ভাব দেখা দিয়েছিল। দেশের প্রকৃত রূপ, ঐতিহ্য যেন মুছে গেল। ঐতিহ্য গেলে থাকল কী? কিন্তু জীবনের উত্তাপ কোনওদিন নিঃশেষ হয় না। এক যুগের ব্যর্থতা নিষ্প্রভতা মেহনতি মানুষকে কখনও নিষ্ক্রিয় ও নির্জীব করতে পারে না। এই আন্দোলন বিশেষত তেভাগা আন্দোলন এক

সৃজনশীল প্রতিভার জন্ম দিয়েছিল। এক দিকে ছিল সংগ্রামী উন্মাদনা অন্য দিকে ছিল হিংস্র পাশবিকতা। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, উত্তরবাংলার এই কৃষকরা এত শক্তি পেল কোথায়? এই আন্দোলন কি একটি অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলন? সম্ভবত তা নয়! নিছক অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলন এত ব্যাপক, এত জঙ্গি, এত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে কি না সন্দেহ জাগে। সংগ্রামী কৃষকদের দৃঢ়তা, ঐক্য বোধ এবং অপূর্ব আত্মত্যাগ এক অনুপ্রেরণাময় ঘটনা। এর মূলে ছিল এক বাস্তব জীবনাদর্শ আর সেই আদর্শবোধ সংগ্রামের এই প্রেরণা ও উন্মাদনা জাগিয়েছিল। ছাড়া ছাড়া কৃষক আন্দোলন এর আগে আরও হয়েছে। এক নতুন আদর্শবাদ এই আন্দোলনের প্রেরণা। ১৯৩৭ সালে দিনাজপুর জেলায় যে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন হয় তার একটা মূল বক্তব্য ছিল—কৃষক-মজুররাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কৃষক-মজুররাজ কৃষক মজুরের সমস্ত দাবি পূরণ করে দেবে। ধনীর পরিবর্তে কৃষক-মজুরের রাজ—এই রাজবংশী, সাঁওতাল ও মুসলমানরা সর্বপ্রথম জানল যে রাশিয়ার কৃষক-মজুর, বড়লোকের রাজত্ব খতম করে কৃষক-শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। সেখানে জমিদার, মুনাফাখোর, জোতদার, চোরাকারবারি এই সব রক্ত শোষকের দল নাই, তাদের নির্মূল করা হয়েছে। ধনীর রাজত্বের বদলে কৃষক মজুরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হল তাদের আদর্শ। অক্টোবর বিপ্লবের কুড়ি-বাইশ বছর পর অক্টোবর বিপ্লবের বার্তা এসে পৌঁছাল উত্তরবাংলার নিভৃত পল্লীর এই অবহেলিত উপেক্ষিত মানুষের দরবারে। সমগ্র কৃষক সমাজ এক উন্নত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনের পর ত্রিশ বৎসর পার হয়ে গেছে। মানুষের মূল্যায়নে এ যেন এক জীবন্ত দলিল, অপূর্ব প্রেরণাময় ইতিহাস।

তেভাগা আন্দোলন ব্যক্তিপূজার মূলে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। সে সময় দেশে ব্যক্তিপূজার প্রাধান্য ছিল। তেভাগা আন্দোলন সমগ্র দেশের সামনে কৃষি সংস্কারকে তুলে ধরেছিল। কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা যে কত উন্নত তেভাগা আন্দোলন তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। অন্য দিকে জমিদার, জোতদারদের নিকৃষ্ট জঘন্য চেহারা জনসমাজে প্রকাশিত হল। খাজনা আদায়, বে-আইনি আদায়, সুদ প্রভৃতির জন্য পুরুষানুক্রমে কৃষকদের উপর যে কী জুলুম অত্যাচার হত, তা প্রকাশ করার মতো নয়। শীতের রাতে জলের চৌবাচ্চার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হত। বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিত। বউ, মেয়েদের লুঠ করত। আর কথায় কথায় মারপিট তো ছিলই। তখন জোতদারদের সকলেরই বন্দুক ছিল। অধিকাংশ জোতদার তাদের বন্দুক ডাকাতদের ভাড়া দিত ডাকাতি করবার জন্য। ফলে তারা ডাকাতির একটা বখরা পেত। তেভাগা আন্দোলন যে নবচেতনা সৃষ্টি করেছিল সে চেতনা ভবিষ্যতে কতদূর যাবে তা কেবল ভবিষ্যতের সংগ্রামী কৃষকরাই উত্তর দেবে। বাস্তব বিবর্জিত, ভাবাবেগ, উচ্ছ্বাস ও অভিজ্ঞতাশূন্য বক্তব্যের উপর বিশ্বাস রাখার অসুস্থ রুচির যুগের পরিসমাপ্তি হয়ে, সংকীর্ণ জীবনবোধের পরিবর্তে এক নতুন জীবনবোধের কি শুরু?

ভবিষ্যতের সংগ্রামী মেহনতি মানুষ এর উত্তর দেবে।

তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা

গুরুদাস তালুকদার

ভারত উপমহাদেশে তখন ব্রিটিশ শাসন চলছিল। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে জমিদার ও মধ্যবিত্তদের অনেকেই ভারতের স্বাধীনতার কথা বলত ঠিকই, কিন্তু সাধারণ কৃষক মজুরের অর্থনৈতিক মুক্তির কোনও কথা তাদের মুখ থেকে বেরুত না। স্বাধীনতার যেমন প্রয়োজন ছিল কৃষক-মজুরের, তেমনি জমির মধ্যবিত্ত মালিক ও বড় বুর্জোয়াদেরও। অবশ্য বড় বুর্জোয়াদের প্রয়োজন ছিল এই অর্থে যে মেহনতি মানুষকে শোষণের পথকে নিজেদের জন্য সুগম করতে।

সে সময় কৃষকদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। সারা বছর খেটে বর্গা কৃষকদের সামন্ত প্রভুদের গোলায় ধান তুলে দিতে হত। বিভিন্ন কৌশলে কৃষকদের কাছ থেকে ধান নিয়ে নেওয়া হত। দিয়ে-থুয়ে চাষি যা পেত তাতে তাদের তিন-চার মাসের বেশি চলা কঠিন হয়ে পড়ত। আবার তাদের সামন্ত প্রভু বা জোতদারদের কাছে হাত পাততে হত। এক মন ধান নিলে ধান কাটার সময় দুই থেকে তিন মন ধান জোতদারদের হাতে তুলে দিতে হত। তখন বর্গাচাষিদের এ রকম শূন্য হাতে বাড়ি ফেরা ছাড়া কোনও উপায় থাকত না।

এরই বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের কৃষকসমাজ, বিশেষ করে দিনাজপুর রংপুর জেলার কৃষকরা জোর আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই আন্দোলনের মূল কথা ছিল: জোতদার পাবে উৎপন্ন দ্রব্যের তিন ভাগের একভাগ। কৃষক পাবে দুই ভাগ। তবে যদি জোতদার ফসল উৎপন্ন করার বীজ, বলদ এবং অন্যান্য খরচ দেয় তা হলে কৃষক পাবে আধাআধি। কিন্তু জোতদাররা বীজধান, চাষের খরচ, বলদ এ সব দেবার জন্য কষ্ট স্বীকার করত না। ফসলের আধা ভাগও ছাড়ত না। চাষিরা বুঝতে পেরেছিল যে লড়াই না করলে জোতদারের কবল থেকে তাদের রক্ষা নেই। তাই তারা লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছিল। এই সংগ্রামই তে-ভাগার লড়াই বলে পরিচিত।

দিনাজপুর জেলায় প্রথম আন্দোলনের সূচনা হয় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ১৪ই পৌষ। এই দিন থেকে কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ধান কাটা শুরু হয়। সেই সময় কৃষকরা 'নিজ খোলানে ধান তোলো' শ্লোগান দিয়ে ধান তুলতে আরম্ভ করে। আগে কৃষকরা জোতদারের খোলানে ধান তুলত। কিন্তু যখন কৃষকরা নিজ খোলানে ধান তোলে তখন প্রথম পাঁচ-ছ' দিন জোতদাররা কৃষকদের বাধা দিতে দাঁড়ায়। কিন্তু হাজার হাজার কৃষক ভলান্টিয়ারের সামনে তাদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল কিছুই করতে পারেনি।

জোতদারেরা পুলিশ ও আর্মড পুলিশ আনবার ব্যবস্থা করে। এই ফৌজের সাথে কৃষক পুরুষ ও মেয়ে ভলান্টিয়ারদেব বারবার সংঘর্ষ বাধে। ২০ পৌষ আটোয়ারি থানার রামপুর মলানি গ্রামে সংঘর্ষের সময় পুরুষেরা ধান কেটে এবং মেয়েরা জমির চারিদিকে আলের উপর দাঁড়িয়ে দা-কুড়ুল, বঁটি, ঝাড়ু প্রভৃতি নিয়ে পাহারা দেয়। আর্মড ফৌজ মেয়েদের বাধা

সত্ত্বেও এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। কৃষক মেয়েরা তখন দা-কুড়ুল যা পারে তাই নিয়ে ফৌজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গাইন দিয়ে পিটিয়ে ফৌজের পাঁচ-ছটি বন্দুক ভেঙে দেয়। হাজার হাজার মেয়ে ভলান্টিয়ারদের সাথে না পেরে আর্মড ফৌজ পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই মেয়ে বাহিনী পরিচালনা করেন রোহিণী বর্মণ ও জয়মণি বর্মণ।

এই ঘটনার পরে কৃষকদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। কিন্তু কৃষকদের ধবার জন্য দারোগা সাহেব গ্রামে ঢুকতে সাহস করেনি। জোতদাররা ভীত হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়। গ্রামে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষক আদালত বসে। এই আদালত কমরেড কম্পরাম সিং (যিনি ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপরা ওয়ার্ডে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন), কমরেড আভারণ সিং, কমরেড রাজেন সিং, কমবেড ডোমী সিং, কমরেড বিভীষণ সিং ও কমরেড তিলক সিংকে নিয়ে গঠিত হয়। এরপর সব কৃযকরা দলে দলে কৃষক আদালতের কাছে সাহায্য চায়। তখন জোতদাররা গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরে বা কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। কৃষক আদালত আদেশ জারি করে: বাড়ি প্রতি এক ভাই, এক লাঠি ও এক টাকা জমা দিতে হবে।

ঘটনার পরদিন থেকে আবার কৃষকরা জোতদারের ধান কাটতে আরম্ভ করে। এ সময়ে এক জোতদার বাধা দেয় এবং গুলি করে। কৃষক ভলান্টিয়াররা ক্ষিপ্ত হয়ে জোতদারকে ঘিরে ফেলে এবং বন্দুকসহ তাকে গ্রেপ্তার করে। সেই জোতদারকে কোমরে দড়ি বেঁধে কৃষক আদালতে হাজির করা হয়। তারপর বিচারে ২০০ টাকা জরিমানা হয়; ২০০ টাকা জরিমানা দিয়ে জোতদার সাহেব মুক্তি লাভ করে।

এর পরেই পুলিশের এক জমাদার সাহেব গ্রামে আসামি ধরার জন্য যায় এবং বাঘা বর্মণ নামে এক কৃষক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে। তখন হাজার হাজার মেয়ে ও পুরুষ লাঠি, দা, কুড়ুল, গাইন, তিরধনুক প্রভৃতি নিয়ে জমাদার ও পুলিশদের ঘেরাও করে। দারোগা কোনও উপায় না দেখে পুলিশকে গুলি করার হুকুম দেয়। পুলিশ গুলি চালালে তিন-চার জন আহত হয়। ভাগুনী রোহিণী বাহিনী তখন গাইন চালাতে আরম্ভ করে। এর ফলে পাঁচ-ছয় জন পুলিশ বন্দুক ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং জমাদার গ্রেপ্তার হয়। তাকে একটা ইস্কুলে ধরে আটকে রেখে মেয়েরা বন্দুক লাঠি ও গাইন নিয়ে পাহারা দেয়।

জমাদার একদিন একরাত আটক থাকার পর দারোগা সাহেব মেয়েদেব কাছে এসে বলেন, 'মা, পুলিশ গুলি ছুড়ে খুবই অন্যায় করেছে। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি, জমাদারকে নিয়ে তোমরাও এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে চলো। সাক্ষী দিতে হবে।'

ভাগুনী পরিষ্কার জবাব দেয়, 'তোমরা চালাকি করে আমাদের গ্রেপ্তার করতে চাও। তা হবে না, আমরা যাব না এবং তোমাকে ও তোমার জমাদারকে গুলি ছোড়ার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। আর কোনওদিন যেন ফৌজ নিয়ে গাঁয়ে না ঢোকে তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে। তবেই আমরা তোমার জমাদারকে বন্দুক ফেরত দেব।' অগত্যা জমাদার সাহেব ক্ষমা চেয়ে জীবন নিয়ে ফিরে যায়।

এই ঘটনা ঘটে রানী শংকৈল থানার গুয়া গাঁয়ে। পক্ষান্তরে চিরির বন্দর থানায় আসামি ধরতে গিয়ে এক দারোগাকে মেয়েদের হাতের ঝাড়ু খেতে হয় এবং ঝাড়ুর বাড়িতে দারোগা সাহেবের মাথা ফেটে যায়। বাধ্য হয়ে দারোগা সাহেব গুলি ছোড়ার হুকুম দেয় এবং শিবরাম ও সমিরউদ্দিন শহিদ হয়।

পতিরাম থানার খাঁপুরে আসামি ধরার জন্য আর্মড ফৌজ পাঁচখানা পুলিশ ভ্যান নিয়ে

যায় এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। কৃষক পুরুষ ও মেয়েরা পুলিশ ভ্যান যাতে না পালিয়ে যেতে পারে সেজন্য রাস্তা খুঁড়ে গর্ত করে পুলিশভ্যান আটকায়। এবং তির ধনুক দিয়ে চাকা ফুটো করে দেয়। ফৌজ গুলি চালায় এবং চিয়ারসাই শেখ ও যমুনা সহ ২১ জন শহিদ হয়।

পুলিশ ঠুমনিয়া লোকাল অফিস ও কৃষক আদালতের হেড অফিস বালিয়াডাঙ্গি থানা আক্রমণ করে। কমরেড মনকটু সিং দুই হাতে লাঠি ঘুরিয়ে পুলিশদের বাধা দেয়। গুলিতে তার পেটের নাড়িভুড়ি বের হয়ে যায়। তবুও সে বাঁ হাতে পেট চেপে ধরে ডান হাতে লাঠি চালায়। দুইজন পুলিশের মাথা ফেটে যায়। কমরেড নিজেও শহিদ হয়।

এই রকম অসংখ্য বীরত্বের-গাথা তেভাগার লড়াই এক সময় গাঁয়ে গাঁয়ে ঘটেছিল। তখনকার লিগ মন্ত্রীসভা তেভাগা দাবির ন্যায্যতা মেনে নিয়েছিল এবং তেভাগাব বিল আইন সভায় উপস্থিত করেছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকেরা দেশ বিভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কংগ্রেস ও লিগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে তখন বিল আর আলোচনা হয়নি।

দিনাজপুর জেলার আধিয়ার বিদ্রোহের কাহিনী

হাজি মহম্মদ দানেশ

ইং ১৯৩৮ সাল। সন্ত্রাসবাদীরা দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর মুক্তি পেয়ে আপন আপন জেলায় ফিরে এসেছেন। বন্দি থাকাকালেই তাঁরা সন্ত্রাসবাদী অন্দোলনের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন। বের হয়ে এসেই তাঁরা নিজেদের জেলাতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। দিনাজপুর জেলাতেও কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। বিভূতি গুহ, সুশীল সেন, শচীন্দু চক্রবর্তী, কালী সরকার, বসন্ত চ্যাটার্জি প্রমুখ কমরেডরা এর উদ্যোক্তা ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি তখন অবশ্য সারা ভারতে বেআইনি ঘোষিত ছিল। কমিউনিস্টরা দেশের রাজনীতিতে নতুন ভাবধারা নিয়ে আসেন। এই নতুন ভাবধারা হল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক কৃষক কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম। আর এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবেন দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাঁদের সহযোগী হবেন দেশের কৃষকশ্রেণী, যাঁরা আমাদের মতো কৃষি প্রধান দেশে জনসংখ্যার শতকরা পঁচাশি জন। সুতরাং তাঁরাই বিপ্লবের মূল শক্তি।

অন্যান্য জেলার ন্যায় দিনাজপুরের কমিউনিস্ট পার্টিও জেলার কৃষকদের সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। তাঁরা বঙ্গীয় কৃষক সভার অধীনে দিনাজপুর জেলায় কৃষক সমিতি গঠন করেন এবং দিনাজপুর শহরে মুন্সিপাড়ায় কৃষক সমিতির অফিসও খোলা হয়। কৃষক সমিতির কাস্তে হাতুড়ি খচিত লাল পতাকাও চালু করা হয়। গুরুদাস তালুকদার, সত্যেন রায়, আমি, সুনীল সেন, অজিত রায়, জনার্দন ভট্টাচার্য, নরেশ চক্রবর্তী, বরদা চক্রবর্তী এঁরাও কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়ে কৃষক সংগঠনের কাজে নেমে পড়েন। পরে এঁরা সবাই পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন।

কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা বিশেষ করে দিনাজপুর জেলায় একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। কৃষকদের নিজেদের ভেতরেই ছিল শ্রেণীভেদ। তাদের মধ্যে ছিল ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক, গরিব কৃষক, ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুর। পরস্পরের মধ্যে তাদের ছিল কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত। কৃষকরা ছিল গ্রামের জোতদার ও মাতব্বরদের তাঁবে। তাদের বুদ্ধি-পরামর্শেই তারা চলত। তারা গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করত। তারা ছিল অদৃষ্টবাদী, আত্মকেন্দ্রিক। তাদের মধ্যে ছিল আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছিল না বললেই চলে। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলন, ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছিল বটে কিন্তু দিনাজপুরের সাধারণ কৃষকেরা তাতে খুব কমই সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। দিনাজপুরে কৃষক সমস্যা নিয়ে কোনও কৃষক-আন্দোলন হয় নাই। কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-সচেতনতাও আসে নাই। গরিব ভূমিহীন কৃষকদের ভোটের অধিকারও ছিল না। এই সময় দেশে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। এর ছোঁয়াচ হিন্দু মুসলিম কৃষকদের মধ্যেও লেগেছিল। এত সব

সত্ত্বেও কয়েক বছরের মধ্যে দিনাজপুরের তৎকালে আঠাশ থানার মধ্যে প্রায় কুড়িটি থানায় শক্তিশালী জঙ্গি কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠে এবং ওই সকল নিরীহ কৃষকরাই ১৯৪৬ সালে তেভাগা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ কাঁপিয়ে তুলেছিল।

কৃষকদের এই বিরাট পরিবর্তনের পিছনে ছিল পার্টির নেতা ও কমরেডদের মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান ও তা প্রয়োগের ক্ষমতা এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রতি তাঁদের অটল বিশ্বাস। তাঁরা কৃষকদের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন। কৃষকদের ভাগ্যের সাথে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করে দিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী।

কৃষকদের কাছ থেকে হোক আর অন্য কারও কাছ থেকে হোক সাড়া পেতে হলে দরকার তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করা, তারা নিজেদের সম্বন্ধে কী চিন্তা-ভাবনা কবেন, তাদের অন্তরের ব্যথা কোথায় তা জানা এবং সেই ব্যথায় হাত দেওয়া। সেই ব্যথায় হাত পড়লে তাঁরা সাড়া না দিয়ে পারেন না। পার্টির এই উপলব্ধিতে, পার্টি ও কৃষক কর্মীরা গ্রামে কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে লাগেন এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় কর্মীরা বুঝতে পারেন গরিব ভূমিহীন আধিয়ার কৃষকরা জোতদারদের শোষণ ও জুলুমে অতিষ্ঠ এবং তা থেকে তারা মুক্তি কামনা করেন। কিন্তু তাদের কাছে প্রশ্ন, কে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে আর পথ দেখাবে!

তখনকার দিনের এক পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় তৎকালীন যুক্তবাংলার শতকরা চৌষট্টি ভাগ জমি ছিল দেশের শতকরা চোদ্দো জনের হাতে। দিনাজপুরে জোতদারদের হাতে জমির পরিমাণ জেলার মোট জমির চৌষট্টি ভাগের চেয়েও ঢের বেশি ছিল। বহু জোতদারের পাঁচ-ছয় হাজার বিঘা পর্যন্ত জমি ছিল। এক হাজার-দুই হাজার বিঘা জমির মালিক দু-চার জন প্রায় প্রতি গ্রামেই ছিল। ভূমিহীন গরিব কৃষকের সংখ্যা শতকরা সত্তর ভাগ ছিল।

জোতদারদের পক্ষে কোনও কায়িক পরিশ্রম করার কথাই আসে না। নিজে হাল-গোরু রেখে মজুর খাটিয়ে চাষ করানোও তাদের দ্বারা হত না। মজুরদের পিছনে পিছনে থাকতে হয়। তা না হলে তারা ফাঁকি দেয়। প্রত্যেকটি জোতদারের জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়ানো। রোজ রোজ মজুরদের পিছনে আজ এখানে কাল ওখানে ঘোরা জোতদারের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই জমি আধি দেওয়াই তারা সুবিধা মনে করত। আর এদিকে ভূমিহীন গরিব কৃষকদের জমি আধি নেওয়া ছাড়া বেঁচে থাকার অন্য পথ ছিল না। দেশে তখন শিল্প ছিল না। দিনাজপুরে খেতমজুরের সংখ্যা কম ছিল এ কারণেই।

জোতদাররা উৎপাদনের জন্য কোনও রূপ ক্যাপিটাল বিনিয়োগ করত না। হালগোরু, সারবীজ এবং হালচাষ, নিড়ানি, ফসলকাটা ও তা যেরূপে হোক আর যতদূরেই হোক জোতদারের বাড়িতে বা তার নির্দিষ্ট কামাত-এ বয়ে নিয়ে যাওয়া, ফসল মাড়ানো, জোতদারের গোলায় ফসল তুলে দেওয়া ইত্যাদি মেহনত ছিল আধিয়ারের। জোতদার অর্ধেক উৎপন্ন ফসল নিত। কোনও কোনও জায়গায় জোতদারের হিস্যা ছিল উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ। এ ছাড়া জোতদাররা সেলামি এবং বহু রকম আবওয়াব আধিয়ারের কাছ থেকে আদায় করত। এই সব আবওয়াব ছিল, খোলানি (জোতদারের যে জায়গায় ফসল মজুত হত ও মাড়াই হত তার ভাড়া), বরকন্দাজি (আধিয়ারকে ডাকাডাকি করার জন্য নিযুক্ত লোকের বেতন), ঝাড়ুদারি (খোলান পরিষ্কার রাখার জন্য লোকের মজুরি),

পাহারাদারি (ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য লোকের বেতন) ওজনি (ফসল ওজনকারীর পারিশ্রমিক) ইত্যাদি। সেলামি (নগদ টাকায়) এবং আবওয়াবগুলি আধিয়ারের অংশের ফসল থেকে আদায় হত।

জোতদাররা শুধু জোতদারি করত না। তাদের মহাজনিও ছিল। তারা আধিয়ারকে ধান কর্জা দিত এবং আধিয়ারকেও ধান কর্জা নিতে হত। আধি করে যে-ধান আধিয়ার পেত তাতে তার বৎসরের তিন মাসও চলত না। কর্জা-ধানের সুদ ছিল 'দুনা' অর্থাৎ, এক মনে দুই মন। কোনও কোনও জোতদার ধান কর্জা না দিয়ে আধিয়ারের কাছে চলতি বাজার দরের চেয়ে দুই গুণ দামে বিক্রি করে দিত। মূল্যের টাকা বাকি থাকত এবং নতূন ধান উঠলে সেই টাকার নতুন ধান জোতদারকে দিতে হত। নতুন ধান উঠার সময় ধানের দর সাধারণত খুব কম থাকে। এতে জোতদাররা সুদে ধান-কর্জা দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি লাভবান হত।

এরূপ শোষণের পরেও আধিয়ারের রেহাই ছিল না। তাকে জোতদারের বাড়িতে সময় অসময় বেগার খাটতে হত। কোনওরূপ অবাধ্যতা দেখালে তার উপর চলত মারধোর, শারীরিক নির্যাতন। তদুপরি আধি-জমি থেকে উচ্ছেদ আর জোতদারের জমিতে যদি তার বসতবাটী থাকত তা হলে তাকে ঘর ছেড়ে পালাতে হত।

গ্রামে জোতদাররা ছিল এক একজন রাজা মহারাজা। গ্রামে তাদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। থানার পুলিশ আমলারা ছিল তাদের সহায়। গ্রামের গরিবদের জীবন নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলত। এখানে বালিয়াডাঙ্গি থানার দুজন প্রবল প্রতাপান্বিত জোতদারের কথা উল্লেখ করতে হয়। তাদের প্রবল প্রতাপের জন্য সেই অঞ্চলের লোকেরা এক জনের নাম দিয়েছিল বড় খোদা; আর একজনের ছোট খোদা।

১৯৩৮ সালে চাষি খাতক আইন কার্যকরী হওয়ার ফলে জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও জুলুম বহুলাংশে কমে যায়। তা সত্ত্বেও জমিদার ও জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের বিশেষ করে মাঝারি ও গরিব কৃষকদের তীব্র বিক্ষোভ ছিল। হাট-বাজারে ও মেলায় জমিদার আমলাদের দৌরাত্ম্য গরিব কৃষকদের উপর পুরোদমে ছিল। তারা সামান্য কিছু জিনিসপত্র হাট-বাজারে বা মেলায় বিক্রি করতে নিয়ে গেলে তাদের কাছ থেকে তাদের সাধ্যের বাইরে খাজনা বা তোলাবটি আদায় করা হত। এখানেও ছিল কৃষকদের বিক্ষোভ। জমির খাজনার জন্য 'সার্টিফিকেট প্রথা' কৃষকের উপর জুলুম ছিল।

১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ফলে যুক্ত বাংলার কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে। তাঁদের উৎপন্ন ফসলের দাম অর্ধেকেরও নীচে নেমে আসায় জমিদারের খাজনা ও মহাজনের ঋণ শোধ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ এলাকায় খাতক কৃষকরা মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অন্যান্য জায়গাতেও কৃষক অসন্তোষ দেখা দেয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার কৃষকদের অবস্থার তদন্ত-প্রতিকারের জন্য ফ্লাউড সাহেবের নেতৃত্বে একটি কমিশন বসায়। কমিশন খেসারতসহ জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও আধিয়ারকে জমির উপর দখলি স্বত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেন।

এবার পার্টি একটা আন্দোলনের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। দিনাজপুর কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পরেই পার্টি দিনাজপুর জেলা কৃষক সমিতির নামে বিভিন্ন জায়গায় লিফলেট ছড়ানো শুরু করে। লিফলেটে ছিল, কৃষক সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ছিল জমিদার, জোতদার ও মহাজনের শোষণের কাহিনী কৃষকদের দুর্দশার কথা ও কারণ এবং

জমিদার, জোতদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে কৃষকদের এক হয়ে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান। তাতে বিভিন্ন জায়গায় কৃষকদের তরফ থেকে সভা করার ডাক আসতে লাগল এবং সভা মিটিংও হতে লাগল এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষক সমিতি গড়ে উঠতে লাগল। আটোয়ারি থানাতেই কৃষক সমিতি প্রথমে জোরদার হয়ে উঠে এবং সেখানে বালিয়া ইউনিয়নে প্রথম 'কৃষক সমিতির' অফিস স্থাপিত হয়। কমরেড রামলাল, বাধাল, ডুলিরাম, গেদেরা মহম্মদ এঁদের চেষ্টাতেই তা সম্ভব হয় এবং এঁদের চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই অতি দ্রুত বালিয়াডাঙ্গি থানা ও ঠাকুরগাঁও থানার পশ্চিমঅঞ্চলে কৃষক সমিতি প্রসার লাভ করে। তাঁবা সবাই ছিলেন আধিয়ার কৃষক।

১৯৩৯ সালের মে মাসের প্রথম দিকে ফুলবাড়ি থানার লালপুর ডাঙ্গায় একটি কৃষক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। সেই সম্মেলনে কমরেড মুজফ্ফর আহম্মদ, কৃষক প্রজাপার্টির এম. এল. এ. বোকাইনগরী সাহেব এবং রংপুরের প্রখ্যাত কৃষক নেতা কমরেড দীনেশ লাহিড়ী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে জমিদারি প্রথা, বিনা খেসারতে উচ্ছেদ এবং জোতদারদের শোষণ, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনের পর পার্টি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। পার্টি ও কৃষক কর্মীদের কৃষক সমিতির বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন গড়ে তোলার ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হল। ষোলো দফা দাবি সম্বলিত একটি প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করা হতে লাগল। ইতিপূর্বে পার্টি ও কৃষক কর্মীরা গ্রামে গ্রামে কৃষক সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ, মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনা করে তাঁদের সমস্যা ও তাঁদের চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তারই ভিত্তিতে ওই দাবিগুলি রচিত হয়। মোটামুটি দাবিগুলি ছিল, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করো, নিলামি জমি কৃষককে ফেরত দাও, হাটে বাজারে তোলাবটির জুলুম বন্ধ করো, 'সার্টিফিকেট' প্রথা বাতিল করো, লাঙল যার জমি তার, কৃষকের সমস্ত ঋণ মকুফ করো, বেগার প্রথা বন্ধ করো, জোতদারের জুলুম চলবে না, কর্জা-ধানের সুদ নাই, সকল প্রকার আবওয়াব বন্ধ করো, কোনও সেলামি নেওয়া চলবে না, আধিয়ারকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না, আধিয়ারকে নিজ খামারে ধান তুলতে দিতে হবে, ইউনিয়ন বোর্ডে নমিনেশন প্রথা বাতিল করো, গরিব কৃষকের চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ করো, কৃষকের পানীয় জলের ব্যবস্থা চাই ইত্যাদি।

পার্টি কর্মীরা দিনের পর দিন কৃষকদের মধ্যে থেকে কৃষকদের ওই দাবিগুলি ও তার যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের নিয়ে রাজনৈতিক ক্লাসও শুরু কবলেন। রাজনৈতিক ক্লাসে কৃষকদের বোঝানো হত রাষ্ট্রশক্তি কী জিনিস, কার সেবক, কার রক্ষক। জমিদার জোতদার কীভাবে আসল। কীভাবে তারা কৃষকদের ঠকায়, লুঠ করে: ধনীদের শক্তি কেমন! কীভাবে সরকার তাদের সমর্থন করে। কেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বদল করা দরকার! কেন আমাদের প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। শুনানো হত—কী করে* বিভিন্ন দেশে কৃষকরা একজোট হয়ে সংগ্রাম করে নিজেদের দাবি আদায় করে নিয়েছে। বুঝানো হত—এ দেশেও কৃষকরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তা হলে এ দেশেও কৃষকরা জমিদার, জোতদার ও মহাজনদেব শোষণ ও জুলুম থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং এ দেশেও

* রুশদেশে কৃষক-শ্রমিকরা একজোট হয়ে সেখানে বাজা, জমিদাব ও ধনীদেব বিরুদ্ধে লড়াই কবে কৃষক-শ্রমিকবাজ কায়েম কবেছে এবং সকল বকম শোষণ হতে নিজেকে মুক্ত করেছে।

শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েম করতে পারে। এই রাজনৈতিক ক্লাস কৃষকদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাঁরা আন্দোলনে নামার চিন্তা করতে লাগলেন। 'কমরেড' শব্দটি ও 'ইনক্লাব' শব্দটি তাঁদের মধ্যে চালু হল। পরস্পর পরস্পরকে 'কমরেড' বলে সম্বোধন করা এবং একজনের সঙ্গে আর একজনের দেখা-সাক্ষাৎ হলে 'ইনক্লাব' বলে সম্ভাষণ জানানো শুরু হল। পরস্পর ভ্রাতৃভাব দেখা দিল।

পার্টি এখন আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে যে কোনও লড়াই হোক, যেতে হলে বিবেচনা করতে হয় নিজেদের শক্তি, নিজেদের প্রস্তুতি, কারা মিত্র হতে পারে, বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধাসমূহ এবং অপর দিকে শত্রুর শক্তি, কারা শত্রু পক্ষে যোগ দিতে পারে ইত্যাদি। আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই। অবস্থা সঠিক নির্ণয় করতে না পারলে হিতে বিপরীত হতে বাধ্য।

কৃষকরা তখন সবেমাত্র সংগঠিত হতে শুরু করেছে। তাদের রাজনৈতিক চেতনা কেবল উন্মেষ লাভ করেছে। অভিজ্ঞতারও ছিল অভাব। এই অবস্থায় পার্টি কোনও বৃহৎ ইস্যু নিয়ে আন্দোলনে যাওয়া সমীচীন মনে করলেন না। পার্টি ভাবলেন সেরূপ কোনও আন্দোলনে গেলে সরকারের সঙ্গে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে এবং সরকারের দমন নীতির কাছে নতুন সংগঠন ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। কৃষকদের মধ্যেও প্রথম অবস্থায় মনোবল নষ্ট হয়ে গেলে তা আবার ফিরিয়ে আনা কষ্টকর হবে। তাই পার্টি স্থানীয় ছোটখাটো সমস্যা, অন্যায়-অবিচার ইত্যাদি নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। কোথাও গোরুর মড়ক লেগেছে, পার্টি কৃষকদের একজোট করে মিছিল করে কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে তার প্রতিকার দাবি জানিয়ে আসল। কোথাও প্রাকৃতিক কারণে ফসল নষ্ট হল কৃষকদের মধ্যে খাদ্য সংকট তীব্র আকার নিল—সেখানে পার্টি কৃষকদের জমায়েত করে মিছিলসহ কর্তৃপক্ষের কাছে রিলিফের দাবি করে জানিয়ে আসল। কোনও গ্রামে কোনও ধনী ব্যক্তি কোনও কৃষকের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করল অমনি কৃষকরা দল বেঁধে গিয়ে অন্যায়কারীর নিকট প্রতিকারের দাবি করল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিকারের দাবি জানাতে গিয়ে ধনী ব্যক্তি থানার সাহায্যে কিছু কৃষককে গ্রেফতার করিয়ে মহকুমায় পাঠালে গ্রামসুদ্ধ কৃষকেরা মিছিল করে মহকুমা হাকিমের নিকট গিয়ে তাদের মুক্তির দাবি জানাল। এতে কৃষকরা কিছু কিছু সুফলও পায় এবং নিজেরা কৃষক সমিতি সম্বন্ধে উৎসাহিতও হয়। তাঁদের একতার জোরে দাবি আদায় যে সম্ভব, এই উপলব্ধিও আসে এবং তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখা দেয়। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব গাঢ়তর হতে থাকে। কৃষক সমিতি বাড়তে থাকে।

পার্টি এরপর হাটে, বাজারে ও মেলায় তোলাবটি এবং গোরু, মহিষ ও ছাগল বিক্রির জন্য উচ্চহারে খাজনা বা লেখাই আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মনস্থ করেন। এর মধ্যে কৃষকরা কৃষক সমিতির মধ্যে কিছুটা সুসংবদ্ধ হয়েছেন। কৃষকদের মধ্য থেকে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হল। প্রত্যেক ভলান্টিয়ারের হাতে একখানা করে বাঁশের লাঠি থাকল। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসের দিকে বীরগঞ্জ থানার ডেমডেমি কালীর মেলায় প্রথম ভলান্টিয়ার বাহিনী নামল। তাদের শ্লোগান ছিল, কৃষকের দ্রব্যের তোলাবটি নাই, গোরু, মহিষ, ছাগলের লেখাই কমাতে হবে। জমিদারের আমলা, বরকন্দাজরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষকরা তোলাবটি ও গোরু, মহিষ এবং ছাগলের লেখাই দেওয়া বন্ধ করে। অন্যান্য বিক্রেতারাও কৃষকদের অনুসরণ করে। জমির খাজনা না দিলে আইন আদালতের আশ্রয় নেওয়া চলত। কিন্তু হাট মেলার তোলাবটি না দিলে বা গোরু মহিষ ছাগলের লেখাই

না দিলে তা আদায়ের জন্য আইন-আদালতের আশ্রয় নেওয়ার কোনও আইন ছিল না। অবস্থাটা ছিল 'জোর যার মুলুক তার।' সংঘবদ্ধ কৃষক ও জনতার কাছে জমিদারের লোকেরা অসহায় হয়ে পড়ল। কৃষকদের জয় হল। বিক্রিত গোরু মহিষ যাতে চোরাই গোরু মহিষ বলে কেউ ধরতে না পারে তার জন্য কৃষক সমিতির সিল ও টিকেট যুক্ত রসিদ দেওয়া হত।

ডেমডেমি কালীর মেলা থেকে এই আন্দোলন আটোয়ারি থানায় আলোয়াখোয়া মেলায় ছড়িয়ে গেল। সেখানকার কৃষকরা ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরি করে একই পদ্ধতিতে তোলাবটি, গোরু, মহিষ বিক্রির লেখাই বন্ধ করে। সেখানেও কৃষকদের জয় হয়। এরপর জেলার বিভিন্ন থানার মেলাতেও একটার পর একটা, একই ঘটনা ঘটতে থাকে। মেলাগুলিতে গোরু-মহিষ লেখাই বাবদ জমিদাররা প্রচুর টাকা আয় করত। সে বৎসর জমিদাররা সেই আয় হতে এইভাবে বঞ্চিত হয়।

মেলার পর হাট বাজারগুলিতে এই আন্দোলন শুরু হয়। জমিদাররা বাধা দিতে থাকলে সেই অঞ্চলের কৃষকরা জমিদারের হাট বয়কট করে পার্শ্বে কৃষকের জমিতে হাট লাগাতে থাকে। এই পর্যায়ে জমিদাররা কৃষক সমিতির সঙ্গে একটা আপস রফায় আসে। এই আপস রফায় স্থির হয় কৃষকরা ঘাড়ে বা ভারে করে যে জিনিস বেচতে নিয়ে যাবে তার তোলাবটি লাগবে না, আর গোরু ছাগলের লেখাই-এর হার অর্ধেক হবে এবং তা শুধু ক্রেতার কাছ থেকে আদায় হবে। জেলার প্রত্যেক হাটে এই নিয়ম চালু হল।

এই সব আন্দোলনে শহরের মধ্যবিত্ত, গ্রামের জোতদার প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন ছিল। কারণ এ আন্দোলন ছিল জমিদারেব বিরুদ্ধে এবং এতে সামান্য হলেও তারাও লাভবান ছিল। সম্ভবত আন্দোলনে এদের সমর্থন থাকার জন্য সরকার কৃষকদের বিরুদ্ধে দমননীতি চালাতে সাহস করে নাই।

এই অভূতপূর্ব আন্দোলন চতুর্দিকে এইভাবে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিতে একসময় তা স্তিমিতও হয়ে পড়ল।

তে-ভাগার দাবি আদায় হয় নাই। কিন্তু দাবির ন্যায্যতা সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। কৃষকদের বীরত্বের কাহিনী শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রেরণা। তেভাগার শহিদদেব নাম কৃষক-শ্রমিকের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ওই সব বীর শহিদদের প্রতি জানাই লাল সেলাম।

তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা

ননীগোপাল দাস মহন্ত

১৯৩৯ সালে সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষ ব্রিটিশ শাসকের শোষণে এবং শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে একটা কিছু পরিবর্তন চাইছেন রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতার। ভারতের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল তখন কেবলমাত্র কংগ্রেস, ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পুষ্ট এই দল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে দেশ থেকে ব্রিটিশ শোষণের অবসান করতে চায়। কৃষকদের নিজস্ব কোনও সংগঠন ছিল না যার দ্বারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলন চলতে পারে। ঠিক ওই সময়েই অবিভক্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেল থেকে সন্ত্রাসবাদী নামে পরিচিত ব্যক্তিরা মুক্তি পেতে থাকেন। জেলে থাকাকালীন তারা চিন্তায় আনেন যে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও কৃষকশ্রেণীর মৈত্রীতে ব্যাপক গণ আন্দোলন ছাড়া সম্ভব নয়। তাই, সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন জেলাতে কৃষক সংগঠন গড়ার কাজ শুরু হল। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলা অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশ অনগ্রসর। ওই জেলার কৃষকরা শত অত্যাচারেও নির্বিকার। অন্যায়ের বিরুদ্ধ আচরণেও দ্বিধাগ্রস্ত। জেলার কৃষক সংগঠন ওই জেলার সবচাইতে দুর্বল এবং অত্যাচারিত জায়গাগুলিতে ঘুরে ঘুরে কৃষকদের দুঃখের কাহিনীগুলি শুনতে লাগলেন। ওই জেলার ফুলবাড়ি থানার লালপুরডাঙায় অনুষ্ঠিত জেলা সম্মেলন থেকে আওয়াজ দেওয়া হল, সমস্ত কৃষক এক হও, দুনিয়ার কৃষক-শ্রমিক এক হও, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই, লাঙল যার জমি তার, বেআইনি আবওয়াব বন্ধ করো, হাটে বাজারে তোলাবটি আদায় বন্ধ করো, ইজারাদারের জুলুম বন্ধ করো, বেগার প্রথা বন্ধ করো ইত্যাদি আওয়াজের ভিত্তিতে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগে এবং সংগঠন কৃষক সমিতি নামে আত্মপ্রকাশ করে। ওই সমিতির ভলান্টিয়ারদের মধ্যে লড়াকু মনোভাবাপন্ন কৃষক কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদে সামিল করা হল। ঠাকুরগাঁও, বোঁচাগঞ্জ, কাহারুল ও লাহিড়ীহাটের তোলাবটি আন্দোলন সফল হয় এবং ইজারাদারদের প্রায় লুপ্ত হয় বলা চলে। লালপুরে সংগঠিত জলকরের আন্দোলনও সফলতা লাভ করে। এখানে কৃষকরা বিনা কর-এ যমুনা নদী থেকে মাছ ধরার অধিকার আদায় করে। ফলে, কৃষক সমিতি ওই জেলাতে কৃষকের একমাত্র বন্ধু রূপে চিহ্নিত হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় দেশে কালোবাজারি ও মুনাফাকারের রাজত্ব কায়েম করে বসে। এর দরুন অনাহারে বহু কৃষকের প্রাণহানি ঘটে। বহু নারী শিশু বিক্রি হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও কৃষক সমিতিগুলি খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত করেন এবং খাদ্যকমিটির মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ ও গঠন অভিযান পরিচালনা করেন। সভাসমিতির প্রতি নিষেধ নির্দেশ থাকায় ও কর্মীদের আত্মগোপন করতে হওয়ায় কৃষক আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ১৯৪০ সালে সংগঠিত সারা ভারত কিষাণ সম্মেলন থেকে আওয়াজ ওঠে তেভাগা আন্দোলনের।

পরিশেষে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে তার গুরুত্ব স্বীকৃত হয় এবং জেলা সংগঠনগুলিকে আন্দোলন পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। যুদ্ধের দামামা ও ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ তখন দিশেহারা।

১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন দেশে এক রাজনৈতিক অস্থিরতা এনে দিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র দেশ থেকে নিরুদ্দেশ। জাপানি ফ্যাসিবাদ দেশে আসছে বলে তাকে রোখা দরকার। সমিতিগুলি তখন আওয়াজ তুলল জাপানকে রুখতে হবে, ফ্যাসিবাদ নিপাত যাক। ওই আওয়াজের মাধ্যমে বৃহত্তরের লড়াইয়ের জন্য কৃষক সংগঠনগুলিকে সজীব করার প্রয়াস চলতে থাকে। ওই রকম অবস্থায় প্রায় পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়।

১৯৪৬ সালে ধান কাটা শুরু হয় গ্রামাঞ্চলে। দেশে তখন সোহরাবর্দি মন্ত্রিসভা এবং তিনিই মুখ্যমন্ত্রী, মুসলিম লিগ দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ওই সময় সারা জেলাব্যাপী তেভাগা আন্দোলনের প্রচার ও সমাবেশ শুরু হয়। তেভাগা যে কৃষকের প্রাণের দাবি তা বুকের রক্তে প্রমাণ হয়েছে। আওয়াজের সার্থকতা—'জান দিব তবু ধান দিব না', 'নিজ খোলানে ধান তোলো', 'তেভাগা আইন চালু করো' ইত্যাদি এবং ব্রিটিশ রাজ নিপাত যাক—ওই শ্লোগানও যুক্ত হয়েছিল। প্রতিটি সভা ও সমাবেশে হাজারে হাজারে কৃষক জমায়েত হতে থাকে। সমিতির সভ্য হবার কী এক অদ্ভুত উন্মাদনা। এর মূল কারণ ছিল চাষিরাই চাষের সম্পূর্ণ খরচ বহন করে এবং ধান বীজের বেলায় তারা যা পায় তা দেনা পরিশোধেও কুলায় না। ফলে, ডালি-কুলা নিয়ে হালের বলদ লিখে দিয়ে পরের বছরের আবাদের অপেক্ষায় থাকতে হয়।

ওই আন্দোলনে বেশিরভাগ পলিয়া-রাজবংশী-সাঁওতাল-কোলকামার এবং গরিব মুসলমান কৃষকরা সামিল হয়েছিল। দিনমজুর কৃষকরা ওই আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্বে ছিল। কৃষকরা সর্বদাই সশস্ত্র তির ধনুক লাঠি ইত্যাদি হাতে নিয়ে জমায়েত সামিল হত এবং ভাগচাষিদের সাহস জোগাত। জোতদার পক্ষ পুলিশের আশ্রয় ছাড়াও গুণ্ডাবাহিনীর মাধ্যমে তাদের উৎপীড়ন করতে পারত। আন্দোলনের জন্য স্বল্প জমির মালিকরা নিরপেক্ষ না থেকে আতঙ্কে জোতদারদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন। এটাই ছিল আন্দোলনের দুর্বলতা। ওই সময় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি জমিদার-জোতদারদের বক্তব্যই প্রকাশ করত। আন্দোলন দমনে তারা সরকারকে উত্তেজিত করত। আমাদের জেলার প্রবীণতম কংগ্রেস নেতা নিশীথনাথ কুণ্ডু কাগজে আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। সংবাদপত্রে তার বিবৃতি প্রচারের কিছুদিনের মধ্যেই চিরির বন্দরে দু জন কৃষক গুলিতে নিহত হয়। ওই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে থাকায় কৃষকরা চঞ্চল হয়ে উঠে এবং আন্দোলনের গতি প্রবল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে পরিণত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত বলছি এই কারণে, যে সব জায়গাতে কৃষকরা সংগঠিত নেতৃত্বের আওতায় ছিল না সে সব জায়গায় কৃষকরা নিজেরাই সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। এরকম কৃষক জাগরণ ইতিপূর্বে জেলাতে আর দেখা গিয়েছে বলে জানা নেই।

বালুরঘাট থানার রহিমানুর গঞ্জ ইউনিয়নের খাঁপুর গ্রাম ছিল একটি জমিদার প্রধান গ্রাম। বাকি সব জোতদার, ছোট জোতদার, মাঝারি কৃষক, আধিয়ার ও দিনমজুর। ওই গ্রামে নেতৃত্বে ছিলেন চিয়ারসাই শেখ (দিনমজুর), গুরুচরণ বর্মণ (দিনমজুর), হোপন মার্ডি (বর্গাদার), মাঝি সারন (বর্গাদার), দুঃখনা কোলকামার (দিনমজুর), ভবানী বর্মণ (বর্গাদার)। আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল পাতিরাম। ওই অঞ্চলে কোথাও সাঁওতালদের ডুগডুগি

বাজলেই বুঝতে হবে কৃষক জমায়েত হতে হবে। ডুগডুগি বাজানোয় জোতদারদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় আর কৃষকের মনে আনে সংগ্রামী প্রেরণা। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সাল। একদল সশস্ত্র পুলিশসহ জেলার সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পতিরামের জমিদার বাড়ির ধান লুঠ হবে আশঙ্কায় সংবাদ পেয়ে ওই অভিযানে আসেন এবং গুলি চালনার জন্য পতিরাম বিদ্যেশ্বরী মণ্ডপের সামনে সারিবদ্ধভাবে বন্দুক নিশানা করে দাঁড়িয়ে যান। ওই সময় কৃষকরা জোতদারের খোলানে উঠানো আধিয়ারের নিজ নিজ ধান বাড়ির খোলানে নিয়ে যায়। অফিসার এগিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কার ধান নিয়ে যাচ্ছ? কৃষকরা উত্তর দেয়, নিজ নিজ উৎপাদিত ধান নিজ খোলানে নিয়ে যাচ্ছে। এতে পুলিশ বাধা দিতে গেলে কৃষকরা উত্তর দেয়, 'সশস্ত্র প্রিয় পুলিশ বন্ধুরা, তোমাদের হাবিলদার কমল তৈওয়ারি তোমাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য অনশন করছে, যাকে তোমরা রুটির লড়াই বলছ। আমরা নিজ নিজ ধান তে-ভাগ পাবার আশায় রুটির লড়াই করছি, তোমরা যদি মনে কর আমাদের অধিকার নেই তবে গুলি চালাতে পার।' সেদিন সশস্ত্র পুলিশের বন্দুক কৃষকের বুকে গর্জে উঠতে পারল না। বেকায়দা বুঝে সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তার পুলিশ দল নিয়ে চলে যাবার সময় বললেন, আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারা আলোচনায় বসবেন ও মীমাংসা করবেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি কোনও আলোচনা হল না। ওই দিন রাত্রিতে অর্তকিতে হানা দিয়ে পুলিশ কৃষ্ণদাস মহন্ত, শরৎচন্দ্র বর্মণ, বিশ্বরঞ্জন দাস, খোকা মিত্র, মুচু হেমরম, জকবা মরমু প্রভৃতি দশ-বারো জন কৃষক নেতাকে গ্রেপ্তার করল। এর দরুন, কৃষক সাধারণ উত্তেজিত হয় এবং সভা করে পুলিশের ওই কাজের নিন্দা করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি খাঁপুর গ্রামে একটি বড় সভা ঘোষণা করা হয়। ওই সভায় প্রাদেশিক কৃষক নেতা ভবানী মুখার্জি কলকাতা থেকে আসবেন। জোতদাররা প্রমাদ গুনলেন যে ওই সভা হলে কৃষকের তেভাগা আন্দোলনের ব্যাপকতা জেলার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। পুলিশ বাহিনীর ওসি ফণিপাঠকের নেতৃত্বে ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে হানা দিয়ে গোপেশ্বর দাম, খোকা বর্মণ, রসগোনা কোলকামার, নাড়ু কোলকামার প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে ও মারধোর দেয় এবং ওই সব কৃষকের বাড়ির মেয়েদেরকে গালিগালাজ ও ধাক্কাধাক্কি করে। ওই সংবাদ পাওয়ামাত্র ডুগডুগি বেজে ওঠে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই খাঁপুর গ্রামে লোক জমায়েত হতে থাকে। কৃষকরা স্থির করে রাস্তা কেটে গাড়ির গতিরোধ করবে এবং তাদের প্রিয় ধৃত নেতাদের মুক্ত করবে। কমরেড নীলমাধব দাসের স্ত্রী যশোদা গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দারোগাবাবুর নির্দেশে পুলিশ তার চুলের গোছা ধরে চড় কিল লাঠি মারলে জনতা মারমুখী হয়ে ওঠে। পুলিশ তখন যশোদার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। যশোদা গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পুলিশ গাড়ি নিয়ে এগোবার চেষ্টা করে। এর মধ্যে গর্তে গাড়ি পড়ে গেলে তার গতিরোধ হয়। গাড়ির চারপাশে জনতা জমায়েত হচ্ছে দেখে পুলিশ নিশানা করে বেছে বেছে নেতাদের হত্যা করে। ওই স্থানে চোদ্দো জন কৃষক নেতা তৎক্ষণাৎ মারা যান, বাকি আট জন হাসপাতালে মারা যান। ওই আট জন অর্ধমৃত অবস্থাতে ছিল। পুলিশ মৃতদেহগুলি লাকড়ি ফেলার মতো ছুড়ে ছুড়ে গাড়িতে ফেলে দেয় এবং একটির উপর একটি একটি করে চাপিয়ে দেয়। ওই অবস্থাতে বালুরঘাট হাসপাতালে পৌঁছানো মাত্র এবং কেউ কেউ রাস্তায় প্রাণ হারান। গুলির শব্দ শোনামাত্র খাঁপুর গ্রামের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি বাড়ি থেকে গুলি চালান যাতে কৃষকরা ওই পথে যেতে না পারে। সেখানেই কৈলাশ ভুঁইমালির মৃত্যু হয়।

ঘটনার দিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে কৃষকরা জমায়েত হতে শুরু করে। ফুলবাড়ি থেকে কৃষকরা বেলা বারোটার মধ্যে আঠারো মাইল পথ পায়ে হেঁটে সভায় যোগ দিতে আসে। বেলা ৩টার মধ্যে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার কৃষক সমাবেশ হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়—তেভাগার দাবি আদায় করতেই হবে। কোনও জোতদারের ক্ষমা নেই। নেতৃস্থানীয় কর্মীদের আত্মগোপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনার দু দিন পরে খাঁপুর গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসে। জোতদাররা পুলিশের সাহায্যে কৃষকদের বাড়ি থেকে ধান জোর করে নিয়ে যেতে থাকে, কৃষকদের ওপর শুরু হয় প্রবল অত্যাচার। ওই সময় গ্রামের পুরুষমানুষ ছ' মাস পর্যন্ত রাত্রিতে মাঠে-গাছতলায় ঘুমিয়েছে। আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে আসে। বিধানসভায় গুলি চালনার সংবাদ স্বীকৃত হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস। দেশবিভাগের ফলে দিনাজপুর জেলা দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। কৃষক সংগঠনও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ব্রিটিশ সরকার পাততাড়ি গোটালেন। ১৪ই আগস্ট রাত্রিবেলায় আত্মগোপনকারী কৃষক ও কৃষক নেতারা আত্মপ্রকাশ করলেন। ১৫ই আগস্ট কৃষক জমায়েত হল। তাতে ঘোষণা করা হল—এই স্বাধীনতা ভুয়ো স্বাধীনতা, ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতায় শ্রমিক-কৃষকের স্বাধীনতা আসবে না।

রংপুরের তেভাগা সংগ্রামের কথা

মণিকৃষ্ণ সেন

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আমরা যোগ দিইনি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিইনি এককথায় বললে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থেকে যায়। মাত্র সতেরো বৎসর বয়সেই ইংরাজ ভারত ছাড়ো এই ব্রত উদযাপনে বুকের রক্তে শপথ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু ৪২-এব ভাবত ছাড়ো—প্রয়োগক্ষেত্রে হয়েছিল তদানীন্তন অক্ষশক্তি (জাপানের) সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা। কারুর দেশপ্রেমে কটাক্ষ না করে আজ নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে যে, ওটা ছিল মারাত্মক রকমের একটা ভুল পথ।

এর চুলচেরা বিচার না করেও খুব সহজেই বলা যায় যে, অন্যান্য বহু দেশের মতোই 'ভারতের স্বাধীনতা' তাৎক্ষণিকভাবে হিটলারের বুটের নীচে প্রচণ্ড মার খেত।

তখন জনযুদ্ধের যুগ। পঞ্চাশের মন্বন্তরে রংপুরের কয়েক লাখ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারিয়েছেন। ওই সময়ে পার্টির নেতৃত্বে দেশি বিদেশি সাহায্যে সাধ্যমতো ত্রাণকাজ করা হয়। জেলার তিন শতেরও বেশি দুগ্ধকেন্দ্র থেকে প্রতি দিন হাজার হাজার মাতা ও শিশুকে বিনা মূল্যে দুধ বিতরণ করা হত। দুধটা অবশ্য আমেরিকার অনুদান। তবে পরিচালনার দায়িত্ব ও আনুষঙ্গিক খরচাদির দায়িত্বে ছিলেন প্রধানত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। জেলা সমিতিতে কিছু লিগ নেতা যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসি মনোভাব ছিল মারাত্মক রকম বিরুদ্ধে। প্রয়াত কিরণশঙ্কর রায় কথাপ্রসঙ্গে একদিন আমাকে বলেন, 'রিলিফ! বলেন কী? সরকারেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি!' পরে ডা. বিধান রায়ের নেতৃত্বে একটি B. M. R. C. C. মেডিকাল রিলিফ সমন্বয় কেন্দ্র খোলা হয়। তাতে পার্টির সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

শহরে, বন্দরে ও গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার প্রাথমিক উদ্যোগে পার্টির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সংকটের ব্যাপকতা ও গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারি সাহায্য আসে। তখন শুরু হয় চুরি। লঙ্গরখানার সঠিক পরিচালনায় পার্টি কমরেড ও কিছু উদারমনা ব্যক্তির কুণ্ঠাহীন ও বিরামহীন সমর্থন পাওয়া গিয়েছে। তদুপরি দুটি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়। রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরিচালনায় একটি (হাড়িয়ার কুটি) কেন্দ্র প্রায় দু' বৎসর কাল সময় বিনা মূল্যে চিকিৎসা চালায়। জরিপে দেখা যায় দুর্ভিক্ষের পর প্রায় ছ মাস কাল হাড়িয়ার কুটি (সদরে) ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পুষ্টিহীনতায় নতুন সন্তান জন্মে নাই। ডা. নীলকান্ত দত্ত ও কমঃ কালীপদ বর্মণ (ডাক্তার)-এর নাম ওই এলাকার জনসাধারণ এখনও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বর্তমানে সেখানে একটি হাট বসে, নাম 'সেন্টারের হাট'।

দুর্ভিক্ষের পরেই আসে মহামারি আকারে বসন্ত রোগ। সাধারণত এক বারের বেশি বসন্তের আক্রমণ হয় না, প্রতিষেধক শক্তি (Immunity) শরীরে জন্মে। কিন্তু তিস্তা অঞ্চলে কমঃ সুধীর মুখার্জির সঙ্গে ওই অঞ্চল পরিদর্শনে বেরিয়ে একই ব্যক্তিকে তিন বার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা দেখেছি; গ্রামকে গ্রাম উজাড়; বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞাসা করায় মৃতের সংখ্যা

জানানোর জন্য দু-এক জন যারা জীবিত ছিলেন (প্রায় ক্ষেত্রেই আক্রান্ত) অঙ্গুলি দিয়ে কবর দেখিয়ে দিতেন। নতুন, পুরনো কবর গুনে বুঝতে হত মৃতের সংখ্যা।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বসন্ত মহামারিতে বেশি প্রাণহানি হয় শুশ্রূষা ও পথ্যের অভাবে। ওষুধের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। বসন্তের কথা শুনলেই পাড়ার লোক সে বাড়ি আসা-যাওয়া বন্ধ করত। এমনকী বাড়ির লোকও পালিয়ে যেত। মশারির অভাবে মাছি যেমন সংক্রমণ ছড়াত তেমনই ঘা'তে পোকা জন্মাত। এতেও যারা বাঁচত তাদের শরীরে ক্ষত শুকানোর সময় যে মারাত্মক 'টান' ধরত এবং তৈলাক্ত পদার্থের অভাবে সেই 'টানে' তাঁরা মারা যেতেন। গঙ্গাচরা থানার লক্ষ্মীটারির কবিরাজ কমরেড সীতা বর্মণ অ্যান্টিসেপটিক তেল বানিয়ে মহামারি অঞ্চলে থেকে হাজার হাজার রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। কমরেড সীতা বর্মণ নিজ হাতে ঘা থেকে পোকা বের করে, ধুয়ে মুছে তেল লাগাতে সংকোচ বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ কখনও করেননি।

এ সব সত্ত্বেও সামান্য কিছু মুসলিম অঞ্চল ছাড়া ব্যাপকতর মুসলিম কৃষকের মধ্যে আমরা ঢুকতে সমর্থ হইনি। তবে ক্ষত্রিয় কৃষকের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পার্টি ও কৃষক সমিতি প্রবেশে সমর্থ হয়েছিল। সাধারণ ক্ষত্রিয় কৃষক এমনকী স্থানীয় মধ্যস্তরের শ্রদ্ধেয় নেতারা পর্যন্ত কৃষক সমিতি, পার্টি বা উভয় সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারি মহলে কথা ছিল 'প্রতিটি ক্ষত্রিয়ই কমিউনিস্ট'। ১৯৫৪-এর পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্টে 'কমিউনিস্ট' নেওয়া হয় না। পার্টির নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। রংপুরের 'সিডিউল' শমন দুটিই পার্টি পায়। নীলফামারির অভয় পণ্ডিত কপর্দকশূন্য প্রাইমারি শিক্ষক, লড়তে হয়েছিল লিগ সমর্থিত অন্যতম ক্ষত্রিয় বড় জোতদার হিরম্ব রায়ের বিরুদ্ধে। 'যাদু মিঞা—হিরম্ব' জোটের বিরুদ্ধে পার্টির প্রকাশ্য সভা সমিতি করা বা পোস্টার লিফলেটের অর্থ ছিল না। মাত্র আটাশ বৎসরের ব্যবধানে শুধু 'টিচ', পার্টির ক্ষুদ্রপত্র 'টিচ' নিয়ে কমরেড সখারউদ্দিন গোপনে জানিয়ে এলেন, অভয় পার্টির লোক, তাকেই ভোট দিতে হবে। হিরম্ব বহু ভোটে হেরে গেল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর:

পলায়নপর ব্রিটিশ-রণনীতি 'পোড়ামাটি'র নীতির মারাত্মক ফল। 'কর্ডন' প্রথার ফলে খাদ্যশস্য স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ। মহা সুযোগ। নতুন ধনীরা 'হোর্ডিং' (মজুত করা) শুরু করে দিল অবশ্যই অন্যায়ভাবে।

ওই সময় ডোমার থানার ভোগ ভাবরির সংলগ্ন পূর্ণিয়া জেলায় খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না। কিন্তু কর্ডন, আনার উপায় নাই। বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান জোতদারের বাস এই গ্রামে। জনৈক জোতদারের শুধু বাড়ির বাইরের অংশে, ওই সময় নিজে শুনেছি বড় আকারের চোদ্দোটি ধানের গোলা। অথচ মাত্র দেড়-দুই মাইল দূরে ওই গ্রামের প্রান্তে একটা গোটা পাড়া দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভাঙা কুঁড়েঘরে কঙ্কালগুলি রোদবৃষ্টিতে সাদা হয়ে পড়ে ছিল।

নীলফামারি মহকুমায় বড় জোতদারের সংখ্যাও যেমন বেশি তেমনই অনাহারে মৃতের বিভীষিকাও ভয়ংকর। অনাহারে দুর্বল আদম সন্তান খাদ্যের অন্বেষণে হামাগুড়ি দিয়ে বড় রাস্তায় এসে রাতের অন্ধকারে গোরুর গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারাত। মনুষ্যাকৃতি অস্থিচর্মসার মায়েরা চামচিকার বাচ্চার মতো শিশু সন্তান বুকে জড়িয়ে বন্য জন্তুর মতো

খাবারের খোঁজে ঘরবাড়ি ছেড়ে দলে দলে ঘুরে বেড়াত। অনাহারে মৃতপ্রায় নিজ সন্তানের মুখ থেকে খাদ্যকণা কেড়ে নিয়ে মাকে খেতে দেখেছি।

হ্যাঁ, জেলাব্যাপী মজুত উদ্ধার অভিযান হয়েছে কৃষক সমিতি ও পার্টির উদ্যোগে। গাইবান্ধার কমরেড ফজলকে নিজ গোলা থেকে ধান বের করার জন্য তার বাপ তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে রাজেন্দ্রপুরের লঙ্গরখানার 'চোরা চাল' ধরার জন্য কমরেড অন্নদাকে ডাকাতির মামলায় পড়তে হয়।

উপরোক্ত আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাৎসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় এবং দুনিয়াব্যাপী নতুন যুগের সম্ভাবনাময় পরিস্থিতিই মহান তেভাগা আন্দোলনের পটভূমি।

আধিয়ারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

তেভাগার প্রস্তুতিপর্বে স্থানীয় পার্টি ও কৃষক সমিতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমাকে ও কমরেড মোকসেদকে জেলা কমিটির নির্দেশনামাসহ ডিমলা (রংপুরের প্রধান তেভাগার অঞ্চল) পাঠানো হয়। প্রাথমিক আলোচনার পর ভারপ্রাপ্ত কমরেড মহী বাগচী ও স্থানীয় নেতা হরিকান্ত সরকার প্রভৃতি সহ সরজমিন জরিপে যাই।

কাঁচা ও আধপাকা ধানে ঢাকা প্রান্তর, দিগন্ত বিস্তৃত। হেমন্তের তেজহীন সূর্য আর পাশে প্রবাহিত কোমলাইয়ের (তিস্তার শাখা) সুশীতল হাওয়া আমাদের চলার পথে সহায়ক ছিল।

এক অপূর্ব দৃশ্য। উপরে সুনীল আকাশ, এখানে ওখানে জলহীন মেঘের ভাসমান সাদা টুকরো। দূরে উত্তরে হিমালয়ের নীলিমা এবং শিখরে বরফে পড়া রোদের রঙের খেলা। ডানে বামে সামনে, চারদিকে ধানের সমারোহ। ধান ভারে অবনত-শিষ গাছগুলি যেন কৃষকের হাড়ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যস্ত। জল নেমে গিয়েছে; অনেক জমির ধান গাছই মাটিতে লুটিয়ে। আশ্বিন-কার্তিকের অনাহারী চাষির ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কৃষকের কাস্তে ও কিষাণির উরুন-গাইনের (ধানভানা আদিম যন্ত্রবিশেষ) প্রতীক্ষায় যেন এরা এক কদম এগিয়ে আছে। প্রচুর ফলেছে, ধানে গাছ ঢাকা পড়েছে। 'মা' লক্ষ্মীর কিরপা!

প্রায় গোটা মাঠটাই অমুক মিঞা কিংবা অমুক বাবুর অর্থাৎ জোতদারের। চাষ হয় আধিয়ারি প্রথায়। একখণ্ড জমির আধিয়ারের নাম খোঁজ করায় উত্তর এল 'এ্যাইটে গ্যাইচে ভোটানত।' কেমন? 'ভাঙা-কান্তাই মাথাত দিয়া, বনুষের হাত ধরি, ছাওয়া কোলত করি, ঐ-ই-ই হুত্তি হুত্তি।' তিস্তার অপর পারে ডুয়ার্সের দিকে আঙুল দেখিয়ে এক জন চিৎকার করে বললেন। অর্থাৎ লোহার ভাঙা কড়াই দিয়ে মাথা ঢেকে স্ত্রীর হাত ধরে শিশু-সন্তান কোলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে দেশান্তরী হয়েছেন। ক্যানে? 'দেনার ভয়ত।'

সম্বৎসরের হাড়ভাঙা খাটুনির ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষা না করে পাকা-সোনা মাঠে ফেলে চাষি তার যথাসর্বস্ব ভাঙা কড়াই সম্বল করে দেশত্যাগী হয়েছেন। বিরল দৃষ্টান্ত নয় বরং স্বাভাবিক। কারণ ব্যবস্থাই এমন যে, ঘোড়ার খরচ, খোলান খরচ, পাইকের খরচ প্রভৃতি আট-দশ রকম আবওয়াব কেটে রাখার পর অর্ধেকের অংশীদার আধিয়ার প্রায় ক্ষেত্রেই খালি ডালা কুলো হাতে বাড়ি ফেরেন। ধানকাটা, জোতদারের খোলানে বহন করা, ঝাড়াই-মাড়াই, গোলাভরতি (জোতদারের) প্রভৃতি কাজ, উপরন্তু, পুরোটাই 'বেগার'। বেঁচে থাকার তাগিদেই আরও নির্মম শর্তে আগাম মজুর বিক্রি করে নতুন ঋণজালে জোতদারের কেনা গোলাম হতে হয়। ভোটান ছাড়া গত্যন্তর কী?

অসংগঠিত জনতা দুর্বলতার উৎস:

সেদিন ছিল স্থানীয় হাটবার। হাটবারে কৃষকের বড় জমায়েত সম্ভব না। তদুপরি লাঠিধারী সংগঠিত ভলান্টিয়ার বাহিনীর পাহারা ছাড়া 'তে-ভাগা'র ধানকাটা নেতৃত্বের নির্দেশে নিষিদ্ধ ছিল। ঘরে বসে রিপোর্ট লিখছিলাম। পাশে বসে কমরেড বিপিন বর্মণ, ভাল জঙ্গি কমরেড। দেশবিভাগের পর পুলিশের তাড়নায় সীমান্ত অতিক্রম করেন, কোথায় কেমন আছেন জানি না। বেলা দশটার দিকে খবর এল টারীর (পাড়ার) জনৈক কৃষক পরিবার লোকজনের সহায়তায় ধান কাটছেন। বিপিনকে পাঠিয়ে নিষেধ করা স্থির করেছিলাম। কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব বোধে নিজেই বিপিনের সঙ্গে গেলাম। আমরা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার পিঠে বন্দুক হাতে জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে লাঠি, বল্লম এবং ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত দশ-বারো জনের আর একটি দল ওখানে হাজির। একেবারে মুখোমুখি। কেটে পড়ার পথ নেই। যতটা মনে আছে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দু-তিনটি কুঁড়েঘরের একটি মাত্র বাড়ি। আমরা দু'জন দো-চালার দুটি কুঁড়েঘরের মাঝে আশ্রয় নিলাম। সামনে বিপিন। হাতে মাত্র বাঁশের একখানি কঞ্চি।

বড় লাঠির আঘাতে হাত জখম হয়ে বিপিনের হাতের কঞ্চি মাটিতে পড়ে যায়। বিপিন পিছনে সরে আসেন। কঞ্চিটা তুলে নিয়ে আমি বাড়ির পথ আগলে দাঁড়াই। বাড়ির পুরুষরা কেটে পড়েছে। ভিতরে শিশু ও মহিলার আর্তনাদ। সামনে অদূরে হাটযাত্রী, কিছু লোকের জনতা, দু-চার জন চেনামুখও দেখা যায়। আশা ছিল পিছনে বিপদ বুঝলে শত্রুবাহিনী সরে পড়বে। নিরীহ আধিয়ার পরিবার লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পাবে।

অসংগঠিত জনতা নীরব দর্শকের ভূমিকা নিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বড় লাঠির আঘাতে আমার মাথার কয়েকটি ক্ষতস্থান থেকে রক্তের স্রোত চোখমুখ ঢেকে দেওয়ায় পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করি।

বিকৃত তথ্যের আশঙ্কা:

প্রায় চার দশকের পুরনো ঘটনা। বিশেষভাবে যাচাই করার সুযোগ না নিলে ঘটনার মারাত্মক বিকৃতি হতে পারে। উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে অনুজপ্রতিম জনৈক বন্ধু তার পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন, 'আমি ঘরে বসে কথা বলছিলাম। ইতিমধ্যে জোতদারের কিছু লোকজন এসে আমাকে বাইরে আসতে বলায় আমি বাইরে আসি এবং সেই সুযোগে তারা আমার মাথায় আঘাত করে।' কোথায় পেলে? উত্তরে, কেন আপনিই তো বলেছেন। তিনি আরও বললেন, পরবর্তীকালে আমাকে নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, জোতদারের কথায় আপনি (আমি) বাইরে গেলেন কেন? এবং উত্তরে নাকি বলেছিলাম, 'ভদ্রলোক ডেকেছে, না যেয়ে কী করি?' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কমরেড অবনী বাগচী এই সময় বাইরে থেকে এসে সক্রিয় অংশ নেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চিকিৎসার জন্য আমাকে বাইরে পাঠানো হয়। প্রতিবাদে বড় বড় জঙ্গি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। শ্লোগান ওঠে—'ধান কেটে ঘরে তোলো এবং দখল রেখে চাষ করো।' প্রথম ব্যবস্থা ছিল জোতদার সম্মত হলে জমিতে ভাগ হয়ে তার ১/৩ অংশ নিজ খরচে নিয়ে যাবে। এতদিনকার প্রচলিত ব্যবস্থা, জোতদারের খোলানে ধান তোলার প্রথা বর্জিত হল। সত্যিকারের লড়াই শুরু হল। শত সহস্র লাঠিধারী সংগঠিত ভলান্টিয়ার বাহিনীর প্রহরায় তেভাগার ধান-কাটা অভিযান দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল।

সাংকেতিক ব্যবস্থা:

বিপদের আশঙ্কাতেই স্থানীয় লোকজন 'শোর' (জোরে চিৎকার) তুলবেন। 'শোর' শোনামাত্র অন্যেরা 'শোর' তুলবেন এবং লাঠি হাতে শোরের উৎসমুখে ছুটে যাবেন। দীনদয়াল ও কালাচাঁদ ছিল শত্রুপক্ষের আতঙ্ক! ওরা আসছে শুনলেই শত্রু বাহিনী রণে ভঙ্গ দিত। ইতিমধ্যে আমি কর্মস্থলে ফিরে আসি।

এতদিন সংগঠিত এলাকাতেই ধানকাটা সীমাবদ্ধ ছিল। আর ওই অঞ্চল ছিল (হিন্দু) ক্ষত্রিয় প্রধান। কয়েকটি ক্ষুদ্র মুসলিম এলাকা বাদে জেলা কৃষক সমিতি ব্যাপক মুসলিম কৃষকদের মধ্যে তখনও ঢুকতে সমর্থ হয়নি। সাম্প্রদায়িক পরিবেশ ও আমাদের অক্ষমতা অবশ্যই এর জন্য দায়ী।

এখন জিন্নার মুসলিম লিগের দ্বিজাতি তত্ত্বের মজবুত বাঁধে ফাটল দেখা দিল। সংগঠিত এলাকার বাইরে থেকে বিশেষ করে মুসলিম কৃষক অঞ্চল থেকে তে-ভাগার ডাক আসতে শুরু করল। 'আমরা প্রস্তুত' নেতা পাঠাও ইত্যাদি।

ষড়যন্ত্রের নতুন মোড়:

এতদিন 'হইলে ছোয়াল' কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষকের ঐক্য বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার চলত। এখন পুলিশের সহায়তায় হত্যা (তন্নারায়ণের হত্যার সময় পূর্বব্যবস্থা মতো সংশ্লিষ্ট জোতদারের বাড়িতে জনৈক দারোগার নেতৃত্বে একদল রাইফেলধারী পুলিশ হাজির ছিল) এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার (সৈয়দপুর) ব্যবস্থা হল।

তন্নারায়ণ হত্যা:

সেদিন স্থানীয় কোনও 'প্রোগ্রাম' ছিল না। নেতারাও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে। সম্পূর্ণ সুস্থ না বলে আমাকে কিছুটা বিশ্রামে রাখা হয়েছে। ভর সন্ধ্যা। সূর্য অস্ত গিয়েছে, পশ্চিম আকাশের লালটা তখনও অন্ধকার গ্রাস করেনি। আমার 'ডেন' (আশ্রয়স্থল)-এর পশ্চিম দিকে খোলামাঠে একা একা পায়চারি করছিলাম। গ্রাম পুরুষ শূন্য, বাজারে কিংবা মাঠে। আরও দূরে পশ্চিমে প্রায় আধমাইল দূরে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। বড় বড় জোতদার পাড়ার সংলগ্ন ওদিকে তো ছোট একটা আধিয়ার পাড়া। সংবাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাকাদাড়ি, লাঠি হাতে জনৈক প্রৌঢ় মুসলিম কমরেড (নামটি স্মরণ নেই) হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে হাজির। খিব—খারাপ—খবর। জোতদারের ঘর যাদু মিঞা (মশিউর রহমান) বন্দুকের গুলিত্ তন্নারায়নণক্ খুন করিচে; (তন্নারায়ণ) বারান্দাত্ বসি আছিল; টারীর মানুষ বাজারে ইতি উতি; পুরুষরা কাঁহই আছিল না। লাশ বারান্দাত্ পড়ি আছে; বাচ্চাই-এর ঘর আগত গেছিল, তার ঘরকও গুলি করিচে; অরা জখম হইচে, মাঠ্ত পড়ি আছে। হামরা শালার ঘরক তাড়াইয়া পিট্টাইয়্যা দিনু। পুলিশ আসচে। তোমাক খবর দিবার আসু।

ঘটনাস্থল ছুটে যাই। কমরেডও সঙ্গে গেলেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় কিছু লোকজন এসেছেন। কমরেডরাও আসতে শুরু করেছেন। শহিদ তন্নারায়ণকে লাল সালাম জানাই। তিনি বারান্দায় পড়ে আছেন। বাচ্চাই শেখ সহ আরও কয়েকজনকে আহত অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকতে দেখি। কলকাতার প্রখ্যাত সাংবাদিক কমরেড গোলাম কুদ্দুস ওই রাতে ঘটনাস্থলে আসেন। উল্লেখ্য যে, আসল খুনির সহোদর ভ্রাতা পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে

আমাকে জানান যে, তার প্রয়াত সহোদর অগ্রজ (বড়বাড়ির) জনৈক জোতদার যুবকের গুলিতেই তন্নারায়ণ শহিদ হন। তবে গুণ্ডাবাহিনীর নেতৃত্বে যাদু মিঞা ছিল, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

পুলিশের আশ্রয়ে, সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরে বসে থাকা নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে হত্যা। গুণ্ডাবাহিনীর এহেন জঘন্য কাজে জনসাধারণের ক্ষোভ ও ক্রোধ ফেটে পড়ল। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিলে 'যাদু মিঞার কাল্লা চাই' ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। শীতের শুকনো মাটি। যাদু মিঞার কাল্লা চাই, তন্নারায়ণের হত্যার বিচার চাই প্রভৃতি চকের (খড়িমাটির) লেখায় রাস্তা, মাঠ প্রভৃতি জায়গা ভরে গেল। 'যাদু মিঞার কাল্লা চাই' দাবিতে জঙ্গি বিক্ষোভ মিছিল যাদু মিঞাদের পাড়ায় ঢুকে পড়ল।

জনতার রুদ্ররোষের মুখে জোতদারকুল ভীত সন্ত্রস্ত; গা ঢাকা দিল, দূরে আত্মীয়স্বজন ও শহরের সরকারি কর্মচারীদের গৃহে আশ্রয় নিল। তদানীন্তন জলপাইগুড়ির জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যাদু মিঞার ভগ্নিপতি, যাদু মিঞাকে আশ্রয় দিল। হুলিয়ার আসামি সরকারি বাংলোয় আশ্রয় পেল।

সমস্যা সমাধানে শ্রেণীসচেতন সংগঠিত জনতার সহস্রপথ: তন্নারায়ণ হত্যার প্রতিবাদে নেতৃত্বের নির্দেশে মহকুমা শহর নীলফামারিতে একটি বড় 'র‍্যালি' (সমাবেশ) অনুষ্ঠিত হয়। আপ-ডাউনে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মাইলের পরিক্রমা। ডিমলা, ডোমার, হরিণচরা (আরও একটি তেভাগা অঞ্চল), নীলফামারি।

শীতের দুপুর। কমরেড অবনী বাগচী, মহী বাগচী, হরিকান্ত সরকার, প্রয়াত চাণ্ডি মহম্মদ, ছকদ্দি মিঞা, বাচ্চাই শেখ, দীনদয়াল বর্মণ, কালাচাঁদ বর্মণ প্রভৃতির নেতৃত্বে লাঠি ও লাল ঝান্ডাধারী কয়েক হাজার ভলান্টিয়ারের এক সংগঠিত বাহিনী। হাঁটাও—না—মার্চও না; প্রায় দৌড়। কাক যেমন যায় সরলরেখায় তেমনই ডোমারের দিকে। শ্লোগান—তে-ভাগা দিতে হবে, তন্নারায়ণ হত্যার বিচার চাই, যাদু মিঞার কাল্লা চাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ প্রভৃতি। পথঘাটের তোয়াক্কা নেই। বন প্রান্তর ভেঙে ছুটছে ডোমারের উদ্দেশে, লাঠির ডগায় বাধা লাল নিশানের এক বিরাট মিছিল। পথ প্রান্তের দু'ধার থেকে যোগ দিচ্ছে, লাঠি হাতে স্বতঃস্ফূর্ত জনতার এক অবিরাম স্রোত। জনৈক চৌকিদারকে নিজ ছেলেকে বলতে শোনা গেল—"যা ক্যানে লাঠি খ্যান ধরি।"

ধূলিধূসরিত পথক্লান্ত মোর্চা ডোমার পৌঁছল। তখন সবে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। তদানীন্তন ডোমারের পার্টি শাখা বেশ শক্তিশালী। কংগ্রেসিদের একটা বড় অংশ পার্টিতে। 'ক্যুরিয়ার' (বার্তাবাহকের)-এর মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল। প্রয়াত কমরেড পাঁচু তুড়ি গোলাম আজিজ, সাদা মিঞা, বলরাম সাহা, নারায়ণ ব্যানার্জি প্রভৃতি কমরেডগণ আগ বাড়িয়ে বন্দরের উপকণ্ঠে লাল সালাম জানিয়ে মোর্চাকে স্বাগতম করলেন। স্থানীয় পার্টির প্রচেষ্টায় ও দেশপ্রেমিক বন্দরবাসী এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচ-ছয় সহস্র লোকের একবেলার এক মুঠো খিচুড়ির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল।

পাটের বন্দর ডোমার। খালি গুদামগুলিতে ব্যবস্থা হয়েছে। মজলিস রান্না করা বড় বড় তামার ডেগচিতে চাল, ডাল আর যা যা তরকারি জুটেছিল সব একসঙ্গে সিদ্ধ হচ্ছে। কার্যকরণ বুঝতে বেশি বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া, তখনকার ডোমার জোতদার প্রধান ও মোসলিম লিগের শক্তিশালী এক ঘাঁটি। ইতিমধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে একসঙ্গে রান্না হিন্দু ও মুসলমান খাবে কী করে?

নেতারা সমস্যা সমাধানে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে মিটিং-এ বসে গেলেন। সকলেরই গালে হাত। উপায় কী? হঠাৎ দিগন্ত কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠল—'দাড়ি টিকি ভাই ভাই; লড়াইয়ের ময়দানে জাতভেদ নাই।' সমস্যা বিরাট, সমাধানও তড়িৎগতিতে এবং চূড়ান্ত। হই হুল্লোড়ের মধ্যে হিন্দু মুসলিম গরিব কৃষক জনতা পাশাপাশি বসে, পরস্পরকে পরিবেশন করে; মহাতৃপ্তির সঙ্গে ক্ষুন্নিবৃত্তি করল। বিভিন্ন শ্লোগানে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ঘোষণার সঙ্গে যে যেখানে পারল পাটের গুদামে, রাস্তার দু' পাশে; দোকানের খোলা বারান্দায়, ঘুমের কোলে ঢুলে পড়ল।

পরের ভোর। পূর্ব ব্যবস্থামতো কাকডাকা ভোরে সকলেই প্রস্তুত। ডোমারের কমরেডরাও সঙ্গে। লালঝান্ডা জিন্দাবাদ, কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ, তে-ভাগা দিতে হবে, তন্নারায়ণ হত্যার বিচার চাই, কংগ্রেস লিগ এক হও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ, দুনিয়ার কৃষক মজুর এক হও, দাড়ি টিকি ভাই ভাই, প্রভৃতি সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত শ্লোগানে বন্দরবাসীর শীতের ভোরের সুখ নিদ্রা ভেঙে গেল। লাল তরঙ্গ আবার ছুটল প্রায় পনেরো মাইল দূরে নীলফামারির উদ্দেশে। সময় একেবারে মাপা। র‍্যালির পর দিনের আলোয় ফিরতে হবে যার যার ঘরের পানে।

হরিণচরা। ক্ষণিক বিশ্রাম। যোগ দিলেন স্থানীয় কিছু জনতা ও লাঠি ঝান্ডা হাতে ভলান্টিয়ার বাহিনী। শ্লোগানের পর শ্লোগান আর গতিবেগ ও কলেবর বৃদ্ধি মোর্চার। চোখে মুখে ভয় বা শঙ্কার লেশমাত্র নেই। জনসমষ্টি একখণ্ড জমায়িত বস্তুর মতো ছুটে চলেছে। সামনে উদ্দেশ্য এক, তেভাগা নিতে হবে; তন্নারায়ণের হত্যার বিচার চাই।

নেতৃত্বের মনে অনেক প্রশ্ন—অনেক সমস্যা। ডোমার জোতদার প্রধান বন্দর। বন্দরের চিকনমাটি, পাড়ার জোতদাররা লিগপন্থী ও শক্তিশালী। একই পাড়ার প্রয়াত কমরেড গোলাম আজিজকে এরা 'একঘরে' করেছিল। তা ছাড়া, ডিমলার পলাতক জোতদাররা অনেকে এদিকে আশ্রয় নিয়েছে। নীলফামারির পথে সোনা রায়। মুসলিম ও বড় জোতদার প্রধান গ্রাম। জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি আমার বন্ধু প্রয়াত মৌলানা আফ্‌ফেন্দি সাহেবের গ্রাম। এদের অনেকেই 'দেহকদপন্থী' তদানীন্তন সর্বভারতীয় কংগ্রেসি নেতা মরহুম মৌলানা কেফায়েতুল্যা সাহেবের শিষ্য। কিন্তু সকলেই বেশ বড় জোতদার। এ অঞ্চলের তেভাগার লড়াই মূলত এদেরই এবং এদের নিকট-আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। পরবর্তীকালে 'তে-ভাগায়' অংশগ্রহণকারী জনৈক নজির মিঞাকে এরা মিথ্যা ডাকাতির মামলায় সাত বৎসর সশ্রম জেল খাটিয়েছিল। এবং প্রখ্যাত পাঁচুতুড়ি এদের চক্রান্তে মারাত্মক আহত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

নীলফামারিও জোতদার প্রধান শহর। এখানে ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী পর্যন্ত প্রায় সকলেই জোতদার। কংগ্রেস নেতা ডা. তারক চক্রবর্তী, উকিল চারু ঘোষ, সুরেন দাস প্রভৃতি সকলেই বড় জোতদার। খাদরি হরিপদ সরকার গেঞ্জির (জাপানি) কলের মালিক। গান্ধীপন্থী ও সুভাষপন্থী সকলেই জনযুদ্ধ বিরোধী। তা ছাড়া, মুসলিম লিগের এটা শক্তিশালী ঘাঁটি। ডা. মনোজ ঘোষ, কমরেড বিমল ভৌমিক প্রভৃতির নেতৃত্বে এখানকার পার্টি শাখা খুবই ছোট ও দুর্বল। অদূরে সৈয়দপুরে শক্তিশালী রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের প্রধান অফিস। এদেরই প্রচেষ্টায় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু '৪৬-এর প্রাদেশিক আইন সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু অবাঙালি-প্রধান এই রেল শহর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এক উর্বর ভূমি বলে চিহ্নিত। গোটা রংপুর জেলায় যে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সংগঠিত হয়েছিল সবগুলিই সৈয়দপুর ও নীলফামারিতে।

লাল তরঙ্গ পৌঁছানোর আগের দিন সৈয়দপুরে দাঙ্গা শুরু হয়। পরের দিন র‍্যালি এসে উপস্থিত হয় নীলফামারিতে, এ সব মিলিয়ে নেতৃত্ব চিন্তাগ্রস্ত ও সতর্ক।

হরিণচরায় সুসজ্জিত ভলান্টিয়ার বাহিনীর যোগদানে নতুন দেশের সৃষ্টি হল। বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে মোর্চা এগিয়ে গেল। বর্ষার দুধার থেকে আসা স্রোতের মতো স্বতঃস্ফূর্ত জনতার স্রোত মোর্চার আকার-প্রকার এবং উদ্যম ও উদ্দীপনা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি করে চলল।

শোগামাছা (শহরের) হাটের দিন। কাঁচা রাস্তা, ধুলোয় মানুষজন চেনা যায় না। ধূলির ঝড় আর নিযুত কণ্ঠের আকাশ কাঁপানো ধ্বনি। মুহূর্তের মধ্যে দোকানি দোকান ফেলে আর ক্রেতা হাট ছেড়ে পালিয়ে গেল। চোখে-মুখে সবারই আতঙ্ক। এক রব, ওই আসছে রে... আসছে রে।

নতুনরূপে গণতান্ত্রিক শক্তি:

সামনের সারিতেই ছিলাম। দু'পাশের জানলা থেকে উল্লাসের ধ্বনি কানে এল। আরে লাল ঝান্ডা... লাল ঝান্ডা রে...। ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে সাম্প্রদায়িকতার চরম শত্রু এক নতুন গণতান্ত্রিক শক্তি। শ্রেণীসচেতন হিন্দু মুসলমান কৃষকের বলিষ্ঠ হাতে ধরা লাল ঝান্ডার তাৎপর্য বুঝতে কালবিলম্ব হল না। রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে সকলে হাসিমুখে স্বাগত জানালেন।

বিদ্যুৎগতিতে প্রোগ্রাম সমাধা করা পার্টির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনুসারে, নগর প্রদক্ষিণরত মোর্চা ছোট্ট শহর নীলফামারি লাল ঝান্ডায় ঢেকে ফেলল। চারদিকে লাল আর লাল এক অপূর্ব দৃশ্য!

মাঠে জনসভা। প্রখ্যাত কৃষকনেতা প্রয়াত কমরেড দীনেশ লাহিড়ী সভাপতি। প্রস্তাবের সারমর্ম, গরিবের তেভাগা আন্দোলন নস্যাৎ করার চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমান জোতদারের মিলিত ষড়যন্ত্র—এই দাঙ্গা। হিন্দু কি মুসলমান, এক জন গরিব খুনের বদলা সাতটি (জোতদার)। তে-ভাগা দিতে হবে এবং তন্নারায়ণ হত্যার বিচার চাই ইত্যাদি। সভাপতির প্রস্তাব অযুত লাঠির শত্রুর-প্রাণ-কাঁপানো ঠকঠকানি শব্দে ও অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত লাল ঝান্ডা জিন্দাবাদ, কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ প্রভৃতি শ্লোগানের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। দাঙ্গা থেমে গেল। গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা আঁতুড়েই মারা গেল।

জেলার আরও দুটি অঞ্চলে তেভাগার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। এক, জলঢাকা—কিশোরগঞ্জ থানা এলাকায় শত্রুপক্ষ পুলিশের সহায়তায় পূর্বাহ্ণেই হামলা শুরু করে। খুব সম্ভবত আমাদের প্রস্তুতি নিতেও বিলম্ব হয়। আন্দোলন এগুতে পারেনি। অমানুষিক হামলায় বহু গরিব কৃষক ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। দুই, বদরগঞ্জের মধুপুর ইউনিয়নে শ্রেণীসংগ্রামের দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ছিল ভাসা ভাসা।

মানবোত্তর জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের বাসনা:

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ (ডিমলার) জোতদারকুল রণে ভঙ্গ দিল। দেশ ত্যাগের হিড়িক বাড়ল। ধান ষোলো আনাই আধিয়ারের ঘরে। জোতদারের ঘরে এক

মুঠিও যায়নি। ডিমলার প্রচণ্ড শীত। আগুনের চারপাশে বসা জনৈক কমরেডকে বিমর্ষ দেখে প্রশ্ন করায় কারণ জানা গেল—'আতত্ নিন্দ হয় না।' ক্যানে? 'মা লক্ষ্মী ঘরত, ঘর ভাঙা, চোরের ভয়।'

সর্বহারার হারানোর কিছুই ছিল না। নিঃশঙ্ক চিত্তে, খালি পেটে, দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর, সে এতদিন, রাতে অচেতন হয়ে পড়ে থাকত। আজ ভাঙা কুঁড়েতে এক মুঠো ধান; ভয় আছে বইকী। এরা নিজেরাই ছাকরবন্দ (ঘরের কাজ করেন)। ধনীর যাবতীয় ঘরের কাজ এরাই করেন। তা ছাড়া, এ সব কাজে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে চালু আছে। এদের প্রয়োজন হয়নি, বোধশক্তিও কাজ করেনি। সমিতির মিটিং-এ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অল্প আয়াসেই রাতে সুনিদ্রার ব্যবস্থা হল।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় ওই সময় প্রায় ছয় মাসকাল তাদের খুবই দুঃসময় গিয়েছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি কোনও 'কেসই' থানায় যায়নি। ঘরে ঘরে ভাত আর পাড়ায় পাড়ায় লাঠিধারী পাহারা, প্রয়োজন ও সুযোগ দুয়েরই অভাব। স্থানীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ডিমলা শাখা থেকে দাবি উঠল, ধনীর ছেলেমেয়েদের মতো তাদের সন্তানসন্ততির জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে পার্টি কমরেডকে।

দ্বিতীয় দাবি, মুড়ি ভাজা শেখাতে হবে। মুড়ি খাওয়া এদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিলাসিতা, এক সৌভাগ্য। ভাতই জোটে না, মুড়ি খাওয়ার সুযোগই বা কোথায়? আর ভাজা শেখার প্রয়োজনই বা কী? কাটার মরশুমে একদল চতুর ব্যবসায়ী ধানের খেতে মুড়ি বিক্রি করে। বাঁশের বা বেতের একডালা মুড়ির বিনিময়ে ওই 'ডালা' ভরতি ধান, দিনে ডাকাতি। এদের মুড়ি খাবার সৌভাগ্য ওই কয়েক দিনের মাত্র। এ প্রসঙ্গে কমরেড রানী মুখার্জির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। শহুরে মহিলা কমরেডদের মধ্যে তাঁরই অবদান বোধ করি সর্বাধিক।

নতুন বিপদের সূচনা:

সরকার এবার সরাসরি মাঠে নেমেছে। রংপুরের ডি এম. তখন ইছাহক সাহেব। আই. ডি. আর. (ভারত রক্ষা আইন) তূণীর থেকে বের করা হল। প্রকাশ্য কমরেড প্রায় সকলেই আটক হলেন। রাতের অন্ধকারে গ্রামাঞ্চলেও আচম্বিতে হামলা চলতে থাকল। গ্রামাঞ্চল তখন মুক্ত এলাকা ও জোতদার এলাকায় বিভক্ত। ডিমলার জোতদার রমেশ এমনই একদিন স্ত্রীর হাত ধরে তিস্তার পারে ডুয়ার্সে পালিয়ে যাচ্ছে। রমেশের 'ঢ্যানা চাকর গনা উঁচু গাছের ডালে বসে ওই দৃশ্য দেখে স্বরচিত গান ধরেছে—'বনুষের হাত ধরি অমেশ ভোটানত যায়, গনা এবার একটা 'ব্যেট ছাওয়া' চায়।

ঢ্যানা সমস্যা বড়ই করুণ। অর্থাভাবে বিবাহে অক্ষম যুবকই 'ঢ্যানা'। তখন কন্যাপক্ষকে বরপক্ষের পণ দিতে হত। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কৃষকের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল, কনে 'বোচ্চাইয়া' খাওয়া। স্বাভাবিক কারণেই অর্থহীন যুবকের ঢ্যানা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অপর পক্ষ গ্রাম্য ধনীরা অর্থবলে যে কোনও বয়সের যে কয়টি খুশি বিয়ে করত। নামেমাত্র বিবাহিত স্ত্রী কার্যত বিনা মাহিনার দাসী—'ধানের মরশুমে ইন্দুর সাতটি বিয়ে করে' গ্রাম্য প্রবাদ। এই সব হতভাগিনীদের কাউকে কাউকে 'ভীত-পাকানো' ব্যেট-ছাওয়া হিসাবে বাইরের চাকর কিষাণের পরিচর্যায় ব্যবহার করা হত। সাধারণভাবেই ঢ্যানারা এই সব মধুচক্রে আকৃষ্ট হয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই পেটভাতায় কাজ করত। এক ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি।

গানটি গনার স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনযাপনের উগ্রবাসনার স্থূল প্রকাশভঙ্গি। "রে এক

মুঠি ধান উঠেছে। মাত্র কয়েক মাসের খোরাক। এর ফলেই চির বঞ্চিত আদম সন্তানদের মনে স্বাভাবিক জীবনের সকল সুপ্ত বাসনা, কামনা জেগে উঠেছে মায় সন্তানসন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা পর্যন্ত।

ধানকাটা অভিযানের সময় সৈয়দপুর, লালমণির হাট প্রভৃতি স্থানের রেল ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা রাতের অন্ধকারে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সংগ্রামী আধিয়ারদের উৎসাহ দিতেন এবং মজদুর কৃষকের শ্রেণী-ঐক্যের প্রয়োজনের কথা শুনাতেন। বড়গাছা (ডোমার থানা) অঞ্চলের জঙ্গি বাহিনী লাল ঝান্ডা খেতে গেড়ে ধান কাটতেন আর শিয়ালদহ-শিলিগুড়ি লাইনের চলন্ত গাড়ির ইঞ্জিনের ভারতীয় খালাসিদের উদ্দেশে শ্লোগান দিতেন—'দুনিয়ার মজদুর-কৃষক এক হও।' খালাসিরা ইঞ্জিনের বাঁশি মুহুর্মুহু বাজিয়ে প্রত্যুত্তর দিতেন। সাদা চামড়ার ড্রাইভাররা প্রথম দিকে বাধা দিত, পরে উদাসীন থাকত। মালগাড়ি ও যাত্রীগাড়ি প্রায় সময়েই থেমে যেত ও বেসরকারিভাবে কৃষকরা নীলফামারি ও ডোমার যাতায়াত করত। বর্তমানে সেখানে সরকারিভাবেই একটি রেলস্টেশন হয়েছে।

ইতিমধ্যে গরিব আধিয়ারদের মধ্যে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার বোধ জেগে উঠেছে। পার্টির কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও দেখা গিয়েছে গ্রামের গরিব শিক্ষক, ধর্মযাজক, বিধবা প্রভৃতিকে গোপনে ১/৩-এর পরিবর্তে অর্ধেক অংশই দেওয়া হয়েছে।

এই সময় তদানীন্তন মুসলিম লিগ নেতা উকিল দবির মিঞা (বর্তমানে আওয়ামি লিগ), মরহুম খয়রাত হোসেন (যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী) ও উকিল মরহুম মনছুর মিঞার নেতৃত্বে আধিয়ার নয় আনা ভিত্তিতে একটি আপস প্রস্তাব আসে। প্রাদেশিক কৃষক সমিতির নির্দেশে তা অগ্রাহ্য হয়।

আমার মনে হয় দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তির অধিকাংশ সক্রিয় সমর্থন না দিলেও তাঁরা বিরুদ্ধে যাননি। এবং এই কারণেই রংপুরের তেভাগার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হয়েছিল।

শীতের শেষ:

জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন তুঙ্গে ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগ আসন্ন। এমতাবস্থায় মেদিনীপুরে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন আহূত হয়। আমাকে এবং প্রয়াত কমরেড পাঁচুতুড়িকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জেলা কৃষক সমিতি মনোনীত করেন। সেখানে প্রায় বিনা আলোচনাতেই তেভাগা সংগ্রাম বিনাশর্তে প্রত্যাহৃত হয়।

উভয়ের মাথার ওপর হুলিয়া। খুবই সাবধানে যাতায়াত করতে হয়েছিল। ফেরার পথে শান্তাহারে এক দুর্ঘটনার জন্য বগুড়ার লাইনে দু' স্টেশন পরিমিত পথ পায়ে হেঁটে পরে রেলযোগে দোমহনি পৌঁছই। সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে তিস্তার বুনোশুয়োর ভরা চর ভেঙে জলপাইগুড়ি শহর। আবার দুর্ঘটনা। সারাদিন পায়ে হেঁটে রাতে ডোমার 'ডেন'-এ পৌঁছই। ভোটান হয়ে ফিরেছিলাম। নিরাপদে তবে অনাহার ও ফাল্গুনের রোদে কষ্ট হয়েছিল খুবই।

বিভাগোত্তর পূর্ব-পাকিস্তান/বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য দায়িত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে এখানে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। সীমাহীন প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও এই মহান শ্রেণী সংগ্রামের সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষা গ্রহণে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১-এর পূর্ব পর্যন্ত রংপুর জেলা পার্টি তেভাগা অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নতুন কাজ সবে শুরু হয়েছে। সরকারি মতে ভূমিহীনের সংখ্যা ৫৬% ভাগ, বাস্তব ক্ষেত্রে আরও বেশি। খেতমজদুর সমিতির কাজ বেশ দানা বেধে উঠেছে। নতুন প্রজন্ম শহিদ তন্নারায়ণ ও তেভাগার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

কিছুদিন পূর্বে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ উপলক্ষে আহূত জনসভায় বহুনিন্দিত যাদু মিঞার (জিয়ার মন্ত্রী সভায় সিনিয়র মন্ত্রী এবং মন্ত্রী থাকাকালীন প্রায় তিন বৎসর পূর্বে মারা যায়) নামে নামকরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ থেকে তন্নারায়ণের নামের প্রস্তাব ওঠে। পরিণতি অবশ্যই স্বাভাবিক। শহিদের রক্ত বৃথা যায় না। স্থানীয় প্রচেষ্টায় শহিদস্মৃতি নির্মাণের ব্যবস্থা হচ্ছে।

তেভাগার নেতৃত্বে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী যারা দেশে ছিলেন তাদের মধ্যে এক, কমরেড বাচ্চাই শেখ বেশ কিছুদিন আগেই মারা যান। দুই, কমরেড চাট্রি মাস চারেক পূর্বে পার্বতীপুর রেল জংশনে আছাড় খেয়ে উরুর হাড় ভাঙা অবস্থায় রংপুর মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। স্থানীয় ও জেলা পার্টি তার চিকিৎসা ও পরিচর্যার সাধ্যমতো প্রচেষ্টা নেন। মরহুমের লাশ লাল ঝান্ডায় ঢেকে তার বাড়ির (ডিমলা) কবরস্থানে পার্টির নেতাদের উপস্থিতিতে 'গার্ড-অব অনার' সহকারে সমাহিত করা হয়। স্থানীয় প্রতিক্রিয়া বেশ অনুকূল হয়েছে। তিন, মাস তিনেক পূর্বে ছকদিভাই রোগে ভুগে মারা গিয়েছেন। চার, এই মাত্র ৮/৮ ইং লিখতে বসে কছির ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেলাম।* বিস্তারিত খবর এখনও আসেনি। বোধ করি বার্ধক্যজনিত মৃত্যু।

পাকিস্তানের গোড়ার দিকে কছির মিঞাকে একবার ডিমলা পাঠানো হয়। জোতদারের গুণ্ডারা তাকে অমানুষিক প্রহার করে। উলঙ্গ করে দু হাত প্রসারিত অবস্থায় লাঠির সঙ্গে বেঁধে ঢিল বানিয়ে পিছন থেকে মারতে মারতে পনেরো মাইল দূরে নীলফামারি হাজতে পৌঁছে দেয়। আমৃত্যু কছিরভাই নিবেদিত প্রাণ একনিষ্ঠ পার্টি কমরেড ছিলেন।

এই সব পুরনো মোসলিম কমরেডের জীবন—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আঘাতে প্রতিঘাতে জর্জরিত। এদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি—যাবে না। মহান তেভাগার শিক্ষা অমর হউক।

---

*১৯৮৪ সালেব ২৮ জুন কমরেড কছির মিঞার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য গ্রাম হরিপুব, ডাকঘর পূর্ণনগব, জেলা রংপুর এই ঠিকানায় পত্র লিখি। উদ্দেশ্য, 'রংপুর জেলার তেভাগা আন্দোলন' সম্পর্কে তাঁব অভিজ্ঞতা মাফিক একটি স্মৃতিচারণা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধের জন্য। দুঃখের বিষয়, আমার লেখা চিঠিটি তার কিছুদিন পর জুলাই মাসের ১৬ তারিখে রংপুর ডাকবিভাগ থেকে ফিরে আসে। চিঠির ঠিকানার অংশে লেখা থাকে 'মালিক মারা গিয়াছে।' এ খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কমরেড সেনের নিকট পত্র লিখে জানাই। সম্পাদক।

তেভাগা সংগ্রামের অমর কাহিনী

অবনী বাগচী

উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলার (জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও রংপুর) কৃষক আধিয়ার ছিল প্রধানত ক্ষত্রিয় ও মুসলমান। অশিক্ষিত ও সরল প্রকৃতির ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে পাহাড়ি বা আদিবাসী সমাজের মিল ছিল অনেক। তারা ছিল বড় বড় জমিদার, জোতদার ও তাদের দক্ষিণ দেশি কর্মচারীদের অবাধ শোষণের শিকার। ক্ষত্রিয় সমিতির প্রভাবে এরা জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিল, যেমন ছিল লিগের প্রভাবে মুসলমানরা। উভয় সম্প্রদায়ই বর্ণহিন্দুদের অবিশ্বাস করত।

তবুও এই শতাব্দীর '৪০-এর দশকে উত্তরবঙ্গের এই তিনটি জেলা নিঃসন্দেহে কৃষক আন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্রে পরিণত হয়। রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি—এই তিনটি জেলার সংযোগস্থলে কালীর মেলায় ১৯৪০ সালের প্রারম্ভে যে গণ্ডি আন্দোলন আরম্ভ হয় তা দাবানলের মতো পরিব্যপ্ত হয় দিনাজপুর, রংপুরের নীলফামারি মহকুমা, জলপাইগুড়ির বোদাপচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানায়। লক্ষাধিক কৃষক সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। কৃষক ঐক্যের ক্ষমতা তারা ভাল করেই বুঝতে পারল। তাদের মনে জেগে উঠল শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আত্মবিশ্বাস। আধিয়ার প্রধান এই অঞ্চলে শীঘ্রই জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আধিয়ার আন্দোলন আরম্ভ হল। কিন্তু এটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কাজেই ব্যাপক দমননীতির প্রয়োগে এ আন্দোলন সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গেল। অনেক নেতা ভারত রক্ষা আইনে আটক হল। কিছু নেতা আত্মগোপন করে কৃষকদের অগ্রগামী জঙ্গি অংশকে সংগঠিত করতে থাকল। '৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে মারা গেল হাজার হাজার গরিব কৃষক আধিয়ার, খেতমজুর। মজুতদার, মহাজন ও জোতদারদের শোষণ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করল। শ্রেণীচেতনাও বাড়ল। এরই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক হাতিয়ার। ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন কী করে রংপুরের ডিমলা থানায় তথা সমগ্র নীলফামারি মহকুমায় সাম্প্রদায়িকতাবাদের মারাত্মক অস্ত্র ভোঁতা করে দিয়েছিল, কী করে সে আন্দোলন নতুন মানুষ তৈরি করেছিল এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এক দিকে শাসক ও শোষক শ্রেণীগুলো যেমন বুঝতে পারল পুরনো কায়দায় তার শাসন শোষণ চলতে পারে না, অপর দিকে গরিব কৃষক আধিয়ারও বুঝতে পারল অবাধ শোষণ বন্ধ করতে না পারলে '৪৩ সালের মতো দুর্ভিক্ষ বার বার আসবে এবং তাদের জোতদার মহাজনদের কাছে আরও বেশি করে বাধা পড়তে হবে। তাই বড় বড় জোতদার মহাজন ও আধিয়ার প্রধান নীলফামারি মহকুমায় বিশেষ করে ডিমলা, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ থানার আধিয়াররা আওয়াজ তুলল—'তে-ভাগা চাই', 'নিজ খামারে ধান তোলো'।

ডিমলা থানার স্থানীয় নেতা হরিকান্ত সরকার এ আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন। তাঁকে

সাহায্য করতে গিয়েছিলেন মণিকৃষ্ণ সেন, মহী বাগচী, নৃপেন ঘোষ প্রভৃতি। এক মাড়ওয়াড়ি জোতদারের গুণ্ডারা মণিকৃষ্ণ সেনকে এমন মারাত্মকভাবে আহত করল যে তাঁকে চিকিৎসার জন্য সদরে চলে যেতে হল। গোড়াতেই ঘা খেয়ে আন্দোলন সাময়িকভাবে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু কিছু কিছু সংগঠিত এলাকায় নিজ খোলানে ধান তোলার সঙ্গে সঙ্গে আধিয়াররা নিজেদের উদ্যোগেই সর্বত্র তেভাগা কমিটি গড়তে লাগল। মুসলমান আধিয়ার কৃষকরা সাম্প্রদায়িক জোতদারদের প্রভাবে আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিল। ক্রমশ তারাও জামসেদ চাটি, নয়মহম্মদ, বাচ্চামহম্মদ প্রভৃতি গরিব আধিয়ার কৃষক নেতার নেতৃত্বে আন্দোলনে জঙ্গি ভূমিকা নিল। ফলে খগাখড়িবাড়ির মুসলমান জোতদাররা আপসের কথাবার্তার আড়ালে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ডিমলা থানার কেন্দ্রস্থলে খগাখড়িবাড়ি। এটা ছিল প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান জোতদারদের আবাসস্থল। যাদু মিঞা অর্থাৎ মশিউর রহমান ছিলেন ওই সব সাম্প্রদায়িকতাবাদী জোতদারদের প্রধান নেতা। তাদের ধারণা ছিল মুসলমান আধিয়াররা কোনও ক্রমেই এ আন্দোলনে যোগ দেবে না। এতদ্‌ভিন্ন তাদের বাড়িগুলির চারপাশে বাস করত 'পরজা' আধিয়াররা। তারা একান্তভাবেই নির্ভরশীল ছিল জোতদারদের ওপর। কারণ তাদের ভিটা বাড়ি, হাল বলদ সবকিছুরই মালিক ছিল জোতদাররা।

শেষ পর্যন্ত 'পরজারাও' সংগোপনে তেভাগার জন্য তাদের সংগঠন গড়ে তুলতে লাগল। শেষ পদক্ষেপের জন্য যখন একদিন রাত্রে সত্তর-আশি জন একত্র বৈঠক করছিল তখন যাদু মিঞার নেতৃত্বে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন জোতদার বন্দুকসহ উপস্থিত হয় এবং তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ঘটনাস্থলে তন্নারায়ণ (একজন পরজা) নিহত হয় এবং পঁচিশ-তিরিশ জন আহত হয়। তৎকালীন 'স্বাধীনতার' বিশেষ সংবাদদাতা এবং প্রখ্যাত লেখক ও কবি গোলাম কুদ্দুস আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য তার পূর্বদিনই ডিমলায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকেও বাধ্য হয়ে তীব্র শীতের মধ্যে সারা রাত্রি মৃত ও আহতদের পাশে কাটাতে হয়।

এই আক্রমণের ফলে আধিয়াররা ভীতসন্ত্রস্ত হলই না বরং প্রায় সমগ্র নীলফামারি মহকুমার আধিয়াররা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল। তারা আওয়াজ তুলল 'খুনি যাদু মিঞার বিচার চাই, যাদু মিঞার রক্ত চাই'। আরম্ভ হল মহকুমা শহরে এই দাবি নিয়ে অভূতপূর্ব হিন্দু-মুসলমান আধিয়ারদের দীর্ঘ জঙ্গি অভিযান। এই অভিযানে ওই মহকুমার আধিয়ার কৃষকরাও মুক্‌ছেদ আলি, মন্টু মজুমদার, দীনেশ লাহিড়ী প্রভৃতির নেতৃত্বে সামিল হল। হিন্দু-মুসলমান আধিয়ার কৃষকের এ অভূতপূর্ব ঐক্যে ভীত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের তূণীরের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল। মহকুমা শহরের মাত্র দশ মাইল দক্ষিণে সৈয়দপুর রেলওয়ে শহরে অবাঙালি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ করল। ঠিক আধিয়ারদের মহকুমা শহর অভিযান আরম্ভ হওয়ার দিনই। ওই দাঙ্গার ফলে প্রায় কুড়ি-তিরিশ জন নিহত হয়। দশ সহস্রাধিক আধিয়ারের জঙ্গি অভিযান যখন নীলফামারি শহরে উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে শহরে প্রবেশ করছিল ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত মৃতদেহগুলিও শহরে আনা হয়। সমস্ত শহরবাসী যখন দাঙ্গার আতঙ্কে অসহায় ঠিক সেই সময়ে হিন্দু-মুসলমান কৃষকের বিরাট জঙ্গি বাহিনী লাঠি হাতে শহরে প্রবেশ করে। শহরের অধিবাসীরা এদেরকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাল। শহরবাসী তাদেরকে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে, অবাঙালিদের বাইরে বা

সৈয়দপুরের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। সাম্প্রদায়িকমূলক বিদ্বেষ আর ঘটল না।

মিছিল সদর মহকুমা হাকিমের বাড়ি ঘেরাও করল। আওয়াজ তুলল 'যাদু মিঞার বিচার চাই।' মহকুমা হাকিম ঘর থেকে বের হল না, পুলিশও উপস্থিত হল না। সকলের মনে সাম্প্রদায়িক শান্তির আশ্বাস জাগিয়ে আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে গভীর রাত্রে মিছিল নিজ নিজ এলাকায় ফিরে চলল। মুখে তাদের একই আওয়াজ।

আন্দোলনকে ভীতসন্ত্রস্ত করার বা ভিতর থেকে দ্বিধা বিভক্ত করার সমস্ত প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন সরকারি আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগল। আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা হল এক চাঞ্চল্যকর 'সংবাদ'। তাতে লেখা হল—'ডিমলা থানায় এক স্বাধীন-রাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার প্রধান হলেন হরিকান্ত সরকার। এদের বাহিনী গ্রামবাসীদেরকে ধরে এনে বিচার করছে এবং সাজা দিচ্ছে। এরা এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে।...'

আন্দোলনের এক অগ্রগামী অংশের বুঝতে বাকি রইল না যে, শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর আক্রমণ আসছে। তারাও সে আক্রমণ প্রতিহত করার উপায় উদ্ভাবন করার জন্য যখন সবেমাত্র সংগ্রাম কমিটিগুলোর বৈঠক ডেকেছে—ঠিক সেই মুহূর্তে ৯ মার্চ রাত্রের অন্ধকারের আড়ালে রাত্রি দশটা নাগাদ তিন শতাধিক সশস্ত্র পুলিশ সমগ্র থানাব্যাপী নয়-দশটি কেন্দ্রে হানা দেয়। কোনও কোনও স্থানে বৈঠকরত সমগ্র সংগ্রাম কমিটিকেই তারা গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। এইভাবে তারা সেই রাত্রেই প্রায় দুইশত সংগ্রামী নেতাকে অতর্কিতে গ্রেপ্তার করে। হরিকান্ত সরকারের বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে বাড়িতে না পেয়ে তাঁর বাড়ির সতেরো জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। তার পরদিন থেকেই চলল পুলিশের তাণ্ডব।

রংপুরের পার্টি ও কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা বুঝতে হলে দুটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। এক, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশে মাত্র তিনটি আসনে কমিউনিস্ট পার্টির candidate জয়ী হয়। Railway Constituency থেকে জ্যোতি বোস, দিনাজপুর থেকে রূপনারায়ণ এবং দার্জিলিং থেকে রতনলাল ব্রাহ্মণ। রংপুরের অন্তর্গত সৈয়দপুর রেল কেন্দ্রের ভোটেই জ্যোতিবাবুর জয় সুনিশ্চিত করে। তাব চাইতেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে রংপুর জেলা constituency-তে বেশি ভোট পেয়েও নিজেদের ভুল হিসাবের জন্য অর্থাৎ দিনাজপুরের মতো শেষ মুহূর্তে একজন প্রার্থী রেখে অন্য প্রার্থী withdraw করিয়ে নিশ্চিত জয় হত। সমগ্র জেলা একটি constituency ছিল এবং প্রতি ভোটারের তিনটি ভোট ছিল—যা সে একজন, দুজন বা তিন জনকে দিতে পারত। আমাদের প্রার্থীরা হরিকান্ত সরকার (ডিমলার) এবং নির্মল বর্মণ (গাইবান্ধা) ১৭০০০ ও ১১০০০ ভোট পায় অর্থাৎ একত্রে ২৮০০০ ভোট পায়। কিন্তু যে তিনজন Elected হয় তার মধ্যে এক জন ২৩০০০ হার ভোট পেয়েই elected হয়। বলাবাহুল্য যে আমাদের ভোটগুলি ব্যক্তিগত ভোট নয় পার্টির ভোট। কাজেই আমরা সমস্ত ভোটই একজনকে দেওয়াতে পারতাম। এভাবে '৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গোটা বাংলাদেশে Seat হারায়নি। জেলা কেন্দ্রে সময়মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো কেউ না থাকাতেই এই অবস্থা হয়।

এদিক থেকে লক্ষ করার বিষয় যে, '৪৬ সালের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের উপর নির্ভর করেই party তিনটি Seat-ই পেয়েছিল এবং আরও একটি Seat পেয়েও হারিয়েছিল।

রংপুরের কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক আন্দোলন

সুধীর মুখার্জি

রংপুর জেলা এককালে ছিল উত্তরবঙ্গ যুব বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র। বিপ্লবী আন্দোলনের গোড়া থেকে এই জেলাতে অনুশীলন সমিতির বিস্তৃত কাজ ছিল। কমরেড সতীশ পাকড়াশী সে যুগে দীর্ঘকাল রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করে কাজ করছিলেন। গোপন অবস্থায় তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছেন। পরবর্তীযুগে যুগান্তর দল বিশেষ শক্তিশালী হয়েছিল। ঢাকার শ্রীসঙ্ঘ ও বি. ভি দলের কিছু কাজ ছিল।

শহিদ প্রফুল্ল চাকীর বাড়ি ছিল বগুড়া। তিনি রংপুরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী চিলমারী বন্দরে ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বিখ্যাত রডা রিভলভার অপসারণের সঙ্গে জড়িত প্রয়াত সুরেন বর্ধন ছিলেন নাগশ্বরীগঞ্জের বিশিষ্ট অধিবাসী।

রংপুর শহরের বিখ্যাত আইনজীবী প্রয়াত সতীশ চক্রবর্তী মহাশয় শহিদ ক্ষুদিরামের মামলায় তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৯৩০ সাল থেকে রংপুর জেলার বহু বিপ্লবী কর্মী বিনা বিচারে আবদ্ধ ছিলেন। অনেকে রাজদ্রোহমূলক বিভিন্ন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সাল থেকে বিনা বিচারে আটক বাংলার রাজবন্দিগণ ক্রমশ মুক্ত হয়ে আসতে থাকেন এবং জেলজীবনে তাঁদের রাজনৈতিক বিকাশ লাভ ঘটে।

কমরেড সতীশ পাকড়াশীর পূর্বতন পলাতক জীবনের অন্যতম সাথী উলিপুরের প্রয়াত যোগেন মজুমদার মার্কসবাদ গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত একনিষ্ঠ থাকেন।

১৯৩৬-৩৭ সালে কমরেড পাকড়াশী বদরগঞ্জ থানায় অন্তরিন আটক থাকেন। সে সময় সেখানকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী বিজয় রায় এবং শচীন রায় নিজ বাড়িতে অন্তরিন অবস্থায় ছিলেন। তারা সে সময় মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করে মার্কসবাদের পথ গ্রহণ করেছিলেন। কমরেড সতীশ পাকড়াশী তাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেন। তিনি সেখানে গোপনে মার্কসবাদ পাঠচক্র সংগঠিত করেন।

কমরেড বিজয় রায় স্মৃতিচারণায় লিখেছেন যে, 'বদরগঞ্জে যাতে কৃষক আন্দোলন আরম্ভ করা যায় তার জন্য প্লান প্রোগ্রাম স্থির করবার কাজে হাত দিয়েছিলাম। কারণ উত্তরবঙ্গের একটা প্রসিদ্ধ কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা [বাতাসন রায়ত সমিতির নেতৃত্বে জমিদারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে খাজনাবন্ধ আন্দোলন—১৯২১-২৩ সাল, সম্পাদক] আমাদের ছিল। ওই আন্দোলন করতে গিয়ে আমার কাকা প্রয়াত ঠাকুরপ্রসাদ রায় জমিদারের পাঠানো গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।'

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ থানায় প্রয়াত প্রখ্যাত মার্কসবাদী পণ্ডিত কমরেড রেবতী বর্মণ অন্তরিন আটক ছিলেন। তিনি সেখানে কিছু কিছু কাজ করতে চেষ্টা করেন।

প্রতিটি পার্টি কর্মীকে কৃষকশ্রেণীর সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, শ্রেণীর সংগঠনের কাজ করতে হবে, এই নীতি ও সংকল্প নিয়ে সমস্ত মুক্ত কর্মীরা জেলার গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।

অন্য দিকে এরাই তৎকালীন নিষ্ক্রিয় কংগ্রেস সংগঠন পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। সারা ভারত কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে গৃহীত গণ-সংযোগ কার্যক্রম এবং স্বতন্ত্র কৃষক সংগঠনের কাজ সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রায় সব কর্মীই কংগ্রেসের জেলা, মহকুমা বা স্থানীয় নেতৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কংগ্রেসের বেশিরভাগ প্রাচীন নেতা ও কর্মী কংগ্রেসের এই নবজাগরণে উৎসাহিত হন। প্রাচীন জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা কমরেড দীনেশ লাহিড়ী, কৃষক আন্দোলনেরও সংগঠনের অগ্রণী পথপ্রদর্শক হন। কমরেড অবনী বাগচী, শচীন ঘোষ, মণিকৃষ্ণ সেন, শিবদাস লাহিড়ী, রথীন গাঙ্গুলী, সুরেশ রায়চৌধুরী, নৃপেন ঘোষ, অমৃত মুখার্জি, পরেশ মজুমদার, বিমল ভৌমিক, বীরু চক্রবর্তী, ফণী বক্সী, লেখক স্বয়ং প্রভৃতি ছিলেন অগ্রণী পথিকৃৎ।

এলাকাগত সমিতি গঠন:

কৃষক সভা 'জমিদারি প্রথা বিনা ক্ষতিপূরণে উচ্ছেদের' ও 'লাঙল যার জমি তার' ধ্বনি সম্মুখে নিয়ে আন্দোলনে অগ্রসর হয়। কৃষক সভার জন্ম থেকেই কোর্ফা প্রজাদের স্থায়ী স্বত্বের দাবি, নিলাম, উচ্ছেদ, ক্রোক বন্ধ আন্দোলন, জমিদারের আবওয়াব, বাজে আদায় বন্ধ, তহরী মহুরি বন্ধ আন্দোলন নিয়ে লড়াই শুরু হয়। বাজে আদায় বলতে কত বিচিত্র রকম ছিল ধারণা করা যায় না। যথা বিবাহ ব্যয়, অন্নপ্রাশন, পৈতা, বন্দুক কেনা, সাইকেল কেনা, মটরগাড়ি কেনা ইত্যাদি।

এই বাজে আদায়, আবওয়াব বন্ধ আন্দোলন সর্বত্র জঙ্গিরূপ নেয়। এই সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে সদরের কালীগঞ্জ থানার কৃষক সমিতি।

টেপার জমিদারিতে অত্যাচার ছিল চরম। অনেক সময় জমিদারের হাতি দিয়ে মাঠের ফসল নষ্ট করে প্রজা শায়েস্তা করা হত। হাতি দিয়ে চাষির গ্রাম তছনছ করে দেওয়া হত। প্রজাকে হাতির পায়ের সঙ্গে বেঁধে বিছুটি পাতা (চোতরা পাতা) দিয়ে ধোলাই করা হত।

১৯৩৮-এ খাজনা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারি করা হয়। চাষিদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি হয়। কমরেড অবনী বাগচী, দীনেশ লাহিড়ী, নৃপেন ঘোষ, পরেশ মজুমদার, মহী বাগচী, বিমল ভৌমিক প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কর্মীগণ কালীগঞ্জের গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি করে বসেন।

জেলা শহরে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ডেপুটেশনের প্রোগ্রাম করা হয়েছিল। পথ পঁচিশ-ছাব্বিশ মাইল। মিছিলের দিন, রাত বা ভোর তিন-চারটার সময় কর্মীরা বের হয়ে পড়েন। কুয়াশা-ঢাকা ভোর। আটশো কৃষক জমায়েত হন। তিস্তা নদী এবং তার প্রসারিত বালুচর পার হয়ে যেতে হয়। ততক্ষণে রৌদ্রে বালু উত্তপ্ত। রংপুর শহর পৌঁছাতে দুপুর দুটো-তিনটে হয়। কৃষকের দাবি ডেপুটেশন সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সংবাদ দেওয়া ছিল। সমবেত কৃষক সমাবেশে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বাজে আদায়, জুলুম অত্যাচার বন্ধ করবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

এই মিছিল ও ডেপুটেশনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সেই যুগে শতাধিক কৃষকের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কৃষক সমিতির ধ্বনি দিতে দিতে লাল ঝান্ডা উড়িয়ে পনেরো-ষোলো মাইল গ্রামের পথ দিয়ে অভিযান শুধু বিস্তৃত এলাকাকে জাগরিত করে তোলে তাই নয়, সংগঠনের

মধ্যেও নিয়ে আসে এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক চিন্তাও নতুন মোড় নেয়।

কমিউনিস্ট পার্টি গঠন:

১৯৩৭ সালের শেষভাগে আন্দামান প্রত্যাগত পার্টি নেতা প্রয়াত কমরেড দেবকুমার দাস প্রাদেশিক পার্টি কমিটির নিকট থেকে একটি নির্দেশমূলক চিঠি নিয়ে আসেন। তদনুসারে কমবেড অবনী বাগচী, শচীন ঘোষ, শিবদাস লাহিড়ী, বিনয় বাগচী ও সুরেশ রায়চৌধুরীকে প্রার্থী সভ্যপদ দিয়ে, একটি অস্থায়ী জেলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় (অবনী বাগচীর চিঠি থেকে)। ১৯৩৮ সালে জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

কৃষক আন্দোলনের প্রসার:

সদর মহকুমার বদরগঞ্জে প্রতি বৎসর শীতে এক মাস ব্যাপী একটি বড় মেলা বসে। বহু দূর দূরান্ত থেকে ওই মেলায় কৃষকেরা হালের গোরু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করতে আসেন। ওই সময়ে প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি রংপুরে পার্টি গঠনের কাজে আসেন। তাদের নিয়ে এই জেলায় একটি জনসভা করা হয়। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি জমিদার, মহাজনদের শোষণের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে আহ্বান করেন। সভার পূর্বে লালঝান্ডা নিয়ে কৃষকের একটি শোভাযাত্রা মেলাটি পরিক্রমা করে। সমবেত কৃষকগণ বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ হন এবং নিজ নিজ অঞ্চলে সভা সমিতি করতে অনুরোধ করেন। সদর মহকুমার কর্মীগণ পীরগাছা কালীগঞ্জ, হাতিবান্ধা, বদরগঞ্জ রংপুর শহরের উপকণ্ঠের গ্রামসমূহে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা গ্রামের কৃষকের বাড়িতে আস্তানা খুঁজে নেন।

কমরেড মণিকৃষ্ণ সেনকে জেলা কংগ্রেস নেতা ও সম্পাদক হিসাবে মুখ্যত কাজ করতে হয়। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রেখেই কাজ হয়। কমরেড শচীন ঘোষ রংপুর শহরে ছাত্র, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত আন্দোলনের দায়িত্বসহ শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এলাকায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন। এই সময় আন্দামান বন্দিমুক্তি আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। রংপুরের সর্বত্র তীব্র আন্দোলন হয়। রংপুর কলেজ, কুড়িগ্রাম স্কুল থেকে ছাত্রদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। ১৪৪ ধারা অমান্য করে শোভাযাত্রা পরিচালনার অপরাধে শচীন ঘোষ সহ বহু ছাত্র যুবকর্মী গ্রেপ্তার হয়। অক্লান্তকর্মী কমরেড রথীন গাঙ্গুলী নীলফামারি মহকুমার সর্বত্র কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। আবু হোসেন সরকার জেলা কৃষক সমিতির সভাপতিও ছিলেন। পরে প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতি মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন।

কুড়িগ্রামে ক্রমশ সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৮ সালে মে দিবস উৎযাপনের জন্য ব্যাপক প্রচার হয়। এটি কৃষক সভা দিবস হিসাবে পালন করা হয়েছিল। এই সভার শেষে একজন বয়স্ক দাড়িওয়ালা মুসলমান কৃষক এই লেখকের হাত ধরে বললেন, "আমি গদাই মিঞা, গান্ধীর ভলানটিয়ার। ভাল নাম তমিজ উদ্দিন। বাড়ি বুড়াবুড়ি (উলিপুর)।' ১৯২১ সালে গান্ধীর আন্দোলনে যোগ দেন। তাতে তাঁর মন ভরে নাই। এতদিনে কৃষক সমিতি আর লালঝান্ডা তাঁর মনের কথা বলেছে। দুর্গাপুরের বর্ষীয়ান কৃষক ও পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন দীননাথ সরকার। এই সভায়, একই ধারায় এসে লালঝান্ডা হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। এই সব কমরেডদের গ্রামে, বাড়িতে কর্মীদের ছয় আস্তানা হয়। সমিতি সংগঠিত হতে থাকে।

কুড়িগ্রাম মহকুমা কৃষক সমিতি গঠিত হয়। নেতৃত্বের প্রথম সারিতে প্রথম যুগে অনেক

পুরাতন খিলাফতি ও কৃষকপ্রজা কর্মীরা থাকেন। এই সময় ব্রহ্মপুত্র নদে প্রবল বন্যা হয়। জেলা পার্টি, কুড়িগ্রামের পার্টি কংগ্রেস, কৃষক প্রজা এবং কৃষক সমিতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্য দিকে জমিদারি, সরকারি আদায়, তশিল, জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমিতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কমরেড হরিকান্ত সরকারের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, 'রংপুর নিবাসী টেপার জমিদার সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার করত। মাঠে প্রজা হাল বইছে, সেই অবস্থায় বরকন্দাজ হালমাঝি ও হালবাড়ি থেকে প্রজাকে গলায় গামছা লাগিয়ে কাছারিতে ধরে নিয়ে যেত। এই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে নাওতারা টেপায় একটি জনসভা হয়। নিজেদের একতার প্রকাশ হিসাবে হাট বন্ধ করবার জনা কৃষক সভা থেকে ঘোষণা করা হয়। জমিদার ঘোষণা করেন যে, প্রজাদের হাট কবতেই হবে।

পরদিন চারিদিক থেকে হাজার হাজার চাষি র‍্যালি করে হাটে উপস্থিত হয়। জমিদার ও তার লোকজন বন্দুক নিয়ে বাহির হয়ে এলে শ্লোগান দেওয়া হয়: 'গতর খেটে চাষ করি, জমিদারের কী ধার ধারি', 'জমিদারের জুলুমবাজি চলবে না' ইত্যাদি। ভয়ে জমিদার প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচার; অন্যায় খরচ আদায় প্রভৃতি বন্ধ করবার দাবি মেনে নেন।'

আমাদের জয় দেখে জনগণ একতাবদ্ধ হতে আবম্ভ করে। গ্রামে গ্রামে ভলেন্টিয়ার হতে আরম্ভ করে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধে। এইভাবে আস্তে আস্তে সংগঠন গড়ে ওঠে। গাইবান্ধা মহকুমার কাজ আরম্ভ হলেও প্রকৃতপক্ষে জনযুদ্ধ যুগে ব্যাপক কৃষক সমিতি গঠিত হয়।

সমিতির আইন আদালতগত কাজ:

জেলা কৃষক সমিতির একটি আইন বিভাগ ছিল। জমিদার মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষককে আইনগত সাহায্য করা ছিল এই বিভাগের কাজ। কমরেড মণি মজুমদাব ছিলেন এই বিভাগের দায়িত্বে। তিনি, বিনয় দাস, বিশ্বেশ্বর লাহিড়ী প্রভৃতি কয়েকজন আইনজীবীর সাহায্যে এই কাজ চালাতেন। কমরেড মণি মজুমদার নিজে বিশিষ্ট উকিল। তৎকালীন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা শ্রদ্ধেয় জিতেন চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সাংস্কৃতিক কর্মী জগদীশ দাশগুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করতেন।

একটি ঐতিহাসিক মামলা:

কিশোরগঞ্জ থানার একজন গরিব কৃষকের একখণ্ড জমি একজন ধনী কৃষক দখল করে কয়েক বছর ধরে ভোগ দখল করে। ওই গরিব চাষিটির নিকট তার মালিকানার কোনও সরকারি দলিল ছিল না। ১৯২১ সালে জাতীয় আন্দোলনের সময় এখানে গণ-অভ্যুত্থান হয়ে 'স্বাধীন সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্বাধীন সরকারের আদালতের একটি দলিল তার ছিল। মামলা চালাবার ক্ষমতা তার ছিল না। সে কৃষক সমিতির সাহায্য প্রার্থনা করে। কৃষক সমিতি সাগ্রহে এগিয়ে আসে। নীলফামারি মুনসিফ কোর্টে ওই দলিল বেআইনি বলে কৃষকটির বিপক্ষে রায় দেয়। তখন রংপুর জজকোর্টে আপিল করা হয়। জেলা জজ এস. কে. হালদার-এর এজলাসে মামলা ওঠে। সমিতির উকিলগণ এই যুক্তি উত্থাপন করেন যে, উক্ত দলিল বৈধ হোক বা না হোক তা এ কথা প্রমাণ করে যে জমিটি ওই চাষির। জজ যুক্তিটি গ্রহণ করে কৃষকটির অনুকূলে রায় দেন। এটা একটা অভাবনীয় জয় ছিল। এই

মামলার মধ্য দিয়ে নতুন করে সকলে জানলেন যে, রংপুরে ১৯২১ সালে ওই এলাকায় একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রংপুরের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ উকিল শ্রীঅক্ষয় সেন এবং শ্রীজিতেন চক্রবর্তীর নিঃস্বার্থ সাহায্য এই মামলায় পাওয়া গিয়েছিল।

১৯৩৮ সালে রংপুরে জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে বিপুল ভোটাধিক্যে পৃথক কৃষক সমিতি গড়বার অধিকারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরের দিন ওই মণ্ডপে প্রাদেশিক কৃষক কমিটির জনাব আবুল হায়াতের সভাপতিত্বে জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। কমরেড আবদুল্লাহ্ রসুল, আবদুল মমিন প্রভৃতি কমিউনিস্ট পার্টির নেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে জেলা কৃষক সমিতি গঠিত হয়। প্রাদেশিক কমিটিগুলি যখন গঠিত হচ্ছিল, তখনই অনেকগুলি আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল। আন্দোলনের দাবিগুলি ছিল—এক, তহুরি, আবওয়াব, বকেয়া খাজনার সুদ প্রভৃতির বিলোপ। দুই, কোর্ফা প্রজার উপরে স্থায়ী স্বত্ব দান। তিন, কর্জা ধানের সুদ শতকরা পঁচিশ ভাগ করা (তখন চল্লিশ ভাগ সুদ প্রচলিত ছিল)। চার, তামাকের ওপর সরকারি শুল্কের বিলোপ সাধন (ওই সময় ফজলুল হক মন্ত্রীসভা তামাকের ওপর শুল্ক ধার্য করেছিলেন। ফলে কৃষকরা দাম কম পেতেন)। পাঁচ, মহাজনের কাছ থেকে কৃষকরা যে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে যেগুলো বাস্তবে শোধ করা হয়েছিল কিন্তু মহাজন দলিলে ওয়াসিল দেননি, সেগুলি মকুব করা এবং সুদের হার কমানো। ছয়, জমিদারি প্রথার বিলোপ। সাত, লাঙল যার জমি তার নীতির প্রবর্তন। আট, দশের 'হারি মাটির' ভিত্তিতে চৌকিদারি ট্যাক্স ধার্যকরণ। অর্থাৎ মৌজার জনসাধারণ জনসভায়, সকলের মতামতের ভিত্তিতে ট্যাক্স ধার্য করা।

'লাঙল যার জমি তার' দাবিটি পরে ছোট কৃষকদের আপত্তির ফলে পরিত্যক্ত হয়। পরিবর্তে 'চাষ করে যে জমির মালিক সে' ধ্বনি চালু হয়। কারণ, ছোট চাষিদের বক্তব্য হয় যে, 'লাঙল যার জমি তার' নীতি ধনী মধ্যচাষির অনুকূল। যে চাষির নিজের হাল নেই অন্যের হাল ভাড়া করে চাষ করে, এই ধ্বনি তাদের স্বার্থের প্রতিকূল।

জেলা কৃষক সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন:

১৯৩৯ সালে কালীগঞ্জ থানার চন্দনপাট গ্রামে রংপুর জেলা কৃষক সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড আবদুলাহ্ রসুল সভাপতি ছিলেন। তা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জি ও নলিনী ঘোষ সম্মেলনে এসেছিলেন। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে দুই শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছিলেন। বহু দূর দূর অঞ্চল থেকে মিছিল এসেছিল। প্রতিনিধি সম্মেলনে তৎকালীন কৃষক সমস্যা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যুগ:

উল্লেখ্য যে, ১৯৩৯ সালে রংপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির মূল রণধ্বনি ছিল 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধে পরিণত করো'। জাতীয় রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান করে, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে স্থানীয় খণ্ড খণ্ড আন্দোলনের ভিত্তিতে জাতীয় বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলো। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন রাজনৈতিক দলিলের ভিত্তিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংগ্রাম গড়ে তুলবার চেষ্টা হয়।

১৯৩৯ সালে কালীগঞ্জ থানার চন্দনপাট গ্রামের জেলা কৃষক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়। ভারত রক্ষা আইন কার্যত অচল করে দিয়ে, সভা সমিতি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য, নানা কৌশল গ্রহণ করে সংগ্রামের পথ গ্রহণ করা হয় ও সংগ্রামের পন্থা গ্রহণ করা হয়। কৃষক সমিতির সাধারণ অধিবেশনকে সমাবেশে পরিণত করা হতে থাকে। বিশেষ কায়দায় জঙ্গি মিছিল সংগঠন করা হয়। কর্মীরা বেশ সাফল্যের সঙ্গে সর্বত্র মিটিং মিছিল সংগঠিত করার কায়দা আয়ত্ত করেন।

১৯৪০ সালে ২৮ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস ও দমননীতি বিরোধী দিবসে জেলার প্রতি কেন্দ্রে ভারতরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসমাবেশ হয়। এই উপলক্ষে হাট হরতাল, লাঙল বন্ধ, পোস্টার দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপকভাবে হয়। প্রতি জমায়েতে পাঁচ থেকে দশ হাজার মানুষ উপস্থিত থাকে। রংপুর শহরে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবিতে ক্রমাগত সভা হয়েছে। কৃষক এলাকা থেকে দশ হাজারের ওপর গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এই অবস্থায় জেলা নেতাদেব সবার নামে ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী সমন জারি করা হয়। এই অবস্থা আশঙ্কা করে সতর্কতা হিসাবে পূর্বেই প্রাদেশিক কমিটি জেলা নেতৃবৃন্দকে আত্মগোপন করতে নির্দেশ দেন। কমরেড অবনী বাগচী, লেখক স্বয়ং, শচীন ঘোষ, শিবদাস লাহিড়ী, রথীন গাঙ্গুলী প্রমুখ আত্মগোপন করে কাজ করেন।

সৈয়দপুর রেলকারখানা কেন্দ্র থেকে পাঁচ জন শ্রমিক নেতাকে বহিষ্কার করা হয়। রংপুর কারমাইকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ গাইবান্ধার কমরেড আবুল মোকসেদ ও নির্মল বর্মণকে কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য কবেন। কুড়িগ্রামের ছাত্র কর্মী কমরেড জীবন দে, অনিল দেব, সুশীল সেন প্রভৃতিকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। ডিমলা ও লোহানি গ্রামে আই. বি ক্যাম্প স্থাপিত হয়। আড়াইশো জন কৃষক কর্মীর নামে ওয়ারেন্ট, ভীতি প্রদর্শন সূর্যাস্ত-সূর্যোদয় অন্তরিন আদেশ জারি করা হয়। জেলা কংগ্রেস সম্পাদক ও কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি সদস্য কমবেড মণিকৃষ্ণ সেনের কংগ্রেস কার্যালয়ে গমন নিষিদ্ধ হয়। এই অবস্থায় জেলা পার্টি অফিস সহ ষোলোটি গোপন পার্টি কেন্দ্র গড়া হয়। ছয় জন গোপন জেলা পার্টি সংগঠকসহ উনিশ জন গোপন পার্টি সংগঠক ঘুরে ঘুরে পার্টি সংগঠন ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পাক্ষিক ভিত্তিতে দুশো পার্টি বুলেটিন এবং মাসে মাসে যুদ্ধবিরোধী ইস্তাহার প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। নভেম্বর দিবসে এক হাজার পোস্টার দেওয়া হয়। উপরোক্ত গোপন নেতারা ছাড়া যাঁরা গোপনে কাজ কবেন তাঁরা হচ্ছেন কমরেড নৃপেন ঘোষ, অমৃত মুখার্জি, পরেশ মজুমদার, মহী বাগচী, মণীশ রায়, জীবন দে, অনিলগোবিন্দ দেব, সুশীল সেন, মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি।

এই সব নেতা ও কর্মীগণ স্থায়ীভাবে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে অবস্থান করেন। এইভাবে আন্দোলনের নতুন উচ্চতর পর্যায় শুরু হয়। কৃষক কর্মীদের নিয়মিত মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস, ইন্ডিয়া টু-ডে, সোভিয়েট পার্টির ইতিহাস ক্লাস চলতে থাকে। অনেক পার্টি কর্মী পত্রিকা পড়বার আগ্রহ থেকে নতুন করে বর্ণপরিচয় শিক্ষা কবেন। এদের কেউ কেউ পাঠচক্রের নেতা হয়ে ওঠেন। এইভাবে গ্রাম অঞ্চলে সংগঠিত রাজনৈতিক সচেতন পার্টি কর্মী গ্রুপ গড়ে ওঠে।

হাটের তোলা বন্ধ আন্দোলন:

১৯৩৯-এর শেষভাগে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হাটের তোলা বন্ধের দাবিতে ব্যাপক

জঙ্গি আন্দোলন সংগঠিত হয়। প্রথম আরম্ভ হয় জলপাইগুড়ি জেলায়। সঙ্গে সঙ্গে তা দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় সংগঠিত হয়। ক্রমে মালদহ, ময়মনসিং, যশোহর, চব্বিশ পরগনা ও অন্যান্য জেলায় প্রসারিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর রংপুর জেলায় হাটের তোলাবন্ধের দাবি নিয়ে অনেক বড় বড় ধারাবাহিক সফল সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে।

রংপুর, দিনাজপুব, জলপাইগুড়ি জেলার সংগঠন ও আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। রংপুর জেলার ডোমারে রংপুর ও জলপাইগুড়ির নেতৃত্বের যুক্ত আলোচনার স্থান ছিল। আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল প্রচণ্ড। এই আন্দোলন এক দিকে সামন্ত শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি লড়েছে, অন্য দিকে ভারত সরকারের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন হিসাবে প্রকাশ্য অভিযান করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের তৎকালীন নিষ্ক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক সমিতি একটি বিশিষ্ট সংগ্রামী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি হিসাবে সকলের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অভিনন্দিত হয়েছে।

কুড়িগ্রাম মহকুমাসহ সদরের কালীগঞ্জ থানা নিয়ে সে সময় একটি কমিউনিস্ট পার্টির লোকাল কমিটি ছিল। এই সমগ্র এলাকার আন্দোলন পরিচালনার একটি পরিকল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল। প্রথমে বেছে দেওয়া হয় একটি মাঝামাঝি ধরনের হাট যার চারপাশে কৃষক সংগঠন ব্যাপক ও শক্তিশালী, যেখানে কৃষক আন্দোলনের কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, সেখান থেকে আন্দোলন চারপাশে ছড়িয়ে দেবার সুবিধা ছিল। প্রথমেই বড় বড় শক্তিশালী কায়েমি স্বার্থ ঘাঁটিগুলি আক্রমণ না করে চারপাশে আন্দোলনের ঢেউ তুলে এবং সংগঠন শক্তিশালী করে এ সমস্ত কায়েমি স্বার্থের ঘাঁটির ওপর আন্দোলনের বন্যা প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। ওই সব কায়েমি স্বার্থের ঘাঁটির ওপরে হাজার হাজার ভলান্টিয়ার অভিযান করে, হাটের হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে এক হয়ে জমিদার, ইজারাদার পুলিশের বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। হাটের তোলাগণ্ডি বন্ধ হয়ে যায়।

তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারত রক্ষা আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, একটি দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। এই দৃষ্টিভঙ্গি রেখে উপস্থিত সংগ্রাম একটি স্থানীয় খণ্ড সংগ্রাম, চূড়ান্ত সংগ্রাম নয়, সেইভাবে আন্দোলন পরিচালনার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। এই আন্দোলনেব সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে পার্টি ও গণসংগঠন শক্তিশালী করে, শোষক শ্রেণীদের অনিবার্য হিংস্র আক্রমণ যথাসাধ্য এড়িয়ে পরবর্তী পর্যায়ের সংগ্রামের প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করে রংপুর জেলা পার্টি বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিল; অভিজ্ঞতায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির রংপুর জেলা কমিটি জেলার সব কয়টি সমিতি এলাকায় এই আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং স্থানীয় পার্টি ও সেলগুলিকে এ বিষয়ে তৎপর করে। দ্রুতগতিতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই আন্দোলনের দাবি এইভাবে তোলা হয়েছিল। এক, কৃষকের গণ্ডি নেই (হাটের তোলা)। দুই, বাঁধা দোকানগুলি থেকে রসিদ দিয়ে খাজনা নিতে হবে। তিন, গোরু ছাগল প্রভৃতি ক্রয়ের রসিদ বাবদ আদায় কমাতে হবে। চার, হাটের ইজারা প্রথা তুলে দিয়ে দলের কমিটির হাতে হাট পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

সারা জেলায় তালিকাভুক্ত ভলান্টিয়ারের সংখ্যা গড়ে উঠেছিল, প্রায় দশ হাজার।

তালিকার বাইরেও বহু ভলান্টিয়ার ছিল। কয়েকটি হাটের তোলাগণ্ডি আন্দোলনের বর্ণনা দেওয়া হল।

কাঁঠালিবাড়ি হাট:

এই হাটটি কুড়িগ্রাম ও লালমণির হাট থানার সংযোগস্থলে অবস্থিত। এটি ঘড়িয়ালডাঙ্গা জমিদারের সম্পত্তি ছিল। জমিদার ছিলেন অপদার্থ ও দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই জেলার তোলাবন্ধ আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং অন্যত্র তা প্রেরণা সৃষ্টি করে।

আশেপাশে কয়েকটি ইউনিয়নে ইতিমধ্যেই সমিতি গঠিত হয়ে গিয়েছিল। জমিদার ইজারাদারের জুলুমের বিরুদ্ধে চারপাশের কৃষকগণ আন্দোলনের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। জলপাইগুড়ির আন্দোলনের সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছেছিল। স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে অনেকের হাটতোলা বন্ধ আন্দোলনের পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল। লেখক স্বয়ং এখানে প্রথম সমিতি গঠন করেন। স্থানীয় সমিতির নেতা কমরেড হরেন্দ্র বর্মণ, নরেন্দ্র দেও, ধরণী কারজি, দয়ারাম বর্মণ, নুটকুল বর্মণ প্রভৃতি ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে নেতৃত্ব দেন। কমরেড অনিল দেব, জীবন দে, মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কর্মীগণ পরিচালনা করেন। হাটের চারপাশের দুই-তিন মাইলের গ্রামসমূহ থেকে প্রায় দুই শত ভলান্টিয়ার 'জমিদারি প্রথা ধ্বংস হউক', 'লাঙল যার জমি তার', 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ধ্বংস হউক', 'সভা সমিতির অধিকার রক্ষা করো', 'হাটের তোলা বন্ধ করো' ও 'কৃষকেব গণ্ডি নাই' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে মিছিল করে এসে হাট পরিক্রমা করে তোলা আদায় বন্ধ করে দেয়। জমিদারের দারোয়ান, গুণ্ডা ও পুলিশ জমিদারের স্বার্থ রক্ষা করতে এসে ভলান্টিয়ারদের ওপর হামলা শুরু করে। হাটের মানুষ অমনি ভলান্টিয়ার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের তাড়া করে। তারা এমন অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। হাটের লোকজনদের হাতে মার খেয়ে কোনও মতে পালিয়ে বাঁচে। পর পর কিছু হাটে ভলান্টিয়ার এসে কৃষকদেব তোলা থেকে রেহাই পাবার এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

এই সাফল্যে চারপাশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে থেকে সমিতি ও ভলান্টিয়ার সংগঠন তৈরি করে দেবার জন্য আবেদন আসতে থাকে। চারপাশের ছোটখাটো হাটে স্থানীয় কৃষকরা নিজেরাই অভিযান করে তোলা বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি গ্রামে কর্মী গ্রুপ ও পার্টি গ্রুপ গঠন ও শিক্ষিত করে তুলবার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উলিপুর হাট:

এটি রংপুর জেলার বৃহত্তম হাট। সুদূর গারো পাহাড় অঞ্চল থেকে আদিবাসীরা ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে তুলো ও অন্যান্য গারো এলাকার কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে এই হাটে বিক্রি করতে আসতেন। এই হাট কাশিমবাজার মহারাজার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমগ্র বাহার বন্দ পরগনার (গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম মহকুমা) এই মহারাজার সদর কাছারি হাটের সংলগ্ন। উলিপুর পুলিশ থানাও হাটের সংলগ্ন। কাজেই ভারত রক্ষা আইন অমান্য করে এই হাটে সফলতার সঙ্গে তোলাবন্ধ আন্দোলন করা বিশেষ কঠিন ও তাৎপর্যপূর্ণ কাজ ছিল।

উলিপুর থানায়, বিশেষভাবে খুড়াবুড়ি এলাকায় একেবারে প্রথম যুগেই সমিতি গঠিত হয়েছিল। দুর্গাপুর এলাকাতেও প্রায় একই সময়ে গঠিত হয়েছিল। প্রথমে বিভিন্ন এলাকায়

স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মীরা থানার প্রায় সমস্ত ছোটখাটো হাটে আন্দোলন করে তোলা গণ্ডি আদায় বন্ধ করে দেয়। সর্বত্র শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয় এবং শত শত ভলান্টিয়ার সংগঠিত হয়। পরবর্তী স্তরে সমস্ত শক্তি সংগঠিত করে উলিপুর হাট অভিযান করা হয়। কমরেড মণীশ রায়, অনিলগোবিন্দ দেব, রবি লাহিড়ী, তনুরুদ্দিন মিঞা, যোগেশ বর্মণ, পূর্ণ বর্মণ, দীনবন্ধু সরকার, সুরেন রায়, শচীন বর্মণ, বিশ্বম্ভর সাহা, বিভূতি চক্রবর্তী প্রমুখ এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। উলিপুর বন্দরের কংগ্রেস কমিটির প্রধান সভাপতি ও পার্টি সমর্থক যোগেন মজুমদার সহ সকলেই আন্দোলনে সহযোগিতা করেন। পরপর কয়েক হাট জমিদার ও পুলিশের সন্ত্রাস, লাঠিবাজি, গুণ্ডামি, গ্রেপ্তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে সহস্রাধিক সংগঠিত লালঝাণ্ডা সহিত লাঠিধারী ভলান্টিয়ার বাহিনী হাটের হাজার হাজার কৃষক সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় হাট তোলা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। ফলে প্রতি গ্রামে অকথ্য পুলিশি অত্যাচার হয়। বহু সংখ্যক কর্মীর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা হয়। কিছু গ্রেপ্তার করা হয়। উলিপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সত্যেন লাহিড়ীকেও এ সময় ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। জমিদার, পুলিশ, গুণ্ডা জোটের এত আক্রমণ সত্ত্বেও কিন্তু গোপন সংগঠন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরই হয়েছিল। আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে পার্টি তার মূল লক্ষ্যে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে।

বড়বাড়ি হাট:

এই হাটটি লালমণির হাট থানার অন্তর্গত এবং জেলার বিরাট বিরাট হাটগুলির অন্যতম। সপ্তাহে দুদিন হাটের মধ্যে বুধবারের হাটটি প্রধান ছিল। এইদিন হাটটিকে গোরুর হাট বলা হত। বহুদূর অঞ্চল থেকে দালাল ও কৃষকরা গোরু ছাগল কেনা-বেচা করতে আসত। পাটের কেনা-বেচার হাট হিসাবে এই হাটটি একটি বিশেষ কেন্দ্র ছিল।

হাটটির মালিক ছিল ভাগ্যকুলের জমিদার এবং ইজারাদার ছিলেন একজন প্রভাবশালী লিগপন্থী মুসলিম জোতদার। এলাকাটি মুসলিম লিগের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কমরেড দয়াময় বর্মণ ও লেখকের চেষ্টায় এখানে ধনী চাষি জানকী রায়ের বাড়ি কেন্দ্র করে কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। ক্রমে এটি আন্দোলনের কেন্দ্র, ভলান্টিয়ার শিক্ষার কেন্দ্র হয়েছিল। কমরেড অনিল দেব এখানে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। হাটের চারপাশে পাঙ্গা, ঘড়িয়ালভাঙ্গা, সিন্দুরমতী, কুলাঘাট, মানিবাড়ি প্রভৃতি স্থান নিয়ে চার-পাঁচটি ইউনিয়ন সমিতি ও বিরাট সংখ্যক শক্ত ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠিত হয়। এই হাটে জমিদার ইজারাদারের অত্যাচার বন্ধের জন্য সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। অন্য দিকে ইজারাদার পুলিশের তোড়জোড় ও হুমকির ঘাটতি ছিল না। শেষ পরিকল্পনা মতো অভিযান আরম্ভ হয়। প্রথম দিন স্থানীয় ভলান্টিয়ার বাহিনী ছাড়াও তিস্তা এলাকার তিন-চারটি ইউনিয়নের এবং লালমণির হাট ও কালীগঞ্জ এলাকার তিনটি ইউনিয়ন থেকে কয়েকটি বাহিনীও অংশ গ্রহণ করে। বড়বাড়ি এলাকার মুসলমান চাষি, লিগ পাণ্ডাদের বাধা অগ্রাহ্য করে আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে।

পুলিশ, ইজারাদার, গুণ্ডা বাহিনী প্রথম দিন মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে, হাজার হাজার লোকের দ্বারা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে হাত জোড় করে পালিয়ে যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে কৃষক সমিতির কৌশল ছিল যথাসম্ভব মারপিট না করে এদের হটিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় দিন থেকে

স্থানীয় সমিতি আন্দোলন চালিয়ে যায়। হাটের তোলাগণ্ডি আদায় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। পশু ক্রয়-বিক্রয়ের লেখাই বাবদ যে অর্থ জুলুম করে আদায় হত, তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয় এবং কৃষক সমিতির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা চালু হয়। এই হাটে গণ্ডি তোলা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই ধারণা সবার নিকট অকল্পনীয় ছিল। এই সাফল্যের সংবাদ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃষক সমিতির জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের প্রভাব ব্যাপকভাবে জনগণের ওপর পড়ে।

মুস্তফি হাট:

মাঝামাঝি স্তরের এই হাটটি তিস্তা এলাকার তিন- চারটি ইউনিয়নের কেন্দ্র। এই হাটের ইজারাদার ছিল এক জন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলিম লিগ পন্থী জোতদার। মানুষকে বিপদে ফেলে শোষণ করাই তার ব্যবসা। তাই এখানকার হিন্দু মুসলমান সকলেই ছিল তার ওপর বিক্ষুব্ধ। একে দমন করতে সকলেই উৎসুক ছিল। এই অবস্থায় হাটের গণ্ডি বন্ধ আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাল। আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইজারাদার মুসলিম লিগের ফতোয়া জারি করে মুসলমান কৃষকদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি।

কাঁঠালবাড়ি আন্দোলনের পরেই কমরেড মনোরঞ্জন গুহ এবং ইন্দু মুখার্জি এই এলাকায় ব্যাপক ও শক্তিশালী কৃষক সমিতি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গডে তোলেন। কমরেড নৃপেন ঘোষ তাদের সাহায্য করেন। অনেকগুলি ছোটখাটো হাটে তোলা বন্ধ করে দেবার পর মুস্তফির হাটে অভিযান করা হয়। সহজেই এখানে তোলা বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ ভারত রক্ষা আইনের সাজানো সাক্ষীর সাহায্যে কয়েকজনের নামে থানায় এজাহার দেয়। এদের নয় মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কমবেড মনোরঞ্জন গুহ, দেবেন্দ্রনাথ রায়, খোকা বর্মণ (নাবালক), মহিম বর্মণ, কমলা বর্মণ, মোহন ডাক্তাব, মজুম মিঞা ও আরও দু-তিন জন এদের মধ্যে অন্যতম। প্রবীণ নেতা ডা. কমলাকান্ত রায় ও বৃদ্ধ জসিমউদ্দিন মুনশি (খিলাফতি) এই আন্দোলনে পুরোপুরি অংশ নেন। কিন্তু সমস্ত এলাকায় এরা এত বেশি জনপ্রিয় ছিলেন যে, এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সম্ভব হয় নাই।

লালমণির হাট:

বাংলার পূর্ব অঞ্চলে তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রেলঘাঁটি ছিল লালমণির হাট জংশন। পাশেই ধরলা নদীর পারে শক্তিশালী কৃষক সমিতির ঘাঁটি যোগন হাট। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে এখানে ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহ ও শেষ সংগ্রাম হয়েছিল। জায়গাটি মুর্শিদাবাদ নবাব এস্টেটের জমিদারি ছিল। এখানে কৃষক সমিতির কাজ করতেন কমরেড বিরাজ নিয়োগী। যুদ্ধকালীন দমন নীতির পরিস্থিতিতে রেলশ্রমিক নেতাদের গোপন কেন্দ্র ছিল এই এলাকায়। কমরেড নৃপেন ঘোষ ও কমরেড অমৃত মুখার্জি তৎকালীন ই. বি. আর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বি. ডি. আর রেল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন। তাঁরা কৃষক আন্দোলনও সংগঠিত করতেন।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিস্থিতিতে, ভারতরক্ষা আইন উপেক্ষা করে লালমণির হাটে সভা কবা, মিছিল করা, হাটে তোলা বন্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ বলে সিদ্ধান্ত কবা হয়। হাটটি ছিল স্টেশনের সংলগ্ন। লালমণির হাট সে সময়ে পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হবার পথে। কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবেই আশঙ্কা করেছিলেন যে, লালমণির হাটে

অচিরে কৃষক অভিযান ছড়িয়ে পড়বে। যদিও কখন, কীভাবে হবে ধারণা করতে পারেন নাই। তারা ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হন। হাটে, পথে সশস্ত্র পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কৃষক সমাবেশ কতখানি শক্তিশালী হতে পারে সে বিষয়ে তাদের হিসাবে ভুল হয়েছিল। এখানে কৃষক সমিতির সঙ্গে রেলশ্রমিক ইউনিয়ন সহযোগিতা করত। স্থানীয় কংগ্রেস সভাপতি কমরেড সূর্য সেন এবং সম্পাদক কমরেড সিতাংশু সেনের নেতৃত্বে শহরের গণতান্ত্রিক শক্তিও সমবেত হয়। লালমণির হাট ও কালীগঞ্জ থানার প্রতিটি ইউনিয়নে ভলান্টিয়ার সংগঠিত করা হয়। তাদের নিকট রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়। 'ভারত রক্ষা' আইনের নাগপাশকে উপেক্ষা করে এবং ফাঁকি দিয়ে, উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করে, যথাসম্ভব কম ক্ষতি স্বীকার করে, সমাবেশ ও মিছিল সফল করে, হাটের তোলা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবার শিক্ষা দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে পার্শ্ববর্তী কাঁঠালবাড়ি এলাকা, তিস্তা এলাকা, বড়বাড়ি এলাকায় প্রস্তুতি হয়। এ সব জায়গাতেই প্রথম পর্বে সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তার প্রভাব পড়েছিল কৃষকদের ওপর।

এভাবে লালমণির হাটের থেকে বিভিন্ন পথে কয়েক হাজার ভলান্টিয়ার একটি নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হয়। এখান থেকে লাঠি ও ঝান্ডায় সজ্জিত হয়ে মিছিল করে শ্লোগান দিয়ে তারা লালমণির হাটে প্রবেশ করে। হাটে প্রবেশ করবার পর এই সংখ্যা কত হাজারে পরিণত হয় তার কোনও হিসাব থাকে না। গোটা হাটের বিপুল জনসাধারণ মিছিল ও সমাবেশের অংশ হয়ে যায়। পুলিশ অবরোধ ভেঙে যায়। তারা কমরেড সিতাংশু সেন সহ দু-তিন জনকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু জনতা ছিনিয়ে নেয়। পুলিশ জনগণের মারমুখো ভাব দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীকালে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে 'ভারতরক্ষা' আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভাদাই হাট:

কালীগঞ্জ থানায় এই হাটটি অবস্থিত। এই হাটের মালিক ডিমলা এস্টেট। এখানকার কাছারির নায়েব স্থানীয় অধিবাসী, কিন্তু তার প্রতাপ কম ছিল না। ভাদাই হাটটি ছোট। গুরুত্বও বিশেষ ছিল না। কিন্তু এই হাটের আন্দোলনটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। স্থানীয় কৃষক প্রয়াত গোরাচাঁদ বর্মণের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে স্থানীয় কর্মীরাই এখানকার আন্দোলন পরিচালনা করেন।

দুই-তিন দিন হাটে অভিযান চলার পর জমিদার পক্ষের সঙ্গে খুব গোলমাল লাগে। জমিদার পক্ষ বাইরে থেকে লোকজন এনে জুলুম চালাতে চেষ্টা করে। তখন গোরাচাঁদ সমস্ত বিক্রেতাদের নিয়ে একটি সভা করেন। হাটের পাশেই এক কৃষকের এক অনুর্বর জমি ছিল। তিনি ওই জমিটি হাটের জন্য ছেড়ে দেন। তখন থেকে এখানেই হাট বসতে থাকে। জনসাধারণের একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। এই কমিটির ওপরেই হাট রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে। এখানেই এ আন্দোলনের বিশেষত্ব।

লোহাকুচি হাট:

রংপুর জেলার হাটগুলির মধ্যে এই হাটটি খুবই প্রসিদ্ধ। জেলার একেবারে উত্তর সীমানায় অবস্থিত। এর সঙ্গে সংলগ্ন হচ্ছে কুচবিহারের সিতাই অঞ্চল। সিতাই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তামাক উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসাবে প্রসিদ্ধ। লোহাকুচি হাটের

প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে তামাকের কারবার। তামাকের মরশুমে কয়েক হাজার তামাক ক্রেতা বিক্রেতা এই হাটে মিলিত হন। এই হাটের মালিকানা দুটি জমিদারের। একটি হচ্ছে ডিমলার জমিদার, অপরটি রংপুর শহরের মজুমদার পরিবার। এই পরিবারের মণি মজুমদার ও পরেশ মজুমদারের অবদান উল্লেখযোগ্য। মজুমদার পরিবার কৃষকের দাবি প্রথম থেকেই মেনে নেন। পরেশ মজুমদার ও বিমল ভৌমিকের নেতৃত্বে এই হাটে গণ্ডি বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়। উপেন সরকার ও গিরিশ সরকারের নেতৃত্বে কমলাবাড়ি, ভাদাই, ভালাবাড়ি প্রভৃতি ইউনিয়নের ভলান্টিয়ার বাহিনী হাট অভিযান শুরু করে। আন্দোলন হয় ডিমলা জমিদার এস্টেটের বিরুদ্ধে। কৃষকগণ একটি নতুন হাট প্রতিষ্ঠা করে নেয়। জমিদার বাধ্য হয়ে গণ্ডির দাবি ছেড়ে দেন। তখন কৃষকরা তামাকহাটি বাদে আর সব হাট সাবেক স্থানে নিয়ে যায়। লোহাকুচি হাটের এই আন্দোলন কুচবিহারের কৃষকদের মধ্যেও বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সিতাই অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে কৃষক সমিতির যোগাযোগ ঘটে।

লালবাগ হাট:

এই হাটটি রংপুর শহরের সংলগ্ন বিরাট হাট। বহুদূর অঞ্চল থেকে এখানে লোক আসতেন। এই হাটের আশেপাশের অপেক্ষাকৃত ছোট হাটগুলিতে গণ্ডি বন্ধ সফল হলে এই হাট অভিযান হয়। প্রয়াত জেলা নেতা শচীন ঘোষ, বীরু চক্রবর্তী ও ভোলা মুখার্জি নেতৃত্বে ছিলেন। এই হাটের আন্দোলনে রংপুর শহরের ছাত্র কর্মীরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সাময়িকভাবে গণ্ডি আদায় বন্ধ হয়ে যায়। সদরের পাঁচটি থানার ছোট বড় সব হাটেই আন্দোলন হয়েছে এবং সফলও হয়েছে। নীলফামারি মহকুমার ছটি থানার মধ্যে পাঁচটি থানায় ছোট বড় সব হাটেই আন্দোলন হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৈসারী হাটের আন্দোলন।

কৈসারী হাট:

এখানকার নেতৃত্বে ছিলেন রংপুরের শান্তি সেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন যোগেশ সরকার, রইচ মিঞা, অভয় বর্মণ, আবদুল সামাদ, আবদুল আজিজ, জগালু বর্মণ প্রভৃতি। এই সময়েই কিশোরগঞ্জ থানার লোহানী অঞ্চলের কৃষক সমিতি জোতদার ধনী কৃষক, পুলিশ জোটের বিরুদ্ধে একটি তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক জোতদার একজন গরিব চাষির জমি দখল নেবার জন্য পেয়াদা, পুলিশ ও লাঠিয়াল নিয়ে জমিতে উঠে ঢোল বাজিয়ে দখল ঘোষণা করতে থাকেন।

কৃষক নেতা কমরেড যোগেশ সরকার জোতদারকে বাধা দেবার প্রস্তাব করেন। বৈঠকে সকলে প্রস্তাব সমর্থন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক কৃষক জমায়েত হয়। তাদের হাতে লাঠি, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র ছিল। তারা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করায় পুলিশ সহ জোতদারের লোকজন ঘাবড়ে যায়। কিছুক্ষণ সংঘর্ষ চলার পর ভলান্টিয়ারগণ জোতদারের বন্দুক কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলেন। সংঘর্ষে জোতদার পক্ষের দু'জনের মৃত্যু ঘটে। জোতদার পক্ষ পালিয়ে যায়। এর পরেই আসে প্রচণ্ড দমন নীতি। ছোট বড় সকল কৃষককর্মীর বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হয়। অনেকে আত্মগোপন করে। প্রচুর গ্রেপ্তার হয়। সমস্ত এলাকা জুড়ে চলে নির্মম অত্যাচার। সেখানে একটি স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসে। গোয়েন্দা বিভাগের লোক মোতায়েন করা হয়, বহু সাধারণ কৃষককেও সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত

গৃহে অন্তবিন থাকাব নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে এক দিন থানায় হাজিবা দিতে বাধ্য হয।

কুড়িগ্রাম হাট

এটি মহকুমা শহবেব হাট। জমিদাব কাশিমবাজাব বাজাব এস্টেট, তখন সবকাবেব হাতে ন্যস্ত ছিল। হাটেব মধ্যেই বাজকাছাবি, নিকটে থানা। এই হাট অভিযান কবা হয় একেবাবে সর্বশেষ পর্যায়ে। এই সময় সবকাব সন্ত্রাসবাহিনী ও ভাবত বক্ষা আইনেব সাহায্যে আন্দোলনেব টুটি চেপে ধববাব জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। স্থিব হয় যে এবাবে এই সংগ্রাম উঠিযে নিয়ে সংগঠনকে মজবুত ও সংহত কববাব কাজে জোব দিতে হবে এবং যুদ্ধবিবোধী পববর্তী সংগ্রামেব জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সবকাব ও সামন্ততন্ত্রেব উপব একটি জোব আঘাত হেনে সবাসবি সবকাবেব মোকাবিলা এড়িয়ে আন্দোলনেব মোড ঘোবাবাব সিদ্ধান্ত কবা হয়।

এ সময়ে কংগ্রেসি নেতৃত্ব ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। অথচ, ভাবত বক্ষা আইন তাব দাপট চালিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতিকেই দাযিত্ব নিতে হল তাব মোকাবিলা কববাব। গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র কৃষক সমিতি যে সভা সমাবেশ মিছিল, সংগ্রাম পবিচালিত কবছিল তা সকল গণতান্ত্রিক মানুষেব মধ্যে বিশেষ প্রেবণা সৃষ্টি কবেছিল। জেলাব সর্বত্র অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মীও এই আন্দোলনেব সঙ্গে বা তাব সমর্থনে দাঁড়িযেছিলেন। এই অবস্থায় শহবেব মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাগ্রহে অপেক্ষা কবছিলেন শহবেব বুকে এই সংগ্রামেব পদক্ষেপেব জন্য। অন্য দিকে সবকাব পক্ষ শহবেব এই অভিযান আশঙ্কা কবে প্রতিদিন নিযমিত বিপুল সশস্ত্র পুলিশ পাহাবা বসিযে অবস্থা মোকাবিলাব জন্য অপেক্ষা কবতে থাকে। এই সময জেলাব শহব ও গ্রাম অঞ্চলেব প্রায সমস্ত নেতৃস্থানীয কর্মী ও বহু সাধাবণ কর্মী গ্রেপ্তাবি পবোযানা এড়িযে গোপনভাবে অবস্থান কবতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই অবস্থায পুলিশেব সকল প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিযে ও ব্যর্থ কবে এ লড়াই সফল কববাব কৌশল স্থিব কবা হয়।

নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট গোপন কর্মীবা ছিলেন কমবেড অনিল দেব, জীবন দে, সুশীল সেন, মণীশ বায, ববি লাহিড়ী, হবেন্দ্র বর্মণ, দযাময বর্মণ, নুটকুল বর্মণ, বসন্ত চক্রবর্তী, মণি চক্রবর্তী, যোগেশ বর্মণ, পূর্ণ বর্মণ আবও অনেকে। বিশেষ বিশেষ কর্মীব নেতৃত্বে ছোট ছোট সুগঠিত দল কবা হয়। বিভিন্ন দল নিয়ে এক একটি বাহিনীব নেতৃত্ব স্থিব কবে দেওযা হয। পবিচালনাব দাযিত্বও নির্দিষ্ট থাকে। ছোট ছোট দলগুলি লাঠি ও ঝান্ডা টুপি লুকিয়ে হাটেব লোকেব সঙ্গে মিশে হাটেব নিকটবর্তী বিভিন্ন কেন্দ্রে জমাযেত হযে অপেক্ষা কবতে থাকে। এই সময় হাটেব মধ্যে কিছু দূব দূব সশস্ত্র পুলিশ পাহাবা সন্ত্রাস সৃষ্টি কবে অপেক্ষা কবছিল।

নির্দিষ্ট সময় প্রধান পবিচালক বাঁশি বাজিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দলেব অধিনায়কগণ তাদেব বাঁশিব আওযাজ কবেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় সমস্ত হাট লালে লাল। মাথাব টুপি, হাতেব লাঠি ও ঝান্ডা গোটা হাট ছেযে আছে এবং সকল স্থান থেকে একই সঙ্গে ব্রজকণ্ঠে আওযাজ ওঠে 'কৃষকেব গণ্ডি নাই', ওঠে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী ধ্বনি। গোটা হাটে হুলুস্থুলু আবম্ভ হয়ে যায়। হাটেব হাজাব হাজাব মানুষ ভলান্টিয়াব দলেব সঙ্গে যোগ দিয়ে দাঁড়ায় এবং আওযাজ তোলে। তাদেব হাতে 'বাকুয়া' (ভাব বহনেব ডাণ্ডা)। সমস্ত পুলিশ বাইফেল নিচু কবে ছুটে পালিযে যায়। জমিদাব বাহিনী পালিয়ে যায়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গে কাশিমবাজার এস্টেট থেকে ঢোল দিয়ে ঘোষণা করা হয় যে কৃষককে কোনও তোলা দিতে হবে না। যাদের বাঁধা দোকান তারা খাজনা দিয়ে রসিদ নেবেন। রেট সুনির্দিষ্ট থাকবে।

মেলায় আন্দোলন:

গণ্ডি বন্ধ আন্দোলনের অসামান্য সাফল্য ঘটায় নেতা ও কর্মীগণ এত উৎসাহিত হন যে, কুড়িগ্রাম মহকুমায় দুটো বড় বড় মেলাতেও পর পর দু বৎসর এই আন্দোলন হয় এবং সাফল্য লাভ করে। মেলায় জুয়া খেলা ও পতিতালয়ের বিলোপের জন্যও কয়েকটি মেলায় আন্দোলন হয়। তা আংশিকভাবে সাফল্য লাভ কবেছিল। উল্লেখ্য যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধযুগে গণ্ডি বন্ধ আন্দোলন ছিল কৃষকের ব্যাপকতম শ্রেণী সংগ্রাম। সমগ্র কৃষকশ্রেণী তার স্বার্থ রক্ষায় জমিদারশ্রেণী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের চরিত্র ছিল জঙ্গি। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের শ্রেণীচেতনা ও সংগঠন বৃদ্ধি পায়। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনেক কলাকৌশল তারা আয়ত্ত করে। অনেক স্থানেই তাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়। বহু সৎ ও নির্ভীক কর্মীর আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে অনেকেরই উন্নতমানের নেতা হবার সম্ভাবনা ছিল এবং বেশ কয়েকজন হয়েও ছিলেন। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে কৃষক সংগঠন ও কমিউনিস্ট পার্টিকে উচ্চতর স্তরে তুলে নেবার পথ এই আন্দোলন করে দেয়।

এই আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনে উপস্থাপিত রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টে বলা হয় যে, শতাধিক হাটে এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দমন নীতির আওতায় এই আন্দোলন স্বভাবতই দমন নীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে পবিণত হয়।

তোলাবন্ধ আন্দোলনের গোটা যুগে জেলা পার্টি সমস্ত এলাকায় আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলবার কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তোলাবন্ধ আন্দোলনের পর সংঘর্ষমূলক অবস্থা থেকে সংগঠনকে সংহত করে, জয়ভিত্তিক করবার, রাজনৈতিক শিক্ষায় উন্নত করবার উপর জোর দেওয়া হয়। এই সময় বেআইনি বলশেভিক পার্টির ইতিহাস ও ইন্ডিয়া টু-ডে বই দুখানি হাতিয়ার ছিল। পার্টির সংগঠন গড়বার ও উন্নত কববার এই প্রচেষ্টার মধ্যেই নতুন কায়দায় একটি বিশেষ দাবি সম্মুখে রেখে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী করা হয়।

পাটের দরের জন্য এবং লাইসেন্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন:

যুদ্ধের বাজারে শিল্পজাত সকল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পায়। কিন্তু কৃষকের অর্থকরী ফসলের দর বাড়ল না। খুব ভাল জাতের পাট ছ-সাত টাকা মন দরে বিক্রি হতে থাকল। মাঝারি জাতের পাটের দর মন প্রতি তিন টাকার বেশি উঠল না। কৃষকের মধ্যে হতাশা ও বিক্ষোভ দুই-ই দেখা দিল। পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্ব একটি সার্কুলারে পাটের মূল্যবৃদ্ধি আন্দোলনের নির্দেশ দিলেন। মনপ্রতি কুড়ি টাকা দাবি করে পোস্টার দেওয়া হয়, হাটে বাজারে প্রচার হয়; জেলা কৃষক সমিতি থেকে বিজ্ঞাপন ছড়ানো হয়। কয়েকটি হাট হরতাল হয়। একটি গণ-দরখাস্ত অভিযানও সংগঠিত করা হয়। দরবৃদ্ধির দিক দিয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায় নাই। অন্য দিকে তৎকালীন মুসলিম লিগ সরকার পাটের মূল্যের নিম্নগতি

রোধের উদ্দেশ্যে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের একটি আইন জারি করেন। পাটের অতিরিক্ত উৎপাদন, মূল্য হ্রাসের কারণ এই যুক্তির ভিত্তিতে পাটচাষ বাধ্যতামূলকভাবে হ্রাসের ১/৩ অংশ হ্রাসের জন্য উৎপাদনে লাইসেন্স প্রথা চালু করেন। উদ্দেশ্য যাই থাক, ব্যবস্থাটি সাধারণ পাট চাষির ওপর এক চরম নির্যাতন চাপিয়ে দেয়। এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটা একটি প্রহসনে পরিণত হয়। ধনী জোতদারদের বাড়িতেই পাট লাইসেন্সের ক্যাম্প বসে। তাদের গায়ে বিশেষ হাত পড়ে না। মধ্যবিত্ত ও গরিব চাষিদের ওপর জুলুম চলতে থাকে।

এই উপলক্ষে গরিবের পাট চাষ জমি রেকর্ডে অবিচার ঘটিয়ে ঘুষ নেবার ভাল সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। গরিবের সামান্য এক খণ্ড জমিতে পাট চাষ বাধ্যতামূলকভাবে হ্রাস বহাল করে, গরিব চাষির পাট চাষ অর্থহীন করে দেওয়া হয়।

মাঠে মাঠে তখন পাটের চারা উঠেছে। এই সময়ে জরিপের জন্য মাঠে নামা হয় ও চারা পাট তছনছ করে দেওয়া হয়। তখন ভারত রক্ষা আইনের যুগ। সভা সমিতি করে প্রতিবাদের উপায় নেই। অনেকের বসতবাটি, বাঁশঝাড়, পুকুর প্রভৃতিও পাট জমি বলে রেকর্ডে করে দেওয়া হয়। ফলে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিল। কিছু অসংগঠিত হাঙ্গামা হয়। চাষিদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই অবস্থায় সর্বত্র কৃষক সমিতি ও পার্টি সজাগ হয়ে ওঠে। প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তোলাবন্ধের সময়ের মতো সরাসরি ভলান্টিয়ার সমাবেশ ও প্রতিকারের পথ নেওয়া হয় না। প্রথম পর্যায়ে গণডেপুটেশনের পথ নেওয়া হয়। গ্রামে গ্রামে বৈঠক করে ইউনিয়ন বোর্ড, জরিপ অফিস ও বিভিন্ন স্থানে ডেপুটেশন সংগঠিত করা হয়। এইগুলি মিছিল ও সভায় পরিণত হতে থাকে। অন্য দিকে পাট লাইসেন্সের অনুকূলে সরকার পক্ষ থেকেও ইউনিয়নে ইউনিয়নে সভার ব্যবস্থা হয়। তাতে মহকুমা পর্যায়ের উচ্চতর অফিসারগণ থাকেন। কোথাও কোথাও আরও উচ্চতর পর্যায়ের অফিসার, এমনকী মন্ত্রীও থাকেন। লিগ নেতারাও থাকতেন। এখানে সাধারণত কৃষকদের হুমকি দেওয়া হত। কৃষক নেতা, কর্মীগণ বিশেষ দক্ষতা ও কৌশলের সঙ্গে এই সভায় নিজেদের উদ্যোগে জমায়েত সংগঠিত করেন। সেখানে কৃষকদের অভিযোগ জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়। সরকারি পক্ষকে পালিয়ে পিঠ বাঁচাতে হয়। জমায়েতগুলি কৃষক সভার, সভায় পরিণত হয়।

গোপন নেতারা জমায়েতের মধ্যেই গোপনে থাকতেন। কৃষকের ওপর অত্যাচার, বেআইনি জুলুমের কৈফিয়ত দাবি করতেন, আইনের শ্রেণী চরিত্রের ওপরেও আক্রমণ করতেন। সরকারি কর্মচারীগণ আজেবাজে কথা বলে, ভীতি প্রদর্শন করতেন। লোকে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের তাড়া করত, তারা পালিয়ে যেতেন। তখন নেতারা বক্তৃতা করতেন। প্রতিটি সভাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ত বিরোধী সভায় পরিণত হয়ে যেত। বেআইনি জুলুমের প্রতিরোধের ও গরিবের পাট ভাঙার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হত এবং গরিবের ন্যায্য অধিকার সংগঠন ও সমাবেশের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এইভাবে একেবারে প্রায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি না দিয়ে জেলাব্যাপী এক বিরাট সফল আন্দোলন হয়ে যায়। হাটের তোলাবন্ধের সমাবেশের তুলনায় এই আন্দোলনের সমাবেশ অনেক বেশি সচেতন ও সংগঠিত ছিল।

প্রকাশ্য ও গোপন কাজের সমন্বয় ও সংগঠন:

পার্টির বেআইনি ও গোপন যুগের গণ আন্দোলন ও তার সাফল্য নির্ভর করে প্রকাশ্য ও গোপন, আইনি ও বেআইনি কাজের সমন্বয়ের ওপর। এ বিষয়ে জেলা স্তর থেকে লোকাল

ও সেল স্তর পর্যন্ত সচেতন প্রচেষ্টা ছিল।

সে সময় জেলা পার্টির অন্যতম নেতা কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, জেলা কৃষক সমিতির নেতা কমরেড দীনেশ লাহিড়ী, পার্টি উকিল কমরেড মণি মজুমদার, পার্টি নেতা কমরেড বিভূতি লাহিড়ী (ভাদু লাহিড়ী) ছাত্র নেতা কমরেড বিজলী লাহিড়ী, গোপাল সেন প্রভৃতি গোপন কাজের সঙ্গে সু-সংহতভাবে পার্টি নেতৃত্বে প্রকাশ্য কাজ পরিচালনা করতেন। নীলফামারিতে কমরেড বিমল ভৌমিক, ক্ষিতীশ দাস, বলরাম সাহা, গোলাম আজিজ। কুড়িগ্রামের কমরেড রবি লাহিড়ী, কালা লাহিড়ী, বদরগঞ্জের কমরেড শঙ্কর রায়, বিজয় রায়, গাইবান্ধার কমরেড নির্মল বর্মণ, পানু পাল, গণেশ ধর, ভূপেশ রায়, ছাত্র কর্মী কমরেড চিনু প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করতেন। লালমণির হাটে ডা. সূর্যকান্ত বিশ্বাস, ডা. সিতাংশু সেন দায়িত্বে ছিলেন।

এ সময়কার পার্টি সংগঠন, সভ্য সংখ্যা ছিল তিন শত। পার্টি কর্মী প্রায় পাঁচ শত। অসংখ্য পার্টি গ্রুপ ছিল। প্রতি পার্টি সভ্যের পরিচয় হত গণসংগঠনের কাজ এবং পার্টির গ্রুপ গঠনের হিসাব দিয়ে।

জেলা কমিটি এ সময় লোকাল ভিত্তিক পনেরোটি পার্টি ক্লাস করেন। লোকাল গতভাবে আরও অনেক হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যুগে দুশোটি পার্টি বুলেটিন বের করা হয়। মাঝে মাঝে যুদ্ধবিরোধী পোস্টার বিলি করা হয়। নভেম্বর দিবস, মে দিবস, স্বাধীনতা দিবস (২৬ জানুয়ারি) প্রভৃতি দিবসে দু' হাজার পোস্টাব দেওয়া হয়। প্রায় আড়াই লক্ষ ইস্তাহার বিলি করা হয়। দুশোটি 'কমিনিষ্ট' ও দুশো কপি বলশেভিক গোপনে বিক্রয় করা হত।

এই সময়ে জেলা পার্টি কমিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিতর্কেব উদ্ভব হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে, জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টে, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব বনাম শ্রেণী ও পার্টির স্বতন্ত্র নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রাদেশিক কমিটি, জাতীয় ফ্রন্ট ও কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকার গুরুত্ব বিষয়ে একটি পার্টিপত্র প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরেই জনযুদ্ধ যুগ আরম্ভ হওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

রংপুরে তেভাগা আন্দোলন প্রসঙ্গে:

রংপুর জেলায় তেভাগা আন্দোলন শুধুমাত্র নীলফামারি মহকুমায় এবং সদর মহকুমার একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল। নীলফামারি মহকুমার সৈয়দপুর থানা বাদ দিয়ে বাকি সব থানাতেই আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়েছিল।

রংপুরের ভূমি ব্যবস্থা সর্বত্র একপ্রকার নয়। নীলফামারি মহকুমা বাদ দিয়ে অন্যান্য মহকুমার জোতদারেরা নিজ হালে বা বর্গায় জমি চাষ করানো থেকে জমি পত্তন দেওয়া অধিকতর শ্রেয় মনে করত। এমনকী বড় রায়ত যারা, তারাও কোর্দা প্রজা বসিয়েছিল। কোনও জমিতে দেখা গেছে কৃষক ও জমিদারের মধ্যে সাতটি স্তর আছে। সেই কারণে বেশিরভাগ কৃষকের সামান্য জমি ছিল। বড় রায়ত চাকর রেখে নিজ হালে চাষ করাত এবং দূরের সামান্য জমি বর্গা চাষ করাত। কুড়িগ্রাম মহকুমায় কিছুটা বিশিষ্টতা ছিল। নদীপ্রধান এই মহকুমার চর এলাকায় সর্বত্র রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা থেকে আগত মহাজন ও মারোয়াড়ি মহাজন নানা কৌশলে বিপুল জোতদারি স্বার্থ কায়েম করে বসেছে। শোষণ ছিল প্রায় আদিম স্তরে।

নীলফামারি মহকুমার ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। এখানে যাদের জোতদার বলা হত তারা সকলেই যে প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী জোতসঙ্ঘের মালিক তা নয়। বেশির ভাগ হচ্ছে বৃহৎ রায়ত। তাদের আবাদি জমির পরিমাণ বিঘা দিয়ে হয় না। হয় 'গাঁ' দিয়ে। এক গাঁ— ৩২০ বিঘা। ডোমাবে এক জোতদার বৎসরে নিজের ভাগে আমন ধান পেত কুড়ি-পঁচিশ হাজার মন। হাজার, দেড় হাজার বিঘা জমির মালিক বেশ কিছু ছিল। এই সব এলাকায় এক দিকে আছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছোট-বড় জোতদার, অপর দিকে বিরাট সংখ্যক বর্গাদার। মধ্যকৃষক বা গরিব কৃষক খুব কম।

এই সব জোতদার বা বৃহৎ রায়তেরা জমি যে বিধি-ব্যবস্থা করে বসেছে তা মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার সমতুল্য। বর্গাদাররা ভূমিদাস ছাড়া আর কিছু নয়। এদের শতকরা আশি ভাগের কোনও ভিটাবাড়ি নাই। জোতদাররা এদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য সামান্য কিছু জমি ও বাঁশ দেয়। তারা যত দিন জমি চাষ করবে, তত দিন সেখানে থাকতে পারবে। জোতদারের অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতে পারবে না।

বর্গাদারদের যে সব শর্ত স্বীকার করে নিতে হত তা হচ্ছে এইরূপ, এক, জোতদার এক জোড়া হালের গোরু দেবে। বর্গাদার প্রতি বৎসর আমন ধান দিয়ে কিস্তি শোধ করবে। দুই, জোতদার খাবার ধান কর্জ দেবে। সুদ পাঁচ শতাংশ। যুদ্ধের সময় সুদ হত দরকাটা হিসাবে। অর্থাৎ জোতদার যখন কর্জা দেবে তখন যা বাজার দর তাই হবে দেনা। ধান উঠলে ওই টাকায় যে ধান বাজারে পাওয়া যাবে তাই দিতে হবে। ফলে, সুদ দাঁড়ায় দুশো শতাংশ। তিন, বেগার দিতে হবে। চার, জোতদারের প্রহরাধীনে ধান কাটতে হবে এবং তা জোতদারের গোলায় তুলতে হবে। পাঁচ, বীজ ধান সমান ভাগ হবে।

আধিয়ার ভাগচাষি যে ভাগ পাবে, তা থেকে জোতদার নিম্নোক্ত বাবদ সমূহ কেটে রাখবে, এক, হাল গোরু বাবদ কিস্তি, খোরাকি বাবদ কর্জ। দুই, বিশারি অর্থাৎ বর্গাদারের প্রাপ্য অংশের ১/২০ অংশ। তিন, খামার পাইকের খরচ। চার, জোতদারের বাড়ি ধান বহনের ব্যয়। পাঁচ, জোতদারের গাড়ি, ঘোড়া, বন্দুক প্রভৃতির জন্য ধার্য আদায়। আউশ ধান, পাট, তামাক প্রভৃতি আধাআধি ভাগ হত।

কার্যত, নারী পুরুষ সকলের কঠোর পরিশ্রমে যে ফসল উৎপন্ন হত তার প্রায় সবটাই জোতদারের ঘরে তুলে দিতে তারা বাধ্য হত। তারপর আবার নতুন ধার কর্জ করতে বাধ্য হত। তা হত চৈত্র মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবার মতো। চৈত্র মাসে ধানের দাম বৃদ্ধি পায়। সে সময় ধান কর্জ দিলে, অনেক বেশি আদায় করা যাবে। ফলে অনেকে কর্জার হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় হিসাবে রাতারাতি পালিয়ে যেত। একে উত্তরবঙ্গে বলা হয় 'ভুটান যাত্রা'।

নীলফামারি মহকুমা হিমালয়ের অনেকটা সংলগ্ন। তাই খুব শীতের প্রকোপ। বেশিরভাগ লোকের সকাল সন্ধ্যায় আগুনের তাপ একমাত্র ভরসা। আর নিজেদের হাতে বোনা এক রকম চট। বাসনপত্রের বিশেষ বালাই থাকত না। শিক্ষার বালাই নাই।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় এই মহকুমার জোতদারদের গোলা ভরতি ধান থাকা সত্ত্বেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যায়। এই হিসাব অধ্যাপক প্রয়াত কামাক্ষাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সমীক্ষা করে নির্ধারিত করে যান। সরকারি হিসাব প্রায় অনুরূপ।

১৯৪০ সালে ডিমলা থানায় টেপা খড়িবাড়ি ও কিসামৎ ছাতনাই ইউনিয়নে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে প্রথম ভাগচাষি আন্দোলন হয়েছিল। হাটের তোলা বন্ধ আন্দোলনের

সঙ্গেই প্রথম ভাগচাষি আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। জলপাইগুড়ির তৎকালীন ভাগচাষি আন্দোলনের প্রভাবও ছিল। ডিমলা থানায় ভাগচাষিদের মধ্যে তীব্র গোলমাল ও বিক্ষোভের সংবাদ পাওয়া যায়। ওই খানায় জোতদার পুলিশের অত্যাচার ও ভাগচাষির প্রতিরোধ হয়েছিল তীব্রতম, মূলত জোতদারের নিকট থেকে রসিদ আদায়ের দাবিতে। জোতদার কর্জার সুদ ছেড়ে দিতে রাজি কিন্তু কোনও ক্রমেই রসিদ দিতে রাজি হয় নাই। রসিদ দিয়ে তারা ধানের ভাগ নিতে অস্বীকার করে। এই আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা কালাচাঁদ বর্মণকে রাতে নিদ্রিত অবস্থায় বুকে বর্শা বিদ্ধ করে জোতদাররা হত্যা করতে চেষ্টা করে। গুরুতর আহত হয়ে, দীর্ঘকাল ভুগে, অসাধারণ প্রাণশক্তির বলে তিনি বেঁচে উঠেন। জোতদাররা কেহই গ্রেপ্তার হয় না। কিন্তু শতাধিক কৃষক ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। গ্রামে গ্রামে শতাধিক পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। কৃষক কর্মীদের গৃহে আটক রাখা হয়। চাষির ধান লুঠ করা হয়।

স্থান অভাবে আমি এখানে রংপুর জেলার দুটি এলাকার তেভাগা সংগ্রামের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

কিশোরগঞ্জ থানা ও জলঢাকা থানার তেভাগা সংগ্রাম:

এই এলাকার দায়িত্ব ছিল কমরেড পরেশ মজুমদার, কমরেড আবদুল মোকসেদের ওপর। বড়ভিটা ছিল প্রধান কেন্দ্র। বিষাদু বর্মণ, বিপিন বর্মণ, বড ধরণী, ছোট ধরণী, সৌরীন সেন প্রভৃতি এখানকার পুরনো কৃষক নেতা। কিশোরগঞ্জ থানার অধীন বড়ভিটা মেলাবর, বড় ডমুরিয়া, রণচণ্ডি, কুটাপড়া ও কইমারি এবং জলঢাকা থানার গারখোল, ঘুযামারা ও অন্যান্য কয়েকটা গ্রামে আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিল। কইমারির ভেরা বানিয়া, জলঢাকায় মহান্ত বানিয়া মহিম বানিয়া, যতীন বানিয়া, আক্তার মিঞা নেতৃত্ব দেন।

এলাকায় কৃষকদের অবস্থা ডিমলা থানার কৃষকদের অবস্থার মতো চরমভাবে শ্রেণীবিভক্ত ছিল না। জোতদাররা ছিল অত্যন্ত হিংস্র ও ঘৃণ্য। বড়ভিটার বড় জোতদারের নাম কৃষকরা মুখে আনত না। এখানে সংগ্রাম প্রথম স্তরেই জঙ্গি পর্যায়ে উঠে যায়। তারা একে একে সকল ধান কেটে আধিয়ারের ঘরে তুলেছে। সমষ্টিগতভাবে জোতদাররা প্রস্তাব দেয়, তিন ভাগের এক ভাগ নেবে, কিন্তু রসিদ দেবে না। গরিব জোতের মালিকের নিকট থেকে তে-ভাগা বাবদ রসিদ নিয়ে ধান দেওয়া হল। ধনী জোতদাররা রসিদও দিল না, ধানও দেওয়া হল না।

এমন সময় খবর এল বিরাট আক্রমণ হয়েছে, গুলি চলেছে। কয়েকজন আহত। পুলিশ কিছু কর্মীকে ধরে নিয়ে গেছে। জোতদার দালালদের সহায়তায় পুলিশ ক্যাম্প বসে। প্রায় একশো জনের ওপর গ্রেপ্তার হয়। চলতে থাকে পুলিশি জুলুম। দিনের বেলা কৃষকরা খেতের কাজকর্ম করে রাতেব বেলা পুরুষরা দল বেঁধে বাঁশের ঝাড়ে শুয়ে থাকে, পালা করে পাহারা দেয়। বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়। মেয়েদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার হয়। জোতদার পুলিশ গ্রাম দখল করে রাখে। বিভিন্ন অত্যাচারে নিগৃহীত হয়েও এখানকার কৃষক পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে নাই। দেশ বিভাগের পর এখানকার মুসলমান চাষি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, 'আমাদের বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া হল। যে জোতদারের সঙ্গে লড়াই তারাই রাজা হয়ে বসল।'

সদর মহকুমার বদরগঞ্জ থানার মধুপুরের তেভাগা আন্দোলন:

মধুপুর, রংপুর পার্টি ও কৃষক সভার একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। এলাকা ছোট। এখানকার

বড় জোতদার টেল্লা বর্মণ। বর্গাদাররা সকলে ছিল হিন্দু। এর চারপাশে মুসলমান প্রধান এলাকা। এখানকার ভূমি ব্যবস্থা ডিমলার মতো ছিল না। ভাগচাষিদের নিজস্ব বাড়িঘর ও কিছু কিছু নিজস্ব জমিও ছিল। ফসল জোতদারের ঘরে তোলা হত। হাল বর্গাদারের। নিজের ভাগ আধাআধি। সুদ দরকাটা হিসাবে। কৃষক কর্মী ও বর্গাদার মিলে আলোচনা করে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই অবস্থায় জোতদার সিদ্ধান্ত করে তারা নিজেরাই ধান কেটে তুলবে। কৃষক সমিতি যদি ধান কাটতে নামে তবে মার দিয়ে তাড়াবে।

কৃষক সমিতি পরিস্থিতিগত নিজেদের দুর্বলতা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করে যে, এক দিকের ধান পাহারা দেওয়া হবে। অন্য দিকের মুসলমান কৃষক ও মাতব্বরদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের নিষ্ক্রিয় রাখতে হবে। সাধারণ মুসলমান কৃষক জোতদার বিরোধী ছিল, কিন্তু তারা কৃষক সমিতির সঙ্গে সামিল হয়ে বর্গাদারের স্বার্থে নামতে চায় না। মাতব্বররা ন' আনা সাত আনা ভাগের প্রস্তাব রাখেন এবং ধান কেটে জমিতে ভাগ, অথবা কোনও তৃতীয় পক্ষের তত্ত্বাবধানে ধান রাখবার প্রস্তাব রাখেন। কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব মেনে নিলেও পরে বাতিল হয়ে যায়। স্থানীয় নেতারা আপস না করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে ধান কাটবার দিন স্থির করে ফেলেন।

ধান কাটার দিন বর্গাদার ও কৃষকগণ সমবেত হন। লাঠি প্রস্তুত রাখা হয়। ধান কাটা শুরু হতেই জোতদাররা পঁচিশ-তিরিশ জন গুণ্ডা নিয়ে হামলা করে। তাদের পক্ষে কোনও হিন্দু বা মুসলমান কৃষক ছিল না। এখানকার মহিলা খেতমজুর বাহিনী, গাইন, হাসুয়া, করুন প্রভৃতি নিয়ে সংগঠিতভাবে ছুটে আসে। গুণ্ডারা ছুটে পালিয়ে যায়।

বর্গাদার ধান কেটে বাড়ি নিয়ে যায়। এই জয় স্থায়ী হতে পারে নাই। স্থির হয়েছিল যে, ধান মাড়াই করবার কাজ সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে ফেলা হবে। কিন্তু বর্গাদাররা এই কাজটি উপেক্ষা করে কাটা ধান উঠোনেই ফেলে রাখে। সেই রাতেই জোতদাররা বর্গাদারদের বাড়ির উঠোন থেকে ধান চুরি করে নিয়ে যায়। সামান্য রক্ষা পায়। বর্গাদারদের পক্ষে জোতদারের বাড়ি থেকে ধান কেড়ে নিয়ে আসবার ক্ষমতা ছিল না। তারা মামলা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সে সময়ে জেলা কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে মামলা করবার মত গ্রহণযোগ্য হয়নি।

তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে কিছু আলোচনা:

তেভাগা আন্দোলনের ধারা ও ফলাফলের মধ্য দিয়ে কী রাজনৈতিক সাংগঠনিক অগ্রগতি হয়েছিল এটা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলবার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তার যথার্থ সাফল্য আমরা পাই নাই। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ছিল অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। যে বিপুল সম্ভাবনা উম্মোচিত হয়েছিল তা ভবিষ্যতের জন্য যে গভীর অবদান রেখে গেছে, সে বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সময়ে আমরা তাকে সংহত করবার সুযোগ পাই নাই।

আপস ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে এল মারাত্মক ফলাফল। ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন শ্রেণীভিত্তিক বিভক্ত হয়ে গেল। তখনই সব বোঝা যায় নাই। ক্রমশ কৃষক সভার ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্ব নেতিবাচক হয়ে উঠতে লাগল পরিবর্তিত সরকারি নীতির সঙ্গে সঙ্গে, যা সামন্ত ব্যবস্থা বজায় রেখে চলে বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূলে।

এদিকে, দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কৃষকের মধ্যে আতঙ্ক, দোদুল্যমানতা, দেশত্যাগের ঝোঁক সৃষ্টি হতে থাকে। মুসলমান চাষির মধ্যে কৃষক সভার সমর্থকদের মনোভাব এই উক্তি থেকে প্রকাশ পায়, 'কমরেড আমাদের বাঘের মুখে ফেলা হল। যার বিরুদ্ধে লড়াই করলাম তারাই এখন রাজা হয়ে বসল। যে জোতদার তেভাগা লড়াইয়ের সময় দেশ ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তারা এখন রাজা হয়ে ফিরে এল।'

কীভাবে হঠকারী পথে গিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে সংগঠন আরও বিপর্যস্ত হবার পথে যায়, সে আর এক কাহিনী।

আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন: ডিমলা থানা

নৃপেন ঘোষ

১৯৩৯-৪০ সালে বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব একটি ভূমি রাজস্ব কমিশন বসিয়েছিলেন। সেই কমিশনের নিকট প্রাদেশিক কৃষক সভার তরফ থেকে একটি স্মাবকলিপি (গেটডতওঠখধট) দেওয়া হয়। তাতে বাংলার কৃষকদের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কাবণ যে জমিদারি প্রথা, তা তুলে ধরে জমিদার জোতদারদের সমস্ত জমি বিনা ক্ষতিপূরণে গ্রহণ করে বিনামূল্যে খেতমজুর, ভাগচাষি ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বিলি করার জন্য দাবি জানানো হয়। বর্গাদারদের জন্য তে-ভাগার দাবি সম্ভবত ওই স্মারকলিপিতে ছিল না। কিন্তু কমিশন বর্গাদারদের জন্য তাদের উৎপাদিত ফসলের দুই তৃতীয়াংশ ধার্য করার জন্য সুপারিশ কবে।

১৯৪০ সালে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন (পাঁজিয়া) থেকে প্রথম তে-ভাগার দাবিতে বর্গাদাবদের আন্দোলন করতে আহ্বান জানানো হয়। ১৯৪১ সালে ডিমলা থানার (রংপুর) উত্তবাঞ্চলের বর্গাদারেরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে একটি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিলেন। আর কোনও জেলায় এই আন্দোলন হয়েছিল কি না তা আমি জানি না। ডিমলার কৃষকের এই সংগ্রামের কাহিনী পরে বলা হবে। ১৯৪১ সালে ডোমার (রংপুর) সম্মেলনে 'ফ্যাসি বিরোধী জনযুদ্ধ' ও আমাদের কর্তব্যই প্রাধান্য পায়; কৃষকের শ্রেণীদাবি গৌণ হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালে নালিতাবাড়ি (ময়মনসিংহ) সম্মেলনে আবার তে-ভাগার দাবি তোলা হয়েছিল কিন্তু কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হয়নি।

ইতিমধ্যে বাংলাব বুকে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ ও মহামারির করালগ্রাস। বাংলার পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক (প্রধানত কৃষক) প্রাণ হারান। রংপুর জেলার নীলফামারি মহকুমার ছয় লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর মৃত্যু হয়। সরকার শুধু নির্বিকারই থাকল না, তার অনুসৃত নীতির ফলে জোতদার, ধনী চাষি ও চোরাকারবারিরা স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে উঠল। কংগ্রেস ও লিগ নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয় থাকলেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধের সকল দায়িত্ব তুলে নিতে হল কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার ঘাড়ে। মানুষকে বাঁচানোই ছিল তখন প্রধান কর্তব্য। অন্যান্য দাবি-দাওয়া স্বাভাবিক কারণেই গৌণ হয়ে যায়। তবে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে ভারতবাসীর মদত জোগানো এবং জাতীয় সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেস, লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত মোর্চা গঠনের প্রচেষ্টায় ভাটা পড়তে দেওয়া হয়নি। দুর্ভিক্ষ ও মহামাবীর ধাক্কা কাটাতে ১৯৪৪ সাল কেটে গিয়েছিল।

১৯৪৫ সালে ফ্যাসিস্ট শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে এবং লাল ফৌজ সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করে। পরাধীন দেশগুলোতে মুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি দেশে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বোপরি মহাচীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মুক্তি

ফৌজের অগ্রগতি দুর্বার হয়ে ওঠে। এগুলোর ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের দেশে জনগণের মধ্যে এনে দেয় মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণা। এই প্রেরণা প্রকাশ পায় আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস, রক্তাক্ত রসিদ আলি দিবস, মৃত্যুঞ্জয়ী নৌ বিদ্রোহ ও তার সমর্থনে কংগ্রেস ও লিগ নেতৃত্বের বাধা অমান্য করে বোম্বাই-এর লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন, জব্বলপুরের দেশীয় সিপাহি এবং পাটনার পুলিশ বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে।

১৯৪৬ সালে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হল সারা ভারতে প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর নির্বাচন। বাংলার প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি কয়েকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনটি আসনে জয়লাভ করল। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলার রেল মজুর কেন্দ্র থেকে কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর জয়লাভ। মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে এবং প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম আসনে জয়লাভ করে। সোহরাবর্দির নেতৃত্বে বাংলার মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

নির্বাচনোত্তরকালে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে রেল ও ডাক বিভাগের কর্মীদের ধর্মঘটের প্রস্তুতি এবং কয়েকটি শিল্পে ধর্মঘট কৃষক শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে (মৌভাগ, খুলনা) তে-ভাগার দাবি মামুলিভাবে তোলা হয়। কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এর থেকে বোঝা যায়, প্রাদেশিক কৃষক নেতৃত্ব তখন পর্যন্ত কৃষকের সংগ্রামী মনোভাব বুঝতে অক্ষম ছিলেন।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার জনসাধারণের মনোভাব ও মেজাজ বুঝতে ভুল করেনি। তারা লিগ নেতৃত্বকে তা বুঝাতেও সক্ষম হয়েছিল। উভয়ের কলাকৌশলে ওই সালেরই ১৮ আগস্ট কলকাতার বুকে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব। কয়েকদিন ধরে এই দাঙ্গা চলে এবং সেখান থেকে বরিশাল ও নোয়াখালি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষণীয় যে, বাংলার আর কোনও জেলায় দাঙ্গা হয়নি। এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সব চাইতে গৌরবজনক ইতিহাস সৃষ্টি করেন হাসনাবাদের হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ। তাঁরা মিলিতভাবে এই সর্বনাশা দাঙ্গা প্রতিরোধ করে সারা বাংলাকে পথ দেখান।

মুসলিম লিগ নেতৃত্বের উদ্দেশ্য ছিল এই দাঙ্গাকে ব্যবহার করে এক দিকে কংগ্রেস নেতৃত্বকে দেশবিভাগ মানতে বাধ্য করা, অপর দিকে কৃষক-মজুরের শ্রেণী আন্দোলন ও সংগঠন ভেঙে দেওয়া। তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়টি হয়নি। বাংলার তেভাগা আন্দোলন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কৃষক-মজুর তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে, হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রামই তাঁদের বাঁচার একমাত্র পথ; অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁদের ধ্বংসের পথ।

কৃষক-মজুরের এই চেতনা কৃষক সভার নেতৃত্বের গতানুগতিক চিন্তাধারায় প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং আংশিকভাবে হলেও তাঁদের করণীয় সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। অন্তত তাঁরা এটা বোঝেন যে, কৃষক শ্রেণীকে তার দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিচালিত করা যায় এবং তা না করলে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শিকারে পরিণত হতে পারেন যা সমগ্র নিপীড়িত জনগণের পক্ষে অকল্যাণকর হবে। সামনেই ছিল ধান কাটার মরশুম। কৃষক কাউন্সিল একটি বৈঠকে তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তাব নেয় এবং বর্গাদারদের (উত্তরবঙ্গের ভাষায় আধিয়ারদের) আহ্বান জানিয়ে বলে, তোমাদের উৎপাদিত ফসল আর জোতদারদের খামারে তুলবে না। উৎপাদিত ফসলের দুই তৃতীয়াংশ তোমার জন্য রেখে বাকি অংশ রসিদ নিয়ে জোতদারকে দেবে। অর্থাৎ বর্গাদারকে

আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে নিজের শক্তিতে তাঁর অধিকার কায়েম করতে ডাক দেওয়া হল। কাজেই এটিকে 'আন্দোলন' না বলে 'সংগ্রাম' বলাই উচিত। কিন্তু যেহেতু 'তেভাগা আন্দোলন' কথাটি চালু হয়ে গেছে সেইহেতু আমিও ওই কথাটি ব্যবহার করছি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হল। কিন্তু সকল দিক ভাল করে বিবেচনা করা হল না। লক্ষ্যে পৌঁছতে কী কী কৌশল গ্রহণ করতে হবে, আন্দোলনের পক্ষে এবং বিপক্ষে কী রকম শক্তি সমাবেশ হতে পারে, শত্রুপক্ষের জনসমাবেশ কতখানি সীমাবদ্ধ করা যায়, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আগুপিছু প্রয়োজন আছে কিনা—এ সব কিছুই চিন্তা করা হয়নি। সংগ্রামের জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতির বিষয়টি ভাবা হয়নি। কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরী বলেছেন, 'কৃষক কাউন্সিল যখন আন্দোলনের সিদ্ধান্ত করে, তখনও এই সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির দিকে আদৌ নজর দেওয়া হয় না। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠন করা হয় না। এই ধরনের শ্রেণীসংগ্রামে শত্রুপক্ষের কাছ হতে কী ধরনের তীব্র আক্রমণ আসতে পারে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আগে হতে ছিল না।' (বাংলার ভূমিব্যবস্থার রূপরেখা—পৃঃ ২৮) এটা সহজেই অনুমেয় যে, আন্দোলনের পর্যায় ও গতিপথ সম্বন্ধে নেতৃত্বের কোনও ধারণাই ছিল না। নেতৃত্বের এক এক অংশ এক একভাবে বুঝেছেন। ফলে এক এক জেলায় এক একভাবে আন্দোলনকে বোঝানো হয়েছে এবং কর্মকৌশলও সেইভাবে ঠিক হয়েছে। প্রাদেশিক নেতৃত্বের কেউ কেউ যে প্রথম থেকেই একটি হঠকারিতার পথ নিয়েছিলেন তার প্রমাণও আমি পেয়েছি। কোনও স্থানে এই আন্দোলনকে কৃষকের আংশিক দাবি আদায়ের সংগ্রাম হিসেবে দেখা হয়েছে, আবার কোনও স্থানে মুক্তাঞ্চল গঠনের সূত্রপাত হিসেবে দেখা হয়েছে। তা ছাড়া জেলাগুলিতে আন্দোলনের নির্দেশ এত দেরিতে পাঠানো হয়েছে যে, সকল দিক বিচার করে কার্যক্রম ঠিক কবার সময় পাওয়া যায়নি। তবুও আন্দোলন শুরু হল।

প্রথম দিকে আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চলেছে। জোতদার পক্ষ প্রথমে বুঝতেই পাবেননি যে, সত্যই বর্গাদারেরা নিজেরাই তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। কিন্তু আন্দোলন যত বাডতে থাকল এবং ধান কাটার সময় যত এগিয়ে আসতে থাকল ততই তাদের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিতে থাকল। তারা প্রথমে তাদেব রক্ষী বাহিনী তৈরি করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু অনেক স্থানেই তা সম্ভব হল না। ধান কাটা শুরু হতেই তাঁরা পুলিশের শরণাপন্ন হলেন এবং পুলিশও তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল, শুরু হল সংঘর্ষ। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক সভা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে আন্দোলনকারীদের জন্য কতকগুলো নির্দেশ পাঠালেন। তার সব নির্দেশগুলো এখন আমার মনে নেই। তবে তাতে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে সর্ব উপায়ে বর্গাদারের ধান ও জান রক্ষা করার নির্দেশ ছিল। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে, আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকের সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করার অধিকার আছে। প্রয়োজন হলে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রায় সব স্থানেই ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

অনেক স্থানে যেমন বর্গাদারেরা ধান কেটে নিজ বাড়িতে সেই ধান তুলতে থাকলেন তেমনই আবার অনেক স্থানে কৃষক কর্মীদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা বার করে এবং পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে তাদের গ্রাম ছাড়া করে আন্দোলনকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা চলল। কোনও কোনও স্থানে তারা এতে সফলও হল। অনেক স্থানে বর্গাদারেরা ধান কাটারই সুযোগ পাননি। কোনও স্থানে পুলিশ বর্গাদারের কাটা ধান কেড়ে নিয়ে জোতদারকে দিয়ে দেয়। পুলিশকে বাধা দিতে গিয়ে কৃষকেরা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন।

এই আন্দোলন এত ব্যাপক ও উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল যে বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে বর্গাদারদের দাবি ও সংগ্রামের কথা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কলকাতার সংবাদপত্রগুলোতে আন্দোলন ও পুলিশি নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল। কোনও কোনও অকমিউনিস্ট সংবাদপত্রেও বর্গাদারদের দাবি সমর্থন করে ও পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা করে সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল। জমিতে কায়েমি স্বার্থ যাঁদের ছিল তাঁরাও প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারেননি। এর প্রভাব যেমন কৃষকদের ওপর পড়েছিল তেমনই পড়েছিল জোতদারদের ওপরেও।

এই রকম অবস্থা যখন চলেছে তখন প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সরকার বর্গাদারদের তে-ভাগার দাবি স্বীকার করে এবং তিনি এই বিষয়ে শিগগির একটি আইন পাস করবেন। লিগ এম. এল. এ.-দের বেশির ভাগই ছিলেন জোতদার বা তাদের সমর্থক। তাদের বিরোধিতায় এই আইন পাস হতে পারেনি। তারপর তিনি অর্ডিন্যান্স জারি করার কথা বলেছিলেন। তাও হয়নি। তাঁর প্রতিশ্রুতি বিরাট ধাপ্পায় পরিণত হল এবং লিগ নেতৃত্বের শ্রেণীচরিত্র জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার একটি ভাল সুযোগ এনে দিল।

তেভাগা আন্দোলনে সরকারের পাশবিক দমননীতির মুখে সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে বাংলার কৃষক যেভাবে সর্বস্ব পণ করে সংগ্রাম করেছেন এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা বাংলার ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকার যোগ্য। নিহত হয়েছেন নব্বই জন, ধর্ষিতা হয়েছেন বহু নারী, আহত হয়েছেন কত তার হিসেব নেই। গ্রেফতারের সংখ্যা হবে কয়েক হাজার। বহু স্থানে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে রেখে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বহুদিন ধরে অচল করে রাখা হয়েছিল। কৃষকরা তবুও পরাজয় স্বীকার করেননি।

তেভাগা আন্দোলন যে খুবই সময়োপযোগী হয়েছে তাতে ষাট লক্ষ কৃষকের যোগদানের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে। এখন এর ফলাফল নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলেছিলেন, কৃষকের একটি আংশিক সংগ্রামকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম হিসেবে পরিচালনা করতে গিয়ে এই সংগ্রাম বিফল হয়েছে। আমাদের জেলার অভিজ্ঞতায় আমি এই মন্তব্য সঠিক বলে মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু বগুড়ার তদানীন্তন জেলা কমিটির সভ্য এবং এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মিহির মুখার্জি (ভোলা মুখার্জি) আমাকে বলেছিলেন যে, বগুড়া জেলার পাঁচবিবি অঞ্চল এবং আরও দু-একটি জেলার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলতে পারেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটির এই অভিমত সত্য। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এই আন্দোলনকে স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম। পাঁচবিবিতে অযথা প্ররোচনা দিয়ে পুলিশ ক্যাম্প বসার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। তার ফলে কৃষক কর্মীরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন এবং বর্গাদারেরা ধান কাটার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।' দিনাজপুরের তদানীন্তন কৃষক নেতা ড. সুনীল সেন তাঁর Agrarian Struggle in Bengal ১৯৪৬-৪৭ (১৯৪৬-৪৭ সালের বঙ্গের কৃষক সংগ্রাম) গ্রন্থে আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলে লিখেছেন। কিন্তু কী কারণে ব্যর্থ হল তা তিনি বলতে পারেননি।

তেভাগা আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে আমি তা স্বীকার করি না। এটা সত্য যে, তে-ভাগার দাবি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকী অনেক স্থানে বর্গাদারেরা তাঁদের ভাগের ধান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং আন্দোলন মাঝপথে থেমে গিয়েছে। কিন্তু এটা তো সত্য যে, ওই আন্দোলন এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যার ফলে বুদ্ধিজীবী মহলেও আলোড়ন ওঠে এবং মন্ত্রীসভা এই দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর তিন-চার

বছরের মধ্যে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক তে-ভাগার আইন পাস হওয়ায় ওই আন্দোলনের সাফল্য ঘোষণা করে। পূর্ব পাকিস্তান সরকারও ওইরূপ একটি আইন পাস করেছিল বলে আমার মনে হচ্ছে।

এই আন্দোলন সফলই হোক আর বিফলই হোক, আন্দোলনে ভুলত্রুটি যাই থাকুক না কেন এই আন্দোলন ছিল তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলার কৃষকের ব্যাপকতম ও তীব্রতম শ্রেণীসংগ্রাম। এ যেন একটি বিদ্যুতের ঝলকের মতো সকলের সামনে কৃষকের প্রকৃত রূপ ও শক্তি উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে খেতমজুর থেকে মধ্য কৃষক পর্যন্ত এমনকী কোনও কোনও স্থলে ছোট ধনী কৃষক পর্যন্ত যে মজুর শ্রেণীর দৃঢ় মিত্র হয়ে উঠতে পারে তার সম্ভাবনাও এই আন্দোলনে প্রকাশিত হয়েছে।

এর থেকে অনেকে মনে করেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি তখন কৃষি বিপ্লবের ডাক না দিয়ে বিপ্লবেব সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। যারা তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতাই শুধু দেখেন তাদের মত যেমন আমি গ্রহণ করতে পারিনে, তেমনই পারিনে তাদের মত গ্রহণ করতে, যারা এক কদম এগিয়ে গিয়ে মনে করেন, কৃষি বিপ্লবের ডাক দিলেই তা সফল হত। যদি তাই হত তবে এই আন্দোলন পরিণতি লাভ করবার পূর্বেই থেমে গেল কেন? নৌ বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ, মজুর ধর্মঘট প্রভৃতির মধ্যে যে চেতনা কাজ করেছে তা হচ্ছে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সময়ে হিন্দু মজুরদের বলতে শোনা গেছে, রুটির লড়াইয়ে লালঝান্ডা ঠিক কিন্তু আজাদির লড়াইয়ে তেরঙ্গা ঝান্ডা ঠিক।

কৃষক শ্রেণীর চেতনাও ওই স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। ডিমলার তেভাগা আন্দোলনে এর প্রমাণ আমি পেয়েছি। এই চেতনাই কি বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট? বিপ্লবের ডাক দিলেই কি বিপ্লব হয়? ১৯৪৮-৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিল, কিন্তু বিপ্লব হয়নি। সাম্প্রতিক কালে নকশালপন্থীরা কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, তাতেও সাড়া মেলেনি। মার্কসবাদ লেনিনবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, বিপ্লব করে জনগণ; পার্টি অগ্রগামী সেনা বাহিনীর কাজ করে এবং নেতৃত্ব দেয়। অসংখ্য গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণ যখন বুঝতে পারে যে, একমাত্র সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনই তাদের বাঁচার পথ করে দিতে পারে শুধু তখনই তারা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। অবশ্য তাদের এই বোধ জাগ্রত করার কাজে পার্টির একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হচ্ছে বড় বড় গণআন্দোলনের পরিণতি; সূচনা নয়। বিপ্লবে জনগণকে পরিচালিত করতে পারে এমন একটি পার্টি যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে সমৃদ্ধ ও সুসংগঠিত। তেভাগা আন্দোলনে বর্গাদারদের আহ্বান জানাতে যে-পার্টির এত দ্বিধা ও দৌর্বল্য ছিল, আহ্বান দিয়েও যে-পার্টির তার করণীয় বিষয়গুলোর ওপর নজর দিতে পারেনি, সে- পার্টির কৃষি বিপ্লবের ডাক দেবার যোগ্যতাই বা ছিল কোথায়? বিপ্লবের কোনও অবস্থাই তখন ছিল না। সে সময়ে পার্টি নেতৃত্ব অনেক ভুলত্রুটি করেছেন তা ঠিক; কিন্তু তাঁরা যে বিপ্লবী সাজতে গিয়ে কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়ে বসেননি, তা ভালই করেছেন। একটি বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচিয়েছেন। তবে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (২০শে?) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি সাহেবের ভারতের নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা বার না হলে তেভাগা আন্দোলন থেকেই আরও বড় বড় আন্দোলন শুরু হয়ে একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করত কিনা তাই বা কে বলতে পারে?

রংপুর জেলার তেভাগা আন্দোলন:

রংপুর জেলার কৃষক সমিতি প্রথম থেকেই বাংলার একটি গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে এসেছে। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে অনেক বড় বড় আন্দোলন হয়েছে। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি যখন বেআইনি, বুদ্ধিজীবী সমাজ-আগত সকল নেতা ও কর্মীরা যখন আত্মগোপন করে কাজ করছেন তখনও কৃষক সমিতির একুশ হাজার সভ্য সংগ্রহ করে, রংপুর বাংলায় তো বটেই সম্ভবত ভারতের জেলাগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে, লাল রংপুর বলে আখ্যায়িত হয়েছিল। কৃষক সমিতির এই ব্যাপক ভিত্তিই দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রতিরোধে কংগ্রেস, লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত রিলিফ কমিটি গঠন সম্ভব করে তুলেছিল যদিও কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্ব এইরূপ কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে ছিলেন।

এই পটভূমিতে তেভাগা আন্দোলনেও রংপুর যে বাংলায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে তাতে সন্দেহের কিছু ছিল না। বিশেষভাবে ১৯৪১ সালে যখন একটি অঞ্চলে তে-ভাগার আন্দোলন হয়ে গিয়েছিল। রংপুর জেলায় বর্গা প্রথা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নিয়মে চলত। এর মধ্যে নীলফামারি মহকুমার বর্গা প্রথাই ছিল জঘন্যতম। ওই এলাকার বর্গাদারেরা ভূমিদাস ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। এই এলাকাতে তেভাগা আন্দোলন শুরু করা সঠিকই হয়েছিল। ডোমার ডিমলা ও কিশোরগঞ্জ থানাতে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। এছাড়া সদরের বদরগঞ্জ থানার একটি গ্রামে এই আন্দোলন চলে। ওখানে ওইভাবে আন্দোলন করার কোনও যুক্তি ছিল না। শুধু শক্তির অপব্যয় হয়েছে।

আন্দোলন শুরু করার আগে আন্দোলন সম্পর্কে কী কী আলোচনা হয়েছিল তা ঠিক বলতে পারব না। যদিও আমি জেলা কমিটির সভ্য ছিলাম, তবুও পিতৃদায়গ্রস্ত হয়ে ছুটিতে থাকায় আমি প্রথম দিকের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। আমি শুধু সিদ্ধান্তগুলো শুনেছিলাম।

প্রাদেশিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যে সব ভুলত্রুটির কথা বলা হয়েছে তা রংপুর জেলা নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রস্তুতি সম্পর্কে ভালভাবে আলোচনা না হওয়ায় সব স্থানে একরকম কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়নি। কিশোরগঞ্জে কিছুটা হঠকারিতা হওয়ার শুরুতেই সরকারি দমননীতি ডেকে নিয়ে আসে এবং আন্দোলন পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। মিহির মুখার্জি পাঁচবিবির আন্দোলন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন এখানেও অনেকটা তাই ঘটেছিল বলে আমি শুনেছি। ডোমারে সংগঠনের ওপর নজর দেওয়া হয়েছিল ঠিকই তবে বিস্তৃতির ওপর নজর দেওয়া হয়নি। সবচাইতে বড় কথা, তেভাগা আন্দোলনের বাইরে যে বিরাট অঞ্চল পড়ে ছিল সেখানকার কৃষকদের মধ্যে প্রচার করে তাঁদের এই আন্দোলনের সহযোগী করে তোলার কোনও প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। শহরের বুদ্ধিজীবীদের এই আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থক হিসেবে পাবারও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। শুধু রংপুর কুড়িগ্রাম ও নীলফামারির উকিল লাইব্রেরিতে একদিন করে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা চালান মণিকৃষ্ণ সেন ও সুধীর মুখার্জি। রংপুর ও কুড়িগ্রামেব আলোচনার ফলাফল আমার মনে নেই। তবে নীলফামারির কথা আমার মনে আছে। নীলফামারি শহরের বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশেব জমিতে কায়েমি স্বার্থ ছিল। এদের মধ্যে অনেকে ওকালতি করতেন। মণিকৃষ্ণ সেন যেদিন নীলফামারি উকিল লাইব্রেরিতে আলাপ করতে যান সেদিন তাঁর সাথে ডোমারের কৃষক কর্মী নজম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে জেল খেটেছিলেন। আলোচনা চলাকালে একজন প্রবীণ উকিল (কংগ্রেস নেতা)

নজম পণ্ডিতকে বলেন, "নজম তুমি শেষকালে ষোলো আনার আন্দোলন ছেড়ে দু পয়সার আন্দোলনে নামলে?" নজম সাথে সাথে উত্তর দিলেন, "আমরা কৃষক, আমাদের কাছে আইন হচ্ছে ইংরাজের দেওয়া পরচা (জরিপে ভূস্বামী, স্বত্ব, জমিকর ইত্যাদি লিখিত পরিচয়পত্র)। আমরা সেই পরচা ছিঁড়ছি। আপনারা আদালতের নথিপত্র ছিঁড়ে বের হয়ে আসুন না, তবেই তো ষোলো আনার আন্দোলন হয়ে যাবে।" প্রবীণ উকিল মহাশয় কোনও উত্তর করতে পারলেন না। অপেক্ষাকৃত নবীনেরা নজমকে তারিফ করলেন। যাদের বিরোধিতা করবার সম্ভাবনা ছিল তাঁরাও নির্বাক থাকলেন। নজমের উত্তরটি শহরের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল।

এর থেকেই বোঝা যায় শহরের বুদ্ধিজীবীদের সহানুভূতি বা সমর্থন কোন দিকে ছিল। আমরা যদি আরও সচেতন হতাম তবে তাঁদের সভা মিছিলে নামিয়ে তেভাগা সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করতে পারতাম। তবুও শহরে যেটুকু কাজ হয়েছে এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তেভাগা আন্দোলনের জন্য যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাব সংগ্রামী কৃষক ও জোতদার উভয়ের ওপরেই পড়েছে।

নিম্নলিখিতভাবে কাজের দায়িত্ব নেতাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। মণিকৃষ্ণ সেন ও মহী বাগচীর ওপর ডিমলা থানার ভার পড়ে ডোমার অঞ্চলের। দীনেশ লাহিড়ী প্রথমে ডিমলা যান। সেখানে কিছুদিন থেকে যান ডোমারে। পরেশ মজুমদার (মণ্টু মজুমদার) যান কিশোরগঞ্জ। তার সাথে আর কে ছিলেন তা এখন মনে নেই। অবনী বাগচী (জেলা সম্পাদক) এবং আমার ওপরেও ভার পড়ে ডিমলার। তবে যেতে দিন কয়েক দেরি হয়। ডিমলা যাবার পূর্বে আমাকে সদরের মধুপুর অঞ্চলের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি কোনও স্থানেই প্রথম থেকে কাজ করার সুযোগ পাইনি। তবে ডিমলা ও মধুপুরের প্রধান আন্দোলনের সময়ে আমি যোগদান করেছি এবং আন্দোলনের ধারা বুঝবারও সুযোগ পেয়েছি। আমার বর্তমান রচনায় শুধুমাত্র ডিমলার আন্দোলনের বিষয় লিখব। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ড. সুনীল সেনের উল্লিখিত পুস্তকে রংপুরের তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে প্রচুর তথ্যের ভুল আছে এবং আন্দোলনও সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি।

ডিমলা থানার তেভাগা আন্দোলন:

ডিমলা, ডোমরা ও কিশোরগঞ্জ থানার জোতদারেরা সকলেই যে প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী জোত স্বত্বের অধিকারী ছিলেন তা নয়। এঁরা বেশির ভাগই ছিলেন বৃহৎ রায়ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যারা 'ভয়ঙ্কর'। হাজার দেড় হাজার বিঘে জমির মালিক বেশ কিছু ছিলেন। সমগ্র অঞ্চলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জোতদার ও বিরাট সংখ্যক বর্গাদারই বাস করতেন। মধ্য কৃষক বা দিনমজুর সামান্য সংখ্যকই এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে বর্গাদাররা আসলে ছিলেন ভূমিদাস। তাদের নিজস্ব কোনও ভিটেবাড়ি ছিল না। জোতদারের জমিতে ঘর তুলে বাস করতেন। জোতদারের অনুমতি ছাড়া তাঁরা অন্য কোথাও যেতে পারতেন না বা, অন্য কারও জমি চাষ করতে পারতেন না। আসলে তারা জমির সাথে বাঁধা ছিলেন।

জোতদার তাদের হালের গোরু দিতেন এবং এই বাবদে প্রতি আমন খন্দে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ধান তাদের কাছ থেকে নিতেন। খাদ্যাভাব হলে জোতদার ধান কর্জ দিতেন। পূর্বে

এই কর্জ বাবদ সুদ দিতে হত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। যুদ্ধের সময় থেকে ব্যবস্থা হল দরকাটি কর্জার। অর্থাৎ বর্গাদার যখন ধান কর্জ নিতেন তখন তার বাজার দর যা থাকত তাই হত কর্জ আবার ধান ওঠার সময়ে বাজার দর অনুযায়ী ধান জোতদারকে দিতে হত। এতে সুদ দাঁড়াত শতকরা একশো থেকে দেড়শো ভাগ। বর্গাদারেরা মাসে দুদিন করে জোতদারের বাড়িতে বা জমিতে বেগার খাটতে বাধ্য ছিলেন। আমন খন্দে বর্গাদার যে ভাগ পেতেন তার থেকে কুড়ি ভাগের এক ভাগ জোতদারকে দিতে হত। একে বলা হত বিশারি। তা ছাড়া আরও অনেক বাবদ ধান দিতে হত। ফলে অনেকের ভাগ্যে মোটেই ধান থাকত না। কারও কারও সব দিয়েও পূর্ব দেনা শোধ হত না। আবার নতুন করে কর্জ নিতে হত। এই সব আদায় আমন খন্দেই হত। অন্যান্য খন্দ যেমন, আউশধান, পাট ও তামাকের আবাদে বাজে আদায় ছিল না। অবশ্য এগুলোর আবাদ ছিল খুবই কম।

তাদের খাদ্য ছিল খুবই নিম্ন মানের। হিমালয়ের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানে শীত ছিল খুবই বেশি। কিন্তু শীতবস্ত্র তাদের জুটত না। কাঁথা সেলাই করার মতো কাপড়ও জুটত না। নিজেদের হাতে বোনা চট গায়ে দিয়ে রাত কাটাতে হত।

অর্থনৈতিক দুর্দশাই সুদূর অতীতকাল থেকে তাদের ঠেলে দিয়েছে সংগ্রামের পথে। উল্লেখ্য যে, ১৯২১ সালে ডিমলা ও কিশোরগঞ্জ থানার কৃষকেরা বাস্তবে স্বাধীনতাই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। তার কুড়ি বছর পরে ১৯৪১ সালে আবার এই ডিমলা থানার কয়েকটি ইউনিয়নের বর্গাদারেরা কৃষক সভার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তেভাগা আন্দোলনে নেমেছিলেন। তখন দেশে ভারতরক্ষা আইনে সকল প্রকার আন্দোলন ছিল নিষিদ্ধ। বুদ্ধিজীবী কর্মীরা আত্মগোপন করে কাজ করছিলেন। এই অবস্থাতেও বর্গাদারেরা জমির ধান কেটে নিজ আঙিনায় তুলেছিলেন। জোতদার পক্ষের ক্ষমতা হয়নি এঁদের মোকাবিলা করার। তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল ইংরাজ সরকারের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। বর্গাদাররা সে পুলিশ বাহিনীকে বাধা দিতে পারেননি। পুলিশ ও জোতদার মিলিতভাবে বর্গাদারদের ধান লুঠ করেছে, জিনিসপত্র ভেঙেচুরে দিয়েছে। নারী ও পুরুষ যাকেই পেয়েছে তাদের ওপরেই করেছে অত্যাচার। শিশুরাও বাদ পড়েনি। তখনকার মতো সংগ্রাম দমিত হয়েছিল কিন্তু বর্গাদাররা দমিত হয়নি। তারা আবার নতুন সুযোগের অপেক্ষায় থাকল।

এই আন্দোলনেব প্রধান নেতা ছিলেন কালাচাঁদ বর্মণ ও দীনদয়াল বর্মণ। দু'জনেই বর্গাদার; জোতদাররা এঁদের হত্যার উদ্দেশ্যে গুণ্ডা নিয়োগ করেছিলেন। দীনদয়ালকে তারা পায়নি কিন্তু এক রাতে কালাচাঁদকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে তাঁর বুকে বল্লম বসিয়ে দেয়। কালাচাঁদের চিৎকারে লোকজন ছুটে আসবার পূর্বেই গুণ্ডারা পালিয়ে যায়। কালাচাঁদ প্রাণে বেঁচে যান এবং দমিত না হয়ে আবার আন্দোলনে নামেন।

তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। দুর্ভিক্ষ মহামারি বহুলোকের প্রাণনাশ করেছে। কৃষক সমিতিকে লড়তে হয়েছে তার বিরুদ্ধে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে পাবার আন্দোলনও করতে হয়েছে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে আইন সভার যে নির্বাচন হল তাতে ডিমলা থানার গয়াবাড়ি ইউনিয়নের পার্টি কর্মী হরিকান্ত সরকার একজন প্রার্থী ছিলেন। তাঁর সমর্থনে যে সব সভা হয় সেগুলোতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও জমির পুনর্বণ্টনের দাবি জোরালোভাবে তোলা হয়েছিল। অল্প ভোটের ব্যবধানে হরিকান্ত হেরে যান; কিন্তু পরবর্তী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে। স্বভাবতই নির্বাচনের মাস ছয়েক পরে যখন তেভাগা আন্দোলনের আহ্বান এল তাতে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। শুধু বর্গাদার নয় মধ্য কৃষক

যাদের তে-ভাগা বা জমির পুনর্বণ্টনে কোনওই লাভ লোকসান ছিল না তারাও এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এই আন্দোলনে স্থানীয় নেতাদের শীর্ষে ছিলেন যিনি (হরিকান্ত সরকার) তিনি ছিলেন মাঝারি জোতদার। তে-ভাগাই হোক আর জমির পুনর্বণ্টনই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই আর্থিক ক্ষতি ছাড়া তাঁর লাভ ছিল না। আর এই আন্দোলনে শহিদ হয়েছিলেন যিনি (তন্নারায়ণ রায়) তিনি ছিলেন একজন মধ্য কৃষক ও কবিরাজ।

আন্দোলন শুরু:

পরিকল্পনা অনুযায়ী মণিকৃষ্ণ সেন, দীনেশ লাহিড়ী ও মহী বাগচী ডিমলা গিয়ে প্রচুর জনসভা করেন। সভায় বিপুল জনসমাগম হতে থাকে। বিভিন্ন স্থান থেকে সভা করবার জন্য ডাক আসতে থাকে। জোতদাররা প্রথম দিকে এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু বর্গাদার থেকে আরম্ভ করে মধ্য কৃষক, এমনকী হরিকান্তর মতো জোতদারও যখন জোট বেঁধেছেন এবং ধান কাটার সময়ও এগিয়ে এসেছে তখনই তাদের টনক নড়ল। তারা ঠিকই বুঝে নিলেন যে, এই আন্দোলন চলতে দিলে তা তাদের মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের ঘন ঘন বৈঠক বসতে থাকল—আন্দোলন প্রতিরোধ করার পন্থা উদ্ভাবনের জন্য। কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। প্রথম চলল বর্গাদারদের ওপর হুমকি, আর তাদের জমি চাষ করতে দেওয়া হবে না বলে। তারপর চলল গ্রেফতারের ভীতি প্রদর্শন। কিন্তু কোনও ফল হল না। আন্দোলন এগিয়ে চলল। তারা স্থানীয় নেতাদের ওপর হামলা করতে সাহস পাননি। তখন ঠিক করলেন বহিরাগত নেতাদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের তাড়ানো। জলপাইগুড়িতে বসবাসকারী এক মাড়ওয়ারির বহু জমি ছিল ডিমলায়। তিনি আর কালক্ষেপ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি স্বয়ং একদিন মণিকৃষ্ণ সেন ও কিশোরগঞ্জ থেকে আগত বিপিন বর্মণকে নিরস্ত্র ও সঙ্গীহীন অবস্থায় পেয়ে আহত করেন। তাদের হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। শত্রুপক্ষ এবং তার কার্যাবলি সম্পর্কে আমাদের চেতনার অভাব কতখানি ছিল তা এই ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। আমরা যাদের আঘাত করতে প্রস্তুত হচ্ছি, তারা আমাদের ওপর সুযোগ পেলে আঘাত হানবেন না—তা আমরা ধরে নিলাম কী করে। একটু প্রস্তুত থাকলে সেই মাড়ওয়ারিটিকেই হাসপাতালে পাঠানো যেত।

জোতদারদের হিসেবেও বিরাট ভুল হয়েছিল। আন্দোলন চলতে দিলে যে তাদের শিয়রে শমন, সে হিসেব তাদের ঠিকই ছিল; কিন্তু বহিরাগত নেতাদের ওপর আক্রমণ চালাতে গেলেও যে সেই শমন ভয়ংকর রূপ নিয়ে আরও দ্রুত এগিয়ে আসবে তা তারা বুঝতে পারেননি। হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকা থেকে লাঠি, দাঁ, কুড়ুল প্রভৃতি নিয়ে তিন-চারশত কর্মী ও সাধারণ মানুষ সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন। তারা মাড়ওয়ারিটিকে খুঁজেছেন কিন্তু ততক্ষণে তিনি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ হাওয়া। জনতা তার খামার বাড়ি পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা তাদের করতে না দিয়ে তাদের নিয়ে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি দমননীতি বিরোধী ধ্বনি দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমণ করে। এই সিদ্ধান্ত ঠিকই হয়েছিল। তে-ভাগা কায়েম করাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। সংগ্রামের জন্যই সংগ্রাম নয়।

এই সংবাদ জেলা শহরে পৌঁছলে, জেলা পার্টি সম্পাদক অবনী বাগচী আমাকে অন্য অঞ্চল থেকে নিয়ে আসেন এবং দুজনে ডিমলা চলে যাই। অবনী বাগচী ডিমলা থানার

আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

'স্বাধীনতা' পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে, কবি গোলাম কুদ্দুস এবং ছবি এঁকে পাঠাবার জন্য শিল্পী সোমনাথ হোড় ডিমলায় ছিলেন। সাধারণ লোক সময় পেলেই এসে তাঁর ছবি আঁকা দেখতেন। সমিতির কেন্দ্রীয় অফিসে সব সময়েই জনসমাগম থাকত। আমার যাবার পরে তাদের যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। পার্টির এক জন নেতা আহত হওয়ায় দুজন নেতা এসেছেন, এতে তাঁরা খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁদের দেখে আমরাও উৎসাহিত হয়েছিলাম।

জোতদারের হামলার প্রতিবাদে তিন-চারদিন পরে একটি জনসভা হয়। সভার উদ্দেশে ডোমার, সৈয়দপুর, লালমণির হাট, গাইবান্ধা প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক নেতাই এসেছিলেন। সভার দু-তিন দিন আগে সংবাদপত্রে প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দির তে-ভাগা দাবির ন্যায্যতা স্বীকার এবং সেই অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের ইচ্ছার সংবাদ প্রকাশিত হয়। কৃষকরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, একটি আইন পাস হতে চলেছে। জোতদাররাও তাই বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ধারণা ছিল, ঠিক তে-ভাগা হবে না। নয় আনা-সাত আনা ভাগের আইন হতে পারে। অচিরেই তারা বুঝে গেলেন ওরকম কোনও আইন হচ্ছে না। ওই আইন হবে তা আমরাও বিশ্বাস করিনি, কারণ লিগ এম. এল. এ.-দের প্রধান অংশই ছিলেন জোতদার। আমরা তা কৃষকের সামনে তুলেও ধরিনি। তবে আমরা তাদের বলেছি যে, আইন হলেও একটি মরণপণ সংগ্রাম ছাড়া তা কার্যকরী হবে না।

দমননীতি বিরোধী সভাটিতে কম করেও ছয়-সাত হাজার জনসমাগম হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন ডোমারের কমিউনিস্ট নেতা বলরাম সাহা। প্রধান বক্তব্য রাখেন সুধীর মুখার্জি। রেল মজুর নেতা (সৈয়দপুর) কমনীয় দাশগুপ্ত তেভাগা আন্দোলনে রেল মজুরদের সমর্থন ও সংহতি ঘোষণা করেন। সভার পূর্বে জনৈক জোতদারের চাকরের কাছ থেকে জানা যায় যে, তার আগের রাতে জোতদাররা ঠিক করেছেন জুম্মাঘরে শুয়োরের মাথা ও দেবস্থানে গোরুর মাথা রেখে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা সৃষ্টি করা হবে। আমি সেই সংবাদ সভায় প্রকাশ করে ঘোষণা করি যে, কোনও ধর্মস্থানে শুয়োর বা গোরুর মাথা পাওয়া গেলে, হিন্দু কৃষক হিন্দু জোতদারের মাথা ফাটাবে এবং মুসলমান কৃষক ফাটাবে মুসলমান জোতদারের। জনতা এই ঘোষণা সমর্থন করেন। সভায় বলরাম সাহা ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁর বর্গাদারদের তে-ভাগার দাবি স্বীকার করে নিয়েছেন। হরিকান্ত সরকারও ঘোষণা করলেন যে, তিনি এবং তাঁর বড় ভাইও এই দাবি মেনে নিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি সব বর্গাদারকে নিজেদের সঙ্ঘ-শক্তির জোরে এই দাবি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহ্বান জানান। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সভার কাজ শেষ হয়। সভার আগে বেশ কয়েকটি মিছিল এসেছিল।

সভার সাফল্য যেমন কৃষকদের উদ্দীপিত করেছিল তেমনই জোতদারদের অন্তরে এনে দিয়েছিল দারুণ ভীতি। একে একে সব চাল তাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে। পুলিশ ছাড়া তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু আর কেউ ছিল না। কাজেই তারা পুলিশের শরণাপন্ন হলেন। তাদের দাবি অনুযায়ী সভার পরদিনই পুলিশ ইন্সপেক্টর দারোগা ও দুজন রাইফেলধারী পুলিশ যাদু মিঞাদের বাড়িতে এলেন। সেই বাড়ির একটি চাকর তাদের কথাবার্তায় বুঝতে পারেন যে, তারা হরিকান্ত সরকারকে ধরতে এসেছেন এবং সাথে সাথে ছুটে গিয়ে সতীশ বর্মণ নামক একজন কর্মীকে সে কথা জানান। সতীশ বর্মণ তৎক্ষণাৎ অন্যান্য স্থানে খবর পাঠিয়ে, ছয়জন

কর্মীকে নিয়ে কেন্দ্রীয় অফিসে আসেন। তাদের সকলেরই হাতে ছিল লাঠি। তাঁরা সংবাদটি দিয়েই দাবি করলেন, পুলিশের সাথে যে দুটো রাইফেল ও দুটো রিভলবার আছে তা তাদের কেড়ে নিতে দিতে হবে। তাদের বলা হয়েছিল, ধান এবং জান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তা ছাড়া পূর্বদিন তারা কৃষকের একতা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পেয়েছেন। কাজেই তাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে, তারা পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিতে সক্ষম। আমরা যে কয়জন ছিলাম, তারা খবর পেয়েই হরিকান্ত সরকারকে সরিয়ে দিই এবং কর্মীদের দাবি সম্পর্কে কী করণীয় তা নিয়ে আলোচনা করি। সিদ্ধান্ত খুবই দ্রুত নিতে হয়েছিল। কারণ হস্তক্ষেপ করবার আগেই পুলিশ এসে গেলে, আমাদের কিছু করার থাকবে না। সব দিক বিবেচনা করে ঠিক হয়, আন্দোলনের ওই অবস্থায় এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে বিরাট পুলিশ বাহিনীর দমননীতির সম্মুখীন হতে হয় এবং বর্গাদারের ধান কাটাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। আবার কর্মীদের মধ্যে যে জঙ্গি মনোভাব দেখা দিয়েছে তা দমিয়ে দেওয়াও ঠিক হবে না। কাজেই সিদ্ধান্ত হল, কর্মীদের সব বুঝিয়ে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে না গিয়ে, একটি দমননীতি বিরোধী মিছিল বের করা হবে। এই কাজটি করার দায়িত্ব আমার ওপরেই পড়ল। কাজটি যে বেশ জটিল ও কঠিন ছিল তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

আমি ও লালমণির হাটের রেল মজুর নেতা বিনয় ভৌমিক, কর্মীদের সব কথা বুঝিয়ে বললাম। তারা সুশৃঙ্খল বাহিনীর মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হল তারা তে-ভাগা চায় কিনা। উত্তরে তারা বলল, তে-ভাগার জন্য রাইফেল চাই। তখন তাদের বোঝানো হল বন্দুক কাজে লাগে তখনই, যখন আমাদের সঙ্ঘশক্তি সেই পর্যায়ে নিতে পারব। সেই কাজটি এখন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তাদের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। সকলেরই দাবি রাইফেল দিতে হবে। তাদের বোঝানো হল দক্ষিণাঞ্চলের বর্গাদারেরা এখনও ভালভাবে সংগঠিত হয়নি। এখন যদি এক বড় পুলিশি হামলা আসে তবে তারা পিছিয়ে যেতে পারে এবং এতে তোমাদের লাভ হবে না, লাভ হবে জোতদারের। দুটো বন্দুক নিয়ে কি তোমরা সেই অবস্থা আনতে চাও? এটা তারা বোঝে। তাদের বলি, চলো আমরা সারা এলাকা পরিক্রমণ করে জোতদারদের সাবধান করে দিই। ইতিমধ্যে সুধীর মুখার্জিও কিছুক্ষণের জন্য এসে কর্মীদের বুঝিয়ে যান।

আমরা মিছিল নিয়ে পুলিশ ও জোতদারের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে দিতে রওনা হয়েছি এমন সময়ে পুলিশ দলটি সামনে এসে পড়েছে। অবস্থা দেখে যে পুলিশরা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তা বেশ বোঝা গেছে। তাদের দেখে কর্মীদের লাইন ভাঙবার অবস্থা। সংগ্রামের ময়দানে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নেতার নির্দেশ মান্য করা যে উচিত তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের লাইনে রাখা হল। তারা পুলিশ বিরোধী ধ্বনি দিতে থাকলেন।

পুলিশ দলটির কাছে গিয়ে আমি তাদের আসার হেতু জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা উত্তরে বললেন যে, একটি গোলযোগের সংবাদ পেয়ে তাঁরা এসেছেন। আমি তাঁদের বললাম, এদিকে কোনও গোলযোগ নেই, কিন্তু তাঁরা থাকলে গোলযোগ হতে পারে। এটা তাঁরা পূর্বেই বুঝেছিলেন কিন্তু আত্মসম্মানের খাতিরে চলে যেতেও পারছিলেন না। তখন বিনয় ভৌমিক তাদের কাছে গিয়ে বলেন যে, এখন চলে গেলে মানটা যাবে ঠিকই, কিন্তু প্রাণটা বাঁচবে; দেরি করলে দুটোই যেতে পারে। এই কথা বলার পরেই তারা সাইকেলে উঠে থানার পথ ধরলেন। এবার আমার অবাক হবার পালা। পুলিশ দল পিছু ফিরতেই, তাঁরা লাইন ভেঙে পুলিশের পিছে ধাওয়া করলেন। আমি ও বিনয় তাদের সাথে ছুটতে থাকলাম।

এবার তাদের ফেরাবার জন্য নয়, তাদের সাথে থাকার জন্য।

কিছু দূরেই একটি মরা নদী পার হতে হয়। পুলিশ দলকে সাইকেল থেকে নেমে ওটা পার হতে হল। ইতিমধ্যে আমরাও নদীর ধারে এসে পড়েছি এবং আমাদের সংখ্যা পাঁচশো ছাড়িয়ে গেছে। পুলিশ দুটো ওপারে গিয়েই আমাদের দিকে রাইফেল তাক করলেন। এতে জনতা একটু থমকে দাঁড়াল। একজন কর্মী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা গুলি চালাতে পারে কিনা। আমি একটু জোরেই বললাম, ওরা গুলি চালাতে পারে, কিন্তু গুলি চালালে যেন ওদের এক জনও ফিরে যেতে না পারে। এই বলে আমি এগিয়ে গেলাম। সাথে সাথে জনতা আরও দ্রুত এগিয়ে চলল। দেখা গেল চারদিক থেকে অসংখ্য লোক লাঠি, কুড়ুল, কোদাল, গাছের ডাল, যিনি যা পেয়েছেন তাই নিয়েই ছুটে আসছেন। নবাব নুরুল উদ্দিন (১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র উত্তরবঙ্গে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কৃষকরা দেবী সিংহের অত্যাচার বন্ধ এবং ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হন। রংপুর ছিল তাঁদের প্রধান কেন্দ্র। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণ সমবেত হয়ে নুরুল উদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে নবাব বলে ঘোষণা করেন) ও দেওয়ান দয়াশীলের (নুরুল উদ্দিন নবাব নির্বাচিত হয়ে দয়াশীল নামক এক প্রবীণ কৃষককে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে রাজা উপাধি দেন) অনুগামীদের বংশধর এঁরা। এঁদের শিরায় শিরায় পূর্বপুরুষের সংগ্রামী রক্তের স্পন্দন আজও সমভাবে বর্তমান। আমি ধরে নিলাম সংঘর্ষ অনিবার্য এবং সেই হিসেবে সকলকে প্রস্তুত হতে বললাম। একটি দিক তখনও খোলা ছিল। পুলিশ দল বেকায়দা বুঝে সেই পথে পালিয়ে গেল। এই ঘটনার পর প্রায় দু মাস তারা ওই অঞ্চলে আসেননি। তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই দু মাস ওই অঞ্চলে চুরি ডাকাতি বা অন্য কোনও প্রকার সমাজবিরোধী ঘটনা ঘটেনি। সকলে যেন সত্যযুগে বাস করেছেন। যে সব কর্মী রাইফেল কেড়ে নেবার দাবি করেছিলেন তাঁরা তখন আমাকে বলেছিলেন যে, রাইফেল কেড়ে না নেওয়া ঠিকই হয়েছিল; এই ভাল হয়েছে।

সেদিন পুলিশের বেইজ্জতি পলায়নে সাধারণ মানুষের মধ্যে আশা ও ভরসা বেশ উচ্চ পর্যায়ে ওঠে। সমস্ত দিকে এই সংবাদ তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণাংশের বর্গাদারদের যেটুকু দ্বিধা ছিল তা তারা কাটিয়ে এগিয়ে আসেন। দূর দূর অঞ্চল থেকে সভা করার ডাক আসছিল। এত বেশি সভা করতে হচ্ছিল যে, আমরা সংগঠনের দিকে সে রকম নজরই দিতে পারিনি। অপরপক্ষে জোতদারদের মধ্যে দেখা দেয় দারুণ নৈরাশ্য। সবই তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

ডিমলা থানায় চোর ডাকাতদের সংখ্যা কিছু বেশিই ছিল। তারা আবার বর্গাদারও ছিল। এই দুটো পেশাতেই তারা জোতদারদের দ্বারা শোষিত হত। ডাকাতি করা মাল নিজেদের বাড়িতে রাখা বিপদজনক। জোতদাররা ছিলেন তাদের থলিয়াৎ। তারা এই মালে তে-ভাগা কায়েম করেছিলেন। তারা ডাকাতদের দিতেন এক ভাগ নিজেরা নিতেন দু ভাগ। এর থেকে অবশ্য একটি অংশ যেত থানাদারদের পকেটে। এই কারণে ডাকাতদের মধ্যে বেশ বিক্ষোভ ছিল। কৃষক সমিতির তেভাগা আন্দোলন ও জমির পুনর্বন্টনের দাবি সহজেই তাদের আকৃষ্ট করে এবং অনেকে আন্দোলনে যোগদান করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ভাল সংগঠক হয়েছিলেন। সাময়িকভাবে হলেও তাদের মনের পরিবর্তন হয়েছিল। এরাই ছিলেন জোতদারদের লাঠিয়াল। তাদের মনে এই পরিবর্তন আসায় জোতদাররা অসহায় হয়ে পড়েন। যে সব চোর ডাকাতের মনের পরিবর্তন হয়নি, তারাও জাগ্রত জনশক্তির ভয়ে ও

কাজে যেতে পারেননি।

ইতিমধ্যে ধান কাটা শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় কর্মীরাই বর্গাদারদের নিয়ে বৈঠক করে দিন ঠিক করে, ধান কেটে নিজ নিজ আঙিনায় ধান তুলতে থাকেন। জোতদারদের ক্ষমতা হয়নি বাধা দেবার। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ চেষ্টা করে, রাতের আঁধারে সেই ধান চুরি করে নিয়ে যাবার বা বর্গাদারের ওপর হামলা করার। তাতেও তারা বিফল হয়। রংপুরের গ্রামে শঙ্খের চল ছিল না। শিঙা কারও কারও বাড়িতে ছিল, তাও খুব কম। কাজেই ঠিক হয়েছিল, কোনওখানে জোতদার বা পুলিশের আক্রমণ হলে, তারা 'হো হো' শব্দ তুলবে। যারা সেই শব্দ শুনবে তারাও 'হো হো' শব্দ করতে করতে সেই দিকে লাঠি নিয়ে দৌড়ে যাবে। এই করেই জোতদারদের হামলা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই 'হো হো' শব্দ জোতদার ও পুলিশ উভয়ের মধ্যেই দারুণ ভীতির সঞ্চার করেছিল।

ধান কাটা শুরু হবার পূর্বে, বহু হাটে আমরা কৃষক মিছিল তুলেছি এবং তেভাগা আন্দোলনের প্রচার করেছি। কুচবিহারের মেখলিগঞ্জ মহকুমা ডিমলা থানার সংলগ্ন। সেখানে একটি খুব বড় হাটে (ঠাকুরগঞ্জহাট) আমরা দুদিন মিছিল তুলেছিলাম। ডিমলা থানার উত্তরাঞ্চলের বহু কৃষক ওই হাট করেন। আমাদের মিছিল ও ডিমলার আন্দোলনের প্রভাবে মেখলিগঞ্জ মহকুমার কয়েকটি গ্রামের বর্গাদারেরা, একজনকে রাজা ও একজনকে মন্ত্রী নির্বাচিত করে এই আন্দোলন করেন। মন্ত্রীর নাম ছিল উমিচাঁদ বর্ষণ। রাজার নাম আমার মনে নেই। ১৯৫১ সালের নির্বাচনের সময়ে রাজা যোগদান করেন কংগ্রেসে এবং মন্ত্রী যোগদান করেন পি. এস. পি.-তে। তিনি মাঝারি কৃষক ছিলেন। বলা যায় তারই নেতৃত্বে বর্গাদারেরা ধান কেটে নিজ নিজ বাড়িতে তোলেন। এক দিন থানার জমাদার ও দুজন সিপাই জোতদারদের সাহায্য করতে এসে, লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যান।

আমরা বিচার বিবেচনা করেই ডিমলার জোতদারদের নেতা যাদু মিঞাদের বাড়ির নিকটের হাটটি (খগার হাট) বাদ রেখেছিলাম। একে হাটটি বেশ ছোট ছিল। হাটের ওপরেই ছিল জমিদার কাছারি। তার নায়েব থেকে আরম্ভ করে পাইক পর্যন্ত, সব যাদু মিঞাদের লোক। তা ছাড়া যাদু মিঞাদের সব শরিকের বাড়ি ওখানেই। বিনা কারণে কোনও সংঘর্ষে যাবার ইচ্ছে আমাদের ছিল না। কিন্তু একদিন যাদু মিঞা ঘোষণা করলেন কমিউনিস্টরা যত হাটেই উঠুক, আমাদের হাটে উঠতে পারবে না। এখানে এলে কয়েকটি লাশ ফেলে যেতে হবে। এতে কর্মীদের মধ্য থেকে দাবি উঠল ওই হাটে উঠতেই হবে। আমরাও রাজি হলাম এবং তার প্রস্তুতি চালালাম। কর্মীদের কয়েকজন বললেন, আটঘড়িটারি নামক গ্রামটির সব লোকই ডাকাত এবং তারাই যাদু মিঞাদের লাঠিয়াল। তাদের পক্ষে পেলে, বিনা বাধায় হাটে ওঠা যাবে। দুজন কর্মী তাদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করেছেন। ডাকাতরা বলেন, তারা এক জন নেতার সাথে এ বিষয়ে আলাপ করতে চান। ঠিক হল আমি তাদের সাথে আলাপ করতে যাব। এক রাতে কয়েকজন কর্মীকে সাথে নিয়ে তাদের পাড়ায় গেলাম এবং তাদের সাথে আলাপ করলাম। আলাপে তারা খুশি হলেন এবং বললেন, 'আমরা ধান চাষ করেও যেমন আমাদের মেহনতের ভাগ পাই না, তেমনই জীবন বিপন্ন করে যে মাল ডাকাতি করে নিয়ে আসি, তারও ন্যায্য ভাগ পাই না। মাল ওদের হাতেই তুলে দিতে হয়। ওরা দু ভাগ নিয়ে এক ভাগ আমাদের দেয়। আমরা এই সুবিধে পাই যে, দারোগা পুলিশের হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। আপনারা যা নিয়ে লড়ছেন তা তো আমাদেরই ভালর জন্য। ধানের ভাগ বৃদ্ধি পেলেও আমাদের লাভ হবে এবং জমির পুর্নবণ্টন হলে আমরাও জমি

পাব। আমরা ডাকাত বলে লোক আমাদের ভয় করে ঠিকই, কিন্তু ঘৃণা করে অনেক বেশি। আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাই। আপনাদের আন্দোলনে আমাদের সমর্থন আছে। তবে নানাভাবে যাদুমিঞাদের হাতে আমরা বাঁধা। আমরা প্রকাশ্যে আপনাদের সাথে যেতে পারব না। তবে আপনাদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরতেও যাব না, তা যত চাপই আমাদের ওপর আসুক না কেন। আমরা ডাকাত, আমরা কখনও কথার খেলাপ করি না।' তারা তাদের কথা রেখেছিলেন।

একদিন তিনশো-সাড়ে তিনশো কর্মীর একটি মিছিল সত্যই খগার হাটে উঠল। প্রত্যেকের হাতে ছিল লাঠি। মিছিলে কয়েকটি লাল পতাকাও ছিল। পরিচালনায় ছিলাম আমি ও গাইবান্ধার কছিরউদ্দিন আহম্মদ। মিছিলটি ছিল খুবই জঙ্গি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাস্তায় একটি স্থানে পড়ে, যার এক দিকে আটঘড়িটারি ও অপর দিকে যাদু মিঞাদের বাড়ি। সেখানে এসেই কর্মীরা যেন আরও জঙ্গি হয়ে উঠলেন। তাদের হাতের লাঠি আরও ওপরে উঠল; শ্লোগানের পর্দাও গেল চড়ে। আমাকে এবং কছির মিঞাকে তারা সামনে থেকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন, যদি কোনও আক্রমণ আসে এই আশঙ্কায়। ভেবে অবাক হতে হয়, এই উত্তেজনার মধ্যেও তারা নেতাদের নিরাপত্তার কথা মনে রেখেছিলেন। এইটাই প্রমাণ করে, সংগ্রাম সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন তারা। আজ এই কথা ভেবে আমি খুবই বিচলিত হই যে, আমাদের ওপরে যে আস্থা রেখে তারা সব রকম বিপদআপদ তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা সে আস্থার মূল্য দিতে পাবলাম কই?

আমরা বিনা বাধায় হাটে উঠলাম। অবনী বাগচী অন্য পথে হাটে গিয়েছিলেন। হাট পরিক্রমা করে একটি সভা করা হল। সভায় যাদু মিঞা সমেত কিছু জোতদার উপস্থিত ছিলেন। আমি আমার বক্তব্যে জোতদারদের তে-ভাগা স্বীকার করে নিয়ে, এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে আহ্বান জানালাম। সাথে সাথে এই হুঁশিয়ারিও দিলাম যে, তারা পীড়নমূলক যে কোনও পন্থা গ্রহণ করলে যে আগুন জ্বলে উঠবে, তাতে তারাই পুড়ে মরবেন। আমার বলা শেষ হলে যাদু মিঞা কিছু বলতে চাইলেন। তাকে বলতে দেওয়া হল। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট ভাষণে বর্গাদারদের ভাগবৃদ্ধির দাবিটি স্বীকার করেও বলেন, তে-ভাগা খুব বেশি হয়ে যায়, ভাগটি নয় আনা সাত আনা করা হোক। তিনি বিশারি আদায় করবেন না বলে ঘোষণা করলেন। তিনি জানালেন যে, তিনি সব জোতদারকে এই দাবি মেনে নিতে বলছেন কিন্তু তারা রাজি না হয়ে ভুল করছেন। আমাদের তরফ থেকে বলা হল, সরকার এই দাবিকে ন্যায্য বলে মনে করে। কাজেই এই দাবি থেকে বর্গাদারদের সরে আসার কোনও কথাই ওঠে না। হয় জোতদাররা এই দাবি মেনে নিন, না হয়, এর ফলাফলের জন্য প্রস্তুত থাকুন। এই কথা বলে, সভা শেষ করে দেওয়া হয়। হাটে মিছিল ওঠা এবং যাদু মিঞার নম্রভাব দেখে কর্মীদের মধ্যে একটি বিজয়গর্ব জেগে ওঠে। আমি তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলি যে, তারা যেন যাদু মিঞার মিষ্ট ভাষণে না ভোলেন।

কিছুদিন আগে থেকে ছোট ছোট জোতদারেরা কর্মীদের কাছে আপসের প্রস্তাব তুলতে থাকেন। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বিধবা ও নাবালক জোতদার ছিলেন। বর্গাদারেরা শেষোক্তদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। একটি কর্মী বৈঠকে তারা এই সমস্যাটি তুলে বললেন, এদের সাথে আপস করাই ভাল। আমি তাদের বলি যে, যদি তারা আন্দোলনে আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন তবে অবশ্যই আমাদের এই বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। তবে সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রীয়ভাবে নেওয়া প্রয়োজন। পরের দিনই একটি জমায়েত ছিল।

তাতে এক বিধবা জোতদার তার নাবালক পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন। সেই রাতেই আমাদের কেন্দ্রীয় বৈঠকে ওই প্রস্তাবটির ওপর আলোচনা তুলি। অনেকেই মনে করেন, এদের সাথে আপস করাই ভাল। কিন্তু জনাদুয়েক এই বলে আপত্তি তুললেন যে, এটা করতে গেলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। সেদিন কোনও সিদ্ধান্ত হল না। আমরা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও, কর্মী ও বর্গাদারেরা আপস করে নিয়েছিলেন। তারা ঠিকই করেছিলেন। আন্দোলনে কোনও বিশৃঙ্খলা হয়নি।

সবচেয়ে শেষে কাটা হয়েছে যাদু মিঞাদের ধান। যেদিন ধান কাটা হবে তার আগের দিন রাতে, স্থানীয় নেতা তন্নারায়ণ রায় এক বর্গাদারদের বাড়িতে বর্গাদারদের নিয়ে একটি বৈঠক করছিলেন। সে বাড়িটি ছিল যাদু মিঞার বাড়ির খুব কাছে। বৈঠক চলাকালে যাদু মিঞার নেতৃত্বে পঁচিশ-তিরিশ জনের একটি দল, অতর্কিতে বন্দুক নিয়ে বর্গাদারদের আক্রমণ করে এবং এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। তাদের বাধা দিতে যেয়ে অনেকে আহত হন। জোতদারদের একজন ত্বড়িৎ গতিতে যেয়ে, তন্নারায়ণের বুকে বন্দুক লাগিয়ে গুলি করে সবসুদ্ধ পালিয়ে যায়। তন্নারায়ণ সাথে সাথে মারা যান। গুলিতে সবচাইতে বেশি জখম হয়েছিলেন বাচ্চা মামুদ। ঘটনাটি এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে, আশেপাশের লোক দৌড়ে এসেও আক্রমণকারীকে ধরতে পারেননি। পুলিশ তখন যাদু মিঞাদের বাড়িতে ছিল বলে শোনা গেছে। মণিকৃষ্ণ সেন ও মহী বাগচী ঘটনাস্থলে ছুটে যান। গোলাম কুদ্দুসও গিয়েছিলেন। আমি ও কছিরউদ্দিন মাইল দুয়েক দক্ষিণে একটি সভা করতে গিয়েছিলাম। সংবাদ পেয়ে আমি আক্রমণস্থলে চলে আসি। আমি যাবার পূর্বেই দারোগা এসে গৃহস্বামী ও অন্যান্য কয়েকজনের জবানবন্দি নেন ও মৃতদেহ নিয়ে চলে যান। বাচ্চা মামুদকে মাইল দুয়েক দূরে একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। আমি যাবার পূর্বেই কয়েক শো লোক সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একদল সেই রাত্রেই জোতদারদের বাড়ি আক্রমণ করতে চান এবং আর একদল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান। দ্বিতীয় মতটিই প্রাধান্য পায়।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় কিছুদিন ধরে, বাধাহীনভাবে কাজ করে আমাদের মধ্যে একটি আত্মসন্তুষ্টির ভাব এসেছিল এবং সতর্কতার প্রয়োজন বোধ কমে গিয়েছিল। কর্মীদেব আমরা সতর্কতা বোধ জাগ্রত করতে পারিনি। যাদু মিঞাদের বাড়ির কাছে বৈঠক বসেছে অথচ পাহারা বা অন্যান্য আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যাদু মিঞা সম্বন্ধে আমি যে সতর্ক থাকার উপদেশ দিয়েছিলাম, তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

খুব ভোর হতেই আক্রান্ত স্থানে জনসমাগম হতে থাকে। সব অঞ্চল থেকেই কর্মীরা এসে খবর দেন যে, বড় জোতদাররা সব রাতেই পালিয়ে গেছে। হাজার পাঁচেক লোক সমবেত হয়েছিলেন। আমরা আলোচনা করে ঠিক করি যে, যাদু মিঞাদের সব শরিকের বাড়ি যাওয়া হবে। সাবালক ব্যক্তি যাদেরই পাওয়া যাবে, তাদেরই ধরে আনা হবে। প্রয়োজন হলে প্রাণ নিতেও দ্বিধা করা হবে না। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই শিশু ও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেওয়া হবে না এবং বাড়িও পোড়ানো হবে না। এই ঠিক করে আমি ও মহী বাগচী মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মিছিলে ঘন ঘন ধ্বনি উঠেছে, 'খুনিদের শাস্তি চাই যাদু মিঞার কাল্লা চাই।' সব স্থানেই দেখা গেছে খুনিরা তো বটেই, তাদের বাড়ির সব সাবালক ব্যক্তিই পালিয়েছে। কর্মীরা সব বাড়িতে ঢুকে দেখেছেন তারা নেই। সব বাড়ি থেকেই স্ত্রীলোকদের ক্রন্দনরব শোনা যাচ্ছে। আমরা যখন মিছিল নিয়ে ঘুরছি, তখন এক স্থানে দেখলাম, একটি বাড়ির

সামনে থানার দারোগা কাঁপতে কাঁপতে ১৪৪ ধারার আদেশটি পড়ছেন। আমরা তাকে ঘিরে ধরলাম। তিনি খুব দ্রুত আদেশটি পড়ে চলে গেলেন। তারপর ৩ মার্চের (১৯৪৭) মধ্যে তাদের আর দেখা যায়নি। বড় জোতদাররাও ফেরার থাকলেন।

সমগ্র থানায় অবস্থাটা দাঁড়াল এই রকম। থানা আছে, কিন্তু তার কোনও কাজ নেই। চৌকিদার-দফাদার আছেন, তারা সমিতির লোক। জোতদার মহাজন নেই, জমিদার কাছারি আছে, তার দরজায় তালা ঝুলছে। আছেন শুধু কৃষক ও তাদের নেতৃবৃন্দ। হাট বাজার নিয়মিত বসছে। ধান কাটা হচ্ছে। বর্গাদারেরা নিজ নিজ বাড়িতে সেই ধান তুলে, তিন ভাগের এক ভাগ জোতদারের জন্য রেখে, বাকিটা মাড়াই করে ঘরে তুলছেন। গ্রামে চুরি-ডাকাতি নেই, ঝগড়াঝাঁটিও নেই। এ এক নতুন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা।

সমস্ত ঘটনা এমনভাবে ঘটে গিয়েছে, মনে হবে যেন এক অলৌকিক শক্তি কৃষকদের পক্ষে কাজ করেছে। কৃষকেরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে না অথচ জোতদার ও পুলিশ কৃষকদের হাতে ময়দান ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছে। আসলে, যে শক্তি কাজ করেছে, তা হচ্ছে থানার প্রতিটি কৃষকের ঐক্য এবং সংগ্রামী মানসিকতা, যা সৃষ্টি হয়েছিল বহু বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নেতৃত্বের সংযত ও অপেক্ষাকৃত সঠিক কর্মকৌশল। বিপ্লবী তন্নারায়ণের আত্মদান এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

এতকাল বর্গাদারেরা ধান কেটে তুলেছেন জোতদারের খামারে। এবার ধান উঠেছে তাদের নিজ আঙিনায়। বাড়ির স্ত্রীলোকেরা এই প্রথম তাদের রঙে বোনা ধান নিজ আঙিনায় উঠতে দেখলেন। তারা দল বেঁধে প্রতিমা দেখার মতো প্রতি বাড়ির ধান দেখে বেরিয়েছিল। এটা ছিল তাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সমিতি এবং তার নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বেড়েছে অনেক।

বড় জোতদাররা ফেরার ছিলেন, তারা তাদের ধান নিতে পারেননি। খুব ছোট জোতদারদের সাথে বর্গাদাররা আপস করেছিলেন। মাঝারি জোতদাররা যা পেয়েছেন তাই নিয়ে গেছেন। কেউ বা রসিদ দিয়েছেন, কেউ দেননি।

গুলি চালনার পরে জেলা শহর থেকে একটি বেসরকারি তদন্ত কমিটি এসেছিল। তাতে ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (উকিল), রংপুরের বিখ্যাত লাহিড়ী পরিবারের ভবতারণ লাহিড়ী, জগদীশ দাশগুপ্ত (উকিল), ডা. নির্মল বোস, মহিলা নেত্রী বিমলা দত্ত এবং আরও অনেকে। এরপর এসেছে কলকাতা এবং রংপুর থেকে ছাত্র প্রতিনিধি দল। এর ফল খুবই ভাল হয়েছিল। কৃষকরা যে তাদের সংগ্রামে একা নন, এটা তারা প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু নেতৃত্বের ত্রুটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ পড়েছে। রেল শ্রমিকদের তরফ থেকে, প্রথম দিকে তাদের সমর্থন জানানো হয়েছিল। কিন্তু গুলি চালনার পরে কোনও প্রতিনিধি দল আসেনি।

ধান কাটা শেষ হয়ে গেলে কৃষক হত্যার প্রতিবাদে এবং দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে শাস্তিদানের দাবিতে, ডিমলা থেকে শ' পাঁচেক লোকের একটি র‍্যালি কুড়ি মাইল হেঁটে নীলফামারি শহরে যায়। পথে ডোমার থেকে সম পরিমাণ কৃষক যোগদান করেছিলেন। ডিমলার র‍্যালি পরিচালনায় মহী বাগচী, কছিরউদ্দিন ও আমি ছিলাম। ডোমারের কৃষকদের সঙ্গে ছিলেন কালীপদ দে ও নারায়ণ ব্যানার্জি। অবনী বাগচী, মণিকৃষ্ণ সেন ও সুধীর মুখার্জি আগেই নীলফামারি চলে গিয়েছিলেন। শহরের পার্টির সভ্য ও সমর্থক বহু লোক র‍্যালিকে অভ্যর্থনা জানান এবং র‍্যালির সাথে শহর পরিক্রমা করেন। রাস্তার দু' ধারে নারী ও পুরুষ

বহু লোক দাঁড়িয়ে কৃষকদের উৎসাহ দেন। র‍্যালির ধ্বনি ছিল, 'খুনিদের শাস্তি চাই, যাদু মিঞার কাল্লা চাই।' মহকুমা শাসকের কোর্টের সামনে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে একটি সভা করা হয়। তারপর র‍্যালিটি আবার নিজ এলাকায় ফিরে যায়। নীলফামারির যাঁরা যোগদান করেন, তাঁদের মধ্যে ডা. মনোজ্ঞ ঘোষ, বিমল ভৌমিক, মোহিত মাস্টার ও ক্ষিতীশ দত্তর নাম উল্লেখযোগ্য।

নীলফামারি র‍্যালি থেকে ফেরার পরে কিছু কর্মীর মধ্যে একটি নতুন চিন্তা দেখা দেয়। তারা ভাবতে থাকেন এ আন্দোলনে আমরা জিতেছি। এরপর আরও বড় সংগ্রাম করতে হবে। তখন অবশ্যই পুলিশের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে যেতে হবে। পুলিশকে ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করার জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করতে হবে, এ সব নিয়ে তাদের মধ্যে পরামর্শ হতে থাকে। তারা এ সব আমাদের কাছে প্রকাশও করেছিলেন। আমরা তাদের উৎসাহই দিয়েছিলাম। এই সময়ে কাকতালীয় ব্যাপারের মতো সূর্য কলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে সন্ধ্যার কিছু আগে এই কলঙ্ক দেখা যেত। তাই দেখে কৃষকরা মনে করেছেন যে, শহিদ তন্নারায়ণ সূর্যে গিয়ে লালঝান্ডা নিয়ে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলছেন। তাদের ধারণা হয়ে গেল তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

এদিকে আবার মহকুমা লিগ নেতাদের একটি চিন্তা দেখা দিল যে, কী করে এই জাগ্রত জনরোষ থেকে জোতদারদের রক্ষা করা হবে। কৃষকদের ঠাণ্ডা করার জন্য প্রথম এলেন মহকুমা মুসলিম লিগের সভাপতি দবীর উদ্দিন আহম্মদ (ইনি পাকিস্তান হবার পরে জেলা আওয়ামি লিগের সভাপতি হন)। তিনি একটি সভা ডাকেন। তাতে লোক বেশি হয়নি। তাদের তিনি বললেন, 'যারা খুন করেছেন আদালত অবশ্যই তাদের শাস্তি দেবে।' আপনারা আমাদের পক্ষে কথা বলতে আসেননি? আজ খুনিদের পক্ষ নিয়ে বলতে এসেছেন কেন? লিগ নেতার কাছে এর কোনও জবাব ছিল না। তিনি সভা থেকে চলে যান। এরপর আসেন লিগ এম. এল. এ. খয়রাত হোসেন। তিনিও কিছু করতে পারেন না, চলে যান।

আমরা গ্রামে গ্রামে বৈঠক করতে থাকি। ধান পাওয়া গেল। এখন জমিতে চাষের অধিকার রাখতে হবে। সুতরাং যে আন্দোলন শুরু হয়েছে এর আগুন নেভানো চলবে না। যে সংগঠন গড়ে উঠেছে, তাকে আরও বাড়াতে হবে। ডিমলা এলাকার বাইরের কৃষক যারা এখনও আন্দোলনে আসেননি, তাদের আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আন্দোলনকে আরও উঁচু স্তরে তুলতে হবে প্রভৃতি বলা হত। কৃষকরাও খুব উৎসাহের সাথে যোগ দিচ্ছিলেন। সব সাবালক মানুষকে কৃষক সমিতির সভ্য করা হচ্ছিল।

হঠাৎ ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্বোক্ত এটলি সাহেবের ঘোষণা বের হবার পর সাধারণ কৃষকদের মধ্যে একটি মনোভাব দেখা দেয়। তা হচ্ছে, দেখি না স্বাধীন সরকার কী করে। ইংরাজ না থাকলে তো তার আইনও থাকবে না। নতুন আইনও থাকবে না। নতুন আইন হবে। সে আইন তো আমাদের পক্ষেও যেতে পারে। সুতরাং এখন আর করবার কিছু নেই। আমাদের পার্টি নেতৃত্ব ওই অবস্থায় গণ আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর করণীয় কী তার নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমরাও বিভ্রান্ত ছিলাম। কী যে তখন করণীয় তা ঠিক করতে পারিনি। শুধু তাদের এইটুকু বলতাম, ইংরাজ দেশের ধনী নেতাদের হাতেই ক্ষমতা দেবে। তখনও লড়াই করেই কৃষক-মজুরের দাবি আদায় করতে হবে। আপনা থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। আমাদের কথাগুলো কর্মীরা ঠিক মনে করলেও, সাধারণ কৃষক সঠিক বলে মেনে নেননি।

আমরা পরবর্তী আন্দোলন সম্পর্কে যাই মনে করি না কেন, তখনকার মতো বেশ বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমরা ধারণাই করতে পারিনি যে, এই ঘোষণার এগারো দিনের মধ্যেই আমাদের ওপর একটি ব্যাপক আক্রমণ হতে চলেছে। যে সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমরা মেনে চলতাম, তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হল না। ৩ মার্চ হামলার কিছুক্ষণ পূর্বে সংবাদ পেলাম, তিন ট্রাক পুলিশ যাদু মিঞার বাড়িতে এসেছে কৃষকের ওপর হামলা করতে। কিন্তু তা বিশ্বাস করলাম না। আমি যদি সংবাদটি বিশ্বাস করতাম তবে কয়েকজন কর্মীকে গ্রেফতার থেকে রক্ষা করা যেত। আজ এতদিন পরেও আমার এই ভুলের জন্য অনুশোচনা হয়। আমরা যে কী করে ধরে নিলাম, যাঁদের প্রতিনিধি ওই মন্ত্রীসভা তারা তাদের ধান পাবেন না, আর মন্ত্রীসভা নিষ্ক্রিয় থাকবে তা একটি রহস্য। অবশ্য এই রহস্যের গোড়ায় আছে আমাদের মধ্যবিত্ত সুলভ চিন্তাধারা।

তিন ট্রাক পুলিশ এসেছিল ঠিকই। তবে তারা যে খুব ভয়ে ভয়ে ছিল তা বেশ বোঝা গেছে। তাদের তালিকা অনুযায়ী সকলকে ধরতে যেতে পারেনি। অতি দ্রুত যাদেরই হাতের কাছে পেয়েছে, তাদেরই ধরে নিয়ে গেছে। সংবাদ যা পেয়েছি তাতে বলা যায় যে, পনেরো মিনিটের মধ্যে তারা কাজ শেষ করে চলে গেছে। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে অনেককেই তারা ধরেছে। এমন লোককেও নিয়ে গেছে, যারা অনেক দূর অঞ্চল থেকে আত্মীয় বাড়িতে এসেছিল। বহিরাগত নেতাদের মধ্যে মহী বাগচী ধরা পড়েছিলেন। কছির উদ্দিন ধরা পড়েছিল কিনা এখন মনে নেই। তবে আমি, অবনী বাগচী ও মণিকৃষ্ণ সেন ধরা পড়িনি।

এই গ্রেফতার সাময়িকভাবে কিছু ভীতি সঞ্চার করলেও, কৃষকের মনোবল ভাঙতে পারেনি। এটলির ঘোষণার ফলে আর কিছু এখন করার নেই বলে যে ধারণাটি হয়েছিল, তা বেশ ধাক্কা খায়। তারা বুঝতে পারেন, তখনও তাদের সমিতি ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য দেশ স্বাধীন হলে যে তাদের কাজ অনেক সহজ হবে, সে ধারণাটি থেকেই যায়।

মণিকৃষ্ণ সেন ওই সময়ে ডোমারে ছিলেন। সুধীর মুখার্জি ধরা পড়েছিলেন। তিনি সম্ভবত তখন ডোমারে ছিলেন না, অন্য স্থান থেকে চলে যান।

গ্রেফতারের পরে আমি ও অবনী বাগচী কয়েকটি স্থানে ঘুরেছি। যেখানে গিয়েছি সেখানেই আশ্রয় পেয়েছি। কৃষকরা আমাদের কথা শুনেছেন। তখন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা খুব একটা হয়নি। কয়েকদিন পরে আমি এবং অবনী বাগচী জেলা কেন্দ্রে চলে যাই। দিন সাতেক পরে আমি ডিমলায় ফিরে আসি এবং ডিমলা ও ডোমার অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে থাকি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত, যাদু মিঞাদের সকল শরিক এবং ডোমারের একটি জোতদার তাদের ধান নিতে আসেননি, তা আমি দেখেছি। সে ধান বর্গাদারের আঙিনায় জমা করা ছিল।

স্মৃতিতে রংপুরের কৃষক সংগ্রাম
পরেশ মজুমদার

১৯২৪-২৫-এ ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় কৃষকেরা ব্যাপক আকারে জোতদার ও মহাজনদের বাড়ি চড়াও করে এবং লুটপাট করে। কৃষকরা লুটপাট করে নিয়ে যেত মূলত জোতদার ও মহাজনদের জমি ক্রয়ের দলিল ও কবলা; তা নিয়ে গিয়ে জোতদার ও মহাজনদের বাড়ির সামনেই পুড়িয়ে ফেলত। এই অবস্থাকে হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণীর এক প্রতিক্রিয়াশীল অংশ হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হচ্ছে এইভাবে আখ্যা দেওয়া শুরু করে। হিতবাদী, সঞ্জীবনী, আজাদ প্রভৃতি পত্রিকা তা নিয়ে প্রচার অভিযানে নামে। পরোক্ষভাবে, ইংরাজরাও একে মদত দিতে শুরু করে। কিন্তু মুখ্যত তা ছিল মহাজন ও জোতদারদের সঙ্গে কৃষকদের শ্রেণীসংঘর্ষ।

ওই সময় কৃষকের সবচেয়ে বেশি জমি জোতদার মহাজনদের হাতে হস্তান্তর হয়। ফলে কৃষক নিঃস্ব ভূমিহীন দাসে পরিণত হতে শুরু করে। এরই ফলশ্রুতি প্রজাস্বত্ব আইন ও ঋণ সালিশি বোর্ড।

১৯৩৭-এ প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসিরা ভোট দেয়। প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হলে প্রজারা জমির স্বত্ব পায়। তখন থেকেই জোতদার ও মহাজনদের সৃষ্টি হয়। জমিদাররা কিছু জমি জোতদার ও মহাজনদের পত্তন দেয়। ফলে, জমির শর্ত নিয়ে জটিলতার সূত্রপাত হয়। এরপরেই শুরু হয় জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের কৃষকের উপর শোষণ। কৃষকের সমস্ত ক্ষমতা তখন কুক্ষিগত ছিল জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের হাতে। কৃষকের হাতে কোনও ক্ষমতাই ছিল না। ফলে, কৃষকদের উপর জমিদার, জোতদার ও মহাজনেরা বিভিন্ন রকম অত্যাচার শুরু করে।

ইংরাজি ১৯৩৯ সালে গণ্ডি আন্দোলন প্রথম শুরু হয় জলপাইগুড়ি জেলায়। রংপুর জেলার 'লোহাকুচি' হাট থেকে তোলাগণ্ডি আন্দোলন প্রথম শুরু হয়, যা রংপুর জেলার কুচবিহার বর্ডারে অবস্থিত। এই হাটটি ছিল সবচেয়ে বড় তামাকের হাট। এই হাট থেকেই কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে শ্লোগান দেওয়া হয় 'তোলাগণ্ডি বন্ধ করো।' কৃষকদের এই দাবি প্রথমে জমিদাররা মেনে নেননি। ফলে, কৃষক সমিতি শ্লোগান দেয় 'কৃষক সমিতির হাট বসাও' এবং হাট বসেও। তখন জমিদার কৃষকগণের স্থায়ী দোকান থেকে 'তোলাগণ্ডি' নেয়—কিন্তু সাধারণ কৃষকদের কাছ থেকে 'তোলাগণ্ডি' নেওয়া বন্ধ করে দেয়। এই সাফল্যের পরে ব্যাপকভাবে আন্দোলন অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত হয়। এরপর শুরু হয় কাঁকনা থানার অধীনে তুষভাণ্ডার হাটে। সেখানে আন্দোলনের উপর পুলিশের গুলি চলে। ফলে আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, কুড়িগ্রাম মহকুমার উলিপুর হাট, চিলমারির হাট এবং অন্যান্য হাটে। সেখানেও আন্দোলন সফল হয়।

কৃষক সমিতির মূল দাবি ছিল হাটে যে সমস্ত স্থায়ী কৃষকের দোকান আছে তা থেকে যে খাজনা আদায় হয়, তার দ্বারা হাট কমিটি করতে হবে ও সেই হাট কমিটির হাতে পয়সা জমা দিতে হবে এবং তা হাটের উন্নতিকল্পে ব্যয় হবে। ফলে এই আন্দোলন রংপুর জেলাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। একমাত্র রংপুর জেলাতেই এই আন্দোলনের জন্য দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং বহু হাটে কৃষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে কমিটি তৈরি করে 'তোলাগণ্ডি' বন্ধ করে দেয়। কোনও কোনও জায়গায় কৃষক সমিতি হাট বসায়, যা কৃষক সমিতির হাট নামে পরিচিত। এই রকম হাট বহু জায়গায় এখনও আছে। এই আন্দোলন সে সময় সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৩৯-৪০ সালে শুরু হয় কৃষকদের বকেয়া খাজনার সুদ মুকুব আন্দোলন। যেমন, রংপুর জেলার 'টেপা' জমিদারিতে সুদ মুকুব আন্দোলন। যেমন, চন্দনপাট গ্রাম থেকে প্রায় হাজার লোকের মিছিল চল্লিশ মাইল রাস্তা হেঁটে রংপুর শহরে এসে, তারা কোর্টে ধরনা দেয় এবং সেখানে কৃষকদের এই দাবিকে কংগ্রেসিরা সমর্থন করে ও কৃষকদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। কংগ্রেস অফিস ময়দানে বিকেলের দিকে জনসভা হয়, কংগ্রেসের জিতেন চক্রবর্তী ও জিতেন সেনের নেতৃত্বে। এর পরে জমিদারের বিরুদ্ধে খাজনা মুকুব আন্দোলন শুরু হয় মালদহ জেলার চাঁচল রাজের জমিদারিতে। সেখানেও এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। জমিদাররা কৃষকদের চাপে পড়ে প্রায় এই দাবি মানতে বাধ্য হয়। রংপুর জেলার কংগ্রেসিরা মোটামুটিভাবে কমিউনিস্ট পার্টির আয়ত্তাধীনে ছিল। কিন্তু অন্যান্য জেলাতে তা ছিল না।

১৯৪০-৪৩ সাল। এই সময় বাংলার অসংখ্য কৃষক মারা যায় মন্বন্তরে। বহু গ্রাম মনুষ্যহীন হয়ে পড়ে। সরকার 'ফ্লাউড কমিশন' বসায় এবং ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কৃষক সমিতি তেভাগার শ্লোগান দেয়। সে সময় একটি আশ্চর্যের বিষয় হল যে, মন্বন্তরের ফলে কৃষক আন্দোলন মজুত উদ্ধার এবং লঙ্গরখানা এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কৃষক নেতারা কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য কোনও বিশেষ শ্লোগান দিল না। ফলে কৃষক না খেয়ে মরল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষে হাত তুলতে পারল না। তারই ফলস্বরূপ দাঁড়াল, ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কৃষকেরা কোনও কৃষক নেতাকে ভোট দিল না, ভোট দিল কংগ্রেসিদের। এর থেকেই জন্ম নিল সংস্কারবাদী আন্দোলন এবং এই আন্দোলন এখনও অব্যাহত। '৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসিরা শ্লোগান তুলেছিল 'আইনের জন্য ভোট দাও', 'স্বাধীনতার জন্য ভোট দাও'। 'তেল নুনের জন্য ভোট দিয়ো না' কারণ, যদি গভর্নমেন্ট তৈরি না করো তা হলে 'তেল নুন' পাবে কোথা থেকে?

১৯৪৬-এ হয় আইন সভার নির্বাচন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির তিন জন প্রার্থী জয়লাভ করেন—যথা জ্যোতি বসু, রূপনারায়ণ রায় ও রতনলাল ব্রাহ্মণ। কংগ্রেস এই নির্বাচনে প্রচণ্ড বিরোধিতা করে এবং কমিউনিস্ট পার্টির উপর প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করে। প্রায় বহু জায়গাতে কমিউনিস্ট পার্টির পোলিং এজেন্টদের বুথে বসতে দেয়নি এবং তাদেরকে প্রচণ্ড মারধোর করে ভাগিয়ে দেয়। জ্যোতি বসু এই প্রথম আইন সভার সভ্য হন। এই আইন সভার মধ্যে দিয়ে কৃষকদের দাবি-দাওয়া ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে এবং তার মধ্যে আধিয়ারদের প্রশ্ন ছিল—যেমন, নিজ খোলানে ধান তোলো, বকেয়া ধানের সুদ মুকুব করো, খোলান খরচ নেওয়া চলবে না, দুঃস্থ

কৃষকদের জমিদারের দাস থেকে মুক্ত করো ইত্যাদি। তেভাগার প্রথম দিকে এই শ্লোগানগুলিই প্রধান ছিল এবং এই দাবিতেই ভাগচাষি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

জেলা কৃষক সমিতির মিটিং-এ ঠিক হয় রংপুর জেলায় ডিমলা ও জলঢাকা এই দুটি থানাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। সে সময় প্রচণ্ড হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর প্রচার হয়। অপর দিকে ছাত্র বিক্ষোভ, শ্রমিক বিক্ষোভ, সৈন্য বিদ্রোহ—সমগ্র বাংলায় এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ডিমলা থানা মোটামুটি ছিল হিন্দু প্রধান অঞ্চল কিন্তু জোতদাররা ছিল প্রধানত মুসলমান। জলঢাকা থানা ছিল মূলত মুসলিম প্রধান অঞ্চল। জলঢাকায় আন্দোলন শুরু হয় মূলত হিন্দু কর্মী দিয়ে এবং ডিমলাতে কিছু মুসলমান কর্মীও ছিল। তখন প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সত্ত্বেও কোথাও হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয়নি। কৃষক সমিতি মূলত আধিয়ার আন্দোলনের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ধ্বনি তুলতে সক্ষম হয়নি। ফলে, এই আন্দোলন অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটিই এই আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা।

এই আন্দোলনে কৃষক মহিলারা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে ও আন্দোলনের জন্য বিভিন্নভাবে লড়াই করে। যেমন, আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মীদের রক্ষা ও দেখাশুনো থেকে শুরু করে প্রকাশ্য ময়দানে পুলিশের সঙ্গে লড়াইতেও এরা সামিল হয়েছে।

একদিনের ঘটনা:

একজন মুসলিম জোতদারের হিন্দু আধিয়ার তার ধান নিজ খোলানে তুলে দিল, তারপর সেই খোলান ভাঙা হয়। তখন জোতদার পুলিশ নিয়ে এসে জোর করে ধান কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কৃষকেরা এই খবর পেয়ে জমায়েত হতে শুরু করে এবং তারা পুলিশের হাত থেকে অস্ত্র ও ফসল কেড়ে নিয়ে পুলিশ ও জোতদারকে ভাগিয়ে দেয়। এই ঘটনায় এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যে চারপাশ থেকে প্রায় দশ হাজার কৃষক মাঠে জমা হয়। কৃষকদের খাওয়ানোর জন্য মহিলা কর্মীরা প্রায় পাঁচ মন চাউল তুলে ভাজা করে এবং এক মুঠো করে চালভাজা দিয়ে পাঁচ মন ভাজা চাল কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে। তাতেও না কুলালে ওই কৃষক জমায়েত থেকে প্রশ্ন ওঠে এখন কী করা হবে? তখন একদল প্রস্তাব দেয় যে, কৃষকেরা গিয়ে থানা আক্রমণ করবে। আরেক দল প্রস্তাব দেয় যে, থানায় যাওয়ার দরকার নেই। এই ধান রক্ষা হোক এবং অন্যান্য সব খোলান ভাঙা হোক। বেশির ভাগ ভোটে থানা আক্রমণ করা পাশ হয় এবং সন্ধ্যার পরে মশাল জ্বালিয়ে কৃষকেরা থানা অভিমুখে রওনা হয়। যত দূর খবর আসে তার থেকে জানা যায় যে—থানাওয়ালারা থানা থেকে সব পালিয়ে যায়, এমনকী দারোগাও। তখন এক জন কৃষক নেতা রাস্তার মাঝখানে একটি গাছের উপরে মশাল হাতে উঠে পড়ে বলেন যে, যুদ্ধের নিয়ম হচ্ছে সেনাপতির আদেশ মানতে হবে; সুতরাং তার আদেশ, থানায় যাওয়া চলবে না, ফিরতে হবে এবং ধান রক্ষা করতে হবে। তখন কৃষকেরা ক্ষুণ্ণ মনে ধান রক্ষা করার জন্য ফিরে আসে। এই আদেশ উক্ত কৃষক নেতার ভুল হয়েছে। এই আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এই চেতনার অভাববোধ থেকে এই ঘটনা ঘটেছিল।

ওই সময় কৃষকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেবার এক বিপুল উদ্দীপনা দেখা দেয়। কিন্তু কৃষকেরা যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে পারে এ বিশ্বাস নেতাদের মধ্যে ছিল না। ফলে কৃষকেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। এতে

আন্দোলন পিছিয়ে পড়ে। কারণ, আন্দোলনের নিয়ম হচ্ছে আন্দোলন কখনও এক জায়গায় থাকে না, হয় এগোয় না হয় তা পিছায়।

কৃষকেরা বোকা ছিল না। তারা নেতাদের ভুল নিশানা ধরতে পেরেছিল । কৃষকেরা বুঝতে পেরেছিল ধান রক্ষা এ রাস্তায় হয় না। ধান রক্ষা করতে গেলে আঘাত হানতে হবে নইলে, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

কৃষকেরা জানে, পুলিশই তাদের শত্রু। শত্রু খতম না করতে পারলে তাদের উপর আক্রমণ নেমে আসবে, তখন প্রতি আক্রমণের আর সময় থাকবে না। এ কথা সত্য যে, সরকারের শক্তিকে সর্বদাই নেতারা বাড়িয়ে দেখেছে, কিন্তু জনসাধারণের সংগ্রামের মনোভাবকে নেতারা সর্বদাই ছোট করে দেখেছে। এই ধারণা থেকেই কৃষক নেতারা কী সিদ্ধান্ত নেবে তা পরিমাপ করতে ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছে। এটিই সমস্ত আন্দোলনের মূল পর্যালোচনা।

এই ঘটনার পর ডিমলা থানায় জোতদারের পক্ষ থেকে যাদু মিঞার নেতৃত্বে কৃষকদের উপর গুলি চালনা হয়। গুলির আঘাতে তন্নারায়ণ রায় নিহত হয়, বাচ্চা মিঞাসহ অন্যান্যরা আহত হন। ফলে, মহকুমা কৃষক সমিতি থেকে নীলফামারি শহরে কৃষক সমিতির মহকুমা জমায়েত-এর ডাক দেওয়া হয় এবং সেখানে কৃষকদের আওয়াজ ওঠে যাদু মিঞার রক্ত চাই, খুনের বদলে খুন চাই।

পুলিশ জানতে পারে, এ ঘটনায় শহরে কৃষক জমায়েত হবে এবং তা জানা মাত্রই শহরের সমস্ত পুলিশ ওই দিন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যায়। বহু পুলিশ অফিসার তাদের পরিবারকে শহরের অন্যত্র নিয়ে যায়। পুলিশের ধারণা ছিল যে, কৃষক জমায়েত এসে মহকুমা সদর দখল করবে এবং এস. ডি. ও সাহেবও এ ঘটনায় সদর মহকুমার সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। কিন্তু কৃষকেরা শুধু জমায়েত করেই চলে এল, কোনও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিল না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার অভাব থেকেই এই বোধ উদ্বুদ্ধ। ফলে, আন্দোলনের গতি একই জায়গায় থেমে থাকল এবং তাতে শাসকগোষ্ঠী প্রতি আক্রমণের সুযোগ পেল। যদি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে কৃষকেরা সেই সময় মহকুমা শহর দখল করে জেলা দপ্তর দখলের দিকে এগিয়ে যেত তা হলে সমস্ত আন্দোলনের চেহারা পালটে যেত। কিন্তু তা না হয়ে আন্দোলনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হযে যেতে লাগল।

রংপুর জেলার কৃষক সমিতি কিশোরগঞ্জ থানার অধীনে 'বড়ভিটায়' একটি জনসভার ডাক দেয়। ওই জনসভায় রংপুর শহরের বেশ কিছু কংগ্রেসকর্মী যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ওই কর্মী ও কংগ্রেস নেতাদের যারা নিতে এসেছিল তাদের একটি সমস্যা দাঁড়াল, গাড়ি আছে কিন্তু পেট্রল নেই। শেষে পেট্রল পাম্পে যাওয়া হল, পাম্পের মালিক বলেন পেট্রল নেই, সমস্ত পেট্রল ডি. এম. অধিগ্রহণ করেছে। এ কথা শোনার পর কৃষক কর্মীরা থানা ও এস. পি. অফিসে পেট্রলের খোঁজে যান। এস.পি. অফিসে শোনা যায় যে, ডি. এম. সমস্ত পেট্রল অধিগ্রহণ করেছে, উদ্দেশ্য সমস্ত কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হবে। এই সংবাদ পেয়ে একজন কর্মী কৃষক সমিতির অফিসে খবর দেন যে ডি. এম. নির্দেশ দিয়েছে গ্রেপ্তার করার, শীঘ্রই ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হচ্ছে। এই সংবাদ কৃষক সমিতির অফিসে পৌঁছানো মাত্র পুলিশও গ্রেপ্তারের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। জেলার কৃষক সমিতির প্রধান নেতাদের ওই রাত্রিতেই গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় তিনশো কৃষক নেতা ও পাঁচশো স্থানীয় কৃষক নেতা ওই রাত্রিতেই গ্রেপ্তার হয়। কৃষকদের ওপর শুরু হয় প্রতি আক্রমণ। জোতদার ও পুলিশের

মিলিত চেষ্টায় প্রচণ্ড প্রতিআক্রমণে সংগ্রামী কৃষক অসহায় হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তারা আর ধান রক্ষা করতে পারে না। সমস্ত নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে কৃষকেরা নেতাহীন হয়ে পড়ে। ধান রক্ষার লড়াই আরও হতে পারত কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। আন্দোলন প্রায় পঙ্গু হয়ে গেল।

জনযুদ্ধ ও পরবর্তীযুগে ডোমারে কৃষক আন্দোলন

বলরাম সাহা

দেশব্যাপী শক্তিশালী কৃষক ও মজুর আন্দোলনকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খতম করার পরিবর্তে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব কখনও যুদ্ধে বিপন্ন ইংরেজকে বিব্রত না করার নীতি, কখনও ব্যক্তিগত সীমিত সত্যাগ্রহ, কখনও আপস, কখনও চাপ দিয়ে কিছু ক্ষমতা আদায়ের চেষ্টা চালাতে থাকে। উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা লালপন্থীদের হাতে চলে না যায়। এই অবস্থায় ১৯৪১ সালে ফ্যাসিস্ট বাহিনী পৃথিবীর প্রথম কৃষক মজুরের রাজ্য সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করে বসল। যুদ্ধের গতি ফিরে গেল। দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের ন্যায় ডোমার এলাকাতে আমরাও মর্মাহত হলাম। যদি দুনিয়ার কৃষক-মজুররাজের এই অন্ধকারের আলো নিভে যায় তবে সবারই দুর্দিন। দেশের বহু লোকের ন্যায় স্থানীয়ভাবে আমরাও উপলব্ধি করলাম যে যেভাবেই হোক প্রথমত জাপ, জার্মান ফ্যাসিস্টদের পরাস্ত করতেই হবে; কিন্তু জনগণের হাতে তো রাজনৈতিক বা অস্ত্রের ক্ষমতা নাই, তাই অন্যান্য স্থানের ন্যায় আমাদের এলাকাতেও শ্লোগান চলল "ফ্যাসিস্টদের রুখতে হবে, রুখতে হলে রাইফেল চাই, রাইফেল দেবে কে? জাতীয় সরকার। জাতীয় সরকার কায়েম করো, হিন্দু মুসলিম এক হও কংগ্রেস লিগ এক হও..." ইত্যাদি।

এদিকে ফ্যাসিস্টদের ক্রমাগত জয়ের মুখে ব্রিটিশের বরাবরের ধামা ধরা হিন্দু মুসলিম কায়েমি স্বার্থপরায়ণগণ হঠাৎ জাপ, হিটলার প্রেমে মেতে উঠল। হিটলারকে তো কল্কি অবতার বলে চালু করারই চেষ্টা হতে লাগল। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ট বিরোধিতা তাদের সহ্য হল না। আর তারা তো শ্রেণী স্বার্থেই সোভিয়েত রুশের দরদী হতে পারে না। তাই দেখা গেল মুসলিম লিগ মুসলমান কৃষককে আর হিন্দু সভার নেতাগণ হিন্দু কৃষক জোতদারকে কমিউনিস্ট বা বামপন্থী নেতৃত্বে কৃষক বা জাপ-বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালাতে লাগল।

এই পরিস্থিতিতেই ডোমারে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের আয়োজন চলতে লাগল। ইতিপূর্বে ডোমার ও ডিমলা থানা এলাকায় গণ্ডি ও তোলা বন্ধ আন্দোলন, ঢলতাবন্ধ আন্দোলন ইত্যাদির ব্যাপকতার জন্য ডোমার জেলা, প্রাদেশিক নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই ডোমার, প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য স্থান নির্বাচন হয়েছিল। চতুর্দিকে সম্মেলনের প্রস্তুতি উপলক্ষে যে জমিদারি প্রথা বিরোধী ও কৃষক স্বার্থবাহী প্রচার ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে মনে হত যেন রীতিমতো শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। সম্মেলনের প্রাক্কালে স্থানীয় মুসলিম লিগ ও সঙ্গে কিছু হিন্দু সভার নেতা পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানালেন যে, সম্মেলন উপলক্ষে হাজার হাজার লোক সমাগম হলে তা নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে না। অবশ্যই লুঠতরাজ হবে, অবৈধ গৃহ প্রবেশ হবে, সুতরাং তা বন্ধ হোক। ডোমার ডাকবাংলোয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ আপত্তিকারীরা এবং সম্মেলনের উদ্যোগী, আমরা

বৈঠকে বসলাম। নিয়ন্ত্রণ রাখার ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা আমাদের আছে বলে আমরা অনেক উদাহরণ ও গ্যারান্টি দিলাম। পুলিশ কর্তৃপক্ষ, যথেষ্ট পুলিশ রাখবে বলে আশ্বাস দিল। তারপর আপত্তিকারীরা নিস্তেজ হল। যাই হোক, যথাসময়ে ঘোর বর্ষা বাদলের মধ্যেই সম্মেলন সুশৃঙ্খল ও উদ্দীপনার সঙ্গে সম্পন্ন হল। সভায় প্রাদেশিক নেতা নির্বাচিত সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি এবং আরও বহু কৃষক নেতা ও প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্থানীয় ডা. প্রফুল্ল সেন। সম্মেলনের সাফল্যে প্রমাণ হল, কৃষক মজুর গরিব মানুষগণ যদি নিজস্ব শ্রেণীনীতিতেই জোট বাধে এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও পাশে আসে। শ্রেণীগত জোট না থাকলে সত্যিকারের মোর্চা বা ফ্রন্ট হয় না, হলেও তা লেজুড় হয়ে থাকতে হয়।

সম্মেলনের আগে ও পরে মাসাধিক কাল তো বটেই, কৃষক কর্মীদের মধ্যে ছিল রীতিমতো উদ্দীপনা ও নেতৃত্বের উপর আস্থা। ঘন ঘন বৈঠক পরামর্শ রাজনৈতিক শিক্ষা, কমরেডদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া-নেওয়া, কাজের উপর চেক আপ; ক্রটি বিচ্যুতির সমালোচনা; সংশোধন; আবার কাজ। যেন বিরাট লড়াইয়ের প্রস্তুতি। এই সময় বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির অনেক কমরেডই ছদ্মনামে ডোমার এলাকায় থাকতেন। কৃষক আন্দোলনের কাজও করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী, সরোজ মুখার্জি, মনসুর হাবিব, ভাদু লাহিড়ী আরও অনেকে। কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী (ছদ্মনাম কালিপদ) ছিলেন প্রাণকেন্দ্র। নবীন কমরেডদের তিনি নানাভাবে শিক্ষায় ও সংগঠনের কাজে দক্ষ করে তুলতেন। বৈঠকে আত্মসমালোচনা ও সমালোচনা ছিল তাঁর অপূর্ব ভালবাসা পূর্ণ। নিরপেক্ষ ও বিরোধী ব্যক্তিদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করে তাদেরকে সত্যিকারের স্বাধীনতা ও সমাজবাদের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। লোককে নিজ বক্তব্য শোনাবার পূর্বে স্বপ্লাচ্ছলে তাদের বক্তব্য শোনাই ছিল তাঁর বিশেষ কায়দা! রংপুরের সু-গায়ক বিনয় রায়ের গোষ্ঠী গণ-সংগীত চর্চার দ্বারা গ্রামগুলোকে যেন মাতিয়ে তুলতেন। কর্মীদের প্রাণে অফুরন্ত শক্তি জানিয়ে দিতেন। সম্মেলনের কাজে স্থানীয় কমরেডদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোলাম আজিজ, সাদামুদ্দিন অধীর সেন, যতীন কর্মকার, গিরীশ সরকার, সুধীর রায়, চিত্ত রায়, চোটকু সাহা অন্যতম। সম্মেলনের সময় জলপাইগুড়ির বীরেন নিয়োগী চালিত কৃষকজাঠা, বোদার কমরেড ভোলা মজুমদার চালিত কৃষক মিছিল সৈয়দপুর থেকে, জলঢাকা, ডিমলা থেকে কৃষকদের মিছিলে মিছিলে ডোমার মুখরিত, চঞ্চল। সম্মেলন শেষে সোৎসাহে ও সুশৃঙ্খলভাবে জমিদারি প্রথা এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধিতার প্রেরণা নিয়ে কৃষকগণ নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান। ডোমারের প্রতিক্রিয়াশীলদের হৃৎকম্প উঠলেও তাদের আশঙ্কিত কোনও বিশৃঙ্খলা হয় নাই সম্মেলনের আগে বা পরে।

বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ জনযুদ্ধের যুগে ফায়দা উঠানো কিছু মতলববাজ ছাড়াও, অন্যান্য স্থানের ন্যায় একদল দেশপ্রেমিক এই অঞ্চলেও আন্তরিকভাবে চাইলেন জাপ, জার্মান সাহায্যে ইংরেজ শাসনকে উৎখাত করতে, একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসাবেই। কিন্তু তারা জয়চাঁদের দ্বারা মহম্মদ ঘোরীর ও মিরজাফর দ্বারা ইংরেজের সাহায্য নেওয়ার ইতিহাস ভুলে যান এবং নৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন সমাজবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার শক্তি, যে অত্যাচারী বর্বর শক্তির চেয়ে বড়, তা ধারণাও করতে পারেন নাই। তাই ভুল পথে যাচ্ছিলেন তারা। পরে ফ্যাসিস্ট জাপান, জার্মানদের পরাজয়ে তারা হিসাবের গোলমাল

বুঝতে পারলেন। ডোমারে এই ধরনের দেশপ্রেমিকদের মধ্যে ছিলেন নরেন কাঞ্জিলাল, অশ্বিনী কুণ্ডু, প্রাণেশ্বর দত্ত প্রভৃতি।

ডোমারে সম্মেলন উপলক্ষে এবং সব সম্মেলন উপলক্ষেই চতুর্দিকে যে প্রচার ও সংগঠন চলে, প্রকৃত সম্মেলন থেকে তার গুরুত্ব কম নয়। সে সব কাজের সময় সাধারণ কৃষক, খেতমজুর ও গ্রামবাসীর সঙ্গে প্রচারকদের সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা ও পরিচয় হয়। তাদের মনের কথা জানবার, তাদের সমস্যার সত্যিকারের সমাধানের পথ দেখানোর এবং তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগানোর পক্ষে ওই সব যোগাযোগ অনেক কাজে লাগে। কার্যত বেশ সুযোগ দেখা গেল । মনের মতো কথা শুনে ও মনের মতো সংগঠক পেয়ে তাদের মধ্যে থেকে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেল, যারা গ্রামে কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে লাগল । পরিক্রমাকালে প্রচারকদেরও প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হয় এবং আনন্দও কম হয় না, নানা কষ্ট অসুবিধার মধ্যেও। ব্যাগে চিড়া নিয়ে দিনের পর দিন কাটানো, পথে নদী বা জল পেলে গামছায় চিড়া ভিজিয়ে খাওয়া, কৃষকদের খোলামেলা ঘরে চট ও খড়ের বিছানায় ঘুমানো এ সব কি কম মজার? যেন গেরিলারা ঘুরছে গ্রামে গ্রামান্তরে।

১৯৪৩ সাল। ফ্যাসিস্ট বিরোধিতা চলছেই। এক দিকে ইংরেজ শাসকদের দায়িত্বহীনতা, অন্য দিকে অর্থলোভী ঠিকাদার, মজুতদার ও মহাজনদের কারসাজিতে সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উধাও। লবণ, কেরাসিন, চাল, ডাল অদৃশ্য। গোপনে অতিরিক্ত দাম দিলে পাওয়া যায়, যা গেরিবদের নাগালের বাইরে। এইভাবে অন্যান্য অনেক স্থানের ন্যায় ডোমার এলাকা কলেরা, বুভুক্ষা ও দুর্ভিক্ষের এলাকাতে পরিণত হল। ছোট বন্দর, কিন্তু তবু চতুর্দিক থেকে শত শত ক্ষুধার্ত ও পীড়িত মানুষ ভিড় করেছে হাট খোলার খোলা ঘরগুলিতে।

অনাহার, ভিক্ষা, কলেরা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। বন্দরের অধিবাসীরা আতঙ্কিত। স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীগণের উদ্যোগে কংগ্রেস-লিগ নিরপেক্ষ প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে জনমঙ্গল সমিতি গড়ে উঠল। চাঁদা আদায় দ্বারা আর্তদের সেবা সাহায্য চলতে লাগল । সরকারি স্তরে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা নাই। গাছের পাতা থাকতে, মায়ের সতীত্ব থাকতে নাকি দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা যায় না। সুতরাং বেসরকারি ও ঐক্যবদ্ধ চেষ্টাতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ চলতে লাগল। কৃষক সমিতির কর্মীরা সংগঠিত ভাবে হাটে হাটে লাইন (কিউ) প্রথায় কেরাসিন বিক্রয়ের কাজ শুরু করল। কুড়ি টাকা মন দরে চাল কিনে অনুসন্ধান করে দুঃস্থ পরিবারগুলোকে ষোলোটাকা দরে তা সরবরাহ শুরু করা হল। ঘাটতি চার টাকা মনকরা আদায়ি চাঁদা দিয়ে পূরণ করা হতে লাগল। বাপ-মা পরিত্যক্ত অনাথ শিশুদের রক্ষার জন্য অনাথ শিশু নিকেতন গড়ে তোলা হল। একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত দম্পতিকে দিয়ে তাদের তদারক চলল। তত্ত্বাবধানে থাকতেন সুবর্ণ চক্রবর্তী। চাউল ও কেরাসিন বিতরণে কার্ড ছাপিয়ে অভাবী পরিবারগুলোকে দেওয়া হল যার ভিত্তিতে তারা সস্তায় ওইসব জিনিস পাবে। তখন পর্যন্ত সরকারি কার্ডের বালাই ছিল না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দিনের পর দিন বেড়েই চলল। গড়ে ডোমার বন্দরে পাঁচ-ছ' জন মানুষ মারা যেতে লাগল। মড়া ফেলার বন্দোবস্ত করা অসম্ভব ছিল। কুকুর কাক দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায়, হাটে, নরমাংস খেতে লাগল। অসহায় মানুষ চোখেমুখে কাপড় দিয়ে পাশ কাটায়। সমিতি পরে 'এমা' নামে এক আফিংখোর ভিখারির সঙ্গে বন্দোবস্ত সূত্রে বানিয়ে দেওয়া কাঠের চার চাকার এক লম্বা ঠেলাগাড়ি করে তাকে দিয়ে মৃতদেহগুলি বন্দরের বাইরে কুয়াগর্তে ফেলানো শুরু করল।

মর্মান্তিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা। বহু পরে সরকার বাধ্য হল এ জি হাসপাতাল ও লঙ্গরখানা খুলতে এবং এই সবেও কৃষক ও কমিউনিস্ট কর্মীরা ছিল অগ্রণী।

এক দিকে এইভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, অন্য দিকে গ্রাম গ্রামান্তরে কৃষক সমিতির কাজ, সমস্তকে ছাপিয়ে তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলন বিস্তার হতে লাগল। জনপ্রিয় রাজনৈতিক শ্লোগান ছিল—'যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা।' এতে মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবিকে প্রতিহত করা যেত। কারণ মুসলিম প্রধান রাজ্যে স্বাভাবিকভাবে তারা স্বায়ত্বশাসন ভোগ করত, কিন্তু একই কেন্দ্রে যুক্ত থাকত। যদিও পরবর্তীকালে কংগ্রেস দেশ ভাগ করতে সম্মত হল, কিন্তু তখন ওই যুক্ত রাষ্ট্রীয় প্রস্তাবে মৃত্যুবাণ দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়েছিল । ডোমার থানা এলাকার কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্র স্থান ছিল হরিণাড়া, আটিয়াবাড়ি আর স্থানীয় কৃষক কমরেড তারক রায়ের বাড়ি ছিল যেন আন্দোলনের হেড কোয়ার্টার। কৃষক মজুর সাধারণ মানুষের সংগঠিত শক্তি নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা আদায়ের চেষ্টা না করে বারবার কংগ্রেস নেতৃত্ব আপস-ক্ষমতা হস্তগত করতে উদগ্রীব। ভয়, ক্ষমতা তারা যে দেশি বুর্জোয়া সামন্তবাদীদের প্রতিনিধি তাদের হাতে না এসে, ওই সব লালপন্থীদের হাতে চলে যায়। এই সব দরকষাকষির চলতি পথে পরবর্তী সময়ে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ে যুদ্ধ শেষ হল । সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আরও অনেক ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি দেখা দিল। যেমন, আজাদ হিন্দ ফৌজ, নৌ বিদ্রোহ, রেল ও ডাক-তার ধর্মঘট ইত্যাদি। ১৯৪৫-৪৬ সাল। এক দিকে এই সব রাজনৈতিক বিস্ফোরণ অন্য দিকে অন্যান্য স্থানের ন্যায় ডোমার ডিমলার গ্রাম গ্রামান্তরে, তেভাগা আন্দোলনের প্রসার। শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে অসংগঠিত কৃষকরাও যে কীভাবে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবকে দূরে ছুড়ে ফেলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, কীভাবে ভূস্বামীদের ভয়কে অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্যে নিজ খামারে ফসল তুলতে পারে, নির্ভীকভাবে তিন ভাগের দুভাগ নিজে রেখে ভূস্বামীকে ফসলের এক ভাগ নিতে বাধ্য করতে পারে, তা না দেখলে সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শহর গ্রামের কৃষক শ্রমিক ও কমিউনিস্ট ভাবধারার সমর্থক নবীন শক্তির ক্রমবিকাশ দেখে কংগ্রেস-লিগ নেতৃত্ব শঙ্কিত হল, সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও। তাই ঝটপট হিন্দুস্থান পাকিস্তান নামে দেশবিভাগের শর্তেও তারা পিছুপা হল না। এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেস ও লিগের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিয়ে আপসসূত্রে ভারতে তাদেরই বাণিজ্যিক স্বত্ব সুরক্ষিত করার চতুর বুদ্ধি প্রয়োগ করল।

তেভাগা আন্দোলন:

কৃষক সমিতির সংগঠিত নেতৃত্বে বাংজোড়া ভাগচাষিদের জনপ্রিয় দাবিই 'তে-ভাগা চাই', 'জমিদারি খতম করো', 'লাঙল যার জমি তার'। আপাতত তে-ভাগার দাবিই চরম। ফসল কেটে নিজ খোলানে উঠাও, জমির মালিককে ডেকে তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ নিতে বাধ্য করো, দু ভাগ ভাগচাষির থাকবে। জমির মালিককে আরও বাধ্য করো একভাগ নিয়ে তার রসিদ দিতে। কিছু জোতদার এই দাবি মেনে নিল, বাকিরা আতঙ্কিত ও অসম্মত হল।

কৃষকদের মধ্যেকার ঐক্য ও দৃঢ়তা দেখে জোতদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা গেল। এখানেও প্রমাণ পাওয়া গেল কৃষকদের একতা ও দৃঢ়তা থাকলে মধ্যবিত্ত জোতদারদের বেশির ভাগ আপসে আসে কিন্তু কিছু সংখ্যক কায়েমি শ্রেণীসচেতন বিরোধিতা ও চক্রান্ত করতে থাকে।

উদাহরণ ডিমলার কুখ্যাত জোতদার যাদু মিঞা, কোড়ামল প্রভৃতি। এদের গুলি ও গুণ্ডা বাজিতে তন্নারায়ণ নামে একজন ভাগচাষি নিহত হন। বহু কৃষক মিছিল করতে যেয়ে গুলিবিদ্ধ হন। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ডোমার ডিমলার কৃষকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা যায়। হাজার হাজার কৃষক বেরিয়ে আসে। হিন্দু মুসলমানের অদ্ভুত একতা, যা কংগ্রেস-লিগ তৈরি করতে পারে নাই, তা দেখা যায়। তন্নারায়ণের মৃতদেহ নিয়ে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরবর্তী নীলফামারি মহকুমা শাসকের কাছে এই হাজার হাজার কৃষকের সুশৃঙ্খল ও বিক্ষুব্ধ সমাবেশ। আসামি যাদু মিঞা, কোড়ামল পলাতক। মিছিল ও সমাবেশে মুহুর্মুহু শ্লোগান, যাদু মিঞার ফাঁসি চাই, কোড়ামলের মাথা চাই। আর শ্লোগান, তে-ভাগার দাবি মানতে হবে, লাঙল যার জমি তার, জমিদারি প্রথা খতম করো, কৃষকে কৃষকে ঝগড়া নাই, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে ও রাজ্যে অস্থায়ী ভারতীয় সরকার কায়েম হয়েছে। দেশ ভাগ হওয়ার মুখে। বাংলার অস্থায়ী রাজ্য সরকার মুখে তে-ভাগা সমর্থন করেও হঠাৎ রুদ্রমূর্তিতে পুলিশ লেলিয়ে দিল কৃষক নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে। সারা রংপুর জেলায় একই দিনে ব্যাপকভাবে শত শত কৃষক কর্মী গ্রেপ্তার হল, জেল ভরে গেল—দেখা গেল, ডোমার ডিমলা এলাকার সংখ্যাই যেন বেশি। তে-ভাগার দাবি সমর্থনও মেনে নেওয়ায় ডিমলার জোতদার হরিকান্ত সরকার, সোনা রায়, মতিয়ার রহমান, লেখক স্বয়ং ও তে-ভাগার দাবিদার শত শত কৃষক কর্মীর সঙ্গে এঁরাও গ্রেপ্তার হলেন। রংপুর জেলে দেখা গেল যেন জেল কৃষক সম্মেলন বসেছে। কমরেড মহী বাগচী, সুধীর মুখার্জি, বসন্ত চক্রবর্তী, ভাদু লাহিড়ী, মণীশ রায়, মনোজ ঘোষ আরও সব কষক নেতা ও কর্মী।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সন্দেহযুক্ত দোদুল্য চিত্ত দেশবাসী বিভক্তভাবে স্বাধীনতা পেল । বন্দি কৃষক কর্মী ও নেতাগণ মুক্তি পেল। কিন্তু দেশি বিদেশি কায়েমি স্বার্থপরায়ণ শ্রেণী লাভবান হল। দীর্ঘদিনের ত্যাগ ও শ্রেণীস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলমান কৃষকশ্রেণীও দ্বিধাবিভক্ত হল, হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়গতভাবে পার্থক্য দানা বাধল। পরস্পরের প্রতি অর্জিত মিলন ও ভালবাসা ছিন্ন হল অবিশ্বাসে, ব্যাপক সংখ্যক গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী হল; হিন্দু বাস্তুহারা ও মুসলমান বাস্তুহারার অভ্যুদয় হল।

হিন্দুস্থানে হিন্দু কৃষক ও গরিব মানুষ, আর পাকিস্তানে মুসলমান কৃষক ও গরিব সাধারণ মানুষ হতাশাগ্রস্ত। কোথায় তাদের জমি, কোথায় সুখ, কোথায় প্রগতি? শুধু আশ্বাস আর বিশ্বাসের বাণী! শিশু রাষ্ট্রের কৈফিয়ৎ। আর ইতিমধ্যে কায়েমি স্বার্থের প্রতিরক্ষী নেতৃত্বকে শক্ত হয়ে গদিতে বসতে দাও। কিন্তু গরিব কৃষক এবং কৃষক আন্দোলনের শ্লোগান ও সংগঠন ধ্বংস হল না। মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল—'দেশ আভিতক্ ভূখা হ্যায়, ভুলো মত্ ভুলো মত্। দেশ আভিতক্ লংগা হ্যায়, ভুলো মত্, ভুলো মত্'।

রংপুরের তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি

দীনেশ লাহিড়ী

সালটা আমার মনে নেই, খুব সম্ভব ১৯৪৬ সাল হবে। আমাদের রংপুর জেলায় সেইবার কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী তপশিল আসনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামি। আমাদের প্রার্থী ছিল দু জন, হরিশ্চন্দ্র সরকার ও নির্মলেন্দু বর্মণ। নির্বাচনের পূর্বদিনের ঘটনা বলছি। কলকাতা থেকে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সংবাদদাতা কমরেড নিখিল চক্রবর্তী ডিমলা নির্বাচনি শিবিরে ঘোর সন্ধ্যার সময় রংপুর থেকে বরাবর এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই চা পানের পর জানালেন, আজ রাত্রেই দূরবর্তী গ্রামে পৌঁছাতে হবে। গয়াবাড়ি হরিকান্ত সরকারের বাড়ি এবং নির্বাচন কেন্দ্র। রাত্রেই মোটর যোগে যে কোনও ভাবেই হোক, তাঁকে পৌঁছতে হবে। সর্বনাশ, আমরা প্রত্যেকেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কারণ, গয়াবাড়ি পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের যে কাঁচা সড়ক আছে, তাতে মানুষ ও গোযান চলতে পারে, কিন্তু মোটর চলাচল করতে পারে না। নিখিলবাবুও নাছোড়বান্দা; বললেন, 'কমরেড, আজ রাত্রিতে যদি আমি গয়াবাড়ি পৌঁছাতে না পারি, তা হলে পার্টির সমূহ ক্ষতি হবে।' কৃষক কমরেডদের তখন যেন চৈতন্যের উদয় হল। একজন বললে, 'রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাব কমরেড।' ভাঙা রাস্তা মেরামত করে যে কোনও ভাবেই হোক মোটর পৌঁছে দেয়। দু'জন কমরেড তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে মোটরে উঠে বসল। পরদিন খবর পেলাম সারারাত্রি খেটে গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে তারা জায়গায় জায়গায় ভাঙা রাস্তা মেরামত করে মোটর চালাবার ব্যবস্থা করেছেন। রাত্রি তিনটার সময় নিখিলবাবু ও তাঁর সহযোগী বন্ধু গয়াবাড়ি পৌঁছান।

এখনও মাঝে মাঝে আমার কানে যেন প্রতিধ্বনিত হয়, 'কমরেড! রাস্তা নেই, তাতে কী? রাস্তা তৈরি করে অগ্রসর হতে হবে।' নিখিলবাবু 'স্বাধীনতা'র রিপোর্টে লিখেছিলেন, 'হ্যাঁ, একেই বলে সংগঠন।' রংপুর জেলার আরও একটি ঘটনার কথা বলছি। ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে। আমাদের মধ্যে অনেকেই গ্রেপ্তার এড়াবাব উদ্দেশ্যে গোপন আশ্রয়ে বসে আছি। এমন সময় সংবাদ এল পুলিশ আমাদের কর্মী মহেশ বর্মণের বাড়ির দিকে আসছে। অতএব আমাকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। আর যাব কোথায়? ধারে কাছে কৃষক কর্মী মথুরা মিস্ত্রির শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের দরজাব কাছে মথুরা মিস্ত্রির ভাইপোর বউ উরুন গাইনে (কাঠের উদুখল ও দণ্ড) ধান ভানছিল। নিমেষে আমার ঘরে ঢুকবার কারণটা বুঝে নিল, তারপর নিম্নস্বরে বলল, 'কমরেড, মাচার 'তলোয়' সোঁদাও (ঢোকো)।' আমি বাধ্য হয়ে মাচার তলোয় প্রবেশ করলাম। সে তৎক্ষণাৎ একটা ধানের

ডোল আমার সম্মুখভাগে রেখে দিয়ে তারপর 'উরুন-গাইন' দিয়ে ধান ভানবার কাজ শুরু করে দিল। আমি মৃদু হাস্য করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি পুলিশ টের পেয়ে এই ঘরে ঢুকে আমাকে গ্রেপ্তার করে, তা হলে তুমি কী করবে বউমা?' কৃষক মহিলা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'অ্যাঁ, পুলিশের বাবার শক্তি হবে না, তোমাকে গ্রেপ্তার করবার। এই গাইন দিয়া উয়ার ঠ্যাং ভাঙ্গি দিমো, হ্যাঁ।' আমি ওর কথা শুনে অবাক।

তরাই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন

শচীন দাশগুপ্ত

১৯৩৮ সালে যে গুটিকয়েক বামপন্থী কর্মী শহরে ছিলেন ও কয়েকজন আটক বন্দি জেল বা অন্তরিন থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এলেন, তাদের নিয়ে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এই সময় ছাত্র সমিতিও গঠিত হয়।

এদের নেতৃত্বে শহরে সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী আন্দোলন, বন্দিমুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি সংগঠিত হতে লাগল। সমাজতান্ত্রিক মনোভাবে জেলার যুবক ও ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল।

বামপন্থী আন্দোলন শুধুমাত্র শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে এই বক্তব্যকে কার্যকরী করার জন্য ১৯৩৮ সালে ২৩ ডিসেম্বর জেলা কৃষক সংগঠনী সমিতি গঠন করা হয়। জেলা বামপন্থী আন্দোলনের একটা বলিষ্ঠ রূপান্তব ঘটল।

জলপাইগুড়ির কৃষকদের অবস্থা, তাদের শোষণের রূপ, কৃষক সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস কিছুই ভাল করে জানা ছিল না। কংগ্রেস কর্মী হিসাবে কৃষকদের সঙ্গে যে যোগাযোগ ছিল তা ভাসাভাসা। প্রধানত জোতদার ও ধনী কৃষকদেব সঙ্গে। তাই সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অবস্থাটা ভাল করে বোঝার প্রয়োজন ছিল, সংগঠন গড়াব ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ।

কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ:

কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রথম প্রচেষ্টা হল বিভিন্ন হাটে লালঝান্ডা নিয়ে সভা করা, স্বাধীনভাবে কৃষকদের কেন আলাদা সংগঠন করতে হবে, কেন শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত করতে হবে, লাঙল যার জমি তার এই আওয়াজের অর্থ কী? ইত্যাদি বোঝানো হয় এবং বিজ্ঞপ্তি ছেপে তা বিলির ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় হাট থেকে কিছু উৎসাহী কৃষকের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে সেই সব কৃষকের গ্রামে গিয়ে ছোট ছোট বৈঠক সভা করি।

এইভাবেই জলপাইগুড়ির গ্রামাঞ্চলের কৃষকের অবস্থা ও তাদের শ্রেণীবিন্যাসের চেহারাটা জানা যায়, জানা যায় শোষণের রূপ। এর থেকেই জানা যায় এ জেলার আধিয়ার সমস্যা ও ভূমিসমস্যা অর্থাৎ কৃষকের আন্দোলনের মূল সমস্যা। সেই জন্য সত্যিকার বিপ্লবী কৃষক আন্দোলন গড়তে হলে আধিয়ার কৃষকদেরই সমিতির নেতৃত্বে এনে তাদের দাবি-দাওয়া কেন্দ্র করেই সত্যিকার বিপ্লবী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। প্রথমেই শুরু হল ব্যাপক প্রচার অভিযান। দাবি উঠল, 'কৃষকের গণ্ডি নাই, হাট তোলা বন্ধের আন্দোলন।' তোলা বা গণ্ডি সর্বশ্রেণীর কৃষককেই আঘাত করে। সুতরাং এই আন্দোলনের

মধ্যে দিয়ে সর্বশ্রেণীর কৃষককেই কৃষক সমিতিতে আনা সম্ভব। আর তারই সঙ্গে আধিয়ারদের ওপর জোতদারদের নির্মমরূপ ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস প্রাদেশিক সম্মেলন এসে গেল। চারদিকে কৃষক সমিতি তার নিজস্ব পতাকা নিয়ে প্রচার অভিযান শুরু করেছে। কৃষকের গণ্ডি নাই এই আওয়াজে সর্বশ্রেণীর কৃষককে সংগঠিত করছে।

রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হচ্ছে। শহরে সোসালিস্ট পার্টি তার নিজস্ব ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করলেন। জেলার বোদা পচাগড় থানার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হল। বোদা ও পচাগড়ের বিশাল কৃষক মিছিল ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ সালে শহরে এসে পৌঁছল। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে 'জগদিন্দ্র নগরে' কৃষক সমিতির এক ক্যাম্প অফিস তৈরি হয়েছে। লালঝান্ডা ও কৃষকদের দাবিদাওয়া সংবলিত পোস্টারে সাজানো। কয়েক হাজার কৃষকের মিছিল লাল ঝান্ডা সামনে রেখে, কলকাতা থেকে আসা বামপন্থীদের এক ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে শুরু হল। হাজার কৃষকের মিছিল সম্মেলনের মণ্ডপের সামনে হাজির হল। কৃষকদের দাবিদাওয়ার আওয়াজে চারিদিক মুখরিত হল।

সম্মেলনের কর্মকর্তারা কৃষকদের সম্মেলনে ঢুকতে বাধা দিলেন। ধার্য দর্শনি দুই আনা। দর্শনি ছাড়া সম্মেলনে ঢোকা যাবে না। কৃষকরা দাবি তুলল দর্শনি ছাড়াই কৃষকদের ঢুকতে দিতে হবে। কংগ্রেসে উপস্থিত বামপন্থী নেতারা কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সম্মেলন মণ্ডপ প্রায় ফাঁকা। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে দর্শনি ছাড়াই কৃষকদের ঢুকতে দিতে বাধ্য হলেন। হাজার হাজার কৃষক কৃষক-সমিতির নেতৃত্বে তাদের দাবি আদায় করে নিল। কৃষক-সমিতির প্রথম জয় হল। কৃষক-সমিতি সর্বসাধারণের মধ্যে সমস্ত জেলায় পরিচিতি লাভ করল।

এই সময়ে জেলার রাজনীতিতে একটা ঘটনা ঘটে। কৃষক সমিতির ও সোসালিস্ট পার্টির তিন জন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে নিয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ বাম কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সংগঠনী কমিটি গঠন করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনি। কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠন গড়ার নীতি নির্ধারিত হল। ঠিক হল বোদা থানার ময়দান দিঘিতে জেলা কৃষক সম্মেলন করা হবে।

এই সম্মেলন উপলক্ষে ময়দানদিঘিতে কৃষক সমিতির প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। চারবিঘা জমির ওপর মাত্র বড় একটি চৌয়ারি খড়ের ঘর তোলা হল। শক্ত বাঁশের বেড়া। সামনে বড় একটা আমগাছের ওপর লাল ঝান্ডা উঠল। বেড়ার চারদিকে লালকালিতে নানা শ্লোগান লেখা। একদিকে রান্নার জায়গা, বাঁশের তৈরি বসার ও খাবার বেঞ্চ। খাবার জায়গার চারদিকে বড় বড় লেখা 'থুথু ফেলিবেন না।'

কার্যালয়ের সামনে মস্ত বড় উঠানে নিয়মিত কুচকাওয়াজ। বোদা থানার সমস্ত অঞ্চল জুড়ে 'কৃষক সমিতির জয়', 'লাঙল যার জমি তার', 'জমিদারি প্রথা ধ্বংস হউক', 'কৃষকের গণ্ডি নাই', প্রভৃতি আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল। ১৮ জুলাই ১৯৩৯ সালে ময়দানদিঘিতে প্রথম জেলা সম্মেলন হয়। জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রায় হাজার খানেক কৃষকের এক সুশৃঙ্খল ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠিত হয়। সদর, বোদা, পচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানার প্রায় সব ইউনিয়নেই কৃষক সমিতি গঠন হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

শুরু হল 'গণ্ডি আন্দোলন'। কৃষকের সক্রিয় লড়াই শুরু হল ময়দান দিঘি হাটে। লাল ঝান্ডা ও লাঠি হাতে ভলান্টিয়াররা কৃষক সমিতির আদেশ প্রচার করল 'কৃষকের গণ্ডি নাই'। কৃষক সমিতির এই আন্দোলন জলপাইগুড়ি জেলাতেই প্রথম। হাটটি হল বোদা থানার ময়দানদিঘির হাট।

জোতদার ও হাটের ইজারাদার চুপ করে বসে রইল না। তারাও তৎপর হয়ে উঠল। শহরে দরখাস্ত গেল, কৃষকদের নানাভাবে ভয় দেখানো হল, পুলিশ দারোগা এল, কিন্তু কৃষকদের সম্মিলিত শক্তির সামনে তা কোনও কাজে এল না। ময়দানদিঘি হাটে গণ্ডি আদায় বন্ধ হল। হাটের এই জয় চারিদিকে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল। গরিব আধিয়ার কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। জোতদার ইজারাদাররা সদর এস. ডি. ওকে নিয়ে এসে এক সভা করলেন তাতে কৃষক সমিতির নেতাদেরও ডাকা হল। ওই সভায় সমিতির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতাদের পাঠানো হল না। সভায় গেল আধিয়ার গরিব কৃষক ও দিনমজুরদের এক প্রতিনিধি দল।

ইংরেজ আমল। হাকিমের সামনে চেয়ারে বসে তারা 'গণ্ডি তোলা যে বেআইনি, কৃষকেরা যে এই বেআইনি কাজ বন্ধ করতে কৃত সংকল্প সে কথা ঘোষণা করলেন।' সেই আমলে জোতদার, ইজারাদার ও নিজেদের দাবিদাওয়ার কথা জোরের সঙ্গে বলতে পারা মোটেই সহজ ছিল না। কৃষকের লড়াই। অবহেলিত, নিষ্পেষিত আধিয়ার কৃষক শোসক শ্রেণীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দাবিদাওয়ার কথা বলতে পারল। সাধারণ কৃষকের বক্তব্যের সামনে সেদিন হাকিম সাহেব সরাসরি জোতদার ইজারাদারদের সাহায্য করতে সক্ষম হলেন না। বোদা, দেবীগঞ্জ, থানার সব বড় হাটে গণ্ডি আন্দোলন সম্প্রসারিত হল।

বোদা কুচবিহার মহাজনের জমিদারি। মস্ত বড় হাট। নায়েব বরকন্দাজও শক্তিশালী। কৃষক ভলান্টিয়ার সংযতভাবে হাটে প্রচার অভিযান চালাল, 'কৃষকের গণ্ডি নাই'। দাবি না মানায় কৃষকরা সিদ্ধান্ত নিল পীরবাস নদীর ওপারে দিনাজপুর জেলায় 'দশের হাট' বসাতে হবে। দলে দলে কৃষক জঙ্গল পরিষ্কার করে হাটের জায়গা তৈরি করে ফেলল। পরের হাট দশের হাট বসানো হল। ফলে দেবীগঞ্জ থেকে স্টেটের ম্যানেজার এসে ঘোষণা করলেন 'কৃষকের গণ্ডি নাই'। কৃষক সমিতির বিরাট জয়। এ এলাকার সর্ববৃহৎ বোদা হাটে গণ্ডি উঠে যাওয়ায় ছোট ছোট হাটগুলির গণ্ডি উঠে যেতে লাগল। বিভিন্ন ইউনিয়নে কৃষক সমিতি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে উঠল।

দেবীগঞ্জ থানায় 'লক্ষ্মীর হাট' আর একটি বড় হাট। এখানে জোতদাররা সাম্প্রদায়িক প্রচার মারফত গণ্ডির লড়াইকে বানচাল করতে চেষ্টা করল। হিন্দু মুসলমান গরিব কৃষকের মিলিত শক্তির সামনে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা পিছু হঠতে বাধ্য হল। এরপর পচাগড় হাট, সেখানেও কৃষকের জয় হল।

দেবীগঞ্জ, বোদা, পচাগড় ও সদরের একাংশে ছোট বড় সব হাট থেকে কৃষকদের গণ্ডি উঠে গেল। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে জলপাইগুড়ি জেলায় আধিয়ার কৃষকের নেতৃত্বে এক গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়ের শেষ হল।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই আন্দোলন জেলার রাজনীতিতে এক বিশেষ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় পনেরোটি ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল। ভলান্টিয়ার হয়েছিল ২২০০। কৃষক সংগঠনগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন ইউনিয়ন কমিটি ও

জেলা কমিটির প্রতিনিধির ওপর কমিটির জেলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

কালীর মেলা অভিযান:

বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে দাবি উঠল কালীর মেলার অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার দুমদুমায় প্রতি বছর কালী পূজার সময় কালীর মেলা হয়। জলপাইগুড়ি সংলগ্ন। মেলার মালিক দিনাজপুরের মুল্লা স্টেট। তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-এর অধীন। বিশাল মেলা। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর থেকে দলে দলে কৃষক এই মেলায় আসত প্রধানত গোরু মহিষ কেনা-বেচার জন্য। জেলা সংগ্রাম কমিটি গরিব কৃষকদের দাবি মেনে নিয়ে আন্দোলনের পরিকল্পনা ঠিক করল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল কালীর মেলার এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষক সমিতি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করবে। গণ্ডির আন্দোলন দিনাজপুর ও রংপুর জেলাতেও ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। আধিয়ারদের সমস্যা ও আন্দোলন সম্বন্ধেও ব্যাপক প্রচার করা যাবে।

লেখাই খরচ বাবদ হাটের কর্তৃপক্ষ চার-পাঁচ টাকা আদায় করত। ধানের দাম তখন দু টাকা আড়াই টাকা মন। সংগ্রাম পরিষদ ঠিক করল চার আনা-পাঁচ আনার বেশি লেখাই খরচ দেওয়া হবে না।

ভুল্লা নদীর তীরে প্রায় তিন মাইল লম্বা এই মেলা। হাজার হাজার গোরু মহিষ বিক্রি হয়। জমিদারের আয় পনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকা। মেলাব সময় অস্থায়ী থানা বসে। সব দিক দিয়েই শক্ত ঘাঁটি। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকেরা গণ্ডি আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ়। আড়াই হাজার সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত ভলান্টিয়ার বাহিনী।

জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচপীরে সাতশো বাছাই করা ভলান্টিয়ার বাহিনী বিভিন্ন কমিটি থেকে এসে জমা হল। কোনও কোনও দল প্রায় পঞ্চাশ মাইল রাস্তা হেঁটে আসল। মাঝ রাত্রি থেকে শুরু হল ভলান্টিয়ার মার্চ। কুড়ি মাইল রাস্তা মার্চ করে বিউগল বাজিয়ে বিভিন্ন দাবিদাওয়ার আওয়াজ দিতে দিতে ভুল্লা নদীর এপারে জলপাইগুড়ি জেলায় তাদের তাঁবু গাড়ল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

দিনাজপুর এলাকার কৃষকেরা এল, আশেপাশের কংগ্রেস ভলান্টিয়াররাও যোগ দিল। সম্মিলিত আওয়াজ উঠল, 'কালীর মেলার কালা আইন চলবে না', 'লেখাই খরচ চার-পাঁচ আনার বেশি নেওয়া চলবে না', লড়াই শুরু হল। ভলান্টিয়ার শৃঙ্খলার সঙ্গে মার্চ করতে করতে কৃষক সমিতির আইন জারি করল। জমিদারের তরফ থেকে দাবি না মানায় কৃষক সমিতির তরফ থেকে বিনা পয়সায় লেখাইয়ের কাজ শুরু হল। দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ থেকে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মহকুমা শাসক এসে ভয় দেখাল। সমস্ত হাটে সশস্ত্র পুলিশ মার্চ করতে লাগল। ১৪৪ ধারা জারি হল।

কৃষক সমিতি সরাসরি সংঘর্ষের পথে না গিয়ে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক গোরু, মহিষ, দোকানপাট নিয়ে ভুল্লা নদীর এপারে জলপাইগুড়ি জেলায় 'দশের' মেলা বসাল। কৃষক সমিতির নামে লিখাই হতে লাগল, কালীর মেলা ফাঁকা হয়ে গেল। কৃষকের দাবি আদায় হল। কৃষক সমিতি আরও বিস্তৃতি লাভ করল। দেবীগঞ্জ থানার অনেক কংগ্রেস কমিটির জায়গায় কৃষক সমিতি গঠিত হল। কৃষক সমিতির জয়ের আওয়াজ দিনাজপুর রংপুরের কৃষকদের উল্লসিত করল। কৃষকের গণ্ডি নাই লড়াই ছড়িয়ে পড়ল।

জলপাইগুড়ি কৃষক সমিতি সর্বদাই প্রাদেশিক নেতৃত্বের যথাযথ নির্দেশ নিয়ে কাজ করতেন।

কালীর মেলার পর সারা বাংলার জেলা সমিতি সম্পাদকদের এক সভা ডাকা হয় কলকাতা কেন্দ্রীয় অফিসে। সমস্ত জেলার সম্পাদক ও প্রাদেশিক নেতারা ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সব জেলা থেকেই আন্দোলনের রিপোর্ট পেশ করা হয়। সমস্ত রিপোর্ট শেষে প্রাদেশিক সমিতির বিশিষ্ট নেতা বিভিন্ন রিপোর্ট পর্যালোচনা করে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বলেন, 'জলপাইগুড়ি সমিতি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। মাত্র তিনজন মধ্যবিত্ত কর্মী থাকিলেও ইতিমধ্যে বহু কৃষককর্মী তৈরি হইয়াছে। সবচেয়ে বিশেষ লক্ষণ হইল যে সমিতি দরিদ্রদের মধ্যে তার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়া জঙ্গি শ্রেণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে গড়িয়ে তুলিয়াছে।' 'Jalpiguri is the Vanguard of the Bengal kisan organisation.'

১৯৩৯ সাল থেকেই জলপাইগুড়ি সমিতি আধিয়ারদের ওপর শোষণের নির্মম রূপ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। কৃষকের সব সভায় প্রচারে শোষণের এই রূপ তুলে ধরা হল এবং লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানানো হয়। কালীর মেলার পর কৃষকেরা আরও সংগঠিত হল। কৃষক সমিতি ও সংগ্রাম পরিষদের সভায় ঠিক হল আধিদের দাবি দাওয়ার লড়াই শুরু করতে হবে। দাবি উঠল 'বাজে আদায় বন্ধ করো', 'কর্জা ধানের সুদ নাই', 'নিজ খোলানে ধান তোলো' ইত্যাদি।

জেলার আধিয়ারদের অবস্থা ছিল ভূমিদাসের মতো। ফসল জোতদারের বাড়িতে উঠলে জোতদার আধিয়ারের কাছ থেকে গোলা মোছানি, গোলা চাঁছানি, বরকন্দাজি এই রকম বিভিন্ন বাজে আদায় আধিয়ারদের ভাগ থেকে কেটে নিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আঠারো রকম বাজে আদায়ের উদাহরণ ছিল। এ ছাড়া জোতদাররা কৃষকের খাবার জন্য কর্জা দিত। ধান উঠলে আধিয়ারের ভাগ থেকে কর্জা ধানের সঙ্গে দেড়া, দুনাসুদ আদায় করত। ফলে ধানের ভাগ আধিয়ারের কপালে প্রায় কিছুই জুটত না। আবার জোতদারদের কাছে কর্জার জন্য হাত পাততে হত।

এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে এবার আধিয়াররা গর্জে উঠল। 'নিজ খোলানে ধান তোলো'। আধিয়ারদের নেতৃত্বে সমস্ত এলাকায় কৃষক সমিতি গড়ে উঠেছে। সুশৃঙ্খল ভলান্টিয়ার বাহিনী গণ্ডি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কৃষক সমিতির সভা আর ভলান্টিয়ার বাহিনীর কুচকাওয়াজে সমস্ত এলাকা চঞ্চল হয়ে উঠল। জোতদাররাও চুপ করে বসে থাকল না। শহরে, কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন, মামলা দায়ের করা হল। বিভিন্ন থানায় পুলিশবাহিনীর বিশেষ ক্যাম্প বসানো হল।

দল বেঁধে ধান কাটা শুরু হল। ভলান্টিয়ার বাহিনী সমস্ত প্রকার প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকল। আধিয়াররা নিজ বাড়িতে ধান তুলতে লাগল। জোতদারদের শাসানি, সশস্ত্র পুলিশের ধমকানি, কোনওকিছুই কৃষকের মনোবল ক্ষুণ্ণ করতে পারল না। দেখতে দেখতে সদর থানার কিছু অংশে, বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ থানার সব জায়গায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। আধিয়াররা নিজ খোলানে ধান তুলল।

তখন নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা। জলপাইগুড়ির নবাব সাহেব অন্যতম মন্ত্রী। নবাব সাহেব জলপাইগুড়িতে এসে জোতদারদের সঙ্গে সভা করলেন। ১৪৪ ধারা জারি করা হল। জোতদারদের সহায়তায় পুলিশ গ্রামে গ্রামে কৃষকদের উপর হামলা শুরু করল। অন্য দিকে

কর্তৃপক্ষ প্রচার করল যে বাজে আদায় বন্ধ করা হবে, পাঁচ কাঠার বেশি সুদ নেওয়া চলবে না। কিন্তু ধান জোতদারদের খোলানে তুলে দিতে হবে, এই মর্মে সরকারি আদেশ জারি করা হল। কৃষকেরা তা প্রত্যাখ্যান করল। দমননীতি বাড়তে লাগল। প্রায় তিনশো কৃষককে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হল। সাধারণ কৃষকের ওপর মারপিট শুরু হল।

ময়দানদিঘি সমিতির অফিসে চারবিঘা জমি দান করেছিলেন এলাকার বৃদ্ধ কৃষক নন্দকিশোর বর্মণ। সার্কেল অফিসের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এসে অত বড় ঘরটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। বৃদ্ধ নন্দকিশোরকে প্রচণ্ড মারধোর করে তাকে দিয়ে চত্বরটা লাঙল দিয়ে চাষ করল, সর্ষে ছিটিয়ে দিল।

সেদিনের সেই আন্দোলন সাময়িকভাবে দমন করা হয়েছিল সত্য। কিন্তু এই লড়াইয়ের মাধ্যমে কৃষক আন্দোলনের এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটল। আধিয়ার সমস্যা ভূমিসমস্যার অন্যতম প্রধান সমস্যা এ সত্যটাও কৃষক আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়াল।

সেদিনের আধিয়ার আন্দোলনের ফলেই পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক তেভাগার লড়াই। সেদিক থেকে আধিয়ার আন্দোলন বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলনের পথিকৃৎ।

জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক আন্দোলনের স্মৃতি

বীরেন্দ্রকুমার নিয়োগী

লবণ আইন আন্দোলনের পর কংগ্রেসের সংগঠন এ জেলায় শিথিল হয়ে পড়েছিল। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব ওই সময় জেলায় কংগ্রেসের প্রচার ও সংগঠন শক্ত করবার দিকে মনোনিবেশ করেন। ওই সময় বোদা থানার কয়েকটি ইউনিয়নে খাদ্যাভাব প্রায় দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। জেলা কংগ্রেস থেকে সেখানে চাল পাঠিয়ে অনাহারী অর্ধাহারীদের সাধ্যমতো সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

বোদায় তখন স্তিমিত কংগ্রেস সংগঠনের ধারক ও বাহক ছিলেন স্বনামখ্যাত প্রয়াত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাই ভোলা মজুমদার এবং আশুতোষ ঘোষ প্রভৃতি দু-চার জন। এঁদের সহযোগে জেলা কংগ্রেসের কিছু কর্মী কংগ্রেসের ত্রাণ কাজের দায়িত্ব পান। গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে কোন পরিবারে কী পবিমাণ চাল দেওয়া হবে তা লিখে কার্ড দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কার্ড অনুসারেই বোদা বন্দরে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে চাল দেওয়া হতে লাগল। ত্রাণকার্য ছাড়াও সভ্য সংগ্রহ, প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি গঠন ইত্যাদি কাজও শুরু হয়।

ওই সময় বোদা ও পচাগড় থানায় কংগ্রেসের প্রাথমিক কয়েকটি সভা হয়। বোদা থেকে পচাগড় যাবার বড় সড়কের ধারে প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির ঘরও তৈরি হয়। কয়েকজন উৎসাহী কংগ্রেসি স্বেচ্ছাসেবকও পাওয়া যায়। তাঁরা মাঝে মাঝে শহরে আসতেন। বছর খানেকের মধ্যে এদের কাছ থেকে প্রথম জানা যায় যে, বোদা, পচাগড় ও দেবীগঞ্জে কৃষক সমিতি গঠিত হচ্ছে এবং কৃষকদের নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে প্রচার আন্দোলনও শুরু হয়েছে। প্রতি রাত্রিতে পাড়ায় পাড়ায় কৃষকদের বৈঠক; মাঝে মাঝে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে হাটে, বাজারে, ময়দানে।

কৃষক সমিতি থেকে প্রকাশিত লাল, সবুজ, হলদে রঙের আকারে ছোট প্রচারপত্রও ওই সময় হাতে এল। ওগুলির মূল বক্তব্য হল 'হাটে কৃষকের গণ্ডি (তোলা) নাই', 'নিজ নিজ এলাকায় কৃষক সমিতি গঠন করো', 'প্রত্যেক কৃষক, কৃষক সমিতির সভ্য হও' ইত্যাদি: শুধু কৃষক সমিতি গঠন ও কৃষকের নিজস্ব দাবি নিয়ে প্রচারান্দোলনই নয়, সমিতির উদ্যোগে ও নেতৃত্বে একই সঙ্গে গড়ে উঠেছে এক কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যা হল কৃষকের নিজস্ব শ্রেণী সংগ্রামে অত্যাবশ্যক এক সুগঠিত, সুশৃঙ্খল কর্মীদল। জলপাইগুড়ি জেলায় এই কৃষক শ্রেণী সংগঠনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন মাধব দাস, শচীন দাশগুপ্ত, গুরুদাস রায় প্রমুখ শহরের আরও কয়েকজন।

জেলা কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা ওই সময় শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীসংগঠনে বিশ্বাসী ছিলেন না। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনির সময় কমিউনিস্টরা 'হাটে গণ্ডি নাই' 'বাজে আদায় বন্ধ করো', 'কর্জা ধানের সুদ নাই' আওয়াজের ওপর কৃষক আন্দোলন শুরু করেন। ওই

সময় আমি জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি। সভাপতি ছিলেন প্রয়াত নিধান রায়। আমি তখন প্রধানত প্রয়াত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছি। স্বভাবতই কমিউনিস্টদের কৃষক আন্দোলনের প্রতি আমার সহানুভূতি জন্মায়। কিন্তু তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃত্বের বড় অংশ এই আন্দোলন সমর্থন করতেন না। বারংবার সমর্থনের কথা বলায় জেলা কমিটি আমাকে ও প্রফুল্ল ত্রিপাঠী (তখন তিনি Village Internship মুক্ত হয়ে জলপাইগুড়ি কংগ্রেসে কাজ করতে শুরু করেন) মহাশয়কে কৃষক আন্দোলনে উচ্ছল এলাকাগুলি ঘুরে দেখে এসে 'রিপোর্ট' করার নির্দেশ দেন।

আমি ও শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠী বোদা, ময়দানদিঘি, পচাগড়, সাঁকোয়া ও দেবীগঞ্জ ঘুরে ওই আন্দোলনের গতি প্রকৃতি লক্ষ করে রিপোর্ট করি, জেলা কমিটির কাছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, এই কৃষক আন্দোলনে গ্রামের শতকরা সত্তর-আশি জনই যুক্ত হয়েছেন। এদের দাবি অত্যন্ত ন্যায্য। এই আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের চোখ বুজে না থেকে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেওয়া সঙ্গত। তা না হলে কংগ্রেস সাধারণ কৃষকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। প্রফুল্ল ত্রিপাঠী এই রিপোর্ট স্বাক্ষর করতে রাজি হন না। শেষ পর্যন্ত রিপোর্টটি জেলা কমিটিতে গৃহীত হয়। এর ফলে জেলা কংগ্রেস থেকে একটি প্রচারপত্র 'আধিয়ারের কথা (১)' ছেপে বিলি করা হয়। যতদূর মনে পড়ে ওই সময় পাটগ্রামের নিকটবর্তী কুচবিহার এলাকায় কেশবচন্দ্র দত্তকে আধিয়ার আন্দোলনের দরুন গ্রেপ্তার করে এবং কুচবিহারে তাঁর বিচার হয়।

ইচ্ছা ছিল আধিয়ারের কথা নিয়ে আরেকটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা। তার আগেই আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের নিপীড়ন শুরু হয়ে যায়। জেলা কংগ্রেসের অন্যতম এক প্রধান নেতা তখন কলকাতায় ছিলেন। কলকাতা থেকে ফিরে এসে কংগ্রেস আধিয়ার আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তিনি মন্তব্য করেন, 'ও সব কমিউনিস্টদের কাণ্ডকারখানা, এ যে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়ে গেল ইত্যাদি।' সুতরাং কংগ্রেসের তথা জাতীয় আদর্শের ওই আন্দোলন সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই এবং জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি পদে ইস্তফা দিই।

জলপাইগুড়ি জেলার পাশের জেলা দিনাজপুরে কৃষক সমিতি। জলপাইগুড়ির মতো সেখানেও কৃষকেরা দলে দলে ওই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। দিনাজপুরের কালী মেলা উত্তরবঙ্গের এক সুপ্রসিদ্ধ বিরাট মেলা। শীতকালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই মেলা বসত। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর পাশাপাশি এই তিন জেলার কৃষক ও জনসাধারণ হাজারে হাজারে এই মেলায় কেনা-বেচা করতেন। দিনাজপুর কৃষক সমিতি এই মেলায় 'কৃষকদের গণ্ডি নাই' এই আওয়াজ তুললেন। জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলার কৃষক স্বেচ্ছাসেবকেরা মেলাতে এর ব্যাপক প্রচার চালালেন। কালীমেলার বিশেষত্ব ছিল, এর গোরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর বেচা-কেনা। হাজার হাজার এই সব পশু বেচা-কেনা হত। মেলার ইজারাদার বিক্রির রসিদ লেখার নাম করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকেই বড় অঙ্কের অর্থ আদায় করত। জেলা কৃষক সমিতি এই অতিরিক্ত আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। কিন্তু মেলার ইজারাদার ওই লেখাইয়ের জন্য অর্থ কম করতে রাজি হল না। মেলার ইজারাদারের অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদে দুই জেলার কৃষক নেতৃত্ব ওই জেলাকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে ভেঙে পাশের নদীর অপর পাড়ে জলপাইগুড়ি জেলার হাজরাডাঙ্গাতে (বোদা থানার ১৩ নং ইউনিয়ন) উঠিয়ে আনল।

গোরু-মহিষ ইত্যাদির বেচা-কেনার রসিদ লিখে দিতে লাগলেন কৃষক সমিতির কর্মীরা, সামান্য অর্থের বিনিময়ে। বহু প্রাচীন মেলাকে স্ব-স্থান চ্যুত করে সাধারণ কৃষকের এই দাবি আদায়, গভর্নমেন্ট পৃষ্ঠপোষিত মালিকের সর্বশক্তির বিরুদ্ধে, এক অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। এ কাজ সম্ভব হয়েছিল শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শে একনিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচালনায়, এক সুসংগঠিত কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে।

কালীমেলায় কৃষকদের সাফল্য স্বভাবতই সারা জেলায় প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। ফলে, কৃষক সমিতির সংগঠন ও তার নিজস্ব শ্রেণী আন্দোলন হয়ে উঠল শক্তিশালী। কৃষকেরা হাটে 'গণ্ডি বন্ধ' আন্দোলন থেকে বৃহত্তর 'আধিয়ার আন্দোলনে' ব্রতী হলেন। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকের প্রায় সত্তর শতাংশই ছিলেন আধিয়ার বা বর্গাদার বা ভাগচাষি। যুগ যুগ ধরে এদের ওপর চলে আসছিল অমানুষিক শোষণ। সেই শোষণের বিরুদ্ধেই আধিয়াররা এবার রুখে দাঁড়ালেন। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে তারা গর্জে উঠলেন, 'আধিভাগ চাই', 'বাজে আদায় নাই', 'কর্জা ধানের সুদ নাই', 'বাকি বকেয়া আদায় বন্ধ করো' ইত্যাদি। শুরু হল হাটে মাঠে ঘাটে সুশৃঙ্খল কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 'মার্চ', ছোট ছোট লাল-সবুজ-হলদে কাগজে আধিয়ার কৃষকের ওই সব দাবি নিয়ে প্রচার-ইস্তাহার বিলি।

ধানকাটার সময় এগিয়ে এল। প্রচার আন্দোলনের কাজ শেষ। এবার প্রকৃত সংগ্রাম শুরু, জোতদারের বিরুদ্ধে আধিয়ারের সংগ্রাম। কৃষক সমিতি আধিয়ারদের নির্দেশ দিল, 'আধিয়াররা তাদের নিজ নিজ খোলানে ধান তোলো। ওই ধানের ভাগ নাও আধা, কর্জাধানের সুদ দিও না, বাজে আদায় দিও না।' এতকাল আধিয়াররা নিজ নিজ খেতের ধান নিজেরাই কেটে জমির মালিক জোতদারের কামাতে তুলতেন। এবার প্রত্যক্ষভাবে সমিতির নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকরাই দল বেঁধে প্রত্যেক আধিয়ারের জমির ধান কেটে যার যার খোলানে (বাড়ির উঠানে) তুলে দিলেন। জোতদারের কামাতে এবার আর পাহাড়ের মতো উঁচু বহু ধানের পুঁজি দেখা গেল না। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে প্রত্যক্ষ করা কিছু দৃশ্যের কাহিনী উল্লেখ করছি।

একদিন সকালে দেখলাম, যতদূর দৃষ্টি চলে খেতের পর খেতে পাকা ধানের স্বর্ণশোভা। পরদিন সকালে সেখানে দেখি মাঠের পর মাঠ ধানশূন্য ফাঁকা। বিগত রাত্রে সমিতির স্বেচ্ছাবাহিনী দলবদ্ধ হয়ে ধান কেটে প্রত্যেক আধিয়ারের নিজ খোলানে পৌঁছে দিয়েছে। শক্তিশালী সংগঠন আর সদ্য জেগে ওঠা কৃষকশ্রেণীর কী বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়।

আধিয়ার-আন্দোলন পরিকল্পনানুযায়ী প্রায় সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের প্রান্তে পৌঁছেও মর্মান্তিকভাবে ভেঙেচুরে গিয়েছিল। সমিতির দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্বের অতি উৎসাহ ও উত্তেজনার বশে অবিবেচনা প্রসূত এক কাজের ফলে প্রচণ্ড সরকারি পুলিশি উৎপীড়ন কৃষকদের ওপর নেমে এল। শত শত কৃষককর্মী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। দারোগা পুলিশ সহায়ে জোতদাররা গ্রামের সমিতির সঙ্গে যুক্ত কৃষক পরিবারের মধ্যে ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করে ব্যাপক ভীতির সঞ্চার করল। গ্রামে গ্রামে আতঙ্ক ও হতাশা নেমে এল। আধিয়ার আন্দোলনের লব্ধপ্রায় জয় সাময়িকভাবে ব্যাহত হল।

আধিয়ার আন্দোলনের পর জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক সংগঠনে দুর্বলতা আসে এবং কৃষক আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ওই সময় বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির দুই জন জেলা নেতা ডা. শচীন দাশগুপ্ত ও নরেশ চক্রবর্তী কৃষকদের মধ্যে গোপনে কাজ করে কৃষক আন্দোলনকে আবার শক্তিশালী করে তোলেন। ধীরে ধীরে জলপাইগুড়ির আধিয়ার

কৃষকেরা পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর ও রংপুর জেলার কৃষকদের সঙ্গে একযোগে সংগ্রামী আন্দোলন শুরু করলেন। যে কৃষক মাত্র কয়েক বছর আগে 'কর্জা ধানের সুদ নাই, বাজে আদায় নাই, আধিভাগ চাই'-এর আওয়াজ তুলে আধিয়ার আন্দোলন করে পূর্ণ সফলতা পাননি, তাঁরাই এবার জোতদারের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে তে-ভাগা আদায়ের জন্য মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দেবীগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী বোদা থানায় এই তেভাগা সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন মাধব দত্ত, গুরুদাস রায়, নরেশ চক্রবর্তী, শচীন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, হরপ্রসাদ ঘোষ, প্রমুখ। এই থানায় তে-ভাগার দাবিতে প্রথম ধান কেটে নিজ খোলানে তোলার জন্য সুন্দরদিঘি ইউনিয়নের আধিয়ার বিদ্যা বর্মণের খেত নির্দিষ্ট হয়েছিল। ধান কাটা শুরু হতে না হতেই সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে এসে জোতদার ধান কাটিয়েদের ওপর হামলা করল। কমরেড মাধব দত্ত আহত হয়ে গ্রেপ্তার হলেন। ফলে, সারা দেবীগঞ্জে তেভাগার সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করল। এর ফলে আধিয়াররাই পূর্ণ জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

মাধব দত্ত স্মরণে

বীরেন্দ্রকুমার নিয়োগী

মাধববাবুর মৃত্যুসংবাদ পেলাম। বয়স হয়েছিল, যত দূর জানি পঁচাত্তর। এ মৃত্যু পরিণত বয়সেই। সে দিক থেকে বলার কিছু নেই। কিন্তু মাধববাবুর এই চলে যাওয়া আমাদের, তাঁর এককালের সহকর্মী ও পরিচিত সকলের পক্ষেই বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করল। কারণ, এমন এক জন আপন-করা, নির্মল হৃদয়, সদানন্দ মানুষের সাক্ষাৎ আমরা আর পাব না।

মাধব দত্তের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার। প্রথম থেকেই তাঁকে রাজনীতিক সহকর্মীরূপেই পেয়েছিলাম। পরে ব্যক্তিগত কারণে যখন রাজনীতি থেকে আমি সরে এসেছিলাম এবং তিনি ছিলেন রাজনীতিতে ওতপ্রোত, তখনও তাঁর সঙ্গে আমার সৌহার্দ্যের অভাব ঘটেনি। এ জন্য তাঁকে জানতে বুঝতে তো বেশিদিনের প্রয়োজন ছিল না। দু-চার দিনের পরিচয়েই তাঁর ভিতর-বাহির খোলা বইর মতো পড়ে নেওয়া যেত।

সন তারিখ আজ আর ঠিক মনে পড়ে না। ১৯৩৭ হবে। লবণ আইন অমান্যের পর এ জেলায় কংগ্রেসের সংগঠন শিথিল হয়ে পড়েছে। জেলা-নেতৃত্ব মন দিলেন জেলায় কংগ্রেসের প্রচার ও সংগঠন শক্ত করার দিকে। এই সময়ে এক দিন স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় এসে জানালেন, সর্বসময়ের জন্য এক জন কংগ্রেস কর্মী পাওয়া গেছে। তাঁর অচল সংসাবে প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাতে হবে। এই সর্বসময়ের জন্য মনোনীত কংগ্রেস কর্মী হলেন আমাদের মাধব দত্ত।

তখন বোদা থানার (বর্তমানে বাংলাদেশে) কয়েকটি ইউনিয়নে খাদ্যাভাব প্রায় দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। জেলা কংগ্রেস থেকে খোলানে চাল পাঠিয়ে অর্ধাহারী অনাহারীদের সাধ্যমতো সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হল। বোদার তখন স্তিমিত কংগ্রেস সংগঠনের ধারক ও বাহক ছিলেন বিখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাই ভোলা মজুমদার ও আশুতোষ প্রভৃতি দু-চারজন। এঁদের সহযোগে মাধববাবু বোদায় কংগ্রেসের ত্রাণকার্যের দায়িত্ব পেলেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল, গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে, কোন পরিবারে কী পরিমাণ চাল দেওয়া হবে তা লিখে কার্ড দেবার ব্যবস্থা করা। এই কার্ড অনুসারেই বোদা বন্দরে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে চাল দেওয়া হতে লাগল। এই ত্রাণকার্য ছাড়া কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্য সংগ্রহ, প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি গঠনও তাঁর অন্যতম করণীয় ছিল। এভাবেই শুরু হল জলপাইগুড়িতে মাধববাবুর কৃষকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা।

মাধববাবু মাঝে মাঝে শহরে আসতেন। বোদা থেকে প্রথম যে দিন তিনি পান্ডাপড়ো জেলা কংগ্রেস অপিসে এলেন, সেই দিনটির কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। কংগ্রেস ভবনের দ্বিতলের অংশমাত্র কাঠের পাটাতনে আচ্ছাদিত ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে বাম ও ডান দিকে একখানা করে ছোট ঘর, বাকি সবটুকু খোলা। রাস্তার ধারের বারান্দা অংশেই শহরের কংগ্রেসিরা কেউ কেউ আসেন, বসেন। অপিস-কর্মীরূপে রোজই আমাবে অপিসে

আসতে হয়। একদিন ওই বারান্দায় বসে কাজ করছি, টের পেলাম কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছেন, কণ্ঠে তাঁর বেসুরো এক রবীন্দ্রসংগীত 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান।/দাঁড় ধরে আজ বোস রে সবাই, টানরে সবাই টান।' গাইতে গাইতে সামনে এসে দাঁড়ালেন মাধব দত্ত। তাঁর চৌকিদারি থলেটা (তখনও শান্তিনিকেতনি কাঁধের থলের প্রচলন হয়নি) নামিয়ে খালি পাটাতনের উপরেই বসে পড়লেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার গান কি ফুরোল?' তিনি তখন পুরো গানটাই তাঁর স্বাভাবিক বেসুরো কণ্ঠে গাইলেন। গানটির এই দুই পঙ্‌ক্তি, 'কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা, ভয়ের কথা কে বলে আজ—ভয় আছে সব জানা।'

গাইলেন দু' বার করে এবং বেশ জোর দিয়ে। মাধববাবুর এই গান গাওয়া থেকেই আমি যেন সেদিন তাঁর সত্যিকার পরিচয় পেয়ে গেলাম। মনে হল, এই গানই হল ওঁর জীবন-সংগীত। পরে, তাঁর সঙ্গে পথ চলতেও দেখেছি এই গান গেয়েই তাঁর পথ-চলা। অর্থাৎ এই গান ওঁর পথ চলারও গান, মার্চ সং পরাধীন নিপীড়িত দেশবাসীর জন্য সংগ্রামের কর্মসাগরে বান ডেকেছে, মাধববাবুর কাছে এবার আনন্দ-সাগরের। নিজের নিঃসম্বল সংসার থেকে ফেরার আহ্বান, বন্ধুজনের ভয়ের কথা বলা—সবই মনে আসছে, কিন্তু সে সব ওঁকে টলাতে পারবে না। কারণ এই পিছুটান, এই ভয়ের কথার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। তাই তিনি নির্ভয়ে পালের রশি কসে ধরে গান গেয়ে মত্ত এ সংগ্রামসাগর পাড়ি দেবেন। কংগ্রেসের কর্মী মাধববাবু। দু-চারটে প্রাথমিক কংগ্রেস গঠিত হল বোদা ও পচাগড়ে। ময়দানদিঘিতে বোদা-পচাগড় সড়কের ধারে ভাল একটি প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির ঘরও তৈরি হল। দু-চারজন উৎসাহী কংগ্রেসি স্বেচ্ছাসেবকও পাওয়া গেল। তাঁরা মাঝে মাঝে শহরে আসতেন। বছরখানেকের মধ্যে এঁদের কাছ থেকেই প্রথম জানা গেল, বোদা, পচাগড ও দেবীগঞ্জ কৃষক সমিতিও গঠিত হচ্ছে এবং কৃষকের নিজস্ব দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। প্রতি রাতে পাড়ায় পাড়ায় কৃষকদের বৈঠক হচ্ছে, মাঝে মাঝে হচ্ছে প্রকাশ্য সভা, হাটে-বাজারে ময়দানে। কয়েকটি লাল সবুজ রঙের আকারে ছোট প্রচারপত্রও হাতে এল। এ সবের মূল বক্তব্য হচ্ছে, 'হাটে কৃষকের গণ্ডি (তোলা) নাই' 'নিজ নিজ এলেকায় কৃষক সমিতি গঠন করো' 'কৃষক সমিতির সভ্য হও' ইত্যাদি। তখন এও জানা গেল, এই কৃষক আন্দোলনের প্রথম ও মুখ্য নেতা হলেন মাধব দত্ত। কৃষক সমিতি গঠন ও কৃষকের নিজস্ব দাবি নিয়ে প্রচারান্দোলনই নয়, তার উদ্যোগে ও নেতৃত্বে একই সঙ্গে গড়ে উঠছে এক কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনের অত্যাবশ্যক এক সুগঠিত, সুশৃঙ্খল কর্মী বাহিনী, জলপাইগুড়ি জেলার ড. শচীন দাশগুপ্ত প্রমুখ শহরের আরও কয়েকজন। তাঁরা সময়ে সময়ে শহর থেকে গ্রামে গিয়ে সভায় বক্তৃতা দিতেন।

পরে অবশ্য গুরুদাস রায়ের নামও শুনেছি এই সম্পর্কে। কিন্তু, জলপাইগুড়ির কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের মূল স্থপতি মাধব দত্ত। আমার এই ধারণা অবিসংবাদী বলেই আমি বিশ্বাস করি।

মাধব দত্তের জেলা কংগ্রেস অপিসে আসা বন্ধ হয়ে গেল, কারণ তখনকার জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম শ্রেণীর নেতারা শ্রেণী সংগঠনে বিশ্বাসী ছিলেন না, এবং তাঁরা এর বিরুদ্ধেই বলতেন। প্রয়োজন বোধে কৃষক সংগঠন-বিরোধী প্রচারও করতেন। বলতেন, 'ও সব কমুনিস্টদের কাণ্ড-কারখানা, বিদেশি ভাবধারা সুতরাং জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শের বিরোধী।' কিন্তু এই শ্রেণী সংগঠনের মুখোমুখি হয়ে হার স্বীকার করতে হয়েছিল একদিন

কট্টর জাতীয়তাবাদী জেলা কংগ্রেসের নেতাদের। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক (কংগ্রেস) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ সনে জলপাইগুড়ি শহরে। মাধববাবুর নেতৃত্বে শত শত কৃষক তাঁদের লাল পতাকা নিয়ে বোদা-পচাগড়-দেবীগঞ্জ থেকে এলেন সম্মেলনে। তাঁরা দাবি করলেন, বিনা দর্শনিতে সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে তাঁদের যোগদান করতে দিতে হবে। প্রথমে সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ কৃষকদের এই দাবি মানতে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজও আমি মনে করি, রক্ষণশীল কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই দাবি আদায়ের জয় মাধব দত্তের আদর্শনিষ্ঠা ও তাঁর সংগঠন নৈপুণ্যের জয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রেণী সংগ্রাম ও সংগঠনে ঘনিষ্ঠ মাধববাবুর ছোট একটি কাহিনী উল্লেখ করি। বোদা-পচাগড় জলপাইগুড়ির বড় সড়কের পাশেই ছিল ময়দানদিঘি প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির অফিস। মাধববাবু ওই নাম দলটির বিপরীত পৃষ্ঠে লিখিয়াছিলেন 'ময়দানদিঘি প্রাথমিক কৃষক সমিতির অপিস।' কারণ অবশ্য এই ছিল যে, ঘরটি কৃষক সমিতির অপিস রূপেও ব্যবহৃত হত। পথচলতি লোকজনের কেউ ঘরটি দেখিয়ে যদি বলত 'কংগ্রেসের ঘর' তখন মাধববাবু ঘরে থাকলে বাইরে সেই ব্যক্তিকে ডেকে বলিয়ে নিতেন, 'কৃষক সমিতিরও ঘর।' এই ঘটনাটি সামান্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই এতে মাধববাবুর নিজস্ব কর্ম ও আদর্শ-নিষ্ঠার পরিচয় মেলে না কি?

জলপাইগুড়ির পাশের জেলা দিনাজপুরেও জেলা কৃষক সমিতি 'কৃষকদের গণ্ডি নাই' আন্দোলন শুরু করেছিল। জলপাইগুড়ির মতো দিনাজপুরেও কৃষকেরা দলে দলে এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। দিনাজপুরে কালীমেলা উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ এক বিরাট মেলা। শীতকালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই মেলা বসত (এখনও বসে কিনা জানা নেই)। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর পাশাপাশি এই তিন জেলার কৃষক ও অন্য জনসাধারণ হাজারে হাজারে কেনাবেচা করতেন এই মেলায়। দিনাজপুর কৃষকসমিতি এই মেলায় 'কৃষকের গণ্ডি নাই' এই আওয়াজ তুলে আন্দোলন শুরু করল। কালীমেলার বিশেষত্ব ছিল এর গোরু-মহিষ ছাগল ভেড়া আদির বেচা-কেনা, হাজার হাজার গোরু-মহিষ বেচা-কেনা হত এখানে। গণ্ডিতে রসিদ লেখাই'র জন্যে ক্রেতার কাছ থেকে মেলার ইজারাদার একটা বড় রকমের অর্থ নিত। 'মেলায় কৃষকদের লাভ নাই' এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সমিতি প্রতিবাদ জানাল এই অতিরিক্ত, 'লেখাই' আদায়ের বিরুদ্ধে। মেলা কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করল না। ফলে কৃষক সমিতি এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে বাধ্য হল। এই সংগ্রামে জলপাইগুড়ির কৃষক সমিতি তার নেতা মাধব দত্তের নেতৃত্বে তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সহ যোগ দিয়েছিল। দুই জেলার কৃষক সমিতির আহ্বানে কালীমেলা তার বহু প্রাচীন নির্দিষ্ট স্থান থেকে ভেঙে পাশের নদীর অপর পারে জলপাইগুড়ি জেলার হাজরা ডাঙা উঠে এল। এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কৃষক সমিতির কর্মীরা গোরু-মহিষ কেনা-বেচার রসিদ লিখে দিতে থাকলেন, অতি নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে। কালীমেলা ভেঙে আনা ও তার সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল, সুশৃঙ্খল সুগঠিত এক কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্যোগী সহায়তায়। বলাবাহুল্য, জলপাইগুড়ি জেলা কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর স্রষ্টা ও পরিচালক ছিলেন মাধব দত্ত।

কালীমেলায় কৃষকদের এই সাফল্য উভয় জেলাতেই কৃষকদের মনে বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। ফলে, জেলায় কৃষক সমিতির সংগঠন ও নিজস্ব শ্রেণী-আন্দোলন

হয়ে উঠল শক্তিশালী।

ভুললে চলবে না, এরও মূলে অন্যতম প্রধান ছিলেন মাধব দত্ত। কৃষকেরা 'হাটে গণ্ডি বন্ধ' আন্দোলন থেকে বৃহত্তর 'আধিয়ার আন্দোলনে' ব্রতী হলেন। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকদের ষাট-সত্তর শতাংশই ছিলেন আধিয়ার বা বর্গাদার ভাগচাষি। যুগ যুগ ধরে এদের ওপর অমানুষিক শোষণ-পীড়ন চলে আসছে। সেই শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে এবার কৃষক সমিতি রুখে দাঁড়াল। সমিতি আওয়াজ তুলল, 'আধি ভাগ চাই', 'বাজে আদায় নাই', 'কর্জা ধানের সুদ নাই'। শুরু হল হাটে-মাঠে-ঘাটে সুশৃঙ্খল কৃষক বাহিনীর মার্চ, সভাসমিতি, ছোট ছোট লাল, সবুজ, হলদে কাগজে কৃষকের এই দাবি নিয়ে প্রচার-ইস্তাহার বিলি। ধান কাটার সময় এগিয়ে এল। সমিতি আধিয়ার চাষিদের নির্দেশ দিল, 'আধিয়ারেরা তাদের উৎপন্ন ধান নিজ নিজ খোলানে তোলো। ওই ধানের সুদ দিও না, দিও না তাদের বাজে আদায়।' এত কাল আধিয়ারেরা নিজ নিজ খেতের ধান নিজেরাই কেটে জোতদারের খামারে তুলে দিত। কিন্তু এবার কৃষক সমিতি প্রত্যক্ষভাবে মাধববাবু ও তাঁর সহকর্মীদের পরিচালনায়, সমিতির স্বেচ্ছাসেবকেরাই দল বেঁধে প্রত্যেক আধিয়ারের ধান কেটে যার যার খোলানে (বাড়িতে) তুলে দিল। জোতদারের খামারে এবার আর অনেক ধানের পুঁজি দেখা গেল না। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলের দু-চার দিনের প্রত্যক্ষ করা দৃশ্য আজও মনে পড়ে। এক দিন সকালে দেখলাম, যত দূর দৃষ্টি চলে, খেতের পর খেতে পাকা ধানের স্বর্ণশোভা। পরদিন সকালে সেখানে গিয়ে দেখি ধানশূন্য মাঠের পর মাঠ আকাশে মেশে। বিগত রাতে কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দলবদ্ধ হয়ে ধান কেটে চাষির খোলানে পৌঁছে দিয়েছে। ভাবতেও অবাক লাগে কী শক্তিশালী সংগঠন, মাধব দত্তই এর অন্যতম প্রধান সংগঠক ও পরিচালক।

এই আধিয়ার আন্দোলন, পরিকল্পনা মতো প্রায় পূর্ণ সাফল্যের প্রান্তে পৌঁছেও মর্মান্তিকভাবে ভেঙেচুরে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্বের অতি উৎসাহ ও উত্তেজনার বশে অবিবেচনাপ্রসূত এক কাজের ফলে প্রচণ্ড সরকারি ও পুলিশি উৎপীড়ন কৃষকদের ওপর নেমে এল। শত শত কৃষককর্মী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। গ্রামে গ্রামে পুলিশ সহায় আধিয়ার পরিবারে ত্রাসের সৃষ্টি করল জোতদারেরা। প্রায় পুরুষ শূন্য গ্রামগুলিতে আতঙ্ক ও হতাশা নেমে এল। আধিয়ার আন্দোলনের সুফল সাময়িকভাবে অনাদায়ী হয়ে রইল।

নেতা মাধববাবুও গ্রেপ্তার হলেন। জামিনে মুক্ত হলেও তাঁর মোকদ্দমার দিন ছাড়া অন্য দিনে তাঁর জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। শিলিগুড়িতে (দার্জিলিং জেলা) বন্ধুগৃহে মাধববাবু আশ্রয় নিলেন।

জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের কর্মীদের আসার আগেই মাধববাবুর দেশপ্রেমিক সংগ্রামী মন অনুশীলনে'র বিপ্লবী রাজনীতি থেকে গণ আন্দোলনের পথে মার্কসবাদী শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ ও কর্মের শিক্ষা নিয়েছিল। এই শিক্ষা তিনি নিয়েছিলেন ১৯৩২-৩৭ সন পর্যন্ত বহরমপুর জেলে বন্দি থাকাকালে। ওঁর দেশপ্রেম ও রাজনীতিক বিশ্বাসের মধ্যে কোনও ফাঁকি ছিল না। তাই তিনি নিজ বিশ্বাস ও কাজকে একই সূত্রে বেঁধে শ্রেণী সংগ্রাম সংগঠনের কাজে ব্রতী হতে কৃতসংকল্প ছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হবে বলে, তিনি স্বর্গত খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কংগ্রেসের কাজ করার আহ্বানে সাড়া দিতে দ্বিধা করেননি। তাঁর মার্কসবাদী আদর্শে ও নিজের ওপর বিশ্বাস এমন প্রবল ছিল যে তিনি জানতেন, কংগ্রেসের পাঠ সংযোগ কার্যক্রমের সুযোগ নিয়ে কৃষকদের কাছে পৌঁছতে পারলে, তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ

করে তাঁদের নিজস্ব শ্রেণীসংগ্রামে নিয়ে আসতে পারবেন। পেরেছিলেনও।

মাধব দত্তের ধ্যানজ্ঞান ছিল মার্কসবাদ। সুযোগ পেলেই তিনি যত্রতত্র এই তত্ত্বের অবতারণা করতেন। উৎসাহের প্রাবল্যে অনেক সময় তিনি স্থান-কাল-পাত্রের অনুপযোগিতা বিচার না করেই, মার্কসীয় তত্ত্বের সোচ্চার ব্যাখ্যায় মেতে উঠতেন। এরূপ দু'-একটি ক্ষেত্রে আমি মাধববাবুকে শেষপর্যন্ত অপ্রস্তুত হতেও দেখেছি। ব্যাপারটা বোঝার পর অবশ্য তিনি অপ্রস্তুতের হাসি হেসে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতেন। আমার মনে হয়, জীবনের শেষ সুস্থ দিন পর্যন্ত বোধহয় মাধববাবু, তাঁর এই সবাইকে মার্কসীয় তত্ত্ব বোঝাবার ও প্রচারের অভ্যাস ছাড়তে পারেননি।

জলপাইগুড়ি থেকে বহিষ্কৃত মাধববাবু শিলিগুড়ি থাকাকালে একটি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন যার ফল ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে, তার ইতিহাসের পাতায় অনুল্লেখিত থাকবে না।

শিলিগুড়ি থাকার সময়ও মাধববাবু তাঁর স্বভাবমতো যেখানে সেখানে তাঁর মার্কসবাদের তত্ত্ব আওড়াতেন। এক দিন চায়ের দোকানে মার্কসবাদ ব্যাখ্যার সময় এক চা-পায়ী তাঁকে জানালেন, শিলিগুড়ি কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেশ্বরবাবুর পুত্রও তো এই সব কথাই বলে থাকে। মাধববাবু কালবিলম্ব না করে বীরেশ্বরবাবুর পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করে জানলেন যে, সত্যিই ইনি মার্কসবাদ পড়াশুনো করেছেন এবং এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। তখন মাধববাবু তাঁকে বললেন, 'তত্ত্ব তো জানেন, কিন্তু কী ফল যদি আপনার এই তত্ত্বজ্ঞান আপনি কাজে প্রয়োগ না করলেন। আপনার তো কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত।' ব্যক্তিটি উত্তর দিলেন, সে সুযোগ তিনি পাচ্ছেন কোথায়? কমিউনিস্ট পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করতে তিনি খুবই উৎসুক। সে সময় বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির দুই জেলা নেতা বোদা-পচাগড়-দেবীগঞ্জ অঞ্চলে কৃষক সংগঠনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

মাধববাবু ব্যক্তিটির আন্তরিকতা বুঝে তাঁকে সেখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। পরপর মাপববাবুর সংকেতসূত্র অনুসরণ করে ওই ব্যক্তি, দেবীগঞ্জে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন। ইনিই হলেন পরবর্তীকালের নকশালবাড়ি তথা নকশাল আন্দোলনের স্রষ্টা চারু মজুমদার। চারুবাবুর ব্যাখ্যাত মার্কসীয় তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ অযথার্থ প্রমাণিত হলেও, তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসসম্মত তত্ত্বানুসরণে নিষ্ঠা ও সংগঠন দক্ষতার জন্য তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবশ্যই উল্লেখিত থাকবেন।

আধিয়ার আন্দোলনের পর জলপাইগুড়ি জেলায় কৃষক সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আন্দোলনে ভাটা পড়ে। এই সময় বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির দুই জেলা নেতা নরেশ চক্রবর্তী ও ড. শচীন দাশগুপ্ত গোপনে কৃষকদের মধ্যে কাজ করে কৃষক আন্দোলনকে আবার শক্তিশালী করে তোলেন। জলপাইগুড়ি জেলার আধিয়ার কৃষক পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর ও রংপুর জেলার কৃষকদের সঙ্গে 'তেভাগা' আন্দোলন শুরু করলেন। যে কৃষকশ্রেণী কয়েক বছর আগে 'কর্জা ধারের সুদ নাই, বাজে আদায় বন্ধ', ও আন্দোলনে পূর্ণ সফলতা পায়নি, তাঁরাই এবার 'তে-ভাগা' আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেবীগঞ্জ থানার এই তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মাধব দত্ত। এই তে-ভাগার দাবিতে সর্ব প্রথম ধান কেটে নিজ খোলানে তোলার জন্য সুন্দরদিঘি ইউনিয়নের বিদ্যা বর্মণের খেত নির্দিষ্ট হয়েছিল। স্থির হয়েছিল মাধববাবুই এর নেতৃত্ব দিবেন। ধানকাটা শুরু হতে না হতেই সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে এসে জোতদার, ধানকাটি মেয়েদের ওপর হামলা করল। মাধব দত্ত আহত হয়ে গ্রেপ্তার হলেন। নেতার গ্রেপ্তারে দেবীগঞ্জে তে-ভাগার আন্দোলন তীব্র আকার নিয়েছিল এবং

কৃষকেরা জয়যুক্তও হয়েছিলেন।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতা এল। দ্বিখণ্ডিত হল ভারত। এই সময়ে মাধব দত্ত ছিলেন বোদা-পচাগড় অঞ্চলে কৃষক সমিতির কাজে রত। এ অঞ্চল পাকিস্তানের মধ্যে পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে নির্যাতিত হলেন। নানা ছল-ছুতায় দীর্ঘকাল এই জেলবাসের পর মুক্ত হয়ে মাধব দত্ত ফিরলেন জলপাইগুড়িতে, তাঁর প্রিয় কৃষকদের কাছে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কৃষকদের কাজেই যুক্ত ছিলেন। মাধব দত্ত জলপাইগুড়ি জেলায় কৃষক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তখন গরিব কৃষকেরা নিজের শ্রমে উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশও ঘরে নিতে পারতেন না। দিনমজুর কৃষকদের মজুরি ছিল যৎসামান্য, তার ওপর জোতদারদের জন্য বেগার খাটাও ছিল অহরহ বিনা মজুরিতে। ফলে বৎসরের বেশি দিনই এঁরা কাটাতেন অর্ধাহারে অনাহারে। মাধববাবুর নেতৃত্বে যে কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তারই পরিণতিতে, আধিয়ার কৃষকেরা ঘরে তুলছেন উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ, দিনমজুরি আজ অনেক গুণ বেড়েছে, বেগার খাটানো বন্ধ হয়েছে। ফলে সাধারণ কৃষকের পুরা বৎসরের খোরাকি সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চয়তা এসেছে। তাই সংগ্রামী মাধব দত্তের মৃত্যুর পরও সংগ্রামী মানুষের মনে নিশ্চয়ই তিনি বেঁচে থাকবেন।

সংগ্রামী মাধব দত্তকে আমরা চিনি, জানি। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন? এখানেও তাঁর বিরল ব্যক্তিত্ব। মার্কসবাদে বিশ্বাসী বা কমিউনিস্ট কর্মী অনেক মধ্যবিত্ত বিত্তবান আছেন, যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামে নিযুক্ত। কিন্তু এঁদের মধ্যে কয়জন মনে প্রাণে, জীবনচর্যায় নিজেদের শ্রেণীচরিত্র থেকে সরে আসতে অর্থাৎ declassed হতে পেরেছেন? নজরে পড়ছে তেমন কাউকেই এক মাধব দত্ত ছাড়া। তিনি নিজের মধ্যবিত্ত সুলভ চরিত্রই হারাননি, তিনি এমন এক ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়েছিলেন, যে ব্যক্তিত্বের ধর্ম মানুষমাত্রকেই ভালবাসা। যাঁর কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম নিত্য সত্য। শোধিত বঞ্চিতের হয়ে সংগ্রাম যেমন ছিল জীবনের ব্রত। তেমনি মানুষমাত্রকেই ভালবাসা ছিল তাঁর হৃদয়ের ধর্ম। কুঁড়ে ঘরের দরিদ্র আর প্রাসাদের ধনী সবার ভাগেই তাঁর সৌহার্দ্য লক্ষ করেছি। ওঁর মতবাদে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকেও ওঁর প্রশংসা করতে শুনেছি। আমি নির্দ্বিধায় নির্দ্বিধায় বলতে পারি এই শ্রেণীসংগ্রাম-নিষ্ঠ মানুষটিকে ভালবাসত না, শ্রদ্ধা করত না, এমন কাউকেই আমার চোখে পড়েনি।

মাধব দত্ত আর আমাদের মধ্যে নেই এ কথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য তিনি ছিলেন এবং আমাদের মধ্যেই ছিলেন। যে থাকা মন থেকে কোনওক্রমেই মুছে ফেলা যায় না। আমরা কল্পনা করতে পারি, বাল্যে ও কৈশোরে, তাঁর খেলাধুলোর বয়সে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিজের ও তাঁর সমুখের অগণিত 'কষ্টের সংসার'। সেখানে 'অন্ন, প্রাণ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরমায়ু' চাই। তখনই তিনি কৃতসংকল্প হয়েছিলেন 'জনতার মাঝখানে' বেরিয়ে আসতে, তাদের হয়ে, তাদের জন্য অন্ন-প্রাণ-পরমায়ু লাভের সংগ্রাম করতে। কারণ, স্বার্থমগ্ন হয়ে 'বৃহৎ জগৎ হতে' বিমুখ থাকা তো তাঁর পক্ষে জীবন্মৃত থাকা। তাই তিনি দুঃখকর, কণ্টকময় জীবনপথে চলেছেন, মৃত্যুকে শঙ্কা করেননি। এই মাধব দত্তকে আমরা চিনেছি, জেনেছি। তাই আমরা তাঁকে ভুলিনি এবং ভুলব না।

জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক আন্দোলন ও তেভাগা

হরপ্রসাদ ঘোষ

জলপাইগুড়ি জেলার বোদা, পচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানার কৃষক আধিয়াররা ছিল পুরোপুরি জোতদারদের অধীনে। এদের বসত বাড়িগুড়ি ছিল ওই সব জোতদারদের বাড়ির আশেপাশে। জোতদারদের বাড়ির কাছাকাছি খেতে এরা বিভিন্ন রকমের শাক সবজির চাষ করত। এই সব উৎপাদিত তরিতরকারি ওই সব এলাকার বিভিন্ন হাটে এরা বিক্রি করতে যেত। বিভিন্ন হাট ও বাজারগুলি বসত মূলত জমিদারদের জায়গায়। ওই সব জমিদারদের সহায়তায় হাটের ইজারাদার ও ঝাড়ুদারেরা কৃষকদের কাছ থেকে তোলা আদায় করত। এই তোলার হার ছিল অত্যধিক। কোনও কৃষক তোলা দিতে অস্বীকার করলে তার ওপর নানা রকম শারীরিক নির্যাতন ও ভয় প্রদর্শন চলত। এই অবস্থায় প্রথম প্রথম কৃষকরা কোনও কিছু করতে ভয় পেত এবং তোলাও তারা দিত।

তোলাগণ্ডি আন্দোলন:

১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে কৃষক সমিতির পরিচালনায় বোদা, পচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানার বিভিন্ন হাটে তোলাগণ্ডি বন্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। প্রধানত বোদা থানার অন্তর্গত ময়দানদিঘি, বোদা, পাঁচপীর, সাঁকোয়া প্রভৃতি হাটে এই আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে সঙ্গে দেবীগঞ্জ থানার কালিয়াগঞ্জ হাট ও পচাগড় থানার হাটগুলিতেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতি হাটে জমিদারের ইজারাদার ও ঝাড়ুদারদের কাছ থেকে তোলা আদায়ের অত্যধিক জুলুম শুরু হওয়ার ফলে কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। কৃষকদের কাছ থেকে তোলা আদায়ের এই জুলুম ও অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার ফলে এর বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধ হতে থাকে। কৃষকরা বুঝতে পারে যে নিজের ভিটায় তৈরি জিনিসে তারা তোলা দেবে কেন? এই অবস্থায় হাটে হাটে কৃষকেরা ছোটখাটো জিনিসের তোলা দিতে অস্বীকার করে। ওই সময় তোলার হার ছিল টাকায় এক পয়সা অথবা ইজারাদার সমস্ত দোকানে দোকানে চার আনা বা দুই আনা টিকিটের মতো এক ধরনের কাগজ তোলা আদায়ের জন্য দিয়ে, পরে হাট শেষে ওই পয়সা তুলে নিয়ে যেত। কিন্তু কৃষকদের দৃঢ়তায় এই পর্যায়ে বিনা শুল্কে তোলা আদায়, কিছু কিছু আপস হয়ে যায়। বিনা সংঘর্ষে। এখানে উল্লেখ্য যে, তোলাগণ্ডি আন্দোলন শুরুর সময়ে ময়দানদিঘিতে পার্টির অফিস খোলা হয়। এর সঙ্গে লাগোয়া গ্রাম লাঙল গাঁও, সেখানেও খোলা হয় আর একটি অফিস। ওই সব থানা এলাকায় এই দুটি শাখা ছিল পার্টির মূল কেন্দ্র।

বোদার সামনে দক্ষিণে এক মাসব্যাপী শুরু হত কালীর মেলা, যেখানে দিনাজপুর জেলা ছিল অবস্থিত। ওই মেলায় বিক্রি হত প্রচুর গোরু ও মহিষ। এখানে গোরু ও মহিষের লেখাই

খরচের হার ছিল অত্যধিক। কৃষক সমিতির পরিচালনায় ওই মেলায় ভলান্টিয়ার নিয়ে তোলা আদায়ের বিরুদ্ধে হাট মিটিং শুরু হয়। পরে ওই ভলান্টিয়ার নিয়ে দোকানে দোকানে পিকেটিং হয়। এই অবস্থায় মেলায় বিক্রেতারা জমিদারকে তোলা দিতে অস্বীকার করে। ফলে মেলা ভেঙে গিয়ে কাছাকাছি নদীর অপর পারে বসানো হয় এবং সেখানে তোলা আদায় বন্ধ হয়ে যায়।

বোদা, পাঁচপীর, ময়দানদিঘি, দেবীগঞ্জ থানার কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি হাট ছিল তোলাগণ্ডি আন্দোলনের মূলকেন্দ্র। ওইসময় কৃষকেরা দলে দলে কৃষক সমিতির সদস্য হতে শুরু করে এবং তোলা দিতে অস্বীকার করে। ১৯৩৯ সালের গোড়া থেকে শুরু হয়ে ১৯৪০ সালের শেষ নাগাদ এই আন্দোলনের সমাপ্তি হয়। আন্দোলনের ফলে কৃষকেরা হাটে বা মেলায় আর কোনও তোলা দিত না। কৃষকদের তোলা আদায় বন্ধের দাবি সাফল্য লাভ করে।

এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শচীন দাশগুপ্ত, নরেশ চক্রবর্তী, গুরুদাস রায়, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, পরিমল মিত্র, রাধামোহন বর্মণ, ইন্দ্রমোহন বর্মণ, উমেশ রায়, উদয় বর্মণ, বিদ্যাধর বর্মণ, কিশোরী বর্মণ প্রমুখ। শহরের ছাত্রফ্রন্ট থেকে এসেছিলেন অবনী তলাপাত্র, সত্যেন মজুমদার (পানু মজুমদার), গোবিন্দ কুণ্ডু, বিমল হোড় প্রভৃতি। দিনাজপুর ও রংপুর থেকে আন্দোলনে সহযোগিতার জন্য এসেছিলেন গুরুদাস তালুকদার, অবনী বাগচী ও দীনেশ লাহিড়ী।

আধিয়ার আন্দোলন:

তোলাগণ্ডি আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে আধিয়ার আন্দোলন শুরু হয়। সালপর্ব ১৯৪০—৪১। পাঁচপীর, সাঁকোয়া, লাঙলগাঁও, বোদা, ময়দানদিঘি প্রভৃতি এলাকায় এই আন্দোলন ব্যাপ্তি লাভ করে। এখানকার জোতদাররা কর্জধান বাবদ আধিয়ার কৃষকের কাছ থেকে অতিরিক্ত সুদ নিত। এক মন ধান কর্জ নিলে দেড়মন দিতে হত। সাধারণত রোয়া গাড়ার সময় এক মন আধ মন সুদে আধিয়াররা এই কর্জ নিত। কিন্তু ধান উঠলে যেহেতু কাঁচা ধান তাই তার বাবদ আরও দশ সের অতিরিক্ত ধান দিতে হত। কারণ, কাঁচা ধান শুকিয়ে যাবে এই মর্মে আরও দশ সের। অর্থাৎ দেড় মনেরও অতিরিক্ত সুদ। এছাড়াও ছিল আরও বিভিন্ন ধরনের সুদ। যেমন, উঠান চাঁছানি: আধিয়ার জোতদারের উঠানে যে জায়গায় ধানের পুঁজি এবং ধান মাড়াই করবে, ওই জায়গাটি চেঁছে পরিষ্কার করতে হত। এই পরিষ্কারের জন্য জোতদারের যে মাটি ঘাটতি হত তা পূরণের জন্য আধিয়ারকে সুদ দিতে হত। এই সুদের পরিমাণ ছিল একমন ধানে একসের। গোলা বাঁধানি: ধান যে গোলাতে রাখবে অর্থাৎ গোলা তৈরি বাবদ যে খরচ তাও আধিয়ারকে দিতে হত। এখানেও এক মন ধানে এক সের। ধানের ধূলা: আধিয়ার জোতদারের সামনে যে ধান ঝাড়াই করছে, এরজন্য জোতদারের নাকে-মুখে গায়ে যে ধুলো যাচ্ছে তাতে জোতদারের সর্দি-কাশি হবে। এই সর্দি-কাশির চিকিৎসাবাবদ সুদ। ওই এক মন ধানে এক সের। হাতি, হাঁস ও মুরগি তাড়ানোর খরচ: ধান রক্ষায় হাতি তাড়াবার জন্য জোতদারকে বন্দুক সেলামি দিতে হত। এর সঙ্গে ছিল হাঁস ও মুরগি তাড়ানো বাবদ খরচ। এখানেও আধিয়ারকে দিতে হত এক মন ধানে এক সের।

এই সব হরেক রকম সুদের চাপে আধিয়ার তার প্রাপ্য ধান থেকে সম্পূর্ণ সুদ শোধ করে জোতদারের কাছ থেকে একরকম শূন্য ডালা নিয়ে বাড়ি ফিরত। জোতদারদের এই সব

বাজে আবওয়াব যে অন্যায্য, কৃষক সমিতির উদ্যোগে আধিয়ারদের বোঝানো হয়। দিনের পর দিন জোতদার এই অত্যাচারের হার বাড়িয়ে দিলে আধিয়ারের উৎপাদিত ফসলের আর কিছুই থাকবে না। আধিয়ারের চোখে আঙুল দিয়ে এ সব দেখানো ও বোঝানো হয় এবং এর বিরুদ্ধে জোর প্রচার, মিছিল, মিটিং শুরু হয়। ওই সময় কৃষক সমিতিতে ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বেড়ে যায়। প্রচার করা হয় যে আধিয়ার নিজ খোলানে ধান তুলবে এবং দশ সেরের বেশি ধান সুদ দেবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, '৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর কর্জ ধানের সুদের চরিত্র বদলে যায়। একে বলে 'কড়ারি'। অর্থাৎ আধিয়ার যখন ধান কর্জ নেয় তখন বাজারে বছরে সবচেয়ে বেশি ধানের দাম থাকে। এই ধান যখন আধিয়ার কর্জ নিচ্ছে, জোতদার তখন ধানের পরিবর্তে ধানের মূল্য লিখে রাখছে। যেমন, আধিয়ারের এক মন ধানের প্রয়োজন। জোতদার চালাকি করে আধিয়ারকে বলে যে, 'এখন তো ধান নেই, পরশু দিন আসিস।' আধিয়ার পরশু দিন এলে জোতদার বলে, 'আমার তো ধান ছিল না, খামারে ধান কিনে রেখেছি তার থেকে এক মন দিচ্ছি। এর বাজার মূল্য ৬০ টাকা।'

তাই যখন ধান উঠবে, জোতদার তখন কৃষকের কাছ থেকে ধানের পরিবর্তে হয় নগদ টাকা নইলে, তিন মন ধান আধিয়ারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। কারণ, তখন বাজার দর ছিল ৬০ টাকা। নতুন ২০ টাকা। তাই এক মনের পরিবর্তে তিন মন নিয়ে নেওয়া। একেই বলে 'কড়ারি'।

মাঠ থেকে ধান কেটে আধিয়াররা জোতদারের খোলানে না রেখে, নিজ খোলানে ধান তুলতে শুরু করে। ফলে সংঘবদ্ধ হয়ে ও পুলিশের সাহায্যে জোতদাররা আধিয়ারদের এই আন্দোলন দমন করবার চেষ্টা করেন। ওই সময় কিছু ঘটনা ঘটে। জোতদাররা সদরে গিয়ে এস. ডি. ও'র কাছে তাদের অভিযোগ জানায়। অভিযোগমতো এস. ডি. ও. পুলিশসহ ঘটনাস্থলে আসে। আধিয়াররা মনোবল দৃঢ় রাখে এই ভেবে যে জোতদারদের সহায়তায় এস. ডি. 'ও পুলিশসহ খোলান ভাঙতে আসছে। ঘটনাস্থলে এস. ডি. ও এসে আধিয়ারদের বলে যে, নিজের বাড়িতে ধান না তুলে জোতদারের বাড়িতে তুলবে এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কর্জ ধানের সুদ দেবে। এ ঘটনায় পাঁচপীরে কৃষকদের সঙ্গে এস. ডি. ওর কথা কাটাকাটি হয়। ফলে, ঘটনাস্থলে ভলান্টিয়াররা এস. ডি. ওর গাড়িটি উলটে ফেলে দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বোদা, পচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানায় ব্যাপকভাবে গণ অ্যারেস্ট শুরু হয়। আনুমানিক শতাধিক কৃষক অ্যারেস্ট হয়েছিল। প্রথম দিকে কৃষকরা খুবই সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু পরের দিকে, মিথ্যা মামলা ও হয়রানির ফলে এদের মনোবল কিছুটা কমে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই সব কৃষক কর্মীদের সহকর্মীর প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতি বোধ ছিল প্রবল। এক জন অ্যারেস্ট হলে তার পরিবারের লোকজনকে দেখাশুনো করার বা কী করে তাকে ছাড়ানো যায়, সেদিকে তাদের লক্ষ ছিল অটুট। এই আন্দোলনে মহিলা কৃষক কমরেডদের অবদানের কথা ভুলবার নয়। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা জানাই।

এক দিন কোর্ট থেকে ফেরার পথে পঁয়া বর্মণ নামে এক কৃষক কমরেড পথে চিড়ামুড়ি সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী বেরুবাড়ি আর পচাগড়ের মাঝামাঝি বিশমোহনীর জঙ্গল, যেখানে সাধারণত আত্মগোপনকারী কৃষক কমরেডরা আশ্রয় নিতেন, সেখানে ঢুকে পড়েন। জঙ্গলে ঢুকে একটি বাঘকে কম্বলাবৃত কমরেড মনে করে তাকে বলেন যে, 'চিড়া মুড়ি খা'। তখন বাঘটা তাঁকে আক্রমণ করে। বাঘের সঙ্গে মারামারি করে সৌভাগ্যক্রমে কমরেডটি

কোনওক্রমে বেঁচে যান।

জলপাইগুড়ি শহরের স্থানীয় উকিল মোক্তারদের দিয়ে ওই সময় একটি লিগাল এইড কমিটি গড়ে ওঠে। এঁরাই ওই সব কমরেডদের মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। কমরেড বীরেন বসু, সন্তোষ সরকার, বীরেন নিয়োগী, দুলালবাবু, উপেন সরকার, পরেশ মিত্র, অনিল মুখার্জি, সমর গাঙ্গুলী, বীরেন পাল, চারু মজুমদার প্রমুখরাও অন্যান্য নেতৃমণ্ডলীর সঙ্গে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ধরণী বর্মণ, ডুলিয়া বর্মণ, বিদ্যাধর বর্মণ, দীননাথ বর্মণ, এঁদের বীরত্বও ভুলবার নয়।

আধিয়ার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে কৃষক সমিতির সঙ্গে সরকারের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনান্তে স্থির হয় যে দশ কাঠা ধানে (এক মন) দশ সের সুদ দেওয়া হবে অর্থাৎ মোট পঁচিশ শতাংশ। এই সিদ্ধান্ত কৃষক সমিতি মেনে নিয়ে একটি লিফলেট প্রকাশ করে তা কৃষকদের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করে। '৪২ সালের গোড়ার দিকে এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সাল:

এই সময় জলপাইগুড়ি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পার্টি, নন-পার্টি নিয়ে পিপলস রিলিফ কমিটি গড়ে ওঠে। দেবীগঞ্জ, বোদা, পচাগড় প্রভৃতি এলাকায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। রিলিফের কাজে সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ও মিটিং মিছিলে গান গাওয়ার জন্য একটি সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠিত হয়। ওই সময় কমরেড রাধানাথ দাসের রচিত দুর্ভিক্ষের গান গ্রামগঞ্জে সাড়া ফেলে।

'পঞ্চাশ লক্ষ দ্যাশের লোক
সই বান্না পারে ভোক
চোখ মুন্দেছে চিরদিনের তানে
কারও হইছে ওলাওঠা,
কারও হইছে পেট মোটা
কাহ্ মইছে নিমনিয়ার বানে।'

অন্যত্রে, ছাওয়া পাওয়া মরিল
বৌ বেটি ইজ্জর দিল
পুরা পেটের জ্বালায়রে জ্বল্যো।'

অন্যত্রে, 'যায় খায় নাই টিপটিপানির ঘাঁও
তার আগং টিপ টিপাও
একবার উঠে দিনু মুই
জেঠ মাসের বাণে
হাড়ি বেটা বেছাইয়া খালে মোক্
আধ কাঠা ধানে
ধূলায় লটপট করি কাটিল কানকাশা
চিলা বেটা দেখালে মোক্ স্বর্গ মর্ত্য তামাশা।'

ধানের কন্ট্রোল রেট চালু করার জন্য গ্রামে গ্রামে গণ মিছিল বের হয়। বোদা থেকে আড়াইশো তিনশো পুরুষ মহিলা কৃষক কমরেড প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার

সারারাত্রি পায়ে হেঁটে, কখনও গোরুর গাড়িতে করে শহরে এসে ডি. সি.-র কাছে ডেপুটেশন দেয়। ডি. সি. দ্রব্যমূল্যের কন্ট্রোল রেট কার্যকরী করতে অক্ষমতার কথা জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক সমিতি থেকে হুঁশিয়ারি করে বলা হয় যে, দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত মূল্য তারা চালু করবে এবং এর জন্য গ্রামগঞ্জে প্রচার, মিছিল, মিটিং পুরোদমে শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, ওই সময় জলপাইগুড়ি জেলায় ধানের মন ছিল ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ টাকা আর সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্য ছিল পনেরো টাকা, কিন্তু তা ছিল কাগজে কলমে। এই ছিল তেভাগা আন্দোলনের আগের পরিস্থিতি।

কন্ট্রোল রেট কার্যকরী করার প্রয়াস:

কৃষক সমিতি থেকে ঠিক করে দেওয়া হয় যে, এক একটি নির্দিষ্ট দিনে লালঝান্ডা ও লাঠিসহ এক হাজার করে ভলান্টিয়ার পচাগড় থানায় উপস্থিত হয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানাবে। এই অবস্থার পরে পচাগড় হাটে লাঠিধারী ভলান্টিয়ার দিয়ে সমস্ত হাটটিকে ঘিরে ফেলা হয়। ফলে ওই হাটে ধান চালের দোকানদারেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ওইদিন হাটে নিয়ন্ত্রিত মূল্য কার্যকরী করা না গেলেও, ধানের মূল্য পঁচিশ-ছাব্বিশ টাকায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়। ফলে পরের হাটে আর ধান ওঠে না। ওই অবস্থায় কৃষক সমিতির দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে গোলা অভিযান শুরু করে। তারা গোলার ধান গৃহস্থের খাবার মতো রেখে, বাকি ধান নিয়ন্ত্রিত দামে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ধানের ওই নিয়ন্ত্রিত মূল্য জোতদারকে দিয়ে, তার নিকট থেকে রসিদ লিখে নেওয়া হত। প্রতিদিন রাত্রি জেগে শয়ে শয়ে ভলান্টিয়ার বিপুল উৎসাহে তিন-চারটি করে গৃহস্থের গোলার ধান নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বন্টন করে দিত। এই সাফল্যে কৃষকদের মনে আশার আলো জেগে ওঠে।

এর পরবর্তী সময়ে ফুলবাড়ির নিকটে গলেহার মাঠে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কৃষকের সমাবেশ করা হয়। ওই সভায় কমরেড ভবানী সেন বক্তব্য রাখেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে যে সব কমরেডরা থাকতেন, তাঁরাও ওই সময় বিভিন্ন জায়গায় মিছিল, মিটিং করতেন। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করতে সাহস পেত না। এমনও দেখা গেছে যে, কোনও কমরেড হয়তো বাসে করে অন্যত্রে যাবে, রাস্তায় রয়েছে, বাসে পুলিশ না থাকলে ড্রাইভার বাস থামিয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিত। পচাগড় থানার দারোগাও কখনও গোপন সংবাদ দিয়ে জানাত, কোন কমরেডের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে। পচাগড় এলাকার পানিমাছ পুকুরির মধ্যবিত্ত জোতদার প্রিয়গোপাল দে এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ওই এলাকার সচ্ছল কৃষক কান্দুরা মহাম্মদ, মহেন্দ্র বর্মণ, চুটুম বর্মণ এঁরাও আন্দোলনে সহযোগিতা করেন।

দুর্ভিক্ষের পর পরেই জলপাইগুড়িতে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে এসেছিলেন খোকা রায়, রেবা রায়, শচীন ঘোষ, কৃষ্ণবিনোদ রায়, আবদুল্লাহ রসুল, মনসুর হাবিব (দেবীগঞ্জ থানার শিবের হাটের কৃষক সভায় ভাষণ দেন), বঙ্কিম মুখার্জি প্রমুখ। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলা কর্মীরা হলেন শিখা নন্দী, কল্যাণী দাশগুপ্ত, অমিয়া নন্দী, কল্পনা নিয়োগী প্রভৃতি।

তেভাগা সংগ্রাম:

৪৫ সাল থেকেই তেভাগার প্রচার কৃষকের মধ্যে ব্যাপকভাবে শুরু হতে থাকে। কৃষকরা

ক্রমশই সংঘবদ্ধ হয়ে নেতৃস্থানীয় কমরেডদের তে-ভাগার জন্য নিজ নিজ অঞ্চলে আহ্বান জানায়। এই সময় শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পচাগড় অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাতরা যেমন, ঝুমাই, সাঁতাউ, উমের আলী এরাও তেভাগা আন্দোলনে যোগ দেন। এদের সামনে জোতদারের লাঠিয়ালরা দাঁড়াতে ভয় পেত। ১৯৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আন্দোলন এতই ব্যাপকতা লাভ করে যে, কোনও জায়গায় নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়নি। কৃষকরা নিজেরাই আন্দোলন পরিচালনা করে। ওই সময় প্রত্যেকদিন পানিমাছ পুকুরির হরিমন্দিরে কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হত। কে কোথায় তে-ভাগা করতে যাবে, ওই সভা থেকে সে সব পরিকল্পনা রূপায়িত হত। ওই সভাগুলি পরিচালনা করতেন কমরেড চারু মজুমদার, বীরেন পাল, লেখক স্বয়ং প্রমুখ। দিনের পর দিন আন্দোলনের ফলে গোপন জীবনযাপন করার নির্দেশ কমরেডরা মেনে চলতেন। এমনও হয়েছে করতোয়া নদীর এপার ওপারে হয়তো অনেক কমরেড বন্ধু রয়েছেন, কিন্তু কেউ কারও নিশানা পেতেন না, এতই গোপনীয়তা ছিল।

আমলাহার ২ নং ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হরেন বর্মণের জমিতে তে-ভাগা করতে গিয়ে কৃষকরা বাধাপ্রাপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত কৃষকদেরই জয় হয়। ৫ নং ময়দানদিঘি ইউনিয়নের মঙ্গলু মহাম্মদের জমিতে তে-ভাগা করতে গেলে, কৃষকদের ওই একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে জোতদার পক্ষের এক মহিলা, লেখককে গুপ্তি নিয়ে আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলে তাকে ধরে ফেলা হয়। কৃষকদের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত জোতদার পক্ষের লোকজনেরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং যথারীতি জমির ফসল তে-ভাগা হয়। ময়দানদিঘির জোতদার মহাম্মদ কাবাৎ। এর জমিতে তে-ভাগা করতে গেলে কাবাৎ বন্দুক নিয়ে বের হয়ে আসে। কিন্তু কৃষকদের চাপে পড়ে সে পালিয়ে যায় এবং এতই ভয় পেয়ে যায় যে, তেভাগার সংগ্রামী কৃষক দেখলেই বলে উঠত 'যদি বা চেঁচাবেন (বা মানে বাবা), হাল গোরু বেচাবেন'।

বোদা থানার ৬ নং শালসিঁড়ি ঝলই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের জমিতে তে-ভাগা করা যায়নি। তিনি চ্যালেঞ্জ দেন। চ্যালেঞ্জ দেবার কারণ হল, ওই অঞ্চলের বহু কৃষক কর্মী ও কৃষক নেতাদের তিনি নিঃস্বার্থভাবে টাকা পয়সা ঔষধ ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করতেন। প্রাদেশিক কৃষক নেতারা এলে তিনি তাঁদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, আমার জমিতে তে-ভাগার জন্য কোনও কৃষককেই লাগানো সম্ভবপর হবে না। ভাল ব্যবহারের জন্যই কোনও কৃষক তাঁর জমিতে তে-ভাগা করতে যায়নি।

পচাগড় থানা ও সীমান্তবর্তী সদর থানার যেমন মানিকগঞ্জ, হরিমন্দির প্রভৃতি এলাকায় তেভাগা সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে। এখানে পুলিশ বাহিনী কৃষক কমরেডদের গ্রেপ্তার করতে গেলে, মহিলা কমরেড নেত্রী শিখা পালের নেতৃত্বে গ্রামের মহিলারা ঝাঁটা, বটি, গাইন, লঙ্কার গুঁড়ো প্রভৃতি নিয়ে পুরুষদের বাধা দেয় এবং সাময়িকভাবে পুলিশকে পশ্চাৎ অপসারণে বাধ্য করে।

এদিকে সরকারের তরফ থেকে প্রচার করা হয় যে, তে-ভাগা মেনে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তা ছিল এক ধরনের প্রতারণা। এর পরবর্তীকালে স্বাধীনতা এসে যায়।

তরাইয়ের তেভাগা সংগ্রামের কথা

মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত

সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলায় কৃষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সংকটময়। এখানে এক একটি জোতদারকে কেন্দ্র করে কৃষকদের বসবাস গড়ে উঠত। এদের মধ্যে গরিব কৃষক, আধিয়ার এবং দিনমজুরের সংখ্যাই ছিল বেশি। জোতদাররাই ছিল তাদের কর্তা। কৃষকদের যে কিছু চাওয়ার আছে, এ জিনিসটা তারা জানত না। জোতদার দয়া করে যা দেবেন তাই তারা গ্রহণ করত। এদের ছেলেমেয়ে এমনকী বউ তার মালিকও ছিল জোতদার: কবে কোন বাড়ির বউ জোতদারের বাড়িতে রাত কাটাবে, তাও জোতদারই ঠিক করে দিত।

এই অবস্থায় কৃষকদের মধ্যে কোনও বড় আন্দোলন করা সম্ভবপর ছিল না। এর কারণ, কৃষকেরা যে কোনও বড় জিনিস চাইতে পারে, এই বোধ তাদের ছিল না। জোতদাররাই ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার। তাদের বিরুদ্ধে কেউ কোনও কিছু বললে, পুলিশ ও ইউনিয়ন বোর্ড উভয়েরই যৌথ উদ্যোগে কৃষকদের হয়রানি হতে হত। কৃষকের নামে ১০ ধারা ৭ ধারা করে ও পুলিশ দিয়ে তাকে শায়েস্তা করত। তাই যত কষ্টই হোক, কৃষকরা জোতদারের বিরুদ্ধে কোনও কিছু সাহস পেত না।

কৃষকের এই অবস্থা দেখে, কিছু কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন যুবক গ্রামে গিয়ে সভা, মিটিং করতে শুরু করে। গরিব কৃষক আধিয়াররা এদের কথা মন দিয়ে শোনেন; কিন্তু এরা যে জোতদারের বিপক্ষে কোনও কথা বলবে বা কিছু চাইবে, এই ধারণা করতে পারে না। কারণ, জোতদারের দয়ার ওপরেই এরা নির্ভরশীল ছিল।

কৃষক সমিতি প্রথমে ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। যেমন, হাটের গণ্ডি (তোলা) বন্ধ আন্দোলন। এই আন্দোলন শুরু হলে জোতদাররা বাধা দেয় না। জোতদারদেরও এতে নিজের স্বার্থ আছে। কারণ, জোতদাররাই হাটে বেশি মাল বিক্রি করে এবং বেশি গণ্ডি দেয়। এই আন্দোলন করতে গিয়ে কৃষকেবা উপলব্ধি করে যে, তারা কিছু চাইলে কিছু পেতে পারে এবং তাদেরও যে চাওয়ার অধিকার আছে এই বোধ জাগ্রত হয়। কৃষক সমিতি একেই ভিত্তি করে আন্দোলন জোরদার করার চেষ্টা করে।

ময়দানদিঘিতে পার্টির সব সময়ের অফিস খোলা হয়। সেখানে কৃষকদের নিয়ে বৈঠক আলোচনা চলে। গুরুদাস রায়, মাধব দত্ত, লেখক স্বয়ং প্রমুখ কৃষক সমিতিকে শক্তিশালী করার জন্য সচেষ্ট হন। সমিতিতে কাজের তিনটি ভাগ ছিল। মাধব দত্ত ছিলেন প্রচার বিভাগে। তাঁর দায়িত্ব ছিল ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা ও ভলান্টিয়ার নিয়ে হাটে রাস্তায় সর্বত্র শ্লোগান প্রচার করা। গুরুদাস রায় ছিলেন ভাল বক্তা। তিনি কৃষকদের হাসাতেও পারতেন, কাঁদাতেও পারতেন। তাঁর কাজ ছিল মিটিং-এ বক্তৃতা দেওয়া। আর এই লেখকের দায়িত্বে ছিল সংগঠন বৃদ্ধি করা।

১৯৩৯ সালের শেষের দিকে পচাগড় হাট, বোরার হাট, লক্ষ্মীর হাট, কালিয়াগঞ্জের হাট প্রভৃতি হাটে গণ্ডি আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। আন্দোলনের ফলে বোদার হাট ভেঙে দিনাজপুর জেলায় চলে যায়। এই হাটটি ছিল বোদা থানার কাছে। এখানে হাট মালিকের সাহায্যে পুলিশ কৃষকদের ওপর অত্যাচার করে, বিক্রেতাদের মারধোর করে। ফলে কৃষকেরা হাট ভেঙে জলপাইগুড়ি থেকে দিনাজপুরে নিয়ে যায়। কারণ, অন্য জেলার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ গিয়ে দিনাজপুরে অত্যাচার করতে পারবে না। ময়দানদিঘি থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়। উমেশ বর্মণ ও খিজুমদ্দিন এই দুই মাঝারি কৃষক এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়।

কালীর মেলাভাঙা আন্দোলন:

দিনাজপুর জেলা এলাকায় জলপাইগুড়ির বর্ডারে চার মাইল জুড়ে একটা কালী মেলা বসত। ওই মেলার মালিক ছিল এক মুসলমান জমিদার। মেলায় প্রচুর গোরু ও মহিষের আমদানি হত। এখানে পশুর লেখাই খরচের হার ছিল অত্যধিক। গোরুর লেখাই বাবদ দশ টাকা ও মহিষের দরুন পঁচিশ টাকা দিতে হত। এর লেখাই খরচের বিরুদ্ধে কৃষকদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তখন কৃষক সমিতি থেকে গোরু মহিষ লেখাইয়ের খরচ কমানোর জন্য আন্দোলন শুরু হয়। দশ হাজার ভলান্টিয়ার মেলায় নামানো হয়।

জমিদারের কাছারির নায়েব প্রথমে এই আন্দোলনে বাধা দেয়। এতে কৃষকেরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং সমস্ত মেলাটিকে ভলান্টিয়ার দিয়ে ঘিরে ফেলে। নায়েব যখন আর পারল না তখন সে ঠাকুরগাঁর এস. ডি. ও-কে খবর দেয়। এস. ডি. ও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন এবং কাছারিতে বসেন। কৃষক সমিতির নেতাদের ডাক দেন। এস. ডি. ও নেতাদের বলেন যে, 'লেখাই খরচ কমানো হবে না, আপনারা লোকজন নিয়ে চলে যান, নইলে পুলিশ গুলি চালাবে।' নেতারা বলেন, লেখাই খরচ না কমালে আমরা যাব না। তখন এস. ডি. ও বলেন, পুলিশ গুলি করবে।

নেতারা এস. ডি. ও-কে কিছু না বলে চলে আসেন। নেতারা চলে এসে কৃষকদের জানান যে, আমাদের দাবি জমিদার ও গভর্নমেন্ট শুনল না এবং গুলি করার ভয় দেখাচ্ছে। মেলায় প্রচার হয়ে যায়, সরকারের লোক কৃষকদের গুলি করবে। আরও প্রচার হয় যে, সরকার যদি গুলি করে তা হলে মানুষ ক'টা মরবে বলা মুশকিল, যেহেতু গোরু মহিষ বড় বড় সেগুলি মরবে বেশি।

এই প্রচারে কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়ে যায়। কৃষকেরা তখন গোরু, মহিষ নিয়ে মেলা ভেঙে জলপাইগুড়ি এলাকায় চলে আসে। এই ঘটনা দেখতে পেয়ে এস. ডি. ও পুলিশ পাঠান। পুলিশ মেলায় এসে দেখে যে, গোরু মহিষ সব ওপারে চলে গেছে। মাত্র কুড়ি-পঁচিশটা গোরু ও মহিষ আছে। ওই কুড়ি-পঁচিশটা গোরু মহিষের কৃষক মালিক পুলিশ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং গোরু-মহিষগুলিকে জলপাইগুড়ি এলাকায় পাঠাতে শুরু করে। তখন পুলিশ তাদের বাধা দেয়। কৃষকেরা পুলিশকে বলে যে, গোরুতে জল খাবে এবং নদীতে গোরু নামিয়ে একটা মার দিতেই গোরু পার হয়ে ওপারে চলে যায়। এর দরুন একটিও গোরু-মহিষ মেলায় থাকে না। জলপাইগুড়ি জেলার বোদা থানার অন্তর্গত হাজরাডাঙাতে সব গোরু-মহিষ এসে দাঁড়ায়। যারা গোরু-মহিষ কিনতে এসেছিল তারাও ওপারে চলে যায়।

সেখানে কৃষক সভার মিটিং হয়। স্থির হয় যে, এ সব পশুর মালিকদের পয়সার দরকার। এগুলি বিক্রি করতে না পারলে পয়সা পাবে কোথায়? কৃষক সভা সিদ্ধান্ত নেয় যে, সাদা কাগজে রসিদ লিখে বিনা পয়সায় ওদের দিয়ে দেবে। কৃষক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কালিয়াগঞ্জ হাট, লক্ষ্মীরহাট, বোদা ও দেবীগঞ্জ বন্দরে যত সাদা কাগজ ছিল সমস্তই কৃষক সমিতি কিনে নিয়ে এল। কাগজগুলি ছোট ছোট করে কেটে রসিদ তৈরি করে ওই রসিদে গোরু মহিষ বিক্রি হয়ে গেল। মেলাও পনেরো দিন বসে। গোরু মহিষের লেখাই খরচ না দিলেও, যারা ওই সব ক্রয়-বিক্রয় করছে তারা নিজ ইচ্ছাতেই দুই আনা চার আনা করে দিয়ে গেল। এতে প্রায় সাড়ে সাতশো টাকা কৃষক সভা পায়। কৃষক সভার তহবিল হিসেবে ওই টাকা রাখা হয়।

কর্জাধানের সুদ বন্ধ আন্দোলন:

আন্দোলনের ফলে যে দাবি দাওয়া পূরণ হতে পারে কৃষকদের মধ্যে এই বোধ আসতে শুরু করে। জমি আবাদের সময় আধিয়ারকে জোতদার বিছন ও খাবার জন্য ধান দিত। ধান উঠলে দ্বিগুণ হারে ওই ধান তাকে পরিশোধ করতে হত। যদি কেউ পাঁচ মন ধান খেয়ে থাকে তা হলে তাকে দিতে হত দশ মন। এ ছাড়া জোতদারের মেয়ের বিয়ে বাবদ ধান। ধান মাপামাপি ও অন্যান্য কাজের জন্য যে খামার থাকত তার যাবতীয় খরচের জন্য ধান, ইত্যাদি আবওয়াব (কর্জ) জোতদারকে দিতে হত। এ সব ধান দিয়ে আধিয়ার জোতদারের কাছে আবার কর্জ করে ধান নিয়ে গৃহে ফিরে আসত আর তার সুদ হত চক্রবৃদ্ধি হারে। এর বিরুদ্ধে কৃষকেরা আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের ব্যাপকতার দরুন জোতদাররা জলপাইগুড়ির ডি. সি-র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আবেদন করেন। ডি. সি. এ ব্যাপারে এস. ডি. ও-কে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পাঠান।

ঘটনাস্থলে বিপুল পরিমাণে কৃষকের জমায়েত হওয়ায় এস. ডি. ও হাটে গাড়ি থামাতে সাহস পান না। এর ফলে পাঁচপীরে তিনি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকার চেষ্টা করেন। তখন কৃষকেরা রাস্তায় গাড়ি আটকিয়ে তাদের দাবির কথা জানায়। কৃষকদের দাবি তিনি সরাসরি নাকচ করে দেন। এতে কৃষকেরা অত্যন্ত রুষ্ট হয় এবং ধুলাবালি ছিটিয়ে এস. ডি. ও-কে অপদস্থ ও অপমান করে এবং গাড়িটিকে রাস্তার ধারে উলটিয়ে ফেলে দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে কৃষকদের ওপর প্রচণ্ড দমন-পীড়ন নেমে আসে।

জেল বোঝাই করা আন্দোলন:

কৃষকের নামে মিথ্যা মামলার অজুহাতে ধরপাকড় শুরু হয়। সমিতি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কৃষকেরা একত্রিত হয়ে প্রত্যেকেই জেলে গিয়ে জেল বোঝাই করবে। সিদ্ধান্ত মতো প্রতিদিন সকালে কৃষকেরা স্নান করে খেয়ে দেয়ে ময়দানদিঘি হাটের ওপরে এসে থাকে একটি লাল ঝান্ডা উড়িয়ে। পুলিশের গাড়ি এলেই তারা গাড়িতে উঠে পড়ে এবং পুলিশ তাদের জেলখানায় নিয়ে যায়। কয়েকদিনে প্রায় তিনশোর বেশি কৃষক জেলখানায় আসে। ফলে জেলখানার ভিতরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কারণ, জেল কর্তৃপক্ষের এদের ম্যানেজ করার কোনও ক্ষমতা ছিল না। জেলার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ওদের ছাড়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ছাড়ার কায়দা রূপে একটা সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে নিয়ে বলে দিতেন যে, 'তোমাদের বন্ড নেওয়া হল, তোমরা লিখে দিলে যে আর কোনও দিন আন্দোলন করবে

না।' দিন পনেরো পর সব ছেড়ে দেয়। এ ঘটনায় কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ বেড়ে যায়।

আকালের বিরুদ্ধে আন্দোলন:

৫০ সনের আকালে দেবীগঞ্জ ও বোদা থানা ঘাটতি এলাকারূপে চিহ্নিত হয়। জেলায় তখন কর্ডন প্রথা চালু ছিল। এক জেলার জিনিস অন্য জেলায় যেত না। দুর্ভিক্ষের সময় একমাত্র দিনাজপুর জেলা ছিল বাড়তি এলাকা। ওই সময় দিনাজপুরে ঠাকুরগাঁ মহকুমার অধীনে গড়েয়াহাটে বহু ধান চালের আমদানি হত। জলপাইগুড়ি থেকে দুই-একজন ওই হাটে চাল কিনতে যেতেন। দু-এক কেজি চাল ওই হাট থেকে কিনে জলপাইগুড়ি এলাকায় আনতে গেলে পুলিশ ওই চাল তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিত এবং এক পয়সাও ফেরত দিত না। এই অবস্থার কয়েকদিন পরে বিষয়টি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কৃষক সভা মিটিং ডেকে কী করা যায় স্থির করে। সভা থেকে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যে, শয়ে শয়ে কৃষক 'বাংকুয়া' (যা দিয়ে দুদিকে ভার বয়ে নিয়ে যায়) নিয়ে, একসঙ্গে চাল কিনে আবার একসঙ্গে আসবে। যদি পাঁচ-সাতজন পুলিশ পাহারা ও বাধা দেয় তা হলে 'বাংকুয়া' দিয়ে পুলিশকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে কেনা চাল নিয়ে আসবে।

পরের হাটে প্রায় শ'দুয়েক কৃষক চাল কিনতে যায় 'বাংকুয়া' নিয়ে। চাল কিনে নিয়ে আসার সময় পুলিশ বাধা দেয় এবং চাল কেড়ে নিতে চায়। কৃষকেরা তখন বাংকুয়া বের করে পুলিশদের মারাব জন্য তৈরি হয়। ওই দেখে পুলিশেরা পালিয়ে যায়।

বাংকুয়া আইন:

এই অবস্থা দেখে দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ির ডি. সি. কে জানায় যে, আপনার এলাকার কৃষক জেলা কর্ডন ভেঙে জোর করে চাল নিয়ে যাচ্ছে। আপনি এর ব্যবস্থা করুন। জলপাইগুড়ির ডি. সি., এস. ডি. ও সাহেবকে এ খবর দেন। এস. ডি. ও, ডি. সি.-র কাছ থেকে এ খবর পেলে, ওখানে যাওয়া যাবে না বলে তৎক্ষণাৎ জানান। কারণ, মনোরঞ্জন দাশগুপ্তের 'বাংকুয়া' আইন ওখানে চালু হয়ে গেছে। মনোরঞ্জন বাবুর স্বাধীন দেবীগঞ্জে গিয়ে কিছু করা যাবে না। ফলে, পুলিশও সেখানে আসে না। এরপর অনবরত কর্ডন ভেঙে দিনাজপুর থেকে জলপাইগুড়িতে কৃষকেরা চাল আনা নেওয়া করত।

জলপাইগুড়ি জেলার আকালে মৃতের সংখ্যা ছিল, দেবীগঞ্জে—১০ জন, জলপাইগুড়ি সদরে—১০০ জন (স্টেশনের নিকটে আমতলাতে মরে থাকত)। বোদা থানায় ৫ জন ও পচাগড়ে ৭ জন।

তেভাগা আন্দোলনের সূচনা:

আকালের পরে কৃষক সভা মিটিং ডেকে আলোচনা করে যে, কৃষকেরা আকালের অভিশাপ থেকে কী করে মুক্তি পাবে? আলোচনা অন্তে স্থির হয় যে, কৃষকেরা যদি ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পায় তা হলেই তারা বাঁচবে, নইলে মরে যাবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দেবীগঞ্জ, বোদা, পচাগড় থানার কৃষক সমিতিতে আলোচনা হয়। আলোচনা করে জলপাইগুড়ি জেলা কমিটিকে তারা সিদ্ধান্তের কথা জানায়। জেলা কমিটি বিষয়টি প্রাদেশিক কমিটিতে পাঠায়। সেখান থেকে এ বিষয়ে তদন্তের জন্য কৃষক নেতা কৃষ্ণবিনোদ রায়-কে জলপাইগুড়িতে পাঠান। বোদা, পচাগড় ও দেবীগঞ্জ এলাকার কৃষক নেতাদের তিনি

দেখা করার জন্য খবর দেন। কৃষক নেতারা দেখা করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসেন। আলোচনান্তে নিজ নিজ এলাকার কত শতাংশ কৃষক এই আন্দোলনকে সমর্থন করে, তার সঠিক হার দেবার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়। সাতদিন পর দেখা যায়, দেবীগঞ্জে পঁচানব্বই শতাংশ, একেবারে ছোট দিনমজুর থেকে শুরু করে মাঝারি কৃষক পর্যন্ত এই আন্দোলন সমর্থন করে। বোদা থানায় শতকরা চুয়ান্ন জন, পচাগড়ে শতকরা ছাপ্পান্ন জন। এই হিসেব পাঠানোর পরে কৃষ্ণবিনোদবাবু আন্দোলন শুরু করার অনুমতি দেন।

অনুমতি পাবার পর প্রচার, মিছিল, মিটিং ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে শুরু হয়ে যায়। জেলা কমিটি তেভাগার ওপর একটি লিফলেট প্রকাশ করে। এই লিফলেট ডুয়ার্সেও পাঠানো হয়। জোর প্রচার আন্দোলন চলছে। এই সময় রায়গঞ্জ থানার বেলাকোবা এলাকা থেকে এক আধিয়ার হঠাৎ করে জলপাইগুড়ি শহরে কৃষক সমিতিতে আসেন। তিনি সম্পাদককে জানান যে, আপনাদের লিফলেট পেয়ে আমি ধান কেটে নিজ খোলানে তুলেছিলাম। কিন্তু জোতদারের লোক এসে ওই ধান নিয়ে যায়। এখন কী করার আছে?

ওই এলাকায় সংগঠন ছিল খুবই দুর্বল। এই পরিস্থিতিতে সম্পাদক মহাশয় ওই আধিয়ারের সঙ্গে নিজ খোলানে ধান তোলার প্রসঙ্গে আলোচনা করলে প্রতিউত্তরে আধিয়ারটি বলেন, ওই এলাকায় তাঁরা ব্যাপকভাবে সংগঠিত, সমিতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। কৃষক সমিতি থেকে এই রচনাকার সহ গুরুদাস রায়, দিলীপ ঘোষ প্রমুখ নেতাদের সেখানে পাঠানো হয়।

বেলাকোবায় গিয়ে রাতে মিটিং হয় যে, ধান আগামী কাল কাটা হবে। পরের দিন ধান কাটা শুরু হয়। ধান কাটতে গেলে জোতদার, দারোগা ও পুলিশের সাহায্যে বাধা দেয়। কিন্তু কৃষকেরা সেই বাধা অগ্রাহ্য করে ধান কেটে আধিয়ারের বাড়িতে তুলে দেয়। ভলান্টিয়ারদের পাহারা দেবার কথা বলা হয় এবং ওই ধান জোতদাররা নিতে এলে তাদের মেরে তাড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে জোতদাররা সেখানে আর ধান নিতে যায়নি। যে কৃষক নেতারা ওখানে গিয়েছিলেন পরের দিন সকালে তাঁরা জলপাইগুড়িতে চলে আসেন।

দেবীগঞ্জে সুরেন রায়ের জমিতে তেভাগা:

জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে শোনা যায় যে কমরেড মাধব দত্ত, বিদ্যাধর রায় প্রমুখ আরও কয়েকজন কমরেড দেবীগঞ্জে সুরেন রায়ের জমিতে তে-ভাগা করতে গিয়ে জোতদারের গুণ্ডা বাহিনীর হাতে গুরুতর আহত হন এবং পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে যায়। এ খবর শোনার পর দেবীগঞ্জ শিবের হাট এলাকায় আমি বুড়িমার বাড়িতে উপস্থিত হই। উপস্থিত হয়ে দেখি যে, ওখানকার কৃষকেরা জোতদারের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে অতি কষ্টে কিছু কমরেডকে জোগাড় করে, খড়ি কাটার নাম করে তাদের জঙ্গলে প্রবেশ করতে বলি। কারণ, ওই বনে যে সব কৃষকেরা লুকিয়ে আছে তাদের খবর দেবার জন্য যে, মনোরঞ্জন কমরেড এসেছে, রাতে উদয় বর্মণের বাড়িতে মিটিং হবে। মিটিং-এ প্রায় দশ হাজার কৃষক জমায়েত হয় এবং ধান কাটার প্রতিজ্ঞা নেয়। আরও ঠিক হয় যে, পরদিন ওই এলাকায় বুড়িমার নেতৃত্বে মহিলা সমিতির ব্যবস্থাপনায় প্রায় সাতশো মহিলা কাঁচি, দাও, গাইন প্রভৃতি নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেবে। ধান কাটা হবে সুরেন রায়ের জমিতে।

সুরেন রায় ওই এলাকার সমস্ত জোতদারদের একত্রিত করে ধান যাতে তে-ভাগা না হয় তার জন্য প্রায় পঞ্চাশ জন আর্মড ফোর্স অর্থাৎ মিলিটারিকে তার বাড়িতে এনে রাখেন। কৃষক মিটিং-এ আগেই স্থির হয়েছিল যে, সুরেন রায়ের বাড়ির পাশের জমিতে যে ধান আছে ওই ধান কাটা হবে। প্রায় আট-ন' হাজার পুরুষ, সাতশো মহিলা সুরেন রায়ের বাড়ির পাশের জমিতেই ধান কাটতে যায়। কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ মিছিল দেখে মিলিটারি ঘরের দরজা জানালা আগে থেকেই বন্ধ করে রাখে। সুরেন রায়ও বাড়ির ভেতরে থাকে। ধান যথারীতি কাটা হয় এবং আধিয়ারের খোলানে তোলা হয়। কৃষকেরা বিরাট সাফল্য লাভ করে।

উল্লেখ্য যে তেভাগা আন্দোলনের ফলে দেবীগঞ্জ থানায় প্রায় সাত-আট মাস দিনের বেলায় কোনও পুলিশ বা মিলিটারিকে ওই এলাকায় প্রবেশ করতে দেখা যায়নি। তখন জলপাইগুড়ির এস. ডি. ও ছিলেন মনোরঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন যে, 'দেবীগঞ্জ স্বাধীন, ওখানে ব্রিটিশের পুলিশ-মিলিটারি ঢুকতে পারেনি।'

তেভাগার জন্য রাজার হাটে দেবীগঞ্জের একজন জোতদার, একজন কমরেডকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গুণ্ডা দিয়ে মেরে বাঁশ তলায় বালি ঢাকা দিয়ে রেখে দেয়। এই এলাকায় ওই একজনই শহিদ হন। বোদা ও পচাগড় থানার চেয়ে দেবীগঞ্জ থানাতেই এই আন্দোলনের ব্যাপকতা তীব্র আকার ধারণ করে।

স্মৃতির আলোয় জলপাইগুড়ির কৃষক আন্দোলন

অবনী তলাপাত্র

দেশভাগের আগে জলপাইগুড়ি জেলার অন্যান্য থানার মধ্যে বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ, তেতুলিয়া ও বেরুবাড়ি এই পাঁচটি থানা ছিল চাষবাসের দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধপূর্ণ। এই কটি থানায় ছিল বড় বড় জোতদারদের বসবাস। এখানে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। কারণ, কৃষকেরা সম্পূর্ণভাবেই ছিল জোতদারদের উপর নির্ভরশীল। এই জোতদাররাই বিপদে-আপদে ছিল এদের বল ভরসা। এদের কথামতোই এরা উঠত বসত।

এখানে মূলত আধিপ্রথায় জোতদারদের জমি চাষ হত। এ ছাড়া ছিল ফুড়নের কাজ। অর্থাৎ ঠিকা বা চুক্তির মাধ্যমে জমি চাষ। এই চাষের কাজে নিযুক্ত হত সাধারণত রাজবংশী, মুসলমান ও মোদেশিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীরা।

কৃষকের উৎপাদিত ফসলের বণ্টন, জোতদারদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করত। কারণ, বিছন, হালগোরু, লাঙল, সার এবং অসময়ে খাওয়ার ধান ইত্যাদি নিয়ে আগেই জোতদারদের কাছে মাথা বিকিয়ে ঋণে জর্জরিত হয়ে কৃষক উৎকণ্ঠায় থাকত। তার আশা, যে ধান উঠলে জোতদারের সমস্ত পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে দিয়ে ঋণভার থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হওয়ার উপায় ছিল না। চক্রবৃদ্ধি হারে কর্জর সুদ বেড়ে যাওয়ায়, কৃষককে একরকম ফসলের প্রায় সমস্ত অংশ দিয়ে নিঃস্ব হয়েই ফিরতে হত। এমনও দেখা গেছে যে, আধিয়ারের কথাবার্তা সুবিধের মনে হচ্ছে না, আগে থেকেই এরকম আঁচ পেয়ে জোতদার সমস্ত জমির ফসল কেড়ে নিত। অর্থাৎ আধিয়ার জোতদারের মনঃপূত না হলে তার উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যেত। নিরীহ কৃষকেরা এর প্রতিবাদ করতে পারত না। এরকম হতে হতে এমন একসময় আসত যে, ঋণের দায়ে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে কৃষককে রিক্তভাবে প্রাণের দায়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে হত।

এরকম সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায়, জলপাইগুড়ি জেলা সদর থেকে বীরেন দত্ত, শচীন দাশগুপ্ত, গুরুদাস রায়, মাধব দত্ত প্রমুখ নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিরা, গ্রামগঞ্জে গিয়ে কৃষকদের মধ্যে থেকে তাদের দুরবস্থার কথা বুঝাতে লাগলেন। কী করে জোতদাররা তাদের লুঠ করে, তাদেরই পরিশ্রমের ফসল নিয়ে বিত্তশালী হয়? প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে এই বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুলে ধরেন। দীর্ঘদিনের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত কৃষকেরা এর ফলে কিছুটা সচেতন হতে শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশ হয়। ওই সমাবেশে স্থির হয় যে, জেলায় জেলায় ছাত্র সংগঠন ও রাজনীতির প্রসার প্রয়োজন। এর কিছুদিন পর ১৯৩৮ সালে জলপাইগুড়ি শহরে প্রথম ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন নরেশ চক্রবর্তী, সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন লেখক স্বয়ং। সদস্য ছিলেন শচীন মৈত্র, গোবিন্দ কুণ্ডু, অনিল মুখার্জি

প্রমুখ। জেলা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে শুরু হয় ছাত্রসংগঠন বৃদ্ধি, শিক্ষা নীতির বিস্তার, গ্রামগঞ্জে বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি। এ ছাড়া, ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ছাত্র ধর্মঘট, ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন অর্থাৎ যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই, ইত্যাদি সংগঠিত হয়। প্রচারিত হয় আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী আন্দোলন ও মার্টিন লুথার কিং-এর কাহিনী, পল রবসনের গান প্রভৃতি। ফলে, জেলার ছাত্রছাত্রী ও মধ্যবিত্ত সমাজে প্রবল সাড়া জাগে। পরবর্তীকালে বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের সময়ে, এর ফলেই আমরা বিভিন্ন সাহায্য ও সহযোগিতা মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে পেয়েছিলাম।

হাটের তোলাবন্ধের দাবি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রথমে শুরু হয়। জমিদারের ইজারাদার তোলা আদায়ের জন্য কৃষকদের উপর অত্যধিক জুলুম করত। ওই জুলুমের চাপে পিষ্ট হয়ে কৃষকদের অবস্থা কাহিল হয়ে ওঠে এবং ভেতরে ভেতরে তাদের অসন্তোষ কিন্তু বেড়ে ওঠে। কোনও কিছু বলতে তারা সাহস পেত না এবং তোলা দিতেও বাধ্য হত। ক্রমে ধীরে ধীরে বুঝতে শিখল যে, নিজের পরিশ্রমের জিনিসই তারা বিক্রি করছে, তাতে আবার তোলা দেবে কেন? হাটে ও মেলায় তোলাগণ্ডি বন্ধ আন্দোলনের সাড়া পড়ে। এতে কৃষকরাই সাফল্য লাভ করে। বোদা, পচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। নরেশ চক্রবর্তী, চারু মজুমদার, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, হরপ্রসাদ ঘোষ সহ আরও বেশ কিছু কৃষক নেতা ওই আন্দোলন পরিচালনা করেন।

আগেই বলেছি যে, কৃষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। জোতদারদের অত্যাচারে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অভাবের সময় এবং ধান গাড়ার সময় জোতদারদের কাছে যে ধান কর্জ নিত, ধান ওঠার পর ওই কর্জ ধানের অতিরিক্ত সুদ ও ফসলের অর্ধাংশ সহ, ঈশ্বরবৃত্তি, খোলান চাঁছা, জমিদারের নজরানা প্রভৃতি আরও বিশ রকমের আবওয়াব শোধ করে, আধিয়ার তার প্রাপ্য ধান খুব কমই ঘরে আনতে পারত। উপরন্তু জোতদারের কাছ থেকে ওই ধানই আবার কর্জ করে নিয়ে বাড়ি ফিরত। এই অন্যায় অবিচারের কোনও সুবিচার ছিল না। পঞ্চায়েতে এই অত্যাচারের কথা জানালে বিচারের নামে প্রহসন হত।

কৃষক সমিতির উদ্যোগে ওই সব নিরীহ অত্যাচারিত ও ঋণে জর্জরিত আধিয়ারদের সংগঠিত করা শুরু হয়। দাবি তোলা হয় 'কর্জা ধানের সুদ নাই'। এর বিরুদ্ধে ওই পাঁচটি থানার আধিয়াররা তুমুল আন্দোলন শুরু করলে জোতদাররা বেকায়দায় পড়ে যায়। তারা শহরে জি. সি., এস. ডি. ও. প্রমুখ উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের সহযোগিতা কামনা করেন। জোতদারদের সহযোগিতার জন্য বিরাট পুলিশ বাহিনীসহ এস. ডি. ও. বোদায় আসেন। সেখানে আধিয়াররা তাদের দাবি-দাওয়ার কথা জানালে এস. ডি. ও. ওই দাবি নাকচ করে দিয়ে বলেন যে, কর্জা ধানের সুদ দিতে হবে এবং জোতদারের খোলানে ধান তুলতে হবে। আধিয়াররা তাঁর দাবি মানছে না বলে চ্যালেঞ্জ দেয়। ফলে, ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয় এবং আন্দোলনও চরমে ওঠে। আন্দোলনের চাপে পড়ে পরে বাধ্য হয়েই জোতদাররা আধিয়ারদের দাবি আপসে মেনে নেয়।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত, দেশে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ওই সময় এই জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় চা বাগানগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন জোরদারভাবে শুরু হয়। বিশেষ করে মাল ও মিটেলিন এলাকায়। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার মধ্যে ছিল ঠিকা প্রথা উচ্ছেদ, বেতন মজুরি বৃদ্ধি, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের

কাজে স্থায়ীকরণ, নির্বাচনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া ছিল স্বাধীনতার দাবি। অন্য দিকে, দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষার জন্য পিপলস্ রিলিফ কমিটি গড়ে উঠে। এই কমিটির মাধ্যমে ঔষধপত্র জোগাড় করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ক্ষুধা নিবারণের জন্য লঙ্গরখানা খোলা এবং ধান চাউল যাতে অন্যত্র পাচার না হয়ে যায়, এর জন্য কৃষক ভলান্টিয়ার দিয়ে মজুত উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। রিলিফের জন্য সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমরেড বিনয় রায়, তিনু চক্রবর্তী, শশাঙ্ক বোস, লীলা মজুমদার, কল্যাণী দাশগুপ্ত, শিবানী রায় প্রমুখের সহায়তায় সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠিত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় রংপুরে নীলফামারি ও ডোমার থেকে প্রচুর নরনারী কদমতলার মাদ্রাসা মাঠে আশ্রয় নেয়।

কৃষক সমিতিতে ক্রমশই ভলান্টিয়ার ও সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। গণ্ডি ও আধিয়ার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝতে পারে যে, ন্যায্য দাবি জানালে শত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর হবে। এই বোধেই উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান কৃষক তেভাগা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বোদা, পচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানায় এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে।

'৪৬ সালের শেষের দিকে তেভাগা সংগ্রামকে দমন করার উদ্দেশ্যে, প্রতিক্রিয়াশীল একশ্রেণীর ফন্দিবাজ লোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্প ছড়িয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। মূলত মুসলমান প্রাধান্য এলাকাগুলিতেই এই সন্ত্রাস ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এর ফলে জলপাইগুড়ি শহরে বেশ কিছু দোকানপাট লুঠতরাজ হয়। শহরে ডা. আজিজ ও ডা. ইসমাইল এই দুজনের চেষ্টায় দাঙ্গা প্রসার লাভ করে, কিন্তু পরে তা স্তিমিত হয়ে আসে।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে কৃষকদের মনের উপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, কিন্তু এর জন্য তেভাগা আন্দোলন চাপা পড়ে যায়নি বরং তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল। নরেশ চক্রবর্তী, কমল স্যান্যাল, চারু মজুমদার, সমর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, হরপ্রসাদ ঘোষ, শচীন দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট কৃষক নেতৃবর্গ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

পরিশেষে জানাই যে, তেভাগা সংগ্রামে সর্বত্র কৃষকদের সংগঠিত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এর কারণ, কৃষকদের দাবি-দাওয়ার পরিমাণ ছিল অতিরিক্ত এবং এই দাবি সময়-উপযোগী ছিল না। এ সত্ত্বেও আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, ন্যায্য দাবি নিয়ে লড়াই করলে তা সাফল্য লাভ করে। আন্দোলনের ফলেই কৃষকরা সংগ্রামী চেতনা ফিরে পেয়েছিল।

ডুয়ার্সের শ্রমিক ও কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী

সমর গাঙ্গুলী

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এলাকা ছিল চা বাগান এলাকা। এই সব চা বাগানের শেয়ার ছিল বড় বড় বাবুদের। জেলার বেশ কিছু সাধারণ মানুষ ছিল এদের চাকর। এর বেশির ভাগই ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। যে সব শ্রমিকরা বাগানে কাজ করত, তারা সাধারণত মোদেশিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসী।

মালিকদের অত্যাচারে সর্বদাই এরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। অত্যাচারের মাত্রা এমনই বেড়ে যেত যে, কোনও শ্রমিক যদি মালিকের বিরুদ্ধে কথা বলত তা হলে তাকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলত। মাঝরাতে বাড়ি থেকে টেনে এনে তার উপর চলত এই নির্মম অত্যাচার।

ডুয়ার্সে কোনও কোনও এলাকায় ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করে চাযের উপযোগী খেত তৈরি করে ধান ফলানো হত। এই সব খেতে সাধারণত বেগারি প্রথায় চাষ হত। জমির মালিকরা চাষিদের মুখে বলত, ভাল করে চাষ করো, আধি ভাগ পাবে, কিন্তু ধান ভাগের সময় কিছুই দিত না। বছরান্তে চাষবাস করে চাষির অনেক আশা এবার তার দুঃখকষ্ট ঘুচবে, বাস্তবে দেখা যেত ধান সে পেত না। উপরন্তু হাতিপোষা, ঘোড়াপোষা, খোলান চাঁছা প্রভৃতির দায়ে ধান কর্জ করে আবার সে চাকর হয়ে যেত। এ ছাড়া ছিল জোতদার ও পুলিশের দাপট।

এর বিরুদ্ধে তরাইয়ের তেতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ ও বেরুবাড়ি থানা এলাকায় আধিভাগ আন্দোলন শুরু হয়। নরেশ চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, ভোলা মজুমদার, গুরুদাস রায়, খগেন দাশগুপ্ত, শশধর কর, বীরেন নিয়োগী, দুলাল বসু, হরপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরী রায়, লালটু রায়, নলিনী বাগচী, মাধব দত্ত, শচীন দাশগুপ্ত প্রমুখেরা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। দেবীগঞ্জের জোতদার সুরেন রায় ওই পাঁচটি থানার জোতদারদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তারই নেতৃত্বে পুলিশের সহযোগিতায় আধিয়ারদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। আন্দোলনের ফলে জোতদারদের কোনও অত্যাচারই কৃষকদের দাবিয়ে রাখতে পারেনি। জোতদাররা নিঃশর্তভাবেই আধিভাগ আন্দোলন মেনে নেয়।

এরপরের শ্লোগান ছিল 'আধি নেই তে-ভাগা চাই'। তে-ভাগার জন্য কৃষক নেতা শচীন দাশগুপ্তর সঙ্গে দেবীগঞ্জ যাচ্ছিলাম। ওই সময় রাস্তায় শুনতে পাই, মাধব দত্ত কিছু কৃষক নিয়ে তে-ভাগা করতে গিয়ে পুলিশের হাতে বন্দি হয়েছেন। ফলে, ওখানকার 'বুড়িমা' নামে জনৈক কৃষক নেত্রী, কিছু নারীবাহিনী নিয়ে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন যে, 'গুলি করো আমাকে, বন্দি হতে কাউকে দেব না।' কৃষক নেতাদের নেতৃত্বে ওই পাঁচটি থানায়, তেভাগা সংগ্রাম ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং সাফল্য লাভ করে।

ডুয়ার্স:

বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় তেভাগা সম্পূর্ণ হওয়ার পর আমি 'রথ' নামে এক কমরেডের সঙ্গে মালে চলে আসি, সেখানে কমরেড পটল ঘোষ (দেবব্রত ঘোষ)-কে সন্ধান করি। একজন গ্যাংম্যান বলে যে, ওই ফুটবল মাঠে পটলবাবু মিটিং করছে। আমি দেখি, ওই গ্যাংম্যানটি পোশাক পরে তেভাগা লিফলেটগুলি বিলি করছে। পটলবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বলেন যে, এই তো তোমাদের তেভাগার নেতা এসেছেন। তিনি জানান ডুয়ার্সে সমস্ত জোতদারদের ধান মাঠে পড়ে আছে, এখনও ভাগ হয়নি। কারণ কৃষকেরা তরাইয়ের আন্দোলন দেখে তে-ভাগার দাবি করছিল। মাঠের মিটিং-এ ঘোষণা করা হয় যে, আগামীকাল যদি দশ হাজার ভলান্টিয়ার জোগাড় করা সম্ভব হয় তা হলেই তে-ভাগা হবে সবচেয়ে বড় খোলানে। মিটিং শেষ হয় কিন্তু বেশ কিছু মোদেশিয়া শ্রমিক ও কৃষক ওই মাঠে থেকে যায়। রাত্রিতে জিজ্ঞেস করা হয়, কেন তোমরা বাড়ি যাওনি? তারা উত্তর দেয় যে, আগামীকাল তে-ভাগা করব। কালই ঠিক তোমরা পারবে? কালই আমরা দশ হাজার লোক জোগাড় করব।

পরদিন সকালে কাউকে আর দেখা যায় না। হঠাৎ দেখি কৃষকের এক মিছিল। তারা বলে, বাতাবাড়ির পাগলা দেউলিয়া জোতে তে-ভাগা শুরু করে দিয়েছি। নরবাহাদুর নামে এক গ্যাংম্যান সহ চালসা পর্যন্ত আসি। মাঝে মাঝে রাস্তায় কিছু লোক তির ধনুক নিয়ে গার্ড দেয়। এই করে পাগলা দেউলিয়া জোতে উপস্থিত হয়ে দেখি, জোতের মালিককে ধানখেতে কিছু লোক ঘিরে রেখে তে-ভাগা করছে। জমির ধান ভাগ করে নিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ওই জোতে তে-ভাগা শেষ হয়। এ দিকে দুপুর দুটো-আড়াইটের সময় জোতদারের এক জামাই চালসা থানায় গিয়ে খবর দেয় যে, কৃষকরা তার শ্বশুরকে মারধোর করে ঘিরে রেখে জোতের ধান ভাগ করে নিচ্ছে।

সন্ধ্যা নাগাদ তে-ভাগা শেষ হয়ে যাওয়ায়, লোকজন নিয়ে চালসা দিয়েই যাবার পরিকল্পনা চলছে। কিন্তু শ্রমিকরা বলে যে, বাতাবাড়ি বাগান দিয়ে যাওয়াই সমীচীন। এমন সময় থানার বড়বাবু পাঁচ-ছয় জন পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বলে, এভাবে তে-ভাগা করবেন না। চোখ রাঙায়। উত্তর দেই, সেটা আমাদের ব্যাপার। এই সময় পটলবাবু এসে উপস্থিত হন। তিনি ঠাট্টা করে বলেন যে, সমরবাবু, দেখুন তো বড়বাবুর বিয়ে দেবার মেয়েটেয়ে আছে কিনা? এতে বড়বাবু অপমানিত হয়ে আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। দেখবেন যাতে মারামারি না হয়, এ কথা বলে চলে যান। এ ঘটনা দেখে বাতাবাড়ি বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে শ্রমিকরা বলছে 'অ্যা—যাই'এ' আর কৃষকরা বলছে 'লাল ঝান্ডা কি জয়'। এক অপূর্ব গণচেতনা।

পুনরায় মালে মিটিং হয়। সেখানে স্থির হয়, কোনও কর্মীকে পুলিশ যেন আক্রমণ করতে না পারে সে রকম প্রস্তুতি নিতে হবে। আরও প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, আগামী কাল বাতাসী ওঁরাও-এর জোতে তে-ভাগা করতে হবে। লক্ষ্যণীয় যে, বাতাসী ওঁরাওয়ের ভাই টেপ্পাও ওঁরাও ছিল একজন আধিয়ার। সে-ও তে-ভাগা চায় এবং আন্দোলনে যোগ দেয়।

পরদিন সকালে বাতাসী ওঁরাওয়ের জোতে তে-ভাগা সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়। রাত্রিতে মালে চলে আসি। পটলবাবু বলেন যে, এ এলাকায় সমস্ত চা-বাগান বন্ধ হয়ে গেছে, অধিকাংশ শ্রমিকরাই আজ কাজে যোগ দেয়নি, তে-ভাগা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে।

এরপরে তে-ভাগা হয় ওদলাবাড়ির জোতদার শামসুদ্দিনের জোতে। এখানেও তে-ভাগা

সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়। এই সময় খবর পাওয়া গেল নেওরামাঝালির জোতদার মনসুর হাবিবের নেতৃত্বে তার বাড়িতে জোতদাররা একত্রিত হচ্ছে এবং তারা সুরাবর্দির কাছে টেলিগ্রাম করেছে যে, হিন্দুরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে।

সন্ধ্যার সময় ইউনিয়ন অফিসে খাওয়াদাওয়া করছি এমন সময় সিটি শোনা গেল। প্রসঙ্গত জানাই যে, শ্রমিক কৃষকদের মিটিং-এ কল হত মাদল বাজিয়ে। আবার মাদল বাজলেই বুঝতে হত যে, তে-ভাগা শুরু হয়েছে অথবা বিপদের সূচনা হয়েছে এবং কৃষকেরা যে যেখানে আছে ছুটে যেত আর ওই সময় স্বেচ্ছাসেবকরা সিটি দিত। এ ছাড়া সবাইকে টিন বাজিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হত এবং এক বাগান থেকে অন্য বাগান হয়ে নাগরাকাটা পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে এই সংকেত শোনানো হত।

কী ব্যাপার, কীসের সিটি? ফাগু ওঁরাও, জগন্নাথ ওঁরাও, সুকরা ওঁরাও, সরবরু মহাম্মদ, লোদোমুণ্ডা, বুনি ওঁরাও, পুরিয়া মানকি মুণ্ডা, হীনা মাঝি বাগানের এই সব শ্রমিকরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। ফাগু ওঁরাও বলে যে, আমরা থানা ঘেরাও করেছি। কেন? পুলিশ আমাদের দু জনকে বন্দি করেছে, আমরা ছিনিয়ে নিয়ে আসব তাদের। হন্তদন্ত হয়ে থানায় ছুটি। সমস্ত লেবার থানার সামনে এসে গেছে আর অনবরত মাদল বেজে যাচ্ছে। পটলবাবুসহ থানায় প্রবেশ করি। ওসি আমাদের দেখে কাঁপছে। এই সময় এস পি কোথা থেকে যেন ফিরছিলেন। সাহেবদের গাড়িগুলিও ওই সময় ক্লাবে যাচ্ছিল। রাস্তায় জনঅরণ্য। গাড়ি দেখলেই কর্মীরা 'লাল ঝান্ডা জিন্দাবাদ, বলে। জনঅরণ্যের মধ্যে হঠাৎ একটি জিপ ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে। ফলে কৃষক অর্জ্জুন ওঁরাওয়ের পায়ে জিপের একটি চাকা লেগে যায় এবং সে চিৎকার করে ওঠে। তখন কৃষকেরা, ধরো বলে জিপের দিকে এগিয়ে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে, এস পি তখন জিপ থেকে লাফিয়ে কৃষকদের তাক করে রিভলভার ধরে। তার আগেই জনৈক কর্মী এস পি-র দিকে তাক করে রিভলভার চালিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এস পি-কে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখানে সে মারা যায়। থানায় ওসি ও পুলিশদের অবস্থা শোচনীয়। থানার লকআপে যে চোর-গুণ্ডারা ছিল, দারোগা তাদেরও তাড়াতাড়ি করে তালা খুলে দেয়। ওই চোরগুণ্ডারা লাল ঝান্ডা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে শুরু করে।

পরদিন বিভিন্ন হাটে তেভাগা সংগ্রাম এবং চা বাগানের আন্দোলনের খবর ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ডুয়ার্সে ১৪৪ ধারা জারি হয়। এই সময় মাদারি হাটে একটি ঘটনা ঘটে। সেখানে শ্রমিকদের আন্দোলন ও তেভাগার প্রচার করার সময় পুলিশ আসে এবং বাধা দেয়। দারোগা কিছুতেই আন্দোলনের খবর প্রচার করতে দেবে না। তখন শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য থেকে রব ওঠে, দারোগাকে শেষ করো। পুলিশ দেখে যে, প্রচুর সংখ্যক মোদেশিয়া কৃষক জড়ো হয়ে গেছে। শেষে দারোগার কপালে থাপ্পড় জোটে। থাপ্পড়ের চোটে দারোগা চম্পট দেয়।

এরপর আমি নাগরাকাটা যাই। সেখানে দেখি নাগরাকাটা রেল স্টেশনে গাড়ি থেমে আছে এবং প্রচার হচ্ছে যে, ক্যালকাতা কা কমরেড কোন্ হ্যায়, উতার যাও। বেশ কিছু গ্যাংম্যানদের কাছে আমি বলি যে, কাকে খুঁজছ? এই তো আপকো। আগেই থানার পুলিশ এসে দেবপ্রসাদ ঘোষ অর্থাৎ পটলবাবুকে থানায় দরকার আছে, এই অজুহাতে অ্যারেস্ট করে। ওই সময় 'রথও' অ্যারেস্ট হয়।

গ্যাংম্যানরা আমাকে বলে যে, আপনি এই ট্রেনে যাবেন না। কারণ, মাল বাজারে সমস্ত

পুলিশ মিলিটারি আপনাকে খুঁজছে, এখানে নেমে যান। এর কারণ 'রথ' থানায় গিয়ে বলে যে, তিনি মাদার হাটে গেছেন, রেলযোগে আসবেন, স্টেশনে ট্রেনে খোঁজ করুন। গ্যাংম্যানদের কথায় ট্রেন থেকে নেমে বললাম তোমাদের কোনও ভয় নেই, তোমরা যেভাবে বলে যাচ্ছ ট্রেন ছাড়া না অবধি সেভাবে বলে যাও। একজন গ্যাংম্যানের বাড়িতে ওই রাত্রিতে থাকি।

এদিকে মালের কোনও খবর পাচ্ছি না। গ্যাংম্যানদের জানালাম তা হলে আমি মালে চলে যাই। তারা বলল, আপনি যেতে পারেন, কিন্তু আপনাকে পোশাক পালটাতে হবে। আপনি খালাসির পোশাক পরে ইঞ্জিনে যাবেন। মাল স্টেশনে গিয়ে ইঞ্জিন জলের জন্য যখন নিয়ে যাবে তখন নেমে পড়বেন। ওইভাবে মালে চলে আসি এবং একজন গ্যাংম্যানের সঙ্গে কৃষক সমিতির অফিসে উপস্থিত হই. সেখানে বহু কৃষক বসে আছে এবং তারা বলে সেক্রিটারি সাহেব অ্যাঁ গিয়া। কমরেড শচীন দাশগুপ্ত জানান, তোমরা তেভাগার জন্য ওই কমরেডকে কি নিয়ে যাবে? কৃষকেরা তাদের এলাকায় তে-ভাগার জন্য নিয়ে যাবে বলে প্রস্তাব দেয়। কৃষকদের সঙ্গে নেওরামাঝালি চলে আসি। নেওরামাঝালিতে দুদিন থাকার পর, এক মদেশিয়া কৃষক বলল, 'হাম লোক তে-ভাগা চাইয়ে।' ওখানে বালগোবিন্দ জোত আছে সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পরদিন সকালে দেখি যে, প্রকাণ্ড একটি মাঠে বেশ কিছু কৃষক জমায়েত হয়েছে। মাঠের ধারে রয়েছে আম গাছ। সেখানে হপনা মাঝি নামে এক কমরেড একটি কাগজে 'পলাশীর মাঠ' লিখে ওই গাছে টাঙিয়ে দেয়। কেন এ কথা তোমরা লিখেছ? হপনা মাঝি উত্তর দেয়, আমি পড়েছি যে পলাশির মাঠে ওই ক্লাইভ যুদ্ধ করেছিল আম বাগানের নীচে, আমরা এখানে যুদ্ধ করব। ওই সময় সরবরু মহাম্মদ নামে এক কমরেডসহ অন্যান্য কৃষকেরা চিৎকার করে ওঠে 'মনসূর হাবিবের খোলান ভাঙো, তে-ভাগা চাই।' কৃষকেরা প্রস্তুত। তাদের হাতে তির ধনুক। আক্রমণ এলে তারাও প্রতি আক্রমণ করবে। মনসুরের জমিতে সাফল্যের সঙ্গে তে-ভাগা সম্পূর্ণ হয়।

এর পরদিন চালসায় গয়ানাথের জোতে তে-ভাগার জন্য রওনা হই। প্রথম দিন গয়ানাথের ধান তে-ভাগা করে সম্পূর্ণ করা গেল না। কারণ, বড় জোত। পরদিন আবার ওই জোতে তে-ভাগা হবে এই পরিকল্পনা নিই। জোতদার গয়ানাথ পরদিন তে-ভাগার আশঙ্কায় আগে থেকেই সশস্ত্র পুলিশ এনে বাড়িতে রেখে দেয়। শোনা যায় পুলিশের জি এস পিও ছিল। সকালে কৃষকেরা তে-ভাগা করতে এসে সশস্ত্র পুলিশ প্রথমে উপরে একটি ফাঁকা গুলি ছুড়ে। এই অবস্থায় কৃষকেরা শুয়ে পড়ে। যেহেতু প্রথম গুলিটা ফাঁকা আওয়াজ করেছে, সে কারণে একজন কৃষক বলে ওঠে যে, 'কিছু নাই হ্যায়'। বলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন উঠে পড়েছে। আর যায় কোথায়? সে সময় পুলিশ আসল গুলি ছুড়ে। ন'জন কৃষক সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে ঢলে পড়ে মারা যায়। এক দিকে পুলিশের গুলি, অন্য দিকে কৃষকের তির চলছে। ওই সময় একজন কৃষকের সহোদর ভাই আহত হওয়ার পর যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল। কৃষকটি তার ভাইকে চেপে ধরে তির ছুড়ছিল। ওইভাবে পুলিশের গুলি আর কৃষকের তির ছুড়তে ছুড়তে তে-ভাগা সম্পূর্ণ হয়। যে কজন পুলিশ গুলি ছুড়ছিল প্রত্যেকেই কৃষকের তিরে আহত হয়। ঘটনাস্থানে গুলিতে নিহত কৃষকদের কিছু লাশ পুলিশ নিয়ে যায়, কিছু কৃষকেরা নিয়ে আসে। গ্যাংম্যানেরা ট্রেন থামিয়ে লাশগুলিকে নিয়ে যায় দোমহনিতে । নিহত অধিকাংশরাই ছিল ওদলবাড়ি চা-বাগানের শ্রমিক। এরপর আর তে-ভাগা করার কোনও জোত ছিল না। ডুয়ার্সের তেভাগার লড়াই এখানেই শেষ হয়।

গুলিতে নিহত হয়েছেন বঁধু খড়িয়া, হপনা মাঝি, কৃষ্ণা ওঁরাও, রামু মুণ্ডা, বিরসা ওঁরাও, সরবরু মহাম্মদ, এতোয়া ওঁরাও, চামড়া ওঁরাও, বেচগাঁ খাড়িয়া।

এ ঘটনার কিছু আগে আরও দুটি ঘটনায় বেশ কিছু কর্মী নিহত হয়।

দিনটি ছিল সোমবার। নেওরামাঝালি থাকাকালীন জোতদারের একটি ছেলে ছল করে কৃষকদের বলে যে 'তোরা মাঠে যাস, তে-ভাগা দেব।' ওই খোলানে কিছু পুলিশ থাকে। কৃষকেরা তে-ভাগা করতে গেলে পুলিশ দেখে ঘাবড়ায় না। কৃষকদের দেখে পুলিশ ফাঁকা আওয়াজ করে। কৃষকেরা বলে যে, কিছু নাই হ্যায়, তখন ওরা দাঁড়িয়ে যায় এবং মাঠের ধান তে-ভাগা করে। মাঠের ধান শেষ হলে গোলার ধান নিতে যায়। গোলার ধান নেওয়ার সময় পুলিশ হুমকি দেয়। কৃষকেরা তখন পুলিশের বন্দুক ধরতে যায়। ওই সময় পুলিশ গুলি চালায়। গুলির আঘাতে নিহত হয় এতোয়ারি মুণ্ডা, কর্মী ওঁরাওনি, বুধনি খড়িয়া, স্বর্ণময়ী ওঁরাওনি, মোট পাঁচ জন।

মনসুর আলি খোলানে কৃষকেরা ধান আনতে গেলে জোতদারের ষড়যন্ত্রে নিহত হন মহাম্মদ খলিল । এ সব ঘটনার কালপর্ব ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে।

এরপর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে মিটিং করি। ওই মিটিংগুলিতে লক্ষ করি গয়ানাথ জোত সহ অন্যান্য জোতে তে-ভাগা করতে গিয়ে শ্রমিকরা মারা গিয়েছে বলে কারও দুঃখ প্রকাশ নেই, বরং উত্তেজনা ও উৎসাহ রয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, ওই সময় মুসলমান জোতদাররা হিন্দুদের মেরেছে এরকম একটা প্রচার চলছিল বলা বাহুল্য, এটা ঠিক নয়। এর আট-ন মাস পরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। এ খবর পেয়ে গ্যাংম্যানেরা দোমহনিতে ঃ নিয়ে আসে। সেখানে পটল ঘোষ, বিমল দাশগুপ্ত প্রমুখের সহায়তায় গ্যাংম্যান যদুনাথের বাড়িতে থাকি। ওখানে দু মাস থাকার পর, গ্যাংম্যানেরা নৌকা ঠিক করে জলপাইগুড়ি সদরে দয়াময় দাসের বাড়িতে নিয়ে আসে।

পরিশেষে লিখি যে, ডুয়ার্সের তেভাগা আন্দোলনে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গণ্ডগোলের সময় উত্তেজিত মেয়েরাই অ্যাকশনে আগে যেত। আদিবাসী মেয়েদের বোধহয় এটাই মূল বৈশিষ্ট্য। ডুয়ার্সের তেভাগা আন্দোলনের চরিত্রটা ছিল মূলত আদিবাসী আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন, দেবপ্রসাদ ঘোষ (পটল ঘোষ), রথ (টাইটেল স্মরণে নেই), বীরেন মজুমদার, অনিল গুপ্ত, বিমল দাশগুপ্ত, শচীন দাশগুপ্ত প্রমুখ।

'৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বর্ধমানে একটা পাবলিক মিটিং-এ যাদুবেন্দ্র পাঁজা আমার পরিচয় প্রকাশ করেন। ওই মিটিং-এ আমি আত্মপ্রকাশ করি।

ডুয়ার্সের শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ও তেভাগা

বিমল দাশগুপ্ত

ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ইংরেজ মালিকরা এক চা-সাম্রাজ্য গঠন করেছিল। এরাই ছিল শ্রমিকদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। পুলিশ ও সরকারি প্রশাসন এদের নির্দেশমতো চলত। এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, কালোবাজারি, মজুতদাবি; শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ অর্ধাহার ও অনাহারের সম্মুখীন হন। এই সময় সারা ভারত জুড়ে, কৃষক, ছাত্র, নৌবাহিনী প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে প্রবল বিক্ষোভ ও গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ গড়ে উঠে।

ডুয়ার্সে গণআন্দোলনের সূত্রপাত হয় রেল শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে রেল শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। ১৯৩৮ সালে রেল শ্রমিকদের B.A. Rail Road workers ইউনিয়ন গঠিত হয়। দেবপ্রসাদ ঘোষ (পটলবাবু) ওই ইউনিয়নের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। গ্যাং কোয়ার্টারে ঘুরে ঘুরে তিনি রেল শ্রমিকদের সংগঠনের কাজ করতেন এবং গ্যাংম্যানের সহায়তায় রেললাইনের কাছাকাছি চা বাগানগুলিতে চা শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। চা বাগানগুলিতে তখন বাইরের লোকের প্রবেশ ছিল নিষেধ। সুতরাং গোপনে যোগাযোগ করা ছাড়া উপায় ছিল না। এই সময় সংগঠিত রেল শ্রমিকদের সাহায্যে কমিউনিস্ট পার্টি ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করে।

১৯৪৫ সালে ডুয়ার্সের মালবাজারে ডাক বাংলোর ময়দানে পার্টির নেতৃত্বে এক বিরাট প্রকাশ্য সম্মেলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে চা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। ওই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং সভাপতি হন রতনলাল ব্রাহ্মণ। ইউনিয়ন লক্ষ করে যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ, এদের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থা ছিল খুবই সংকটপূর্ণ। দেশের লোক হয়ে এরা ছিল পরদেশীর মতো, পরিত্যক্ত, ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত। তাই আর্থিক ও সামাজিক মুক্তি ছাড়া পৃথকভাবে শুধু জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এদের কাছে ছিল অর্থহীন। তাই চা শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠন ও আন্দোলন শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দিকে। পার্টির নেতৃত্বে ডুয়ার্সের রেল শ্রমিক আন্দোলন এদের অনুপ্রাণিত করল।

ইউনিয়ন থেকে শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি, পে-স্কেল চালু, বোনাস, গ্রাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বাগিচা কানুন, প্রসূতিভাতা, সস্তাদরে রেশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি তৎকালীন বাংলাদেশের লেবার কমিশনারের নিকট দেওয়া হয়। লেবার কমিশনার I.T.P.A এবং D.P.A শ্রমিকদের ওই দাবি সংবলিত স্মারকলিপিটি কর্তৃপক্ষের

নজরে দেয়। I.T.P.A এবং D.P.A তখন মালিকপক্ষের অনুগত ইউনিয়ন গঠনের জন্য তৎপর হয়ে পড়েন। (Reference: I.T.P.A 1946: 104; D.P.A 1947, Apendix B: 105; December 1946)।

পার্টির নেতৃত্বে চা শ্রমিকরা ছেচল্লিশের ওই উত্তাল তরঙ্গে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ওই দাবিদাওয়া সহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বংশধর চা বাগিচায় ইংরেজ মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে 'বিলেতি মালিক লন্ডন ভাগো' ইত্যাদি। ইংরেজ ম্যানেজাররা আইনকানুন কিছুই মানত না। তাদের কথাই ছিল আইন। থানা, পুলিশ ও সরকারি অফিস ম্যানেজার বাবুদের কথামতো চলত। শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন অত্যাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ফলে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়।

শ্রমিকদের একটা সাধারণ ধারণা ছিল যে, ইংরেজ মালিকরা তাদের আন্দোলন দমনের জন্য যে কোনও পীড়ন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাই তারা যখন কোনও দাবি নিয়ে ম্যানেজারের কাছে যেত তখন মেয়ে পুরুষ, বালক বালিকা সমস্ত শ্রমিক পরিবার বিক্ষোভে ফেটে পড়ত এবং ম্যানেজারকে ঘেরাও করে সঙ্গে সঙ্গে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ত না। সাহেব ম্যানেজার খারাপ ব্যবহার করলে শ্রমিকদের সহস্র হাত ঝাঁপিয়ে পড়ত তার উপর। শ্রমিকদের মরিয়া হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ তারা জানত আইন কানুন, পুলিশ, আদালত সবই মালিকের পক্ষে।

ওইসময় লক্ষ্মীপাড়া বাগানে একটি ঘটনা ঘটে। শ্রমিকরা অতিরিক্ত কাজের ঠিকার জন্য বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ম্যানেজার পালিয়ে গেল তার কুঠিতে। শ্রমিকরা কুঠি ঘেরাও করল। কুঠির জানলা ও দরজার কাচগুলি ভেঙে দিল। ঘরে ঢুকে টাকার তোড়াগুলি নিয়ে দা দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে ফেলে দিল। ম্যানেজারের মোটরগাড়িটাও ভেঙে দিল। ফলে ধুমচি পাড়া বাগানের ম্যানেজার মিথ্যা কেস দিয়ে শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করাল। ওই ঘটনায় বাগানের মেয়ে পুরুষ সমস্ত শ্রমিক বাগানের মধ্যে পুলিশকে ঘেরাও করে রাখে। তাদের দাবি, হয় নেতাদের ছেড়ে দাও নয়তো সকলকে জেলে নিয়ে যাও। পুলিশ বাধ্য হল ম্যানেজারকে জামিন করে নেতাদের ছেড়ে দিতে। হায় হায় পাথার, মীনগ্রাম, বাগরাকোট, ভগতপুর, ডেঙ্গুয়াঝাড়, কালচিনি প্রভৃতি বহু বাগানে এরকম ঘটনা ঘটে।

ওই সময় রেলশ্রমিকদের সহায়তায় চা শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ আরও জোরদারভাবে শুরু হয়। গোপনে ঝাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাতের অন্ধকারে বাগানের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন পটলবাবু। লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার জানতে পারে পটলবাবু বাগানে আছেন। তখন ওই রাতে ম্যানেজার কয়েকজন চৌকিদার পাঠিয়ে দেয় পটলবাবুকে ধরে আনার জন্য। চৌকিদার সব লাইনে গেলে লাইনের শ্রমিকরা বেরিয়ে চৌকিদারদের ঘেরাও করে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে শ্রমিকরা পটলবাবুকে আড়াল করে বাগানের বাইরে নিয়ে যায় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে এক কৃষকের বাড়িতে তাঁকে নিরাপদে রেখে দেয়।

ডায়না বাগানে অবস্থানকালে কমরেড অনিল গুপ্তকে চৌকিদার পাকড়াও করে বেঁধে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যায়। অনিল গুপ্তকে প্রচণ্ড মারধোর করে পুলিশের হাতে দেয়। কমরেড শচীন দাশগুপ্তকেও ডেঙ্গুঝাড় বাগানে অনুরূপ ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। উল্লেখ্য যে, কমরেড পটল ঘোষ জিপগাড়িতে করে একদিন মীনগ্রাম বাগানে ম্যানেজারের কুঠির সামনে দিয়ে সহজ রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন। ওই সময়

ম্যানেজার গাড়ি থামিয়ে তাকে গালাগাল করে এবং তার প্রাইভেট রাস্তা দিয়ে কেন আসা হয়েছে বলে চার্জ করে। পটলবাবু বলেন, প্রাইভেট রোড বলে কিছু আইনে নেই। প্রাইভেট রোড মানি না। দূর থেকে পটলবাবুকে বাগানের শ্রমিকরা দেখতে পেয়ে সেখানে এসে জড়ো হয়। বেগতিক দেখে ম্যানেজার কুঠিতে চলে যান। এরকম বহু ঘটনা শ্রমিকদের মনে রেখাপাত করে।

১৯৪৬-৪৭ সালে চা-শ্রমিকদের আন্দোলন আরও জোরদার হয়। এই সময় রেলশ্রমিক, চা ও কৃষকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য গড়ে ওঠে এবং কৃষকদের তে-ভাগার দাবিতে হাজারে হাজারে মিছিল করে গ্রামে বড় বড় জোতদারের খোলানে তে-ভাগা করে।

রেল শ্রমিক আন্দোলন

বি-ডি রেলের হেডঅফিস ছিল প্রথমে বার্নিশ জংশনে, পরে দোমহনিতে আনা হয়। এটি ছিল বিলেতি কোম্পানি। ইংরেজ সাহেবদের দাপট ছিল পুরোমাত্রায় ভারতীয়দের নেটিভ ভেবে ইংরেজ সাহেবরা দাসসুলভ ব্যবহার করত। বিভিন্ন আইন ছিল এদের সুবিধা মতো। লালমণির হাট থেকে মাদারি হাট, মালজংশন থেকে বাগরা কোট। এরপরে আর কোনও রেললাইন ছিল না। আসামে যাওয়ার লাইন ছিল লালমণির হাট দিয়ে। আর শিলিগুড়ি দার্জিলিং যাওয়ার লাইন ছিল পার্বতীপুর, জলপাইগুড়ি দিয়ে।

এই ছোট্ট ২০০ মাইলের রেল কোম্পানির আয় ছিল ভারতের সমস্ত বড় বড় রেল কোম্পানির সারিতে তৃতীয় স্থানে। চা-শিল্প ও ফরেস্ট বিভাগের প্রয়োজনে আমদানি রপ্তানির জন্য এই রেল লাইনের প্রতিষ্ঠা। নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের আমদানি রপ্তানি এবং যাত্রী চলাচলও ভাল ছিল। খালাসি অর্থাৎ গ্যাংম্যানদের মাইনে ছিল ১২ টাকা, দক্ষ শ্রমিক ও মাঝারি কর্মচারীদের ৩০/৪০ টাকা থেকে শুরু। আর উপরের কর্মচারীদের ৫০/৬০ টাকা থেকে। ১৯৩৮ সালে বিলেত থেকে মিস্টার স্লেইন নামে হোম বোর্ডের একজন প্রতিনিধি এলেন। উদ্দেশ্য শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই করা, মাইনের স্কেল আরও কমিয়ে দেওয়া। কৈফিয়ৎ আয় কম। সাদা চামড়ার সামনে যারা কথা বলতে ভয় পেত তারা রুখে দাঁড়াল।

অফিসে, কারখানায়, স্টেশনে, গ্যাং কোয়ার্টারে প্রতিদিন শ্রমিকে জড়ো হতে লাগল। তাদের আওয়াজ, সাহেবদের এ কথা মানব না। গোপনে সভা সমিতি হতে লাগল। গণদরখাস্তে শ্রমিকরা স্বাক্ষর করল। ইউনিয়ন গঠিত হল। বীরেন দাশগুপ্ত সম্পাদক এবং জে এন দাশগুপ্ত সভাপতি। ম্যানেজার রিড সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ultimaterm দিলেন সভাপতি। যদি দাবি না মানো তবে, 'one fine morning you will see your wagons are standing in as it is and wheels are not moving শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্য ছিল বলিষ্ঠ। সকলেই এককথায় উঠে বসে। ইউনিয়নের নির্দেশ ২০০ মাইল রেল পথে জানিয়ে দিতে সময় লাগে ২০/২৫ মিনিট। কোম্পানি ভয় পেল। চেয়ারম্যান এল বিলেত থেকে। দাবি মানতে বাধ্য হল। শুধু নতুন যারা চাকরিতে ভরতি হবেন তাদের জন্য নিউস্কেল থাকল।

১৯৩৮ সালে বি-ডি-রেল নিয়ে বেঙ্গল ও আসাম রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয় দোমহনিতে। দোমহনিতেই ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল। সম্পাদক বীরেন দাশগুপ্ত, সভাপতি জে-এন দাশগুপ্ত। পয়েন্টম্যান, গ্যাংম্যান থেকে শুরু করে স্টেশনমাস্টার, টি, আই' অফিসের কেরানি সকলেই ইউনিয়নের সভ্য ছিলেন।

দোমহনিই ছিল উত্তরবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পীঠস্থান।

এখান থেকে দার্জিলিং ও আসামে স্কোয়াড যেত ইউনিয়নের প্রচার করতে। স্টেশন মাস্টার কালী পাল ও কালী ঘোষের নেতৃত্বে একটি স্কোয়াড যায় দার্জিলিং-এ ইউনিয়ন গঠনের প্রচার করতে। ইউনিয়নের কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল প্রচুর। দোমহনিতে কমরেড পটল ঘোষ, পরিমল মিত্র ও বীরেন দাশগুপ্ত সহ ইউনিয়নের কাজে যাদের সর্বদাই সক্রিয় ভূমিকায় পাওয়া যেত তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, যদুনাথ সিং, পরিছন মিছির, ইয়াকুব মিঞা, অপরেশ রায়, হীরালাল, রেবতীমোহন বসু, রামচরির মিস্ত্রী, ইন্দু দাশগুপ্ত, বারীন বিশ্বাস, রামেশ্বর সিং, নিতাই রায়, শিবেশ্বর আচার্য, মোহিত বাগচী, অনিল মুখার্জি, গদাধর, অনিল মিত্র, মানসিং, লালবাহাদুর ছেত্রী, নিখিল, বিনয়, বীরেন, আবদুল সামাদ, সীতানাথ, দীনবন্ধু চ্যাটার্জি, রামস্বরূপ মিস্ত্রী, রনেন ঘোষ দস্তিদার, অরুণবিকাশ সিংহ, জগন মাহাতো, সোনেলাল, সীতারাম, রামনাথ, খোদাবক্স, মহাবীর মিস্ত্রী, নিতাই ব্যানার্জি, সুভাষ বালো, অমূল্য সেন, পি. লাহিড়ী, স্যান্যালবাবু, প্রভাত সেন , পরেশ সেন, রামানন্দ ঝাঁ, রামাশীষ, সত্য চ্যাটার্জি, মৃণাল চক্রবর্তী, বুধন, যমুনা কুর্মী, ফাগুয়াস, মোর্চা মেখু প্রভৃতি আরও অনেকে। ইউনিয়ন রেল কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পেয়েছিল।

প্রসঙ্গত জানাই মাননীয় জ্যোতি বসু যিনি এই ইউনিয়নের পরে জেনারেল সেক্রেটারি হন, তিনি বিলেত থেকে প্রথমে কাঁচরাপাড়াকে কেন্দ্র করে বি.এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামে একটি রেল শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেন ১৯৪৪ সালে । সেই ইউনিয়নের স্বীকৃতি ছিল না। কমিউনিস্ট ইউনিয়ন বলে রেকগনিশন পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। আমরা দোমহনিতে বি.এ. রেল রোড ওয়াকার্স ইউনিয়নকে ভেতর থেকে নানাভাবে সংগঠিত করে জ্যোতি বাবুর ওই ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলাম। এ কাজ করার জন্য বহু প্রচেষ্টা ও আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে এবং জ্যোতিবাবুকেও অনেকবার তিস্তা ভেঙে দোমহনিতে আসতে হয়েছে। দুটি ইউনিয়নের সংযুক্তির পর দোমহনির বি. এ. রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নাম থেকে যায় এবং জ্যোতিবাবুর ইউনিয়নের নাম তুলে দেওয়া হয়। সংযুক্তির পর বাংলা-আসাম জুড়ে বিরাট রেলশ্রমিক ইউনিয়ন রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে। সংযুক্তির পর এই ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হন জ্যোতি বসু এবং জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি হন বীরেন দাশগুপ্ত, সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জি। ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা না করে কর্তৃপক্ষের কিছু করার উপায় ছিল না। ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত বিকল্প রেল প্রশাসনের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। আন্দোলনের কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করি। রেলের গ্রেনশপ থেকে সস্তাদরে সরিষার তেল দেওয়া হত। হঠাৎ ওই তেলের সংকট তৈরি হয়। বাজারে বেশি দামে তেল পাওয়া যায়। গ্রেনশপে তেল নেই। সঙ্গে সঙ্গে পোস্টার পড়ে গেল স্টেশনে ডিপার্টমেন্টে, রেলগাড়িতে। তারিখ ঘোষণা করে বলা হল ওই নির্দিষ্ট দিনে শ্রমিক কর্মচারীরা নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের অফিসারের সামনে সমবেত হবেন। সরিষার তৈল ও অন্যান্য জিনিসের সরবরাহ নিয়মিত হলে তবেই কাজে যোগ দেওয়া হবে; নচেৎ কাজ বন্ধ থাকবে। সবাই তৈরি হয়ে গেল। যথাসময় হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী দোমহনি ডিস্ট্রিক্ট অফিসের সামনে হাজির হলেন। কাজ বন্ধ। সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত সমাবেশ। মাঝে মাঝে শ্লোগান দেওয়া হয়। রেলের বড় অফিসাররা লালমণির হাট ও কলকাতার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন। পরে ইউনিয়নকে জানিয়ে দিলেন, আগামীকাল থেকে সরিষার তেল ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া হবে: ইউনিয়নের প্রতিনিধি সঙ্গে করে বার্নিশ বাজার থেকে সরিষার তেল ক্রয় করা হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা জনৈক হারাধন ড্রাইভার একটি মেমো হাতে করে এসে ইউনিয়ন অফিসে জানালেন, অসুস্থ অবস্থায় সিক রিপোর্ট দিতে ফোরম্যান সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি ডাক্তার সাহেবকে মেমো লিখে দিয়ে বলছেন, কাজ করতে হবে। মেমোতে লেখা আছে, Please advise this driver to work with medicine. রুগি সম্পর্কে ডাক্তারকে এমন নির্দেশ দেবার ঘটনা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। ফোরম্যানের কাছে যাওয়া হল। ফোরম্যান সাহেব অল্প দিন হল এসেছেন। তিনি হুকুমের দ্বারা কাজ চালাতে চান। কাজের খুব বিশৃঙ্খলা। তার অফিসঘরে আরও সাত-আট জন ড্রাইভার তাদের নানা অসুবিধার কথা ফোরম্যানকে বলছেন। ফোরম্যান টেবিল চাপড়িয়ে গরম গরম কথা বলছেন। ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি বাইরে বেরিয়ে লোকো শেডের জপফদের সঙ্গে খানিক চেঁচামেচি করে এসে চেয়ারে বসলেন। ওই মেমোটা দেখিয়ে বলা হল, This is irregular memo you can simply direct for medical advice. সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন, I am right. My order will stand. Get out from my office. ইউনিয়ন নেহি মাঙ্গতা। আমরা বেরিয়ে এসে সোজা শেডের মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদের সামনে উপস্থিত হলাম, কথা বললাম। কাজ বন্ধ হয়ে গেল। ফোরম্যান চাক্কা বন্ধের আওয়াজ শুনে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে একা একাই চেঁচাতে লাগলেন 'চাকা চালু'। পরে বেগতিক দেখে সোজা বাংলোতে চলে গেলেন। সর্বত্র খবর পৌঁছে গেল। সহকর্মীরা সব এসে হাজির। সব ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজ ছেড়ে শ্রমিক কর্মচারীরা চলে এলেন। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। ইঞ্জিনের সামনে শত শত লোক দাঁড়িয়ে গেলেন: ড্রাইভার, ফায়ারম্যান ইঞ্জিন থেকে নেমে এলেন। লাইনে লাল নিশান পোঁতা হল। ট্রেনের যাত্রীরাও সমবেত শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে দাবি করলেন, এখনি বিচার চাই। অপদার্থ ফোরম্যানকে অপসারিত করো। বড় সাহেবরা এলেন। ফোরম্যানকে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা হল সিক মেমো বাতিল করা হল। অপরাপর ড্রাইভারদের অসুবিধাগুলি দূর করার আশ্বাস দেওয়া হল। ঘণ্টা চারেক পরে আবার রেলের চাকা চালু হল।

প্রসঙ্গত জানাই, ইউনিয়ন শুধু রেল শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছে এমন নয়। ১৯৪২-৪৩ সালে 'মা, একটু ফ্যান দাও' বলে যখন গ্রাম বাংলার মায়েরা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে লাগলেন তখন, ইউনিয়ন অফিসে লঙ্গরখানা খুলে প্রতিদিন শতশত নরনারীকে খাওয়ানো হত। প্রায় দুই মাস যাবৎ শ্রমিক কর্মচারীদের সাহায্যে এই লঙ্গরখানা চালানো হয়। গান বাঁধলেন শ্রমিকরা। কমরেড পাঁচুতুরীর লেখা গান,

ইউনিয়ন জিন্দাবাদ হামারা ইউনিয়ন জিন্দাবাদ
এক হামারা দুখ হ্যায় ভাইয়া ভাইয়া এক হামারা সুখ
এক হামারা ঘর দরবাজা কেইসে হোগা ফুট
হামসে কেইসে হোগা ফুট—
মগর হোমসে রহনা মজদুর তুমহে ফুট না আওয়ে,
সেই সে তুমহে ফুটনা আওয়ে—
ধনীয়োঁকা দালাল সেইসে তুন্‌হে ঘুসনা যাওয়ে।
তুহি ভাই রেল চলাকর অন্‌চলাচল কিয়া
লঙ্গরখানা খোল তুহিনে মা-বহিন বাঁচায়া
আব্ তুহিনে আপনি হালৎ জনতাকো জানাও
আপনি মাঙ্গো পিছেয়োতু জনতায়োকো লাও,

তব তুমাহারা জান বাঁচেগা আউর তুমহারা মাঙ্গ—
তব যাকর যা বাঙাল বাঁচেগা আউর সারে জাহান।

জলপাইগুড়ির রেডক্রস ও কলকাতার পিপলস্ রিলিফ কমিটির সহায়তায় রেলের মহিলা সমিতি মারফত শিশুদের জন্য দুধ, নানাপ্রকার ভিটামিন ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

রেলশ্রমিক ও রেল ইউনিয়নের কর্মীরা চা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সংগঠক। রেলের পয়েন্টসম্যান, গ্যাংম্যানরা চা শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। রেলশ্রমিকদের আন্দোলনে সাফল্য দেখে চা শ্রমিক ও কৃষকেরা উৎসাহিত হন।

বি-এ রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লামডিং-এ ১৯৪৬ সালের ৬/৭/৮ ডিসেম্বর। ওই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যে প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয় তার মধ্যে চতুর্থ নম্বর প্রস্তাব হল তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'বাংলা ও আসামের কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য যে তেভাগা আন্দোলন শুরু করিয়াছেন এই সম্মেলন তাহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছে। এই সম্মেলন মনে করে যে, যে সমস্ত জমির মালিকেরা ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থায় তাঁহাদের নায্য অংশ গ্রহণ করেন না তাহারা ফসলের এক তৃতীয়াংশের অধিক পাইবার অধিকারী নহেন। এই দাবির অনুকূলে আইন পাশ করিবার জন্য সম্মেলন বাংলা সরকারের প্রতি আবেদন জানাইতেছে।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জীবনযাত্রার ব্যয় ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৪৬ সালে সারা ভারত জুড়ে রেলের চাকা বন্ধের আওয়াজ ওঠে। ১৯৪৬ সালের ২৭ জুন সারা ভারত রেল ধর্মঘট ঘোষিত হয়। A.I.R.F থেকে এই ঘোষণা করা হয়। দাবি ছিল বেতন বৃদ্ধি, মাগ্‌গিভাতা, গ্রেনশপ, পে-কমিশন ও এডজুডিকেশন। সারা ভারত জুড়ে রেল লাইনে এই প্রথম সংগঠিত আন্দোলন। জাতীয় জাগরণ দেখা দিল ইংরেজ মালিকদের বিরুদ্ধে। ইংরেজ মালিকরা দাবি মানতে বাধ্য হল। এই জয়ে ডুয়ার্সের সমস্ত শ্রমিকরা লাল ঝান্ডা উঠিয়ে বিজয় উৎসব পালন করলেন ও প্রতিটি স্টেশন এবং গ্যাং কোয়ার্টারে অভিনন্দন জানানো হল।

তেভাগা

তিস্তা নদী জলপাইগুড়ি জেলাকে দুভাগ করেছে। পশ্চিম পারে জলপাইগুড়ি জেলা শহর এবং সংলগ্ন গ্রাম। পূর্ব পার থেকে ডুয়ার্স। ডুয়ার্সে চা বাগান এলাকাও গ্রাম। চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে তপসিলি উপজাতি উরাও, মুণ্ডা, ঘারিয়া বেশি। নেপালি শ্রমিকও আছেন। অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরাই অধিকাংশ।

পটল ঘোষ, মান সিং, বুধন, জুলিয়াস, ফাগুরাম ওঁরাও, জগন্নাথ ওঁরাও প্রমুখ চা শ্রমিক, রেলশ্রমিক, ও কর্মীদের চেষ্টায় কৃষকদের মধ্যে তেভাগার হ্যান্ডবিল বিলি হতে থাকে এবং মিটিং মিছিল শুরু হয়। গ্রামের গরিব আধিয়ারদের তেভাগার দাবিকে চা শ্রমিক, রেল শ্রমিক প্রভৃতি সকলে একটা সামগ্রিক বাঁচার দাবি হিসাবে গ্রহণ করেন। তাই রেল শ্রমিক, চা শ্রমিক ও কৃষকদের অভূতপূর্ব ঐক্যের সেতুবন্ধনে ডুয়ার্সে তেভাগা সংগ্রাম শুরু হয়। মালবাজার, ওদলাবাড়ি, নেওড়ামাঝিয়ালি, মহাবাড়ি, বাতাবাড়ি, মহুলবাড়ি, তেশিমলা, সুলকাপাড়া, সাঁওগা, কলাগাইতি, সরুগাঁ প্রভৃতি এলাকায় এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে।

"তুলব না ধান পরের গোলায়
মরব না আর ক্ষুধার জ্বালায়, মরব না

পঞ্চাশে লাখ প্রাণ দিছি, মা বোনেদের মান দিছি
সাদা হাতির কালো মাঁহুত তুলি না।"

তরাইয়ে তেভাগার লড়াইয়ে জোতদারদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডার লাঠিতে কমরেড মাধব দত্তের মাথা ফেটেছে। ধানের গায়ে অন্নদাতা কৃষকের রক্ত ঝরেছে। ডুয়ার্সের গ্রামে গ্রামে চা বাগানে ও রেল লাইনে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। কালবাজারে রেলের ইউনিয়ন অফিসে মিটিং চলছিল। সেখানে কয়েকজন উপজাতি কৃষক এসে বলল, 'একঠো ঝান্ডা দিজিয়ে। ওদের হাতে একটা লাল ঝান্ডা দিজিয়ে, পহিলা মার্চ দোমহনি মিটিংসে জায়গা।' ঠিক ওরা দল বেধে মিটিং-এ গেল। কিন্তু সে যাওয়া সাধারণ মিছিল মিটিং-এ যাওয়া নয়। ডুয়ার্সের কৃষক, চা শ্রমিক ও রেল শ্রমিকের উত্তাল তরঙ্গ।

লালমণির হাট থেকে মাদারিহাট ২০০ মাইল রেলপথের উপর যেন ডুয়ার্সের জনজীবন ঝাঁপিয়ে পড়ল। ট্রেনে জায়গা নেই, গাড়ি চাই, স্পেশাল ট্রেন চাই। দোমহানিতে রেলের বড় সাহেবরা ছুটাছুটি শুরু করলেন। স্টেশনে স্টেশনে চা চালান দেওয়ার জন্য যে সব খালি মালগাড়ি ছিল সেগুলি জুড়ে দেওয়া হল। কিন্তু তাতেও বহু লোক পড়ে থাকল। ইউনিয়নের নেতাদের কাছে বড় সাহেবরা অনুরোধ করলেন, 'প্লিজ ম্যানেজ।' গাড়ির অভাবে বহু লোক পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। মায়েরা পিঠে বাচ্চা বেঁধে চলেছেন, ছেলেদের কাঁধে তির ধনুক, টাঙ্গি, কিছু চিড়া মুড়ির পোটলা। বালকদের হাতে ঝান্ডা। গোটা গোটা পরিবার চলেছেন।

জেলা শাসক দোমহনিতে ১৪৪ ধারা জারি করে জনসভা নিষিদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু সেদিন ডুয়ার্সের যে গণদেবতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তাকে শাসন করার ক্ষমতা জেলা শাসকদের ছিল না। শুধু দোমহনি নয় সারা ডুয়ার্স জুড়ে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যযুদ্ধ আওয়াজ তুললেন, 'বিলেতি মালিক লন্ডন ভাগো', 'জমিদারি খতম করো', 'তে-ভাগা দাবি মানতে হবে' ইত্যাদি। ১৪৪ ধারা ভেঙে বিশাল সভা হল। কমরেড জ্যোতি বসু ওই সভায় ভাষণ দেন। সকলেই উৎসাহিত হয়ে ফিরে চললেন। যারা গাড়ির অভাবে দোমহনি মিটিং-এ আসতে পারেননি তারা দলে দলে উপস্থিত হয়ে তে-ভাগা করতে লেগে পড়লেন।

মহাবাড়ি বস্তির বড় জোতদার গয়নাথের খোলানে তে-ভাগা একটি স্মরণীয় ঘটনা। মেটেলি থানার মহাবাড়ি বস্তি থেকে মাল থানার পনোয়ার বস্তিতে অবস্থিত কৃষক সমিতির অফিস পর্যন্ত পাঁচ-ছ' মাইল রাস্তা যোগাযোগ রক্ষা করে কৃষক শ্রমিকরা তে-ভাগা করছিলেন। পুলিশ বাহিনী জোতদারের পক্ষ হয়ে তেভাগাকারী কৃষক শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। গুলিতে ন' জন ঘটনাস্থলে মারা যান। সাত জন গুরুতর আহত হন। গুলি খাওয়া আহতদের মধ্যে ছিলেন বাতাবাড়ি চা বাগানের পাতরাশ ওঁরাও, ওদলাবাড়ি চা বাগানের জিতু কুমার, হোসনা ওঁরাও, মঙ্গরু ওঁরাও, সাওগাঁ বস্তির ভুলন ওঁরাও, দক্ষিণ ওদলাবাড়ি বস্তির বুধু ওঁরাও, শুকা ওঁরাও প্রভৃতি। আহতদের কাঁধে করে নিয়ে মাল জংশন রেল হাসপাতালে ফার্স্ট এড-এর ব্যবস্থা করেন। নিখিল, বিনয় প্রমুখ লোকো শেডের শ্রমিকরা আহতদের স্ট্রেচারে করে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। নিহতের মধ্যে ছিল একজন আট বছরের বালক। হাতে ছিল লাল ঝান্ডা। পুলিশের গুলিতে যখন বালকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখনও তার হাত থেকে লাল ঝান্ডা ছাড়েনি।

রেলের পয়েন্টসম্যান মান সিং। সাত দিনের ছুটি নিয়ে তে-ভাগা করতে বেরিয়েছিল। মানসিং চলত আধা মিলিটারি বেশে। পায়ে বুট ও ফুলমোজা, খাঁকি হাফপ্যান্ট। গরম ওভারকোট আর একটা বড় সাহেবি টুপি। কোমরে থাকত ভোজালি। ওভারকোটটি ছিল তার

শীতের বিছানা। এক সন্ধ্যায় মানসিং বলল, একমাস ধরে তার পায়ের বুট খোলার অবসর হয়নি। মিটিং আর ভলান্টিয়ার বাহিনী নিয়ে তে-ভাগা এই ছিল একমাস ধরে নিয়মিত কাজ।

রানারহাট, বিন্নাগুড়ি অঞ্চলে চা বাগান সংলগ্ন গ্রামগুলিতে তে-ভাগা শুরু হয়েছে। কৃষকেরা সরুগাঁ বস্তিতে তে-ভাগা করে ভলান্টিয়ার নিয়ে নেওড়ামাঝিয়ালি প্রবেশ করেন। ব্রহ্ম.ধুয়ায় বড় বিরসার দল পুলিশদলকে তাড়া করে পিছু হটিয়ে দেন। নেওড়া মাঝিয়ালিতে এই ভলান্টিয়ার দলের নেতৃত্বে ছিলেন ট্রাইবাল মেয়ে পোকো ওঁরাও ও তার বোনেরা। ফরেস্টের মধ্যে শিবির হয়েছে, সেখানে খাবার জন্য ধানের গোলা খুলে দিয়েছেন ট্রাইবাল ধনী কৃষক বন্দে ভগত, বিজলা ভগত প্রমুখ। অত্যাচারী জোতদারকে গাছের সঙ্গে বেঁধে মেয়েরা শাস্তি দিয়েছে। খুশি মহাম্মদের খোলানে তে-ভাগা করতে গিয়ে নেতৃত্ব দেন বন্দে ভগতের মা, লেধরা বুড়া, সরবরু মহাম্মদ প্রভৃতি।

তে-ভাগার সময় মাদল বাজানো হত। মাদলের বাজনা রিলে করা হত গ্রামে গ্রামে ও চা বাগানে। মাদলের বাজনা শুনে তির ধনুক সজ্জিত হয়ে শ্রমিক কৃষকেরা চলতেন তে-ভাগায়। বিশ্বস্ত নেতা ও কর্মী ছাড়া অন্য কেউ লালঝান্ডা বাড়িতে ওড়াতে পারত না। যার বাড়িতে লাল ঝান্ডা উড়ত তার খুব সম্মান ছিল।

তেভাগার সময় ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার সাংবাদিক ননী ভৌমিক ডুয়ার্সে এসেছিলেন। ওই সময় কমরেড পটল ঘোষ ও ননী ভৌমিক গ্রেপ্তার হন। সংগ্রাম দমন করার উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিশ ছেয়ে ফেলল মালবাজার ও তার চতুর্দিকে। ধরপাকড় শুরু হল। অপর দিকে, চা বাগানের শ্রমিকদের তেভাগা আন্দোলন থেকে নিরস্ত্র করার জন্য কয়েক পয়সা হাজিরা বাড়িয়ে দালাল লাগিয়ে শ্রমিকদের বোঝাতে শুরু করল, তে-ভাগা কৃষকেরা পারে, তোমাদের সেখানে গিয়ে লাভ কী? ব্যাপক দমন-পীড়ন সত্ত্বেও শ্রমিক কৃষকদের মনোভাব অটুট ছিল। আমাদের আন্দোলনের ফলেই ১৯৫৬ সালে ডুয়ার্সের বড় জোতদার ফতেঁচাঁদ মহেশী, কাউচার আলম, রমণী রাহুত, জমিরুদ্দিন, নিজামউদ্দিন, ইসলাম পণ্ডিত, মুকুট প্রসাদ প্রভৃতির অতিরিক্ত জমি খাস হয়।

পরিশেষে জানাই, ডুয়ার্সের তেভাগা সংগ্রামের নেতা ও বীর সৈনিকের মধ্যে অনেকে আজ জীবিত নেই। কমরেড পটল ঘোষ মারা গেছেন ১৯৭২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মালবাজারে। কমরেড মান সিং সাত দিনের ছুটি নিয়ে আর রেলের চাকুরিতে ফিরে আসেননি। তেভাগা আন্দোলনের শেষে চলে গিয়েছিলেন ভুটানে। কয়েক বছর পরে একবার দেখা হয়েছিল। বললেন ভুটানেও কৃষকদের মধ্যে লালঝান্ডার কথা চলছে। গুলি খাওয়া কমরেড পুরিয়া মানকিমুণ্ডা মারা গেছেন। রেল শ্রমিক যদুনাথ সিং ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষণা হলে আত্মগোপন অবস্থায় টি. বি রোগে আক্রান্ত হন। শেষ অবস্থায় জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মারা যান। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস। বালাবাড়ি চা বাগান থেকে মিটিং করে বাস ধরার জন্য বালাবাড়ি মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ দেখলাম এক বৃদ্ধ কঙ্কালসার চেহারা, চোখ দুটি কোটরস্থ, খালি গা, পরনে ছেঁড়া ময়লা এক টুকরা কাপড়। দূর থেকে আমাকে দেখে হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়াল। সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি পাতরাম না? হেসে বলল, হ্যাঁ। কোথায় থাকো, কী কর? বলল, যেখানে যখন যে কাজ পাই করি, দিনমজুরি খাটি। পাতরামের বৃদ্ধ বয়সে এই অবস্থা দেখে মন বড় খারাপ লাগল। মনে হল আমরা, উত্তরসূরিরা অপরাধী। পরে জানতে পেলাম পাতরাম মারা গেছেন।

পরিশিষ্ট

তেভাগার গান

দিনাজপুর জেলার অধীনে খাঁপুরের ঐতিহাসিক বীরত্বপূর্ণ তেভাগা লড়াইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং খাঁপুরের তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড কালী সরকার রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে বন্দি থাকাকালীন ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল এই জংগানটি রচনা করেছিলেন। জং-অর্থে যুদ্ধ, মহরমের সময় সাধারণত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা কারবালা যুদ্ধের বর্ণনা করে ওই গান গেয়ে থাকে। ওই গানের সুরকে ভিত্তি করে গানটি রচিত হয়েছে এবং এই গানে খাঁপুরের তেভাগা লড়াইয়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। খাঁপড়ার 'নানকিং' বিজয় উৎসবে গানটি প্রথম গাওয়া হয়। গানটি সংগ্রহ করেছি কালী সরকারের কাছ থেকে।

একে একে বলে যাই শোনেন বন্ধুগণ
খাঁপুর যুদ্ধের কথা করিব বর্ণন
১৩৫৩ সাল মাঘ মাসের শেষে
তেভাগার রণে কৃষক কুদ্দিল সাহসে ॥
ভাল্‌কা বাঁশের ধনুক নিল হস্তেতে তুলিয়া
চোখা চোখা তির নিল পৃষ্ঠেতে বাঁধিয়া
দলে দলে কৃষক সাজে বলে মার মার
কোমর বান্ধিয়া সবে হৈল তৈয়ার
ঘুটঘুটি আন্‌ধার রাতে ম্যাঘের ঝড়ে পানি
জালিমে এই রাতে বুঝি করিবে দুশমনি ॥

পৃষ্ঠে বান্ধি ধনুক তির চোঙ লইয়া করে
ভোলান্টি পাহারা দেয় পতিরামের মোড়ে
এমন সময় দ্যাখ দূরে দেখা যায়
মটোর গাড়ির বাতি মিটি মিটি চায়
মিলিটারির গাড়ি আসে ভেলান্টি ভাবিল
হুঁশিয়ারি বলি মর্দ চোঙে ফুঁক দিল ॥
ডিং ডিং শব্দে লাগ্‌রা উঠিল বাজিয়া
ইনক্লাব শব্দে আকাশ উঠিল কাঁপিয়া
না ঢুকে সৈন্যের গাড়ি রড় দিল রণে

পতিরামে ঢুকিয়া মোড় দিল ডানে
কতক দূর হৈতে গাড়ি কতেক দূরে যায়
বড় রাস্তা ছাড়ি গাড়ি গাঁয়ের পথে যায় ॥

এক ধারে উঁচা পাহাড় একধারে বাড়ি
শুলশুলি পথে মোটর যায় গুড়ি গুড়ি ॥
সম্মুখে ফাঁকা জায়গায় মোটর গাড়ি থুইয়া
নামিল কতেক সৈন্য বন্দুক কাঁধে লইয়া
আন্ধার রাতে চুপে চুপে বাড়িতে ঢুকিল
গোপেশ ডাক্তারের সাথে পাঁচজনকে ধরিল ॥
হাতেতে হাত কড়ি লাগায় কোমরে বান্ধে দড়ি
কিলচড় মারি তাদের নিয়ে যায় ধরি ॥

গ্রামের মহিলা যত ক্ষেপিয়া উঠিল
ঝাঁকা বারণ হস্তে মোটর ঘেরিল ॥
নারীগণ সৈন্যে কয় শোনরে গোলাম
সবারে ছাড়িয়া দাও করিয়া সেলাম ॥
ঝাঁটার বাড়িতে নহে খতম হবে
বাপ দায় দিয়া ঘরে ফিরে যাও সবে।
নারী ভেলান্টিয়ার সাথে মরদ আসে জুটি
পৃষ্ঠে বানধি ধনুক-তির হস্তে মোটা লাঠি ॥

সৈন্যের গাড়ির পিছে দেখা নাহি যায়
ট্রেঞ্চে খোঁড়ে কতক বীর গেরিলা কায়দায় ॥
সম্মুখে জনতা দেখি সৈন্যের কাঁপে হিয়া
নিজ নিজ ঘরে সবে যাইরে ফিরিয়া ॥
মুখে বলে এই বাত ট্রাক পিছায় ধীরে
গিড়িত করে পলো গাড়ি গাড়িয়ার ভিতরে ॥
প্রমাদ গণিল সৈন্য জান বুঝি গেল্
সম্মুখে তিরের ফালা পিছনেতে খাল ॥
ফায়ার ফায়ার বলি কাপ্তান ডুকুরিয়া উঠিল
অঙ্গ কাঁন্দে ঘন মুতে প্যান্ট ভিজে গেল ॥

বত্রিশটা বন্দুকের গুলি ছোটে ঝাঁকে ঝাঁক
প্রলয়ের আগুনে যেন ছাইল ব্যাবাক ॥

সাজিল কতেক সৈন্য মালকোচা সাটি
ঝাপ্টে নিল তির-ধনুক কোন্দে ঘোরায় লাঠি ॥

ডিং ডিং ডিং ডিং তাং-ধিতাং নাগরা মাদল রবে
সামিল কৃষক সৈন্য ভয়ঙ্কর সবে ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে তির ছোটে লাঠি বনবনে
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য ভয় নাহি মনে ॥
সামনে গুলি মারে সৈন্য পিছনে জমিদার
ছুটিল গেরিলা দল সময় নাহি আর ॥

ছুটিল চিয়ার সাই হস্তে মোটা লাঠি
জোয়ান মর্দ বাপের বেটা আটত্রিশ ইঞ্চি ছাতি ॥
দোহতিয়া বাড়ি মারে সৈন্যের মাথায়
বাপ ডাক ছাড়ি সৈন্য টলে পড়ে যায় ॥
হঠাৎ লাগিল গুলি বাম কাঁধের পরে
ক্রোধ ভয়ে বাপের বেটা যায় নিজ ঘরে ॥
ঘর হতে চিয়ার সাই শাবল এক আনিল
সবলে ট্রাকের চাকা ফাটিতে লাগিল ॥
আর এক গুলি চিয়ার সায়ের বুকে ফোটে
আন্‌ধার হৈল দুনিয়াদারি বেতন গেল টুটে ॥

ক্ষণে অচেতন মর্দ মনেতে চেতন
লাফ দিয়া ট্রাকে উঠে সিংহের মতন ॥
দুশমনের গুলি ফের লাগিল কপালে
বেহুঁশ হৈল মর্দ রুহু ছেড়ে দিল
অভিমানে মায়ের বুকে আছড়ি পড়িল ॥
চিয়ার সাই পোল দেখে ক্ষেপিল সকলে
দিশা নাই হুঁশ নাই মার মার বলে।
লম্ফ দ্যায় কোন মর্দ কেহ হামাগুড়ি
অন্য কথা নাহি মুখে মার মার বুলি ॥
মটোরের চাকা কেহ দুহাতে দিয়া টানে
কেহ আছড়ায় কেহ কামড়ায় হুঁশ নাহি মনে ॥
তির ধনুক শাবল লাঠি হামুয়া কুঠার
মারিছে সবাই দ্যাখ যা দিল যাহার
কেহ ছোড়ে ঢিল এক অন্ধ ছিটোয় বালি
মার মার মার খালি মার মার বুলি ॥

বন্দুকের গুলি মুখে টিকিতে না পারে
একে একে বীরগণ ঢোলে ঢোলে পড়ে ॥
তিনখানি ট্রাকের মধ্যে অবশ করল দুই
শহিদের রক্তে রাঙা হয়ে গেল ভুঁই ॥

একে একে একুশ বীর জান ছেড়ে দিল
শহিদের রক্তে রাঙা লাল ঝান্ডা হল ॥

যুগযুগের রুদ্ধ রাগ এই মত করে
ফাটিয়া পড়িল ভাই ওই খাঁপুরে ॥
এই খানেকে আমার জংগান সাঙ্গ হয়ে গেল
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ সবাই মুখে বলো ॥

এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী গানটি রচনা করেছিলেন রংপুরের কৃষক জামশেদ আলি চাটি। গানটি রংপুর অঞ্চলের অজ্ঞাতনামা লোককবির রচিত বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, তা সঠিক নয়। জামশেদ আলি চাটি তেভাগা আন্দোলনের সময় গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে গান গেয়ে কৃষকদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। গান গাওয়ার অপরাধে চাটি মহম্মদ আত্মগোপন করে থাকার সময় তিনি তার স্ত্রী ও কন্যাকে হারিয়েছিলেন। গানটি রংপুরের ডিমলা থানার নাওতারা গ্রামে বসবাসকারী একজন অত্যাচারী মাড়োয়ারি জোতদারকে নিয়ে রচিত। ওই মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর নাম কোরামল দাগা। তিনি কৃষকদের যারপর নাই শোষণ করতেন। তেভাগার লড়াই চলাকালীন আধিয়ার চাষি বাবুরি বর্মণ দলবল নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ধান কাটতে গেলে সম্ভাব্য বিপদ বুঝে কৃষক নেতা মণিকৃষ্ণ সেন তাকে নিরস্ত করতে মাঠে যান। ওই সময় কোরামল বন্দুক ও লাঠিধারী পাইক নিয়ে রংপুরের কৃষক নেতা মণিকৃষ্ণ সেনকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তোলেন। এই ঘটনার খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে রাজবংশী কিষাণ কিষাণীর দল প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে লাঠি ও বল্লম হাতে বাবুরি বর্মণের মা সত্তর বছরের বৃদ্ধা নয়নতারা বর্মণীর নেতৃত্বে কোরামলের আস্তানায় ছুটলেন। গাইন হাতে নয়নতারা আঙিনার শক্ত দরজা ভেঙে কোরামলকে ধরে পিঠে গাইনের কয়েক ঘা বসিয়ে বললেন, ‘কেনে মারলু আমার নেতাটাকে’। শিল্পী সোমনাথ হোড় ‘তেভাগার ডাইরি’তে এ ঘটনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। রংপুরের কৃষক নেতা-বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক শান্তি সান্যাল ‘মণিকৃষ্ণ সেন: জনগনমন অধিনায়ক’ নিবন্ধে লিখেছেন, ‘শিল্পী সোমনাথ হোড়-এর তেভাগার ডায়রি সম্প্রতি ছেপে বেরিয়েছে। উত্তর রংপুরের ডিমলা, ডোমার এলাকার তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বের কাহিনী সেখানে ধরা আছে। জোতদারের লাঠিয়াল মণিকৃষ্ণদার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। তার স্কেচ ডায়রিতে আছে। এই কাহিনী নিয়ে চাটি মহম্মদের (জামশেদ আলি চাটি) গান আছে’ (দ্রষ্টব্য : সংগ্রামী জননেতা কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন: মোতাহার হোসেন সুফি সম্পাদিত; প্রথম প্রকাশ ১ নভেম্বর ১৯৯২, প্রমোদাসুন্দরী সেন কল্যাণ ট্রাস্ট, রংপুর, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা: ৩৮, ৩৯)। গানে ‘কাইয়া’ শব্দটি প্রতীক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ‘কাইয়া’—অর্থে ‘কাক’। এই কাক হল সেই কোরামল দাগা। গানটি ওই সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং কোরামলের সহায়তায় পুলিশ কর্তৃক গানটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। জামশেদ আলি চাটি-র রচিত এই গানটি মণিকৃষ্ণ সেনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।

বিকান থাকি আলুরে কাইয়া
হাতে লইয়া ঘটি,

আস্তে আস্তে নিলুরে কাইয়া
মোদের দেশের মাটি
কোন দেশের নাড়িয়া কাইয়ারে
মোরে দেশে আলুরে কাইয়া,
মোরে মাটি নিলু,
পেটের ভোগে তেভাগা চাইতে
মাথাতে ডাঙ্গালু।
কোন দেশের নাড়িয়া কাইয়ারে।
কাইয়া কান্দে কাইয়ার মাও
মণি সেনের মাথায় ডাঙ্গেয়া
কি করিস উপায়
কাইয়া কান্দেরে।

চল্লিশের দশকে রংপুরের বিনয় রায় জাপান বিরোধী, দাঙ্গা বিরোধী, নৌ-বিদ্রোহ বিষয়ে, তেভাগা আন্দোলন বিষয়ে গান রচনা, সুর সংযোজনা ও গান গেয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের কুনজরে পড়ে ছিলেন। গণসংগীত জগতে তিনি ছিলেন কিংবদন্তি প্রতীক। দেশভাগের বছরে তাঁর তিনখানি গানের উপর ঔপনিবেশিক সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিল। ওই গানগুলির মধ্যে একটি ছিল কাশ্মীর সংক্রান্ত গান অপরটি নৌ-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। তেভাগার রক্তঝরা দিনগুলিতে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করতে তিনি 'ডাঙুয়ার বধুয়া তুই'— ওই গানের সুর অবলম্বনে একটি নতুন গান বেঁধেছিলেন। গানটিতে কৃষকের উপর জোতদার-মজুতদারের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

গরিব দেশবাসী গরিব কিষাণ ভাই
তুই খ্যাত্যাৎ করলিরে ফসল
সেই ফসল কাড়িয়া নিল
মজুতদার শয়তানে,
গরিব কিষাণ ভাইরে।
তুই জলোইতে ভিজিলি,
ঐ দোত পুড়িলি
হাড় ভাঙা খাটলিরে তুই
ফসল না তোর ঘর ওঠে
চিনিয়ে নেরে বাটপাড়ে
গরিব কিষান ভাই রে।

চল্লিশের দশকে মালদহ জেলার দুই গম্ভীরা শিল্পী গানের মাধ্যমে লোভী মহাজন এবং চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালিয়ে কৃষক সমাজে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। ওই দুই জনপ্রিয় গম্ভীরাগায়ক হলেন গোবিন্দ শেঠ ও বনমালী কুণ্ডু। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর যখন জমিদার ও মহাজনের লোক কৃষকের ধান বলপূর্বক নিয়ে যায়, তখন কৃষক সভার আহ্বানে তারা লড়াই করতে এগিয়ে আসে। বিপদ আপদ-ভয় দুর্বলতা তখন তাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। গোবিন্দ শেঠ রচিত এই গানটিতে সে কথাই ফুটে ওঠে। গানটি এতই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে শেষপর্যন্ত অবস্থা সামাল দিতে মালদহের জেলাশাসক

ঢোল মহরত আদেশ জারি করে সারা জেলায় গম্ভীরা গান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ওই গান গাওয়ার অপরাধে জেলাশাসক তৎপরতার সঙ্গে গায়ক গোবিন্দ শেঠকে চরম শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন এবং শিল্পীর গান গাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তেভাগার ইঙ্গিত গানটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। মালদহের কৃষক নেতা নরেন চক্রবর্তীর কাছ থেকে গানটি সংগ্রহ করেছি।

ওরে জমিদারের চর আইস্যাছে কাড়ইয়া নিতে ধান
ছাইরবো না ভাই ঘরের লক্ষ্মী
দ্যাহে থাকিতে প্রাণ ॥

জলে ভিজইয়া,
রোদে পুড়ইয়া,
আনছি ঘরে লক্ষ্মী—
তোমরা থাইকো সাক্ষী ॥
তারই আইজ গায়ের জোড়ে লইতে আইছে ওরা।
এ ধান দিমু না,
এ লক্ষ্মী—ছাড়মু না
দ্যাহে থাকিতে প্রাণ
ওগো মা আমরাও তো তোমারি সন্তান ॥

মালদহের গম্ভীরা গায়ক ও কবি বনমালী কুণ্ডু তেভাগার উপর অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন। শ্রেণী বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক প্রচার করা হচ্ছে বলে ব্রিটিশ সরকার ওই গানগুলির প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল। বনমালী কুণ্ডুর রচিত এই গানটি সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ খুলে দিয়েছিল। কৃষক নেতা নরেন চক্রবর্তীর কাছ থেকে গানটি সংগ্রহ করেছি।

শোনরে ভোলা নানা মাঠে নাইকো দানা
ক্যানে দিলি এমন সাজারে
তোর ভূতের বেগার খাটা
ভাত নাই আধ পেটা
হামার খাঁচা হয়্যাছে বুকের পাঁজারে ॥

এবারকার আকাশ হতে কালা আগুন ঝড়েছে ভোলা
গায়ের মানুষ উজার হল
ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বরে
ভোলা বাঁচি কেমন করে ॥

মহাজনের চোরাবাজারে ও ভোলা
তুই তাদের করলি রাজারে
সকলি দেখা নাক ডাক্যা
ঘুমাও পড়্যা খায়্যা গাঁজারে

স্বরাজ পাইলে ঘুচাব তোর মজারে ॥

দিনাজপুরের কৃষক কবি তেভাগা লড়াইয়ের অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে সমস্যা জর্জরিত ও অত্যাচার উৎপীড়িত কৃষকসমাজের কথা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি থানার বাসিন্দা রজনী বর্মণ ওই সময় লিখেছিলেন অনেকগুলো তেভাগার গান। পার্টি অন্তপ্রাণ ওই গায়ক কবি তেভাগা সংগ্রামে পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে বীরত্ব দেখান। পরে ধরা পড়লে জেলখানায় মারা যান। তাঁর রচিত কয়েকটি গান।

কৃষক মজুর ভাই
চল চুড়ামুড়ি বেচিব*
*বোটি না হয়
আবহাওয়াব বন্ধ কর ॥
নাই নাই বিধবার বোটি নাই নাই
দশের হাট* হামাদের হাট
*বেটির চুল ছোবা না জোতদার—
কৃষক মজুর ভাই ভাই ॥

(দুই)

ওরে কৃষক ভাই এইবার বান্ধেছি
*হামরয় কৃষক সমিতি-পুলিশের লড়াই
ওরে কৃষক ভাই।

কারো ভাঙ্গিছে হাতরে কৃষক ভাই
কারো ভাঙ্গিছে দাঁত
ছাম *গাইল ফেলে পড়ল ডাং
কিছু পুলিশের মাথাত ॥

ওরে কৃষক ভাই শুনরে গোপন গপ্প কথা
পুলিশ খালে বড় খাসি
ধনীর ঘরত দিয়া লাঠি
কৃষকের মাল গেছে বেশি
জলপান খাওয়ার চুড়ার হাড়ি ॥*

(*বেচিব—বিক্রি করব। বোটি—তোলাবটি অর্থাৎ জোতদারদের বেআইনি আদায়। হামাদের—আমাদের। বেটীর—কন্যার। হামরয়—আমরা। ছাম গাইল—উদূখল।)

** দিনাজপুর জেলার আটোয়ারি থানার রামপুরে তেভাগার লড়াইয়ের সময় আধিয়ারের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ওই লড়াইয়ে পুলিশের দাঁত ভেঙে যায়। ফলে, কৃষকদের উপর নেমে আসে ব্রিটিশ পুলিশের নির্মম আঘাত। প্রতিশোধ নিতে সিপাহিরা কৃষকের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দেয়। পুলিশ কৃষকের ঘর তল্লাশি করে শুধুমাত্র চিড়ার একটি মাটির হাড়ি ছাড়া আর কিছুই পায় না।

জমিদার, জোতদার ও মহাজনের অত্যাচার চরমে উঠলে এক দিকে যেমন অগণিত কৃষক তেভাগার লড়াইয়ে সামিল হয়, অপর দিকে ঋণ জর্জরিত কৃষক ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে দেশত্যাগ করে 'ভোটান' যাত্রা করে। লোক কবি ওই দৃশ্য থেকে গান জুড়েন। গানটির রচয়িতার নাম জানা যায়নি, তবে ওই গান রংপুরের গয়াবাড়ি অঞ্চলের কৃষকের মুখে শুনেছি। ওই একই সুরে তেভাগা সংগ্রাম কালে আরও একটি গান প্রচলিত হয়েছিল। গানটির বিষয়বস্তু, তেভাগা আন্দোলনে আধিয়ার-কৃষকের জঙ্গিরূপ দেখে জোতদার রমেশ বউয়ের হাত ধরে 'ভুটান' অভিমুখে পালিয়ে যাচ্ছে; সঙ্গে গনা নামে তার 'ঢ্যানা' অর্থাৎ আইবুড়ো, অর্থাভাবে এতকাল যার স্ত্রী জুটে নাই, ওই দৃশ্য দেখে সে আনন্দে মেতে উঠেছে। তার আশা যে—এবার বিয়ে করতে পারবে। এই গানকে কেউ কেউ 'উল্টো ভুটান যাত্রা' বলেন। প্রথম গানটিতে কৃষকের দৈন্য ও বঞ্চনার এক অপূর্ব চিত্র ফুটে উঠেছে। ওই গানের দুটি মাত্র লাইন বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হতে দেখা যায় (দ্রষ্টব্য: চল্লিশ দশকের বাংলায় গণসংগীত আন্দোলন: অনুরাধা রায়)। কিন্তু, রংপুরের গয়াবাড়ি অঞ্চলের কৃষ্ণপদ বর্মণ, রহমৎ কফির প্রমুখের কাছ থেকে গানের পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি যেমন শুনেছিলাম হুবহু তা সংগ্রহ করে এখানে তুলে দিলাম। অপর গানটির দুটি লাইন ছাড়া অন্যান্য পঙ্‌ক্তিগুলির হদিশ পাওয়া যায়নি।

বনুসের হাত ধরি অমেশ *ভোটানত যায়
*কান্তাই মাথায় দিয়া ফিরে ফিরে চায় ॥
হামার পেট ত নাই ভাত
মোক মহাজনে করিল তাড়া
ওরে গনা ভিটে মাটি থেকে
মুই উচ্ছেদ হইলাম ॥

হায়রে মোর পোড়া কপাল
মুই কি করিম রে ভাই
ও *বনুস কোনও গতি নাই
চল ভোটানত যাই ॥

(*ভোটান—বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার 'পশ্চিমদুয়ার' বা 'Western Duars'। কান্তাই—কড়াই। বনুস—বউ।)

অপর গানটি:

বনুসের হাত ধরি অমেশ ভোটান যায়
গনা ঢ্যানা এইবার ব্যাটাছাওয়া চায় ॥

চল্লিশের দশকে এই গানটি কৃষক সমাজকে আলোড়িত করেছিল। আধিয়ার যুবকের অন্তরের কথা নিয়ে এমন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গানটির কথা ও সুর কে করেছিলেন তা গুণীজনদের মতে অজ্ঞাতনামা থেকে গেছে। সুধীদার (সুধী প্রধান) কাছে শুনেছিলাম, কোচবিহারের অন্ধ দোতারা বাদক টগর অধিকারি ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত ফ্যাবিলেশিস

সম্মেলন উপলক্ষে ওই গানটি পরিবেশন করেছিলেন। শিল্পী সোমনাথ হোড়ও গয়াবাড়িতে হরিকান্ত সরকারের বাড়িতে এক আধিয়ার জোয়ানের কণ্ঠে ওই গান শুনেছেন। সত্তর দশকে রংপুরের তেভাগা আন্দোলনের কৃষক নেতা অবনী বাগচী, বলরাম সাহা ও পরেশ মজুমদারের কাছে গানটির প্রকৃত রচয়িতা ও সুরকার কে ছিলেন ওই বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে, তাঁরা গাইবান্ধার সাংস্কৃতিক কর্মী পানু পালের কথা বলেছিলেন। রংপুরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী পানু পাল ছিলেন রংপুরের সাংস্কৃতিক স্কোয়াড-এর অন্যতম কর্মী। চল্লিশের দশকে মজুতদার-চোরাবাজারি বিরোধী নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত করে তিনি অগণিত কৃষককে আলোড়িত করেছিলেন। কয়েক বছর কেন্দ্রীয় গণ নাট্য সংঘেও তিনি কাজ করেছিলেন। এই গানের কথা ও সুর বিষয়ে রংপুরে গিয়েও খোঁজ নিয়েছিলাম, কিন্তু সঠিক তথ্যের কোনও সন্ধান পাইনি।

দিনের শুভা *সুরজ রে
*আইতের শুভা *চান
হালুযার শুভা হাল কৃষি
জমিনের *শুভা ধান।

(* সুরজ—সূর্য। আইতের—রাতের। চান—চাঁদ। শুভা—শোভা।)

তরাই-ডুয়ার্সে তেভাগা লড়াইয়ের উপর গান লিখে খ্যাত হয়ে আছেন জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানের শ্রমিক লাল শুকরা ওরাওঁ। তেভাগা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে কৃষক ও শ্রমিকের জন্য তিনি মাতৃ ভাষায় কিছু গণসংগীত রচনা করেছিলেন। তাঁর বোন পোকো ওরাওঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে এ সব গান গেয়ে বেড়াতেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে রচিত লাল শুকরা ওরাওঁ-এর দুটি গান এখানে দেওয়া হল। গান দুটি ডুয়ার্সের কৃষক নেতা বিমল দাশগুপ্তের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।

(এক)

মাল বাজার আনা যানা
মাটিয়ালী থানা রে
শুনো ভাই স্বাধীন দেশকা গানা রে।
এক বিতা পেট লিগিন
গিলি জেল খানারে
শুনো ভাই স্বাধীন দেশকা গানা রে।

(দুই)

হাওয়া চলে সর সর
লাল ঝান্ডা উড়ে ফর ফর
চলু কিশান চলু মজদুর
নিকালিনা যার কিরে
লড়াইকে ময়দান।

১৯৪৬-এ তেভাগা লড়াইয়ের সেই উত্তাল দিনগুলিতে পাহাড়ে কমিউনিস্ট কর্মীরা গ্যাংম্যান, চা শ্রমিকদের নিয়ে এক বিশাল কর্মকাণ্ডে নেমেছেন। নেপালি ভাষায়, রতনলাল ব্রাহ্মণ তৈরি করলেন লাল ঝান্ডার গান।

ইন কিলাব জিন্দাবাদ
লালঝান্ডা জিন্দাবাদ
হামরো ঝান্ডা লাল হো
ইন কিলাব গান হো ॥

'লাঙল যার জমি তার', 'জোতদার মজুতদার হুঁশিয়ার', 'নিজ খোলানে ধান তোলো', 'আধি নাই তেভাগা চাই', 'কর্জা ধানের সুদ নাই', 'দল বেঁধে ধান কাটো', 'ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলো', 'জান দিব, তবু ধান দিব না', 'এক লাঠি, এক মানুষ এক টাকা', ওইসব দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয় স্বাধীনতার দাবি—'ব্রিটিশ সৈন্য সরে যাও—আজ গদি ছেড়ে দাও' ইত্যাদি। কৃষক ভলান্টিয়ার বাহিনী ওই সময় ধানকাটা ও তোলার সময় চার লাইনের একটি গান গাইত। গানটি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার পতিরাম অঞ্চল থেকে (বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা) সংগৃহীত।

*নাল বরণ ঝান্ডা
*রগ্নি বরণ কাইদা
এ ভারত করতে স্বাধীন
সবাই মিলে আগা।

(* নাল—লাল। রগ্নি—অগ্নি)

(তিন)

পারই আর নি বাইম আধি হাল
আর নি বাইম আধি হাল

সারা বছর হাল চাষ করে
কিছুই পাওয়া যায় না ওরে কৃষক ভাই—
ডালি কুলা শূন্য করে* মুই
*গুদিগুদি নিয়ে ঘরে ফিরে যাই
ওরে কৃষক ভাই ॥

এ কি *হামার হাল হইল রে
ওরে কৃষক ভাই
সারা বছর আবাদ করে

কিছুই পাওয়া যায় না ওরে কৃষক ভাই
পারই আর নি বাহিম আধি হাল ॥

(* মুই—আমি। গুদিগুদি—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হামার—আমার।)

তেভাগার লড়াইয়ে কৃষকনেতা ও কর্মী

ঐতিহ্যমণ্ডিত তেভাগা সংগ্রামের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হল। কৃষকদের এই আন্দোলন আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। আমাদের সমাজে দরিদ্র মেহনতিদের কোনও কর্মকাণ্ড ইতিহাসের বিষয়বস্তু হওয়াটা কম বড় কথা নয়। কেননা, ইতিহাস মানেই তো বোঝায় রাজা, রাজবংশ-শাসনকর্তা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি। অগণিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ক্রিয়াকাণ্ড ইতিহাসে থাকে অবহেলিত-অনুল্লেখিত। বৃহত্তর জনসাধারণের কোনও কর্মযজ্ঞ যখন প্রচলিত সমাজে ইতিহাসের বিষয়সূচি হয়ে দাঁড়ায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই ঘটনার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার গভীরতা সম্পর্কে ধারণা করা চলে। বস্তুতপক্ষে অবিভক্ত বলে উনিশটি জেলার শত শত কৃষকের এই সংগ্রাম, ঔপনিবেশিক ভারতের বৃহত্তর গণ আন্দোলনগুলির অন্যতম। ওই আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষককুলের সত্যার্পণ। তেভাগার লড়াই গ্রাম বাংলার কিষাণ সমাজের গৌরব মণ্ডিত ঐতিহ্য ও কৃতিত্ব।

তেভাগার ওই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও কৃতিত্ব যাঁরা রচনা করেছিলেন, যে অজস্র বজ্রমানিক দিয়ে গড়া প্রাণ ওই বিক্ষোভ বহ্নিতে ফুটে উঠেছিল— সেই সব কৃষক নেতা ও কর্মীরা আজ বিস্মৃতপ্রায়। তাঁদের নিয়েই এই তালিকা। এঁরা নিজেদের জীবনের সকল সুখ শান্তি আনন্দ বিলীন করে, কেউ কেউ পৈতৃক সম্পত্তির লোভ-লালসা বিসর্জন দিয়ে, দুঃখী সর্বহারা নিঃস্ব মানুষের জন্য জীবনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন। এঁরা যেমন জমিদার, জোতদারের অমানুষিক অত্যাচারে, পুলিশের গুলিতে, কারাগারে জীবন-মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন, তেমনই বছরের পর বছর জেলখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে তিল তিল করে দুঃখকে সয়েছেন। এই অমর সংগ্রামীদের অসীম আত্মত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা ভুলবার নয়। লাল পতাকায় আদৃত সর্বহারা মানুষের মুক্তির জন্য, শোষণহীন সমাজের জন্য এঁদের আজীবনের ত্যাগ তিতিক্ষা কমিউনিস্ট দল ও তার লাল ঝান্ডাকে চূড়ান্ত রূপ দেবে এবং সেই লাল পতাকার মাঝে এঁরা বেঁচে থাকবেন।

তেভাগার লড়াইয়ে কৃষক নেতা ও কর্মীদের নিয়ে কাজটি আমি প্রথম শুরু করি ১৯৭২ সালে। অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি এই তিনটি জেলা নিয়ে এই কাজ। তেভাগা আন্দোলনে এই তিনটি জেলায় অংশগ্রণকারী কৃষক নেতা ও কর্মীদের পরিচিতি সংগ্রহের জন্য আমাকে বিশেষ করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পূর্ব দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী যেতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই তালিকা সম্পূর্ণ করে উঠতে পারিনি। এর দুটি অন্যতম কারণ, দেশভাগ এবং বেশিরভাগ নেতা-কর্মীদের মৃত্যু। এই কাজ করতে গিয়ে যাঁদের সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়, কৃষ্ণবিনোদ রায়, মণিকৃষ্ণ সেন, অবনী বাগচী, সুশীল সেন, বিভূতি গুহ, নৃপেন ঘোষ, হাজি মোহম্মদ দানেশ, আবদুল্লাহ রসুল, ডা. শচীন দাশগুপ্ত, ডা. অবনী তলাপাত্র, বিমল দাশগুপ্ত,

বীরেন্দ্রকুমার নিয়োগী, নরহরি কবিরাজ, বসন্ত চ্যাটার্জি প্রমুখ উল্লেখ্য। এঁদের অধিকাংশই বর্তমানে প্রয়াত।—সম্পাদক

তেভাগার লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী দিনাজপুর জেলার কৃষক নেতা ও কর্মী

চিয়ার সাই শেখ—বালুরঘাট থানার অধীনে খাঁপুর গ্রামের অধিবাসী। একজন খেতমজুর, যিনি নিষ্ঠার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্ত করে সাচ্চা কমিউনিস্ট কর্মী হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। খেতমজুর চিয়ার সাই ছিলেন খাঁপুরের জমিদার অসিতমোহন সিংহরায় কাছারির মাস মাহিনার চাকর। দুর্ভিক্ষের বছরে দশ হাজার ভুখা মানুষের মিছিল নিয়ে বালুরঘাটে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। খাঁপুরে মজুত বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। এক দিন শেষ রাত্রে শুনতে পেলেন অনেক গোরুর গাড়ির ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ। সন্দেহে তিনি তড়াক করে লাঠি হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। দেখেন, তারই অন্নদাতা সিংহরায় কাছারি থেকে সারিবন্দি ধান বোঝাই গাড়ি চলেছে হিলিতে চোরাবাজারে বিক্রয়ের জন্য। লাঠি বাগিয়ে রুখে দাঁড়ান—'খবরদার, দাঁড় কর গাড়ি। একটি গাড়িও না যায়।' চিয়ার সাইকে ডিঙিয়ে যায় এমন সাহস ওই অঞ্চলে কারও ছিল না। জমিদার অসিতমোহন সিংহরায়ের রাতের অন্ধকারে প্রায় দুই শো বস্তা ধান পাচার করা আর হল না। পরে ওই ধান ভুখা মানুষের মধ্যে সরকারি দরে বিলি করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তেভাগার লড়াইয়ে খাঁপুরের রক্তরাঙা মাটিতে মৃত্যু বরণ করে চিয়ার সাই শেখ দিনাজপুর জেলায় এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। খাঁপুর লড়াইয়ের আগের দিনের ঘটনা, বেঁকি নামে এক কৃষক রমণীর 'জংলি' নামে গোরু অসিতমোহন সিংহ আটক করে। সেই গোরু যখন গর্ভবতী, বেঁকি ছাড়াতে যায়। ওই দিন গুরুচরণ বর্মণ নামে এক আধিয়ারের গোরুও অসিতমোহন আটক করে বরকন্দাজ দিয়ে খোঁয়ারে পাঠালে, গুরুচরণ পথে তার গোরু উদ্ধার করে, তখন বিরোধের সূত্রপাত। জমিদার পুলিশের কাছে খবর পাঠায়। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে খাঁপুরে পুলিশ আসে। এই খবর যখন আন্দোলনের সংগঠকদের কাছে পৌঁছায়, তাঁরা আত্মগোপন করেন। চিয়ার সাই তখন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। খাঁপুরে যখন পুলিশবাহিনীর সঙ্গে কৃষকের অসমযুদ্ধ চলছে, সেই সময় লম্বা চওড়ায় বিশাল চেহারার চিয়ার সাই একটি লাঠি নিয়ে পুলিশের ট্রাকের উপর লাফিয়ে উঠে পুলিশকে পিটাতে থাকে। ওই সময় হাতে গুলির আঘাত খেলে আবার ছুটে বাড়ি গিয়ে, লাঠি রেখে সে শাবল এনে ট্রাকের চাকা কাটতে শুরু করে। এই সময় জমিদার ও পুলিশ বাহিনীর যৌথ আক্রমণে পর পর আরও দুটি গুলি তার বুকে এসে লাগে। মোট বত্রিশ জন সশস্ত্র পুলিশ আর জমিদারের ষোলো জন সঙ্গীর সঙ্গে চিয়ার সাই লড়াই করে, মোট তিনটি গুলিতেই খাঁপুরের মাটিতে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েন।

শিবরাম মাঝি—একজন গরিব সাঁওতাল আধিয়ার। দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর থানার অধিবাসী। ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের বীর সেনানী শিবরাম, দিনাজপুর শহরের চিরির বন্দর এলাকায় ১৯৪৭ সালের ৪ জানুয়ারি সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হন। শিবরাম মাঝি ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শহিদ।

সমিরুদ্দিন আহমেদ—গরিব খেতমজুর। চিরির বন্দর এলাকায় ১৯৪৭ সালের ৪ জানুয়ারি ধান কাটার সময় সশস্ত্র পুলিশ ও কৃষক ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধের মুহূর্তে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। শিবরাম ও সমিরুদ্দিন চিরির বন্দরে পুলিশের গুলিতে একই সময় নিহত হন। সে কারণে সমিরুদ্দিনও ছিলেন তেভাগা সংগ্রামের একজন শহিদ।

শুকুরচাঁদ সিং—সংগ্রামে দুর্জয় সাহসী। ভূমিহীন খেতমজুর। ঠাকুরগাঁ মহকুমার ঠুমনিয়ার অধিবাসী। ১৯৪৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি খাঁপুর কৃষক হত্যার পরদিনই পুলিশের গুলিকে নিহত হন।

বিভূতি গুহ—জন্ম ৭ নভেম্বর, ১৯১০। পিতা কালীনাথ গুহ। মা অমূল্যসুন্দরী দেবী। জন্মস্থান দিনাজপুর বালুবাড়ি। প্রথম জীবনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে জেলখানায় মার্কসবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন। ওই সালে বন্দিশালা থেকে বের হয়ে এসে বিভূতি গুহ, কালী সরকার ও সুশীল সেন এই তিন জন জেলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। দিনাজপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক। তেভাগা সংগ্রামে ফুলবাড়ি, ঠাকুরগাঁ, ইটাহার, চিরির বন্দর প্রভৃতি এলাকায় কাজ করেন। ১৯৪৪ সালে কৃষকের জন্য অতি সরল ভাষায় তিনি লেনিনের বিখ্যাত বই 'গ্রামের গরিবদের প্রতি' প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯৪৮ সালে লেখেন 'রুশ বিপ্লবের ইতিহাস'। আশির দশকে তিনি প্রয়াত হন।

জনার্দন ভট্টাচার্য —জন্ম ১৭ চৈত্র বুধবার, ১৩১৭ সন। পিতা অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য, মা বিরাজমোহিনী দেবী। জন্মস্থান বরিশাল জেলার গৌর নন্দী থানার অন্তর্গত গৈলা, তর্কবাগীশ বাটি। প্রথম জীবনে দিনাজপুর শহরে অনুশীলন দলের নেতা ছিলেন। ১৯৩৯ সালে সারা ভারত কৃষক সভার গয়া অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। তেভাগা আন্দোলনে তিনি সেতাবগঞ্জ অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন। দীর্ঘদিন তিনি আত্মগোপন করে কাটান। অবিবাহিত। বর্তমান ঠিকানা: শকরপুর, ডাকঘর মুদাফত, ভায়া কালিয়াগঞ্জ, জেলা উত্তর দিনাজপুর।

কালিপদ ধর—দিনাজপুর শহরের বাসিন্দা। একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

দীনেশ রায়—জন্ম ১৯ অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩১৮ সন। পিতা লালনোচন্দ্র রায়, মা নগেন্দ্রবালা দেবী। জন্মস্থান দিনাজপুর শহরের ক্ষেত্রপাড়া। দিনাজপুর জেলায় যুগান্তর সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। ১৯৩০ সালে ভারতরক্ষা আইনে কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং ওই সালে জেলা কৃষক সমিতি গঠন হয়েছিল তাঁরই চেষ্টায়। ডা. ধীরেন সেন, রোহিণী ভট্টাচার্য, নগেন মুখার্জি, জীবন মুখার্জি, শিবদাস লাহিড়ী প্রমুখের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ সাহেবের সঙ্গে পার্টি প্রসঙ্গে তিন দিন ধরে তাঁর আলোচনা দিনাজপুর জেলায় এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৯৮ সালে তিনি প্রয়াত হন।

সত্যেন রায়—ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা। পার্টির সব সময়ের কর্মী ছিলেন। ঠাকুরগাঁও ও বীরগঞ্জ থানা অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বড় বড় সভা করে তিন-চারশো কৃষককে সমিতির সভ্য করেছিলেন।

ভূজেন পালিত—১৯২৫ সালের জুন মাসে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা উমাপ্রসাদ পালিত। ছাত্রজীবনে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। তেভাগার অগ্নিক্ষেত্র ঠাকুরগাঁয়ে সক্রিয়ভাবে কৃষকদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন কারাবরণ করেন। কৃষ্ণবিনোদ রায়, নলিনী দাস, অমূল্য সেন, হৃষীকেশ ভট্টাচার্য প্রমুখের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

রামলাল সিং—আটোয়ারি থানার বালিয়া গ্রামের কমরেড। পার্টির সাচ্চা কর্মী।

নরেশ চক্রবর্তী—পার্টি অন্তপ্রাণ। আটোয়ারি থানার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক কর্মীদের শ্লোগান দেওয়া শেখাতেন।

পাখাল সিং—একজন সক্রিয় কর্মী। বহু কর্মীকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে এবং অসময়ে সাহায্য করে অবদান রেখে গেছেন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে কৃষক নেতাদের সঙ্গী হতেন।

বিভীষণ সিং—আটোয়ারি থানার খারিয়া গ্রামের অধিবাসী। পার্টি অন্তপ্রাণ।

তিলক সিং—একজন আদর্শ কমিউনিস্ট কর্মী। আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করতেন।

আভরণ সিং—একজন আদর্শ কমিউনিস্ট কর্মী। আটোয়ারি থানার অধিবাসী।

তেন সিং—সাচ্চা কর্মী।

রাজেন সিং—তেভাগার লড়াইয়ে একজন সংগ্রামী কৃষক।

গোপীমোহন বর্মণ—বোঁচাগঞ্জ থানার একজন লড়াকু কর্মী।

কৃষ্ণদাস মোহন্ত—বালুরঘাট থানার পতিরামের অধিবাসী। এগারো বছর বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। বহুকাল জেল খেটেছেন। পতিরাম, খাঁপুর, গুটিন প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। খাঁপুরে তেভাগার বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বরদাভূষণ চক্রবর্তী—বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও প্রগতিশীল রাজনীতির অন্যতম কর্মী। প্রথম জীবনে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৩৩ সালে হিলি স্টেশনে যে ডাকাতি হয়েছিল—ওই সময় কারাবরণ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারার দরুন বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন। বক্সার ও জেউলি ডিটেনশান ক্যাম্পে অন্তরিন ছিলেন। রংপুর জেলার লাটাসামে তাকে নজরবন্দি রাখা হয় এবং সাত বছর পর ছাড়া পান। পার্টি অন্তপ্রাণ। দুঃস্থ সর্বহারা কৃষকদের তিনি পরম বন্ধু ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর থেকে কমিউনিস্ট মতবাদের নেপথ্য বাহনরূপে 'সন্ধানী' নামে মাসিক পত্রিকাটি তাঁরই সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেন। দেশ বিভাগের পরে তিনি ভারতে না এসে পূর্ব পাকিস্তানেরই দিনাজপুর শহরে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন।

গনেন সরকার—চিকিৎসক। ফুলবাড়ি থানার বাসিন্দা। ১৯৩৮ সালে ফুলবাড়ি থানার লালপুর ময়দানে দিনাজপুর জেলা প্রথম কৃষক সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম।

ভূপেশ ব্যানার্জি—পার্টি অন্তপ্রাণ। দিনাজপুর শহরের অধিবাসী। কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সভ্যপদ লাভ করে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে তেভাগা আন্দোলনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং কৃষক কর্মীদের তেভাগা লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। ওই কাজ করতে করতে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গিয়ে মারা যান।

নব সিং—একজন সাচ্চা কর্মী।

বারু সিং—একজন সাচ্চা কর্মী। আটোয়ারি থানার অধিবাসী।

যুগল বর্মণ—কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ঠাকুরগাঁও পূর্ব অঞ্চলে

তার বাড়িতে ছিল কৃষক নেতাদের আস্তানা। পার্টি অন্তপ্রাণ।

হরি বর্মণ—উৎসাহী তরুণ। হাসিমুখে পার্টির কাজ করতেন।

নবচাঁদ বর্মণ—ঠাকুরগাঁ পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী। উদ্যোগী কর্মী।

অবনী লাহিড়ী—একজন আদর্শ মার্কসবাদী কর্মী ও কৃষক নেতা। ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ১২১ রাউন্ড গুলি চালিয়ে পুলিশ যেদিন খাঁপুরে ২২ জন কৃষককে হত্যা করেছিল। ওই দিনই খাঁপুরের ওই ঘটনাস্থলেই গুলি চালনা ও হত্যার প্রতিবাদে বিরাট এক কৃষক সমাবেশ হয়। অবনী লাহিড়ী ওই সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

সৌরী ঘটক—সাহিত্যিক ও পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। ঠাকুরগাঁও কোর্টে চাকুরি করতেন। ঠাকুরগাঁওয়ে পার্টির গোপন মহকুমা কেন্দ্রটির দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর পিসেমশাই রায়সাহেব গিরীন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে থেকে তিনি পার্টির কাজ করতেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে 'তেভাগা বিল'-এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের উদ্যোগে জোতদারদের একটি গোপন ষড়যন্ত্র সভা গিরীশ চৌধুরীর বাড়িতে হয়। সৌরী ঘটক সে খবর পৌঁছে দেন কৃষক নেতা অবনী লাহিড়ীর কাছে। পর দিনই ওই ষড়যন্ত্রের খবর 'স্বাধীনতা' পত্রিকাতে ছাপা হয়। কিছুদিন পরেই পুলিশ রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চাকরি চলে যায় এবং জেলা থেকে পুলিশ তাঁকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন।

সুশীল সেন—মার্কসবাদী কর্মী ও কৃষকনেতা। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর দিনাজপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩১ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করার পর ১৯৩৪ সালে বি.এ. পাশ করেন। দিনাজপুর জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির গঠনপর্বে যে তিন জন পার্টি সদস্যপদ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সুশীল সেন একজন। ১৯৪২ সালে তিনি দিনাজপুর জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং সেই সূত্রে প্রাদেশিক কমিটিরও সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে পার্বতীপুর রেলওয়ে জংশনে শ্রমিক আন্দোলনও সংগঠিত করেন। ওই সালে এ. আই. টি. ইউ. সি-র সম্মেলন উপলক্ষে মাদ্রাজে যান। ১৯৪৬ অক্টোবর মাসে তাঁরই নেতৃত্বে দিনাজপুর জেলা কমিটি তেভাগা আন্দোলনের বিস্তৃত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়েছিল। এই আদর্শ মার্কসবাদী কর্মী ও কৃষক নেতা প্রয়াত হন ১৯৮০ সালে।

গুরুদাস তালুকদার—জন্ম ১৮৯৬ সাল। পিতা কালীভৈরব তালুকদার, জন্মস্থান রংপুর জেলার পীরগাছা থানার মন্দুনা। কলকাতা ন্যাশনাল কলেজের চতুর্থ বৎসরের ছাত্র থাকাকালীন মহাত্মা গান্ধীর ডাকে দেশমাতৃকার সেবায় কংগ্রেসে যোগ দেন। রাজনৈতিক কারণে পিতার সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে ১৯২১ সালে তিনি দিনাজপুর শহরে চলে আসেন। ১৯৩৮ সালে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে আত্মগোপন অবস্থায় সাংগঠনিক কাজে দিনাজপুরে এসেছিলেন, ফিরে যাবার সময় গোয়েন্দা বাহিনীর নজরে পড়লে পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। তেভাগা লড়াইয়ের সময় তিনি ঠাকুরগাঁও মহকুমার পশ্চিম অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন। দুই যুগেরও বেশি সময় তিনি কারাগারে ও আত্মগোপনে জীবন কাটিয়েছেন। জীবনের এক পর্বে অভিনয়কলাকে একটি সাধনার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নাটকের মঞ্চকে জনশিক্ষা বিস্তার ও গণচেতনা জাগ্রত করবার একটি প্ল্যাটফর্ম বলে তিনি মনে করতেন। ১৯৮০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

রূপনারায়ণ রায়—ভূমিহীন চাষি পরিবারের সন্তান। দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে জন্ম।

পার্টি অন্তপ্রাণ। প্রচারে-সংগঠনে ছিলেন দক্ষ। জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক সমিতি ও কৃষক আন্দোলন তিনি গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৪৬ সালে আইনসভার নির্বাচনে জেলায় কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক করল নির্বাচনে খাস কৃষক সন্তানকে দাঁড় করানো হবে। রূপনারায়ণ রায় হলেন কৃষকদের মনোনীত প্রার্থী। ওই সময় একই সম্প্রদায়ের জোতদার প্রার্থীর বিরুদ্ধে কৃষক প্রার্থী রূপনারায়ণের জয়লাভ, বাংলার কৃষক আন্দোলনে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। তেভাগার লড়াইয়ে তিনি ফুলবাড়ি ও পতিরাম এলাকার দায়িত্বে ছিলেন।

সুধীর সমাজপতি—পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা। দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর এলাকার কৃষকদের সংগঠিত করে তেভাগা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন।

পষ্টরাম সিং—সাচ্চা কর্মী। জেলার রানিশংকৈল থানার অধিবাসী। তেভাগার সময় পুলিশের নির্মম গুলিবর্ষণ তুচ্ছ করে কৃষককুলকে অসীম সাহস জুগিয়েছেন।

শকটু সিং—ঠাকুরগাঁও মহকুমার ঠুমনিয়ার অধিবাসী। ১৯৪৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দু জন কৃষক কর্মীকে পুলিশ ওই গ্রামে গ্রেফতার করতে এলে শকটু সিং তা প্রতিরোধ করেন। বর্বর পুলিশের গুলি তখন শকটু সিং-এর বুক ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

নেন্দালি সিং—ঠাকুরগাঁয়ের ঠুমনিয়ার অধিবাসী। ১৯৪৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

কম্পরাম সিং—কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। রাজশাহী জেলে প্রহরীর গুলিতে মারা যান।

ডোকা সিং—একজন উদ্যোগী কর্মী।

বীরনারায়ণ বর্মন—সাচ্চা কর্মী। ঠাকুরগাঁও মহকুমায় গোপন বৈঠক, মিটিং-এর জন্য নেতারা বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে পাঠাতেন কৃষকদের জমায়েতের জন্য।

মহী বাগচী—আদর্শবান পার্টি কর্মী। রংপুর জেলা থেকে ছুটে এসে দিনাজপুর জেলায় কৃষকদের মধ্যে কাজ করেন ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

সুবোধ সেন—সুদূর ঢাকা থেকে ছুটে আসেন দিনাজপুর জেলায়। তেভাগার লড়াইয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

বিনোদ ঘোষ—বীরগঞ্জ থানার অধিবাসী। জঙ্গি কর্মী।

অখিল সরকার—একজন আদর্শবান কর্মী।

বালা বর্মণ—তেভাগার লড়াইয়ের একজন সংগ্রামী কৃষক।

দোলগোবিন্দ বর্মণ—জঙ্গি কর্মী।

আমিরচাঁদ বর্মণ—একজন জঙ্গি কর্মী।

হেমন্ত বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।

নেন্দু বর্মন—বীরগঞ্জ থানার অধিবাসী। তেভাগা আন্দোলনের জঙ্গি কর্মী।

দুর্গা সেন—সৎ ও আদর্শবান পার্টি কর্মী। কমরেড সেন সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে দিনাজপুর শহরে পার্টির কাজ করেন।

অরুণ সেন—দিনাজপুর শহরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পার্টির আদর্শ ছড়িয়ে দেবার কাজ করেন। ওই সময় তাঁর চেষ্টায় দিনাজপুর শহরে পার্টির সভ্য সংখ্যা বেড়ে যায়।

সুনীল সেন—আদর্শবান পার্টি কর্মী। জেলার ছাত্রছাত্রীদের মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং বেশ কিছুদিন জেলা দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। তেভাগা

লড়াইয়ের দিনগুলিতে ঠাকুরগাঁও পশ্চিম অঞ্চলে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। পরবর্তী কালে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন।

ননীগোপাল দাসমহন্ত—বালুরঘাট থানার অধীনে পতিরামের বাসিন্দা। কৃষক নেতা কেষ্টদাস মোহন্ত ছিলেন তাঁর পিতা। ননীগোপাল দাসমহন্ত প্রথম জীবনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বোল্লা স্বদেশি ডাকাতির কেসে আন্দামান বন্দিনিবাসে কারারুদ্ধ হন। জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তেভাগার লড়াইয়ে পতিরাম ও খাঁপুর এলাকায় আন্দোলন পরিচালনা করেন।

অমূল্য লাহিড়ী—পার্টি অন্তপ্রাণ। বহু কৃষককে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা তলে হাজির করেছিলেন।

অনিল চক্রবর্তী—দিনাজপুর জেলার রানীশংকৈল থানার বাসিন্দা। সাচ্চা পার্টি কর্মী।

মকরচাঁদ—বীরগঞ্জ থানার ছয় নম্বর ইউনিয়নের অধিবাসী। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের সূচনায় পুলিশ তাঁর বাড়ি এসে খানাতল্লাশি করে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

হীরামন বর্মন—সাচ্চা কর্মী। ঠাকুরগাঁও মহকুমার বৈরাগী আখড়াহাটে বসতি। ওই হাটে কৃষক জনসমাবেশে পুলিশ একটি মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে হীরামন মাটিতে ঢলে পড়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিয়ামত আলি—জঙ্গি কৃষক কর্মী। ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। বৈরাগী আখড়াহাটে পুলিশের গুলি চালানোর সময় কমরেড গোরুর গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে কৃষকদের উৎসাহিত করছিলেন, ওই সময় পায়ে একটি গুলি লাগলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। পরে হাসপাতালে পায়ের অর্দ্ধেক কেটে দিতে হয়।

অজিত রায়—দিনাজপুর শহরের অধিবাসী। বিশিষ্ট কৃষক নেতা। তেভাগা সংগ্রামে ঠাকুরগাঁও পূর্ব অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন।

শচীন্দু চক্রবর্তী—জন্ম ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ সাল। পিতা ডাক্তার তারকেশ্বর চক্রবর্তী, মা হেমনলিনী দেবী। জন্মস্থান দিনাজপুর। প্রথম জীবনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন অভিযোগে ১৯৩৬ সালে মেদিনীপুরের হিজলি জেলে বন্দি হন। জেলখানাতেই মার্কসবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন। ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪০ সালে পার্বতীপুর থানার অন্তর্গত চাঁদের হাট গ্রামে তোলাবটি বন্ধ আন্দোলনের ফলে পুলিশি অত্যাচার শুরু হয়। এর প্রতিবাদে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। দিনাজপুরের খ্যাতনামা উকিল যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর পক্ষে দাঁড়ান এবং মুক্তি পান। ওই সময় পুলিশের রিপোর্ট ভুল—'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশে খুবই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সারা জীবনে এগারো বছর জেল খাটেন। তেভাগা সংগ্রামে তিনি চিরির বন্দর অঞ্চলের দায়িত্বে থাকেন। ১৯৯৭ সালে তিনি মারা যান।

বসন্তলাল চ্যাটার্জি—জন্ম ১ মে ১৯১৫। পিতা বিনোদলাল চ্যাটার্জি, মা মৃণালিনী দেবী। জন্মস্থান ইটাহার থানার বড় গ্রাম। ১৯৩০-৩২ সালে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউট-এ সি. ডি. মুভমেন্টের অংশরূপে ছাত্র আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে কৃষক মজদুর আন্দোলনে যোগ দেন। সেখানে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে পার্টির কাজ করেন। ১৯৩৯ সালের শেষে মালদহ জেলার কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে তাঁর নামে হুলিয়া বের হয়। ১৯৪৭ সালের

মার্চ মাসে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৮ সালে তাঁর নামে আবার হুলিয়া বের হয়। পুনরায় ১৯৪৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বন্দি হন এবং ওই সালেই মুক্তি পেয়ে পুনরায় অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দি হন এবং ১৯৫২ সালে আইনসভার নির্বাচনের সময় মুক্তি পান। ১৯৫৭ সালের আইনসভার নির্বাচনে তিনি ইটাহার বিধানসভা থেকে কমিউনিস্ট প্রার্থীরূপে জয়ী হন। ১৯৫৯ সালে খাদ্য-আন্দোলনে রায়গঞ্জ জেলে দশ-পনেরো দিনের জন্য বন্দি হন। তিনি ছিলেন কৃষকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা। দূর-দুরান্তে পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতেন, সঙ্গে তাঁর কাপড় বলতে একটি মাত্র গামছা; এটিই দিল পরনের, ভাত-জলখাবারের ভাণ্ড আবার রাত্রিতে গায়ের চাদর। তেভাগার লড়াইয়ে তিনি ইটাহার অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন। ইটাহার অঞ্চলে মাছ ধরা আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বর্তমান ঠিকানা: তুলসীতলা, ডাকঘর রায়গঞ্জ, জেলা উত্তর দিনাজপুর।

হাজি মোহম্মদ দানেশ—১৪মে ১৯৮৪ সালে একটি পত্রে তিনি জানিয়েছেন, "আমার জন্ম তারিখ কোনখানে লিখা নাই। তবে আমার এক চাচাতো ভাইয়ের জন্মের এক বছর পর আমার জন্ম। তার জন্ম ১৩১১ সালের ভাদ্র-আশ্বিনে। সুতরাং আমার জন্ম ১৩১২ সনের কার্তিক মাসে। আমার পিতার নাম সালামতদ্দিন, মা ওফিরন্নেদা, আমার পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী। অতি শৈশবেই আমার মা মারা যান এবং আমি আমার সৎমার কাছে লালিত-পালিত হই। এই সৎমা নিজের মায়ের মতোই ছিল। এরূপ সৎমা বিরল। আমি ১৯৩৮ সালে হজে যাই। সেখানে আরববাসীদের বাঙালি-মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও দুর্ব্যবহার আমার মনকে বিষিয়ে তোলে এবং সেখানেই মনে মনে শপথ নিই, দেশে ফিরে দেশকে স্বাধীন করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা নেব। তখন দেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ এই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল। কংগ্রেসের সংগ্রামী ঐতিহ্য আমাকে সেদিকেই নিয়ে যায়। কংগ্রেসের কমিউনিস্ট যুবকদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। দিনাজপুর জেলায় তাদের প্রতিষ্ঠিত কৃষক সমিতির আমিও সক্রিয় সদস্য হই। সভা মিটিং করে বেড়াই। সভা মিটিং-এর জন্য আমার বিরুদ্ধে Defence of India Act-এ দুটি case হয় এবং প্রত্যেক case-এ এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও একশো টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ছ' মাস জেল। এ ভাবেই আমার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে আসা হয়। Case হয়েছিল ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে কি ১৯৪০ সালেব প্রথম দিকে। জেল খেটে বের হয়ে আসার পরও আমি সক্রিয় থাকায় ১৯৪২ সালে পার্টি সদস্যপদ লাভ করি এবং তখন হতে আজ পর্যন্ত প্রকাশ্য অথবা গোপনে কমিউনিস্ট পার্টিতে সক্রিয় আছি।" হাজি মোহম্মদ দানেশ জীবনে মোট পনেরো বছর জেল খাটেন। তেভাগার লড়াইয়ের সময় তিনি ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন। ৯০-এর দশকে প্রয়াত হন।

মোহন লালভক্ত—বংশীহারী থানার অধিবাসী। তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।

কৃষ্ট বর্মণ—পার্টি অন্তপ্রাণ। খেতমজুর। দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার অধিবাসী।

রঙ্গলাল প্রধান—খেতমজুর। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। আলোয়াখোয়া, লাহিড়ীহাট, ফুলবাড়ি হাট, সরলামেলা ও জিনপীর মেলায় কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বে থাকতেন। ইটাহার থানার বাসিন্দা।

তফানু বর্মণ—খেতমজুর। ইটাহার থানার অধিবাসী। তেভাগা সংগ্রামী কৃষক।

বাঙ্গর প্রধান—কুশমণ্ডি থানার অধিবাসী। একজন জঙ্গি কর্মী।

ধনবর সরকার—খেতমজুর। পার্টির জন্য কারাবরণ করেছেন।

চৈতু সরকার—কুশমণ্ডি থানার বাসিন্দা। পার্টি অন্তপ্রাণ। কারাবরণ করেছেন।

মতম প্রধান—খেতমজুর। পার্টির সাচ্চা কর্মী।

ভগীরথ সরকার—খেতমজুর, পার্টির সাচ্চা কর্মী।

শশী প্রধান—খেতমজুর। পার্টি অন্তপ্রাণ।

নরিয়া প্রধান—কুশমণ্ডি থানার অধিবাসী। জঙ্গি কর্মী।

ভোজু টুটু—কালিয়াগঞ্জ থানার বরুণা গ্রামনিবাসী। আদিবাসীদের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে তাঁর বিপুল প্রতিষ্ঠা পঞ্চাশ দশক অবধি ছিল। তেভাগার লড়াইয়ে আদিবাসী ভাইদের পাশে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও সমবেত করেছিলেন।

লক্ষ্মী বর্মণ—কালিয়াগঞ্জ থানার অধিবাসী। তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।

ব্রজমোহন সরকার—খেতমজুর। লেখাপড়া জানতেন। গ্রামে গ্রামে সভা সমিতিতে ভাষণ দিয়ে কৃষক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

বসন্ত দেবশর্মা—খেতমজুর। একজন সাচ্চা কর্মী।

মুলিয়া দেশী—তেভাগা আন্দোলনের সময় ভূপালপুরের জমিদারের বিল এলাকায় মাছ ধরবার অধিকারের দাবিতে যে প্রচণ্ড আন্দোলন হয়েছিল, তার নেতৃত্ব দেন। বরুণা ও বৈরাট্টা অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেন। কালিয়াগঞ্জ থানার অধিবাসী। পার্টির সাচ্চা কর্মী।

গুড়িয়া দেশী—তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন কৃষক কর্মী। তাঁর নেতৃত্বে তরঙ্গপুর, খেজুরপুকুর, মুস্তাফানগর প্রভৃতি গ্রামে জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হতে পেরেছিলেন। কালিয়াগঞ্জ থানার অধিবাসী।

মনুয়া প্রধান—ইটাহার থানার অধিবাসী। জঙ্গি কৃষক কর্মী।

ঝাবন লাল ভক্ত—খেতমজুর। ইটাহার থানার বাসিন্দা, সাচ্চা কর্মী।

বনমালী সরকার—খেতমজুর। তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।

কালী সরকার—দিনাজপুর জেলার অধিবাসী। প্রথম জীবনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা শাখা গঠন করেন। দিনাজপুরের গ্রাম-গ্রামান্তরের গরিব অসহায় অত্যাচারিত কৃষকদের সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ির যোগ।

১৯৩৮ সালে ফুলবাড়ি থানার লালপুর ময়দানে প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। তিনিই ছিলেন তার মুখ্য সংগঠক। তেভাগা আন্দোলনে ফুলবাড়ি, পতিরাম, ইটাহার প্রভৃতি অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৯ সালে রাজশাহী জেলে বসে খাঁপুরের তেভাগা লড়াইয়ের কাহিনী নিয়ে লেখা 'জং' গান তাঁর প্রতিভার এক উল্লেখযোগ্য দিক। গানটি সে সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাত্রে তিনি বালুরঘাট হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

নয়ান বর্মণ—একজন জঙ্গি কর্মী। নয়ান বর্মণকে নিয়ে সে সময় একটি ঘটনা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ঘটনাটি হল, একদিন ভোরে দুইজন সিপাহি রাইফেল কাঁধে নিয়ে টহল দিতে দিতে একটি ভাঙা জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাড়ির সামনে একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল,—'এ বাড়ি কার?'

লোকটি উত্তর দিল—'আজ্ঞে নয়ান বর্মণের'।

সিপাহি—'সে কোথায়'?

লোকটি—'সে তো আপনাদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে।'

সিপাহি—'কেন পালিয়ে গিয়েছে?'

লোকটি—'ওকে দেখলেই তো ধরে নিয়ে যাবেন।'

সিপাহি—'পালিয়ে বেড়ানোর দরকার নেই, ওকে বোলো, ও যেন হাজির হয়ে কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে আসে। বাড়ি তো একেবারে ভেঙে গেছে, এখন যদি মেরামত না করে তবে চৈত্র-বৈশাখের ঝড়ে বাড়ি পড়ে যাবে।'

কিছু দুর যেতেই তারা দেখল জোতদারের লোক তাদের দিকে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। কাছে আসতেই—'ওকে ধরো, ওকে ধরো, ওই তো নয়ান বর্মণ।' সিপাহী দুজন আর জোতদারের লোক দুটি এসে দেখে নয়ান বর্মণ উধাও।

রজনী বর্মণ—জঙ্গি কৃষক কর্মী। পার্টি অন্তপ্রাণ। ঠাকুরগাঁয়ের বালিয়াডাঙ্গি থানার অধিবাসী। তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে বীরত্ব দেখান। পরে ধরা পড়লে জেলখানায় মারা যান।

মহেশ বর্মণ—জঙ্গি কৃষক কর্মী। বালিয়াডাঙ্গির বাসিন্দা। পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে বীরত্ব দেখান। পরে ধরা পড়লে জেলখানায় মারা যান।

ছোট মিঞাজান—সাচ্চা কর্মী। মুসলমান কৃষকদের মধ্যে তেভাগার প্রচার করে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন।

বড় মিঞাজান—সাচ্চা কর্মী। পার্বতীপুর থানার অধিবাসী।

হাকিমুদ্দিন—সাচ্চা কর্মী। তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।

গিয়াসুদ্দিন—সাচ্চা কর্মী। ওই সময় লিগ ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড কর্মীদের বিভ্রান্তিকর প্রচারের বিরুদ্ধে মুসলিম কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেন।

পোহাতু বর্মণ—তেভাগার লড়াইয়ে সংগ্রামী কৃষক। 'জান দিব, তবু ধান দিব না' এই শ্লোগানের বিনিময়ে ধানকাটা অভিযানে পুলিশের বেপরোয়া গুলি চললে গুরুতরভাবে আহত হন। পরে তাঁর একটি পা কেটে ফেলতে হয়।

কাজবর সিং—খেতমজুর। পার্টির একজন সর্বক্ষণের কর্মী।

মধু বর্মণ—চিরির বন্দর এলাকার বাসিন্দা। পার্টি অন্তপ্রাণ। পুলিশ এক বার মধু বর্মণকে প্রচণ্ড মার দিয়ে ছেঁচ্ড়াতে ছেঁচ্ড়াতে নিয়ে যায়। মধু বর্মণ মরে গেছে মনে করে তাকে জঙ্গলের ভেতর ঠেলে দিয়ে পুলিশ ও জোতদারের গুণ্ডারা পালিয়ে যায়। পরে গ্রামের মেয়েরা ওই ঝোপের থেকে এনে তাকে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন।

নিয়ামত হোসেন—একজন জঙ্গি কৃষক । পুলিশের গুলি লেগে একটি পা জখম হয়ে যায়। পরে ওই পা কেটে ফেলতে হয়।

গেদেরা মহম্মদ—সাচ্চা কর্মী। আটোয়ারি থানার অধিবাসী।

গজেন বর্মণ—সাচ্চা কর্মী। চিরির বন্দর থানা এলাকার অধিবাসী। ওই থানায় কৃষক সমিতি গড়ে তোলেন। পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

গুরুচরণ বর্মণ—খেতমজুর। খাঁপুরের বাসিন্দা। তেভাগার লড়াইয়ে শহিদ হন।

হপন মার্ডি—খেতমজুর। খাঁপুরের বাসিন্দা। তেভাগার লড়াইয়ে শহিদ হন।

মাঝি সরেন—খেতমজুর। খাঁপুরের তেভাগার লড়াইয়ে শহিদ হন।

দুখনা কোলকামার—সাচ্চা কর্মী। খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

পুরনা কোলকামার—খেতমজুর। খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

ফাগুয়া কোলকামার—খাঁপুরের তেভাগার লড়াইয়ে শহিদ হন।

রাজেন চ্যাটার্জি—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী। ভাল বক্তৃতা দিতেন। মার্কসবাদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যুব সমাজের মধ্যে পার্টির প্রচার ও ক্লাস নিতেন। দিনাজপুরে রাজেন চ্যাটার্জির উদ্যোগে প্রচুর তরুণ কমিউনিস্ট পার্টিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

কৈলাস ভুঁইমালি—খেত মজুর। খাঁপুরের তেভাগার লড়াইয়ে শহিদ হন।

ভোলানাথ কোলকামার—তেভাগার সংগ্রামী কৃষক। খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

খোতো বর্মণ— সাচ্চা কর্মী। খাঁপুরে তেভাগার লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ভাদু বর্মণ— সাচ্চা কর্মী। খাঁপুরে তেভাগার লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আলু বর্মণ—সাচ্চা কর্মী। খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

বামুরম সিং—সাচ্চা কর্মী। বালিয়াডাঙ্গি থানার অধিবাসী।

ডাক্তার গোপেশ্বর দাম—খাঁপুরের অধিবাসী। তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের উৎসাহিত করেন।

নেদা কর্মকার—খাঁপুরের অধিবাসী। তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।

যতীন সরকার—পার্টি অন্তপ্রাণ। খাঁপুরের অধিবাসী।

নীলমাধব সরকার—পার্টি অন্তপ্রাণ। খাঁপুরের অধিবাসী।

মঙ্গল বর্মণ—সাচ্চা কর্মী। খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

জ্ঞান বর্মণ—পার্টি অন্তপ্রাণ। খাঁপুর লড়াইয়ে শহিদ হন।

নারায়ণ মুর্মু—জঙ্গি কৃষক কর্মী। পুলিশের গুলিতে খাঁপুরে নিহত হন।

গহনুয়া মাহাতো— সাচ্চা কর্মী। খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

নিমশ্বর বর্মণ—তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।

জান মহম্মদ—জাল কাতরা নামে সমধিক পরিচিত। সাচ্চা কর্মী।

খগেন বাইশা—তেভাগার সংগ্রামী কৃষক। পার্টি অন্তপ্রাণ।

বেণু সেন—একজন আর্দশবান পার্টি কর্মী।

দীপ্তেন রায়—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী।

গোপালী চ্যাটার্জি—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী।

শরৎচন্দ্র বর্মণ—সাচ্চা কর্মী। পতিরামের কাছে খাঁপুরে বাড়ি। তেভাগা সংগ্রামে কারাবরণ করেছেন।

বিশ্বরঞ্জন দাস—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী।

খোকা সিং—সাচ্চা কর্মী। তেভাগার লড়াইয়ে কারাবরণ করেছেন। খাঁপুরে বাড়ি।

সুচু হেমরম—খেতমজুর। খাঁপুরের অধিবাসী। তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।

জলপা মুর্মু—খেতমজুর। একজন সাচ্চা কর্মী।

গোপেশ্বর দাস—পতিরামের অধিবাসী। একজন আদর্শবান কর্মী।

রসগোল্লা কোলকামার—একজন জঙ্গি কর্মী। তেভাগার লড়াইয়ের সময়ে পুলিশ ধরে নিয়ে ভীষণ অত্যাচার করেছিল।

নাড়ু কোলকামার—খাঁপুরের অধিবাসী। একজন আদর্শবান কর্মী।

মহিলা কর্মী

রানী মিত্র—দিনাজপুর শহরের বাসিন্দা। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ পান। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দিনাজপুর জেলা শাখার সম্পাদিকা নির্বাচিত হন।

বীণা সেন—দিনাজপুর শহরের অধিবাসী। চল্লিশের দশকে পার্টি সদস্য পদ লাভ করেন। একজন দক্ষ কর্মী।

অলকা মজুমদার—দিনাজপুর শহরের অধিবাসী। পার্টির সদস্য পদ পান। একজন দক্ষ কর্মী ছিলেন।

সাবিত্রী সেন—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দিনাজপুর জেলা শাখার নেত্রী। প্রকৃষ্ট কর্মী।

আশালতা চক্রবর্তী—পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। চল্লিশের দশকে পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। দক্ষ নেত্রী।

আশা সেন—দক্ষ পার্টি কর্মী। দিনাজপুর শহরের অধিবাসী।

শিবানী রায়—দক্ষ পার্টি কর্মী।

দীপ্তি বাগচী—দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও-এর অধিবাসী। পার্টির সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের একজন সদস্য। দক্ষ কর্মী।

তৃপ্তি মিত্র—দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও সদরের অধিবাসী। পিতা আশুতোষ ভাদুড়ি, মা শৈলবালা দেবী। রূপনারায়ণ বায়ের নির্বাচনি প্রচারে তৃপ্তি মিত্র ঠাকুরগাঁয়ে বিভিন্ন সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতেন। পার্টির দক্ষ কর্মী। ইনি খ্যাতনামা অভিনেতা শম্ভু মিত্রের সহধর্মিণী।

মানসী রায়—একজন দক্ষ পার্টি কর্মী।

সাবেরা খাতুন—দিনাজপুর শহরের মুন্সিপাড়ার অধিবাসী। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দিনাজপুর জেলা শাখার সদস্যা। প্রকৃষ্ট পার্টি কর্মী।

মনসুরা বেগম—দিনাজপুর শহরের বাসিন্দা। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দিনাজপুর জেলা শাখার সদস্যা। দক্ষ পার্টি কর্মী।

যশোদারানী সরকার—পতিরামের কাছে খাঁপুরের অধিবাসী। তেভাগার মরণজয়ী সংগ্রামে পুলিশ ও জমিদারের যৌথ আক্রমণে নিহত হন।

কৌশল্যা কামারিণী—খাঁপুরের বাসিন্দা। পুলিশের গুলিতে খাঁপুর লড়াইয়ে শহিদ হন।

দ্বীপশ্বরী বর্মণী—দক্ষ পার্টি কর্মী। অটোয়ারি থানার অধিবাসী। রামপুর গ্রামে পুলিশ কমরেড ফুলজুড়ি ও আরও কয়েকজনকে ধরতে গেলে গ্রামের মেয়েরা দ্বীপশ্বরী বর্মণীর নেতৃত্বে গাইন হাতে বের হয়ে এসে রাইফেলধারি পুলিশের সামনে দাঁড়ায়। পুলিশের সঙ্গে তাদের খণ্ড যুদ্ধ চলে। কমরেড দ্বীপশ্বরী বর্মণীর গাইনের আঘাতে হাবিলদারের দাঁত ভেঙে যায়।

ভাগুনী বর্মণী—অসম সাহসী তরুণী বধূ। রানী শংকৈল থানার অধিবাসী। ওই থানায় একটি সংঘর্ষের সময় পুলিশ একজন কৃষককে আহত করে। ওই সময় কৃষক মেয়ে ভাগুনীর নেতৃত্বে ভলান্টিয়ার দল পুলিশকে ঘিরে ফেলে পুলিশের সব বন্দুক কেড়ে নেন আর পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সারা রাত বন্দি করে রাখেন। জঙ্গি ভাগুনী নিজে সারা রাত বন্দুক কাঁধে নিয়ে বন্দি ইন্সপেক্টরকে পাহারা দিয়েছিলেন যতক্ষণ না উঁচু স্তরের নেতারা ইন্সপেক্টরকে মুক্ত

করে দেবার আদেশ দেয়।

ফুলেশ্বরী বর্মণী—বীরগঞ্জ থানার অধিবাসী। তেভাগার লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

রানী বসন্ত— রামপুরের অধিবাসী। তেভাগার লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

রোহিণী বর্মণী—রানী শংকৈলের বাসিন্দা। তেভাগা আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাহসিকতার পরিচয় দেন।

জয়মনি সিং—বালিয়াডাঙ্গির অধিবাসী। পার্টি অন্তপ্রাণ। বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং লেখাপড়াও শিখেছিলেন। পাড়া প্রতিবেশী, কৃষক নারীদের সংগঠিত করে তেভাগার লড়াইকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। কৃষক সভার সদস্যদের গোপন বৈঠক তাঁর বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হত। বীর রমণী রানী মিত্রের সহায়তায় জয়মনি এক জমিদারের বাড়ি ঘেরাও করে জমিদারটিকে প্রহার করেছিলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এলে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেন। পশ্চিম ঠাকুরগাঁয়ের কমিটির অফিসে পার্টি সদস্যের মিটিং চলছে। জেলা সম্পাদকের বক্তৃতার মাঝে যেন সভায় বোমা পড়ল। জয়মনি দাঁড়িয়ে সম্পাদককে প্রশ্ন করলেন—'কমরেড, ঘরের লোকটাকে মারিবার রাইন (আইন) আছে কি পার্টিতে? হামার ঘরের কমরাডটা হামায় মারিবে ক্যান? বিচার চাই'। স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা কমিউনিস্ট আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তখনই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

সিয়া বর্মণী—রানী শংকৈলের বাসিন্দা। তেভাগা আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাহসিকতার পরিচয় দেন।

মাতী বর্মণী—রানী শংকৈলের অধিবাসী। তেভাগার লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

বৃন্দাবনী বর্মণী—রানী শংকৈলের অধিবাসী। গ্রামের মেয়েদের তেভাগা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার কাজে একজন দক্ষ কর্মী ছিলেন।

জয়া বর্মণী—রানী শংকৈলের অধিবাসী। তেভাগার লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

সুনীমা সিং—ঠুমনিয়ার অধিবাসী। ঠুমনিয়ায় কৃষক সভার অফিসে পুলিশ কৃষক নেতাদের ধরতে এলে সুনীমা সিং-এর নেতৃত্বে নারীরা বটি, ঝাড়ু, ঢেকির দণ্ড, মরিচগুঁড়ো ইত্যাদি নিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালান। পুলিশের গুলিতে শেষ পর্যন্ত সুনীমা সিং তাঁর স্বামী শুকুরচাঁদের সঙ্গে একত্রে নিহত হন।

ফকো বর্মণী—ঠুমনিয়ার অধিবাসী। ঠুমনিয়ায় কৃষক সভার অফিসে পুলিশি হামলার খণ্ডযুদ্ধে গুলিতে শহিদ হন।

ভূতেশ্বরী বর্মণী—সেতাবগঞ্জের অধিবাসী। তেভাগা আন্দোলনে বহু অত্যাচার সহ্য করেও বীরত্বের পরিচয় দেন।

বুধমনি বর্মণী—ফুলবাড়ি থানার বাসিন্দা। তেভাগা আন্দোলনের একজন সংগ্রামী কৃষক নারী।

যমুনা বর্মণী—ফুলবাড়ি থানার বাসিন্দা। তেভাগার লড়াইয়ে অপূর্ব সাহসিকতার পরিচয় দেন।

কণ্ঠমনি—ইটাহার থানার অধিবাসী। ইটাহার লোকাল কমিটির সদস্যা ছিলেন। কণ্ঠমনি

লোকাল কমিটির এক সভায় নালিশ করলেন, উঠোনের আনাজপাতি, গাছের ফলপাকুড়, হাঁস মুরগির ডিম, গোরু ছাগলের দুধ, বিলের মাছ বা ঘরের পাঁঠা বেচে মেয়েরা যে পয়সা পান তার মালিক কে? স্বামী না স্ত্রী? কারণ স্বামীরা দাবি করেন এই অর্থ সংসারের। পার্টিকে সেদিন রায় দিয়ে হয়েছিল এই অর্থ স্ত্রী-ধন। এ অর্থে পুরুষের কোনও অধিকার নেই। গ্রাম্য নারীর এই সচেতনতাবোধ, এই দাবি চল্লিশের দশক থেকেই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তেভাগার দাবি আদায়ের পাশাপাশি নারীর মৌলিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামেও নারীরা সামিল হয়ে উঠেছিল। গ্রাম্য নারী জাগরণের এক উজ্জ্বল প্রতীক ইটাহারের কণ্ঠমনি বর্মণী।

পোলিয়া বর্মণী—পার্টি অন্তপ্রাণ। তেভাগার লড়াইয়ের সময় এক পুলিশের কাছ থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিজ হাঁটুর উপর রেখে বাড়ি মেরে দু টুকরো করে ফেলেছিলেন।

তেভাগার লড়াইয়ে জলপাইগুড়ি জেলার অংশগ্রহণকারী কৃষকনেতা ও কর্মী

সরবরু মহাম্মদ—মনসুর হাবিবের খোলান ভাঙো, তেভাগা চাই, সরবরু মহাম্মদই ওই শ্লোগান প্রথম দিলে কৃষকেরা ধানের লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। কৃষকেরা তির-ধনুক নিয়ে ওই আন্দোলন পরিচালনা করে। ওই লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে সরবরু মহাম্মদের মৃত্যু হয়। ডুয়ার্স এলাকার অধিবাসী।

হপনা মাঝি—একজন চা শ্রমিক। বালগোবিন্দ জোতে একটি কাগজে 'পলাশীর মাঠ' লিখে আম গাছে টাঙিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, লর্ড ক্লাইভ যে ভাবে সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, সেভাবেই তেভাগার জন্য জোতদারের সঙ্গে লড়াই করবে কৃষকরা। মহাবাড়ি গয়ানাথ জোতে তেভাগা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ডুয়ার্সের বাসিন্দা। পার্টির সাচ্চা কর্মী।

বুধু খড়িয়া—ওদলাবাড়ি চা বাগান শ্রমিক। মহাবাড়ি গয়ানাথ জোতে তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

কৃষ্ণা ওরাওঁ—ওদলাবাড়ি চা বাগান শ্রমিক। মহাবাড়ি গয়ানাথ জোতে ধানের জন্য লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। জঙ্গি কর্মী।

রামুমুণ্ডা—ওদলাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক। মহাবাড়ি গয়ানাথ জোতে ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

বিরমা ওরাওঁ—জঙ্গি কর্মী। চা শ্রমিক। মহাবাড়ি গয়ানাথ জোতে ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান।

চামড়া ওরাওঁ—প্রকৃষ্ট কর্মী। ওদলাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক। গয়ানাথ জোতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

মহম্মদ খলিল—ডুয়ার্সের সাচ্চা কর্মী। মনসুর আলী খোলানে জোতদারদের ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

জিতু কুমার—ডুয়ার্সের অধিবাসী। তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

লোধরা বুড়া—ওদলাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক। তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

লছমন সিং—সাচ্চা কর্মী। ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

কিশোরী বর্মণ—সাচ্চা কর্মী। ধানের লড়াইয়ে নয়, ১৯৪২ সালে সাপের কামড়ে মারা যান। রংপুরের ডোমারে যে কৃষকসভা হয়েছিল সেখানে স্মৃতিরক্ষার্থে 'কিশোরী তোরণ' করা হয়েছিল।

ধনঞ্জয় বর্মণ—রাজারহাটে দেবীগঞ্জ থানার একজন জোতদার গুণ্ডা দিয়ে কমরেডটিকে মেরে বাঁশবনে বালি ঢাকা দিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত—বোদা, পচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানা এলাকায় কৃষকদের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যে কজন আদর্শবান মার্কসবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদেরই অন্যতম কমরেড মাধব দত্ত। আধিয়ার আন্দোলনে জোতদারের ষড়যন্ত্রে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন। জামিনে মুক্ত হলেও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। নকশালবাড়ি আন্দোলনের স্রষ্টা চারু মজুমদারকে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য প্রথম 'রিক্রুট' করেছিলেন মাধব দত্ত। ১৯৮৫ সালে তিনি প্রয়াত হন।

বিদ্যাধর বর্মণ—গরিব কৃষক। দেবীগঞ্জ থানার পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। আধিয়ার আন্দোলনে জোতদারের গুণ্ডাবাহিনীর হাতে আহত হন। পাঁচ পীরে এস ডি ও সাহেবের গাড়ি উলটানোর জন্য বন্দি হন। সংগ্রামী কর্মী।

নন্দকিশোর বর্মণ—বৃদ্ধ কৃষক। ময়দান দিঘিতে পার্টি অফিসের জন্য চার বিঘা জমি দান করেছিলেন। আধিয়ার আন্দোলনে বৃদ্ধ নন্দকিশোরকে পুলিশ প্রচণ্ড মারধোর করে আহত করে। পুলিশ ময়দান দিঘির পার্টি অফিস ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় এবং তাকে দিয়ে ওই জমি লাঙল দিয়ে চাষ করিয়ে ছাই ছিটিয়ে দেয়। দেবীগঞ্জ থানার বাসিন্দা।

কেশবচন্দ্র দত্ত—কুচবিহার জেলার পাটগ্রামের অধিবাসী। তরাই ও ডুয়ার্সের আধিয়ার আন্দোলনে অংশ নেন এবং কুচবিহার পুলিশের হাতে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন এবং সেখানেই বিচার হয়।

পুরিয়ামানকি মুণ্ডা—ডুয়ার্সের বাসিন্দা। জঙ্গি কর্মী। তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলি লেগে আহত হন।

পাতরায় ওরাওঁ—বালাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক। জঙ্গি কর্মী। গয়ানাথ জোতে তেভাগা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হন।

হোসনা—জঙ্গি কর্মী। ডুয়ার্সের অধিবাসী। তেভাগা সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে আহত হন।

মঙ্গরু ওরাওঁ—ডুয়ার্সের অধিবাসী। তেভাগা সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে আহত হন।

ভুলন ওরাওঁ—সাঁওগা বস্তির বাসিন্দা। ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হন।

শুকরা ওরাওঁ—দক্ষিণ ওদলাবাড়ির বাসিন্দা। তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হন।

পয়া বর্মণ—গরিব কৃষক। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। বাঘের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে আহত হন। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। দেবীগঞ্জ থানার অধিবাসী। সাচ্চা কর্মী।

ডাক্তার সুরেন ব্যানার্জি—অনেক কমরেড তাঁর বাইরের বারান্দায় রাত্রিতে বেঞ্চে শুয়ে থাকতেন। একদিন সকালে তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে কয়েকজন কৃষক নেতাকে ওই বেঞ্চে ঘুমোতে দেখে বলেন যে, বাইরে বাঘের ভয়। ভেতরের ঘরে থাকবেন। কথামতো কমরেডরা বাড়ির ভেতরের ঘরে গিয়ে রাত্রিতে আশ্রয় নিতেন। দেবীগঞ্জ থানার অধিবাসী।

প্রিয়গোপাল দে—পচাগড় থানার পানিমাছ পুচুরির মধ্যবিত্ত জোতদার পার্টির সক্রিয়

সমর্থক ছিলেন।

কান্দুরা মহাম্মদ—সচ্ছল কৃষক। তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। কমরেডদের আশ্রয় ও খাদ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন।

মহেন্দ্র বর্মণ—সচ্ছল কৃষক। কমরেডদের আশ্রয় ও খাদ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন।

চটুম বর্মণ—সচ্ছল কৃষক। পচাগড় এলাকার বাসিন্দা।

ঝুমাই—পচাগড় থানার কুখ্যাত ডাকাত। শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। জমিদারের লাঠিয়ালরা যমের মতো ভয় করত।

সাঁতাউ—কুখ্যাত ডাকাত। একজন জঙ্গি কর্মী। শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। বোদা এলাকার বাসিন্দা।

সুফিউদ্দিন মহম্মদ—বড় জোতদার । বোদা থানার ৬নং শালসিঁড়ি বালই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট দিলেন। ওই এলাকার কৃষকদের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও আশ্রয় দিয়ে সর্বদাই সহযোগিতা করতেন। বহু কৃষক নেতা গোপনে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকতেন। এমনকী কোনও কমরেডের অসুখ হলে গোপনে ডাক্তার নিয়ে এসে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও তিনি করতেন। প্রাদেশিক কৃষকসভার নেতারা এলে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। পার্টির প্রতি সমর্থন ছিল। ভাল ব্যবহারের জন্য কৃষকরা তাঁর জমিতে তে-ভাগা করেনি।

রাধামোহন বর্মণ—সাধারণ কৃষক। লাঙল গাওঁ-এ পার্টির মূল কেন্দ্রের সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন।

বীরেশ মিত্র—সুদূর সিলেট থেকে জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেন।

নরেশ চক্রবর্তী—ডুয়ার্সের তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম কর্মী। পার্টি অন্ত প্রাণ।

গুরুদাস রায়—তেভাগা সংগ্রামের অন্যতম নেতা। বহু কৃষককে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ইন্দ্রমোহন বর্মণ—একজন দক্ষ পার্টি কর্মী। দেবীগঞ্জ থানার অধিবাসী।

গোবিন্দ কুণ্ডু—সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা। রাজগঞ্জ তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক।

ভোলা মজুমদার —একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী।

কিশোরী রায়—একজন দক্ষ কর্মী।

নলিনী বাগচী—পচাগড়, দেবীগঞ্জ, বোদা অঞ্চলে দুর্বার কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে তাঁর শ্রম ব্যর্থ হয়নি। পার্টি অন্ত প্রাণ।

উমেশ রায়—ময়দানদিঘির জঙ্গি কৃষক কর্মী। দেবীগঞ্জ থানার বাসিন্দা।

উদয় বর্মণ—গরিব কৃষক। পাঁচ পীরে এস ডি ও'র গাড়ি উললটানোর বিষয়ে বন্দি হন। সংগ্রামী কৃষক। দেবীগঞ্জ থানার বাসিন্দা।

ধরণী বর্মণ—গরিব কৃষক। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। এস ডি ও'র গাড়ি উলটানোর ব্যাপারে বন্দি হন। দেবীগঞ্জ থানার অধিবাসী।

ভুলিয়া বর্মণ—সাধারণ কৃষক। পাঁচ পীরে এস ডি ও-র গাড়ি উলটানোর ব্যাপারে বন্দি হন। দেবীগঞ্জ থানার বাসিন্দা।

দীননাথ বর্মণ—সাচ্চা কর্মী। কারাভোগ করেন।

উপেন সরকার—পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। দেবীগঞ্জ থানার অধিবাসী। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

রাধানাথ দাস—এঁর রচিত দুর্ভিক্ষের গান ওই সময় আলোড়ন সৃষ্টি করে। ময়নাগুড়ি থানার বাসিন্দা।

লালটু রায়—গরিব কৃষক। পাঁচ পীর, ভোলাডাবরি, বেরুবাড়ি, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি এলাকায় নেতৃত্ব দেন। দেবীগঞ্জ থানার বাসিন্দা।

সুরেন রায়—মাঝারি কৃষক। দেবীগঞ্জ থানার দেবীডুগ গ্রামের বাসিন্দা। প্রকৃষ্ট কর্মী।

ভবানী রায়—সচ্ছল কৃষক। দেবীগঞ্জ থানার রাজারহাট এলাকার বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।

পূর্ণ রায়—মাঝারি কৃষক। দেবীগঞ্জ থানার রাজারহাট এলাকার বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।

কামিনী রায়—আদর্শবান পার্টি কর্মী। পার্টি অন্তপ্রাণ।

চৈতু রায়—দায়িত্বশীল। পার্টি পাগল যুবক। সর্বক্ষণের কর্মী।

দীপেন রায়—বড় জোতদার, কাচুয়া ধনীর ছেলে। দেবীগঞ্জ থানার কালিয়াগঞ্জের হাট এলাকার বাসিন্দা।

সুরেন রায়—বোদা থানার অধিবাসী। পার্টির জন্য সংসার ত্যাগী।

ইন্দ্রমোহন রায়—গরিব কৃষক। লাঙলগাঁও গ্রামের অধিবাসী।

প্রসাদ রায়—গরিব আধিয়ার। লাঙল গাঁও গ্রামের অধিবাসী।

মণি মুন্সি—মাঝারি কৃষক। পচাগড় থানার বাসিন্দা। প্রকৃষ্ট কর্মী।

ভাটিয়া রায়—সাচ্চা কর্মী। ধুলাবাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দা।

চারুয়া ওরাওঁ—সাচ্চা কর্মী। ধুলাবাড়ি অঞ্চলের অধিবাসী।

মংগুরুভগৎ—জঙ্গি কর্মী। নাগরাকাটা/.গজোল ডোবা এলাকার অধিবাসী।

ইমারুদ্দিন—জঙ্গি কর্মী। ডিমডিমা এলাকার বাসিন্দা।

পুনাই ওরাওঁ—সাচ্চা কর্মী। চালমা এলাকার অধিবাসী।

জগুমুণ্ডা—বালগোবিন্দ জোতের বাসিন্দা।

চামু মমি—নেওড়ামাঝালি এলাকার বাসিন্দা। জঙ্গি কর্মী।

টেপ্পাও ওরাওঁ—ধনী জোতদারের সহোদর ভাই। আধিয়ার। তেভাগা সংগ্রামের জঙ্গি কর্মী। বাতাবাড়ি বস্তির বাসিন্দা।

ফাগু ওরাওঁ—হায় হায় বাড়ি বাগানের চা শ্রমিক। প্রকৃষ্ট কর্মী।

জগন্নাথ ওরাওঁ—তেশিমলা বস্তির চা শ্রমিক। সাচ্চা কর্মী।

সুকরা ওরাওঁ—মাল এলাকার তেশিমলার বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।

লোদোমুণ্ডা—মাল নদী এলাকার বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।

রনি ওরাওঁ—সাচ্চা কর্মী। ওদলাবাড়ি এলাকার অধিবাসী।

অর্জুন ওরাওঁ— দুস্থ কৃষক। কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দেন। ডুয়ার্সের অধিবাসী।

দয়াময় দাস—পার্টির সমর্থক। সময়ে অসময়ে পার্টির কর্মীদের উদারভাবে সহযোগিতা করেন।

মাতু মাঝি—সাচ্চা কর্মী। বানারহাট এলাকার হৃদয়পুরের অধিবাসী।

ঢুকুর ওরাওঁ—তেভাগার বীর কৃষক। নেতৃত্ব দেন। ধুলাবাড়ি অঞ্চলের অধিবাসী।

শিবেশ্বর আচার্য—একজন আদর্শবান কর্মী। রেল কর্মচারী।

মোহিত বাগচী—একজন আদর্শবান কর্মী। রেল কর্মচারী।

অনিল মুখার্জি—রেল কর্মচারী। দক্ষ পার্টি কর্মী।

গদাধর—রেল কর্মচারী। দক্ষ পার্টি কর্মী।
অনিল মিত্র—রেল কর্মচারী। প্রকৃষ্ট পার্টি কর্মী।
মান সিং—রেল কর্মচারী। সাচ্চা কর্মী। ধানের লড়াইয়ে অংশ নেন।
লাল বাহাদুর ছেত্রী—রেল শ্রমিক। তেভাগার দক্ষ কর্মী।
নিখিল—রেল কর্মচারী। তেভাগার দক্ষ কর্মী।
বীরেন—পার্টি অন্তপ্রাণ। দক্ষ কর্মী। রেল কর্মচারী।
সীতানাথ— সাচ্চা কর্মী। রেল শ্রমিক।
দীনবন্ধু চ্যাটার্জি—রেল কর্মচারী। প্রকৃষ্ট কর্মী।
রামস্বরূপ মিস্ত্রি—রেল কর্মচারী। সাচ্চা কর্মী।
রণেন ঘোষ দস্তিদার—একজন আদর্শবান নেতা। পার্টি অন্তপ্রাণ। রেল কর্মচারী।
অরুণবিকাশ সিংহ—রেল কর্মচারী। কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।
চারুয়া মুণ্ডা—নেওড়ামাঝালি এলাকার বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।
কাশিম উদ্দিন—সাচ্চা কর্মী। তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।
কুমা মুণ্ডা—হাঁসখালি এলাকার বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।
লালকু মুণ্ডা—বাতাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। জঙ্গি কর্মী।
পাত্রাস মাঝি—গাজোল ডোবা এলাকার বাসিন্দা। জঙ্গি কর্মী।
চামারু মুণ্ডা—নেওড়ামাঝালির বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।
নথিয়া ওরাওঁ—বাতাবাড়ি বস্তির বাসিন্দা। জঙ্গি কর্মী।
করমা মুণ্ডা—ওদলাবাড়ি চা বাগানের অধিবাসী।
টেম্পা ওরাওঁ—তেশিমলার বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।
যদুনাথ সিং—রেল শ্রমিক। ডুয়ার্স এলাকার বাসিন্দা। জঙ্গি কর্মী।
পরিদিন মিরির—রেল শ্রমিক। ধানের লড়াইয়ে অংশ নেন।
ইয়াকুব মিঞা—রেল শ্রমিক। ধানের লড়াইয়ে অংশ নেন।
অপরেশ রায়—রেল কর্মচারী। কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।
হীরালাল—রেল শ্রমিক। ডুয়ার্স এলাকার বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।
রেবতীমোহন বসু—রেল কর্মচারী। কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।
রামচরিত মিস্ত্রী—ডুয়ার্স এলাকার অধিবাসী। রেল শ্রমিক। সাচ্চা কর্মী।
ইন্দু দাশগুপ্ত—রেল কর্মচারী। প্রকৃষ্ট কর্মী।
বারীন বিশ্বাস—রেল কর্মচারী। প্রকৃষ্ট কর্মী।
রামেশ্বর সিং—রেল শ্রমিক। ডুয়ার্সের অধিবাসী। সাচ্চা কর্মী।
নিতাই রায়—রেল শ্রমিক। প্রকৃষ্ট কর্মী। ধানের লড়াইয়ে অংশ নেন।
বৈদ্য রায়—মাঝারি কৃষক। পচাগড় থানার বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।
আবদুল সামাদ—সাচ্চা কর্মী। ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন।
সুধাংশু মজুমদার—সাচ্চা কর্মী। কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।
ডাক্তার জগদীশ বসু—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী।
অঘোর সরকার—পার্টির সমর্থক। প্রকৃষ্ট কর্মী।
সতীশ লাহিড়ী—সাচ্চা কর্মী।
খিজুমুদ্দিন—বোদা থানার পার্টির একজন সর্বক্ষণের কর্মী। ময়দানদিঘিতে গণ্ডি

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

উমেশ বর্মণ—সাচ্চা কর্মী। ময়দানদিঘিতে গণ্ডি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বোদা থানার অধিবাসী।

নরবাহাদুর—রেলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, গ্যাংম্যান। শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ডুয়ার্সের তেভাগা সংগ্রামের বীর সৈনিক।

ডগন মাহাতো—রেলশ্রমিক। জঙ্গি কর্মী।

মোহনলাল—সাচ্চা কর্মী। রেলশ্রমিক।

সীতারাম—সাচ্চা কর্মী। রেলশ্রমিক।

রাম দাস—আদর্শবান যুবক। পার্টি অন্তপ্রাণ।

খোদা বক্স—আদর্শবান যুবক। প্যার্টি অন্তপ্রাণ।

মহাবীর মিস্ত্রি—প্রকৃষ্ট কর্মী। তেভাগার সৈনিক।

নিতাই ব্যানাজি—আদর্শবান পার্টি কর্মী। কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

চারু মজুমদার—তেভাগা আন্দোলনে পচাগড়ে কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নকশাল বাড়ি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা।

বীরেন্দ্রকুমার নিয়োগী—১৯৪১ সালে পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। তেভাগা সংগ্রামে জলপাইগুড়ি জেলায় নেতৃত্ব দেন।

সুভাষ বালো—প্রকৃষ্ট কর্মী। তেভাগার বীর সৈনিক। রেল কর্মচারী।

অমূল্য সেন—রেল কর্মচারী। আদর্শবান পার্টি কর্মী।

খগেন দাশগুপ্ত—তেতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ ও বেরুবাড়ি খানা এলাকায় আধিভাগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

শশধর কর—পার্টি অন্তপ্রাণ। তেভাগা আন্দোলনে ডুয়ার্সে নেতৃত্ব দেন।

পটল ঘোষ (দেবব্রত ঘোষ)—পার্টি অন্তপ্রাণ। তেভাগা আন্দোলনে ডুয়ার্স অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন।

দুলাল বসু—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী। তেভাগা আন্দোলনে দেবীগঞ্জ ও বেরুবাড়ি থানা এলাকায় নেতৃত্ব দেন।

রথ—তরুণ যুবক। তেভাগা সংগ্রামের বীর সৈনিক।

ধীরেন মজুমদার—পার্টি অন্তপ্রাণ। ডুয়ার্সে তেভাগা আন্দোলন নেতৃত্ব দেন।

অনিল গুপ্ত—পার্টি অন্তপ্রাণ। তেভাগার লড়াইয়ে ডুয়ার্স অঞ্চলে কৃষকদের উৎসাহিত করেন।

কমল সান্যাল—পার্টি অন্তপ্রাণ। তরাই অঞ্চলে তেভাগার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন।

শচীন মৈত্র—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী।

বিনয় রায়—তরাই-ডুয়ার্সের সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের কর্মী।

তিনু চক্রবর্তী—রিলিফের জন্য সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তরাই-ডুয়ার্সে যে সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠিত হয় তাতে অংশ নেন। পার্টি অন্তপ্রাণ।

শশাঙ্ক বোস—সাংস্কৃতিক স্কোয়ার্ডের কর্মী। পার্টি অন্তপ্রাণ।

সত্যেন মজুমদার—বোদা, পাঁচপীর ও ময়দানদিঘি অঞ্চলে তোলা গণ্ডি ও তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

পরিমল মিত্র—পার্টি অন্তপ্রাণ। তরাই অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

বিমল হোড়—একজন আদর্শ পার্টি কর্মী। কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

প্রমদা ঠাকুর—আদর্শবান পার্টি কর্মী।

হারাধন চক্রবর্তী—পার্টি অন্ত প্রাণ। তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

অবনী ধর গুহ নিয়োগী—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী। গণ্ডি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন।

সতীশ লাহিড়ী—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী। গণ্ডি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন।

অনাথশরণ গৌতম—পার্টি অন্তপ্রাণ। গণ্ডি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন।

শচীন দাশগুপ্ত—জন্ম ১৯১৩ সাল। জন্মস্থান জলপাইগুড়ি। পিতা জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মা সুমতি দেবী। নিজের অন্তরের টানেই রাজনীতিতে আসেন। প্রথমে গান্ধী গণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য জেলে যান। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস জেলা কমিটির সদস্য হন। ওই সময় এম. এন. রায়ের বই পড়ে উৎসাহিত হন এবং অবনী গুহ নিয়োগী, চুনীলাল বসু, অর্ধেন্দু বসু, বিজয় হোড়, নলিনী বাগচী প্রমুখ কংগ্রেসের মধ্যে থেকে বামগ্রুপ তৈরি করে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন। ওই কমিটির তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের আন্দোলন ওই সময় জলপাইগুড়ি শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি অনুভব করেন যে, হাজার হাজার কৃষক যারা গ্রামে রয়েছেন তাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই সময় জেল থেকে বেরিয়ে আসেন গুরুদাস রায় ও তাঁর সঙ্গী বীরেন দত্ত, এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৯৩৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সোমনাথ লাহিড়ীর উপস্থিতিতে জলপাইগুড়ি জেলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯৩৯ সালে শচীন দাশগুপ্ত পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে কিছুদিনের জন্য জেলে যান। জেল থেকে বেরিয়ে অন্তরিন অবস্থায় থাকেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল, ওই সময়ের মধ্যে পুনরায় জেল ও অন্তরিন অবস্থায় থাকেন। পেশায় চিকিৎসক ছিলেন।

বীরেন্দ্রকুমার নিয়োগী—গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে প্রথমে যুক্ত ছিলেন। দেবীগঞ্জ, বোদা, পচাগড় প্রভৃতি এলাকায় কংগ্রেস সংগঠন করতে গিয়ে কৃষকদের দুরবস্থা দেখে দুঃখ পান এবং তারই ফলশ্রুতিতে ওই সব এলাকার কৃষকদের উপর জোতদারের অত্যাচার বন্ধ করতে আন্দোলনের জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকটে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। জেলা কংগ্রেস কমিটিতে ওই রিপোর্ট পেশ করার জন্য মনে মনে বেশ কিছু কংগ্রেস সদস্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষক আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জন্মায়। ফলে, জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং ১৯৪১ সালে পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন।

পি. লাহিড়ী—রেল কর্মচারী। আদর্শবান পার্টি কর্মী।

অমিয় সান্যাল—তেভাগার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। রেল কর্মচারী।

প্রভাত সেন—রেল কর্মচারী। সাচ্চা কর্মী।

পরেশ সেন—রেল কর্মচারী। সাচ্চা কর্মী।

রামানন্দ ঝাঁ—রেল শ্রমিক। তেভাগার সৈনিক।

রামাশীষ—রেল শ্রমিক। তেভাগার সৈনিক।

হরপ্রসাদ ঘোষ—জন্ম ১ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সাল। জন্মস্থান খুলনা জেলার মৌভাগ। পিতা যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, মা সুভাষিণী দেবী। খুলনার শচীন বসু (খোকাদা), অনিল ঘোষ, প্রমথ ভৌমিক, বিষ্ণু চ্যাটার্জি প্রমুখের উৎসাহে রাজনীতিতে আসেন। পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন ১৯৪২ সালে। পার্টি বে-আইনি ঘোষণা হলে তিনি আত্মগোপন করেন। স্বাধীনতার পর জলপাইগুড়ি, দমদম, আলিপুর বিভিন্ন জেলে মোট ছ বছর কাটান।

সত্য চ্যাটার্জি—আদর্শবান কৃষক নেতা। রেল দপ্তরে চাকরি করতেন।

মৃণাল চক্রবর্তী—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী। রেল দপ্তরে চাকরি করতেন।

বধুন—জঙ্গি কর্মী। রেল শ্রমিক।

যমুনা কুরমি—জঙ্গি কর্মী। রেল শ্রমিক।

মোটা—জঙ্গি কর্মী। রেল শ্রমিক।

মেঘু—সাচ্চা কর্মী। রেল শ্রমিক।

মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত—জন্ম ১৯১২ সাল। জন্মস্থান ঢাকা, বিক্রমপুরের বাহেরক এলাকা। পিতা গুরুপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, মা সুখদাদেবী। বহরমপুর কলেজে ভর্তি হবার পর রাধার ঘাটে সি. আর. দাশের বক্তৃতা শুনে রাজনীতির প্রেরণা পান। বই কেনার টাকা দিয়ে খদ্দর কেনেন এবং গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। জেলখানায় ধরণী গোস্বামীর উৎসাহে মার্কসবাদ পড়েন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন মোট এগারো-বারো বার জেল খাটেন।

অবনী তলাপাত্র—জন্ম ১৯২০, জন্মস্থান জলপাইগুড়ি। পিতা মন্মথরঞ্জন তলাপাত্র। মা মৃণালিনী দেবী। ১৯৩৭ সালে বীরেন দত্ত, শচীন দাশগুপ্ত, চারু মজুমদার প্রমুখের প্রেরণায় রাজনীতিতে আসেন। ১৯৩৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। জেলায় ছাত্র ফ্রন্টে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪২ সালে আগস্ট মাসে প্রথমে দু'মাস এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৪২-৪৩-৪৪ সালে মোট ছ'বারের মতো জেল খাটেন। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে দার্জিলিং জেলায় পুনরায় গ্রেপ্তার হন পরে জামিনে মুক্তি পান। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত নজরবন্দি থাকেন। পেশায় চিকিৎসক।

সময় গাঙ্গুলী—জন্ম ১০ অক্টোবর ১৯১৭ সাল। জন্মস্থান বরিশাল জেলায় নলচিড়া। পিতা মন্মথনাথ গাঙ্গুলী, মা রাজকুমারী দেবী। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের প্রেরণায় রাজনীতিতে আসেন। ১৯৪০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত জেল জীবন কাটান। ১৯৪৬ সালে অন্তরিন অবস্থায় থেকে ডুয়ার্সের তেভাগা সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর বর্ধমানে একটি পাবলিক মিটিং-এ যাদুবেন্দ্র পাঁজা তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেন। ওই মিটিং-এ তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। পার্টি বে-আইনি ঘোষণা হলে পুনরায় বন্দি হন এবং ১৯৫৩ সালে ছাড়া পান।

ফাগুরাম—জঙ্গি কর্মী। রেল শ্রমিক।

কালী পাল—স্টেশন মাস্টার। শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

কালী ঘোষ—স্টেশন মাস্টার। শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাঁরই নেতৃত্বে ওই সময় একটি স্কোয়ার্ড দার্জিলিং-এ ইউনিয়ন গঠন করার চেষ্টা করে।

ফাগুরাম ওরাওঁ—চা শ্রমিক। কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

বিমল দাশগুপ্ত—জন্ম ১ এপ্রিল ১৯২১ সাল। জন্মস্থান বার্ণিশ জংশন। পিতা ভুবনেশ্বর দাশগুপ্ত, মা গোলাপবাসিনী দেবী। ছাত্র অবস্থায় গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ঠাকুরমার কাছে পূর্বপুরুষদের জমিদারির কাহিনী ও প্রজাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিবরণ এবং গ্রামবাসীদের দুঃখকষ্ট দেখে জমিদারি প্রথার প্রতি ঘৃণার ভাব জাগ্রত হয়। দোমহনিতে ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে রেলের চাকরিতে নিযুক্ত হন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। রেল ইউনিয়নের দোমহনি শাখার সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষণা হলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন এবং তিন বছর আত্মগোপন অবস্থায় পার্টির কাজ করেন। ১৯৫১ সালের ৬ নভেম্বর থেকে ১৯৫২ সালের ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত ভারত রক্ষা আইনে বন্দি হন। ১৯৫৩ সালে কিছুদিনের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ছিলেন।

জগন্নাথ ওরাওঁ—জঙ্গি কর্মী। চা শ্রমিক।

পাঁচু তুরী—গান রচনা করে শত শত কৃষককে উৎসাহিত করেন।

ননী ভৌমিক—স্বাধীনতা পত্রিকার সাংবাদিক। ওই সময় ডুয়ার্সে তেভাগা সংগ্রাম সম্পর্কে খবর নিতে এলে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বন্দে ভগত—ধনী কৃষক। তেভাগার বীর সৈনিকদের বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেন।

জুলিয়াস—জঙ্গি কর্মী। রেল শ্রমিক। তেভাগার বীর সৈনিক।

মহিলা কর্মী

মাকড়ি বমর্ণী—সুন্দরদিঘি অঞ্চলে তেভাগার লড়াইয়ের সংগ্রামী কর্মী।

উজানী বমর্ণী—তেভাগার সংগ্রামী কর্মী। হাতে রম-দা নিয়ে পুলিশকে রুখে দিয়েছিল।

শিখা নন্দী—পার্টি অন্তপ্রাণ। তেভাগা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন।

তিলকতারিণী দেবী—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একজন দক্ষ কর্মী। বোদার পাঁচপীরে কৃষকসমিতি গড়ে তুলতে তাঁর অবদান ভুলবার নয়। জোতদারের দালালদের হাতে বীরেন পাল, মাধব দত্ত প্রমুখ কৃষক নেতা আহত হলে তিনি সমস্ত রকম শাসানি ও ভয়কে অগ্রাহ্য করে তাঁদের চিকিৎসার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

নগরী বমর্ণী—বিদ্যাধর বর্মণের স্ত্রী। পার্টি অন্তপ্রাণ।

অমিয়া দে—পার্টির দক্ষ কর্মী।

অমিয়া ঘোষ—পার্টি অন্তপ্রাণ। দক্ষ কর্মী।

সরযূ সরকার—পার্টির দক্ষ কর্মী।

সুষমা দত্ত—পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী।

সুরুচি দত্ত—পার্টির দক্ষ কর্মী।

চুন্দিয়া উরাইন—লাল শুক্রার বোন। তেভাগার লড়াইয়ে সাহসিকতার পরিচয় দেন।

নিভা দত্ত—তরাই-ডুয়ার্সে আন্দোলনে নারীদের নেতৃত্ব দেন।

পুষ্পা ভগত—বন্দে ভগতের মা। ধনী কৃষকের বৃদ্ধ জননী। তেভাগার বীর কৃষকদের সঙ্গে লড়াইয়ে অংশ নেন।

অমিয়া নন্দী—সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের কর্মী। পার্টি অন্ত প্রাণ।

টেম্পু ওরাওঁনি—সরুগাঁও বস্তির বাসিন্দা। প্রকৃষ্ট প্রাণ।

যমুনা ওরাওঁনি—দক্ষ কর্মী। রেডবেঙ্ বাগানের শ্রমিক।

বীণা বর্মণ—নেওড়ামাঝালির বাসিন্দা। দক্ষ কর্মী।

সতীশি খুড়িয়া—চালসা নীচের এলাকার বাসিন্দা। সাচ্চা কর্মী।

কুরনি ওরাওঁনি—ওদলাবাড়ি চা বাগানের মহিলা শ্রমিক। পার্টি অন্তপ্রাণ।

পুণ্ডেশ্রী বমর্ণী—ইনি সবার প্রিয় 'বুড়িমা' নামে খ্যাত। কৃষক কর্মীরা মিটিং করছে। হয়তো হঠাৎ জোতদারের কোনও দালালকে দেখা গেল। বুড়িমার শিক্ষায় গ্রামের মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যথাস্থানে খবর পৌঁছে দিল যাতে তারা লুকিয়ে পড়তে পারে। পুণ্ডেশ্রী বমর্ণী একদিন সন্ধের পর সিন্‌জা (পাটকাটি) জ্বালিয়ে বাড়ি ফিরছে, দূরে দেখা যায় দুটো চৌকিদার সহ পুলিশ। অমনি বুড়িমার চিৎকার 'পালা পালা পুলিশ আসছে'। চৌকিদার দুটো পালিয়ে গেল কিন্তু তার আগেই কাজ হাসিল।

করমি ওরাওঁনি—ডুয়ার্স অঞ্চলের নেওড়ামাঝালির বাসিন্দা। দক্ষ পার্টি কর্মী। ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

বুধনি ওরাওঁনি—জঙ্গি কর্মী। গোলার ধান তেভাগা করতে গিয়ে জোতদারের ষড়যন্ত্রে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ডুয়ার্সের বাসিন্দা।

স্বর্ণময়ী ওরাওঁনি—জঙ্গি কর্মী। তেভাগার লড়াইয়ে জোতদারের যড়যন্ত্রে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

এঁতোয়ারি ওরাওঁলি (মুণ্ডা)—সাচ্চা কর্মী। নেওড়ামাঝালিতে তে-ভাগা করতে গিয়ে পুলিশের দলকে তাড়া করে পিছে হঠিয়ে দেবার সময় নিহত হন।

নৈরারী ওরাওঁনি—ডুয়ার্সে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পার্টি অন্তপ্রাণ।

ছোটোন ওরাওঁনি—ডুয়ার্সে পুলিশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

পোকো ওরাওঁনি—নেওড়ামাঝিয়ালির কাছে মাথা চুলকাইতেও তেভাগা আন্দোলন পরিচালনা করে।

সুনীতি বমর্ণী—জঙ্গি কর্মী। মাল নদী এলাকার বাসিন্দা। তেভাগা করতে গিয়ে পুলিশের গুলি পায়ে লেগে আহত হন।

তেভাগা আন্দোলনে পুলিশ, জমিদার ও জোতদারের গুলিতে নিহত কিষাণ-কিষাণী

দিনাজপুর জেলা

শিবরাম মাঝি	চিরির বন্দর	৪ জানুয়ারি ১৯৪৭
সমির উদ্দিন	,,	,,
চিয়ার সাই শেখ	খাঁপুর	২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭
যশোদারানি সরকার	,,	,,
কৌশল্যা কামারণী	,,	,,

গুরুচরণ বর্মণ	”	”
হপন মার্ডি	”	”
মাঝি সরেন	”	”
দুখনা কোলকামার	”	”
পুরনা কোলকামার	”	”
ফাগুয়া কোলকামার	”	”
ভোলানাথ কোলকামার	”	”
* কৈলাশ ভুঁইমালি	”	”
খেতো বর্মণ	”	”
ভাদু বর্মণ	”	”
আলু বর্মণ	”	”
মঙ্গল বর্মণ	”	”
শ্যামাচরণ	”	”
নগেন বর্মণ	”	”
ভুবন বর্মণ	”	”
ভবানী বর্মণ	”	”
জ্ঞান বর্মণ	”	”
নারায়ণ মুর্মু	”	”
গহনুয়া মাহাতো	”	”
শুকুর চাঁদ	ঠুমনিয়া	২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭
রূপমণি	”	”
মাকটু সিং	”	”
নেন্দোলি সিং	”	”
গজেন বর্মণ	চিরির বন্দর	”
ঝড়ু বর্মণ	”	”
হীরামন মহম্মদ	* ঠাকুরগাঁও	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭
অনিল বর্মণ	”	”
ভদ্র বর্মণ	”	”
হেমেন হেমব্রম	”	”
গেদু হেমব্রম	”	”
গদাধর বর্মণ	* দিনাজপুর সদর জেল	২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭
খগেন রাজবংশী	”	”
চেরু বর্মণ	”	”
গোবর্ধন বর্মণ	”	”
* একজন কৃষক	খাঁপুর	১৯৪৭

জলপাইগুড়ি জেলা

হপ্না মাঝি	মেটেলি, হায় হায় পাথার	১ মার্চ ১৯৪৮

সরবরু মোহম্মদ	,,	,,
বধু খেড়িয়া	,,	,,
কৃষ্ণ উরাও	,,	,,
রামু মুণ্ডা	,,	,,
লোধরা বুড়া	,,	,,
বিরশা মুণ্ডা	মেটালি, মঙ্গলবাড়ি	৪ এপ্রিল ১৯৪৭
জিতু কুমহার	,,	,,
বেচপা খেড়িয়া	,,	,,
লছমন সিং	,,	,,
শহরাই মুণ্ডা	,,	,,
করমি উরাওনি	,,	,,
স্বর্ণময়ী উরাওনি	,,	,,
এতোয়ারি উরাওনি	,,	,,
	রংপুর জেলা	
* তন্নারায়ণ		৯ জানুয়ারি ১৯৪৭

* কৈলাশ ভুঁইমালি—জমিদারের গুলিতে নিহত হন

* ঠাকুরগাঁও—এখানে একটি কৃষক সমাবেশে যোগ দিতে পথে কৃষকের একটি বড় মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালালে ওই পাঁচজন নিহত হন।

দিনাজপুর সদবজেল—ওই চারজন কৃষক কর্মীকে পুলিশ দিনাজপুর সদব জেলে ধবে এনে গুলি করে হত্যা করেছিল।

একজন কৃষক—১৯৪৭ সালে খাঁপুরে জোতদারের গুলিতে একজন কৃষক নিহত হন বলে আবদুল্লাহ রসুল 'কৃষক সভার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃ. ২৮৪)। কিন্তু, খাঁপুরে নিহত ওই কৃষকের সন্ধান আমি পাইনি। সম্পাদক।

* তন্নারায়ণ বর্মণ—জোতদারের গুলিতে শহিদ হন।

তেভাগার লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী
রংপুর জেলার কৃষক নেতা ও কর্মী

গোরাচাঁদ বর্মণ—কালীগঞ্জ থানার এক গরিব চাষি যিনি নিষ্ঠার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্ত করে কমিউনিস্ট নেতা হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। প্রথম থেকেই সব সময়ের কর্মী। কোনও আর্থিক সাহায্যের উপর ভরসা না করে পার্টিতে যোগ দেবার পর লেখাপড়া শেখেন এবং ভাল করেই আয়ত্ত করেন। পার্টির বই পড়তেন এবং পড়াতেন। সোভিয়েত পার্টির ইতিহাস দুবার গভীরভাবে পড়েন। নিজে একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। নিজের একটি টিনের ঘর ও গোরু পরে পার্টিকে দিয়ে দেন। 'মাগন জমি', 'মাগন হাল', 'মাগন শ্রমের' সাহায্যে অভাবগ্রস্ত কর্মীদের সাহায্য সংগঠিত করেন। মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। গোপন যুগে মহিলা কর্মীদের দায়িত্ব ছিল গোপন কর্মীদের সাহায্য করা। তাঁর অঞ্চলে রেল ইউনিয়নের গোপন কেন্দ্র ছিল। তিনি বিশেষভাবে সাংগঠনিক দায়িত্বের পরিচয় দেন। একটি ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। তিনি বলেন, "ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা

যতদিন থাকবে ততদিন এর হাত থেকে নিস্তার নেই।" আত্মগোপন অবস্থায় তিনি উদরী রোগে মারা যান।

সোমরাও ওঁরাও—মিঠাপুকুর থানার বলদিপুকুরের একজন মাঝারি চাষি। ১৯২১ সালের জাতীয় আন্দোলনের নেতা, কৃষক আন্দোলনে সকল স্তরে নেতৃত্ব করেছেন।

আহম্মদ কবিরাজ—কৃষক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বহু নির্যাতিত নেতা। গঙ্গাচরা থানার কোনকোন্দ ইউনিয়নের অধিবাসী।

রাজেন সাধু—বয়সে বৃদ্ধ, মাঝারি চাষি। বহু সংগ্রামের নির্যাতিত নেতা। তাঁর দরাজ গলা কায়েমি স্বার্থবিরোধী গানে সমবেত পাঁচ-দশ হাজার চাষিকে উদ্বেল করে তুলতে পারত। কোনকোন্দ ইউনিয়নের অধিবাসী।

বংশী বাদ্যকর—কৃষক সমিতির চারণকবি। কোনকোন্দ ইউনিয়নের বাসিন্দা।

বিলায়েৎ আলি—১৯৪৮-৪৯ সালে অল্প বয়স। সংগ্রামে দুর্জয় সাহসী, হাসি-ভরা মুখ। ভূমিহীন, খেতমজুর। গঙ্গাচরা থানার অধিবাসী।

বেণী মালি—একজন আদর্শ মার্কসবাদী কর্মী। তাঁর কাছে অনেক সময় পার্টি ফান্ড থাকত। চরম অভাবে পড়েও তাতে হাত দিতেন না। একবার সপরিবারে অনাহারে থেকেও তার গৃহে রক্ষিত পার্টির মজুত চালে তিনি হাত দেন নাই। এমনকী ঋণ নিতে স্বীকার করেন নাই। গরিব চাষি। সোলার কাজ করতেন। কোনকোন্দ ইউনিয়নের বাসিন্দা।

কেনা রায়—অবস্থাপন্ন চাষি। সরকার গ্রামের বিদ্যালয়ের জন্য হাটের একটি গাছ কেটেছিলেন। এই অপরাধে জমিদারবাবু তাঁকে প্রধান আসামি করে অশেষ নির্যাতন করেন। সমস্ত দমন-নির্যাতনের মধ্যেও তিনি দৃঢ়ভাবে কাজ করেন। গঙ্গাচরা থানার বাসিন্দা।

বৈকুণ্ঠ সরকার—ধনী কৃষক। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মী। ওই সময় বিধবা বিবাহ করে ডানাবাড়ি অঞ্চলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মণিকৃষ্ণ সেন—জন্ম ১ নভেম্বর, ১৯০৩। পিতা বেণীমাধব সেনগুপ্ত, মা প্রমদাসুন্দরী দেবী। জন্মস্থান ফরিদপুরের রাজবাড়ি। আট বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। ১৯২০ সালে সতেরো বছর বয়সে ইংরেজ ভারত ছাড়ো এই ব্রত উদ্‌যাপনে বুকের রক্তে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২১ সালে মণিকৃষ্ণ সেন জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ সালে তাঁকে আটকে রাখা হয় মেদিনীপুরের হিজলি ক্যাম্পে ও রাজপুতনার মরুভূমিতে দেউলি বন্দিশিবিরে। ১৯৩৮ সালে রংপুর কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলে তিনি ওই পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে কালীগঞ্জ থানার চন্দনপাট গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় রংপুর জেলা কৃষক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন। ওই সালের শেষের দিকে তোলাগণ্ডি বন্ধের দাবিতে রংপুরের গ্রাম-গ্রামান্তরে হাটে বন্দরে কৃষকদের তিনি নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পীড়িত মানুষকে বাঁচানোর জন্য রংপুর জেলা রিলিফ কমিটির তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তেভাগা সংগ্রাম চলাকালে এক পর্যায়ে মাড়োয়ারি জোতদারের গুণ্ডাদের অতর্কিত আক্রমণে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছিল। ১৯৯১ সালের ২৮ অক্টোবর তাঁর কর্মবহুল সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটে।

জাকেয়ৎ আলি—গাইবান্ধা মহকুমার সুন্দরঘাট থানার অধিবাসী। সব সময়ের কর্মী। গরিব চাষি।

বীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—গাইবান্ধা মহকুমায় পার্টি ও কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম কর্মী।

হানিফ ভুঁইয়া—১৯৪৯ সালে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিতে গেলে গুলিতে নিহত হন।

ফয়েজউদ্দিন—জঙ্গি কর্মী। ১৯৪৯ সালে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। ১৪৪ ধারা অমান্য করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিতে গেলে গুলিতে নিহত হন।

ডাক্তার কাইয়ুম—১৯২১-১৯৩০-এর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী। কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। ফুলঝুড়ি থানার ককিপাড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা।

ফজলার রহমান—ধনী কৃষক। একদল নিষ্ঠাবান কর্মী-সৃষ্টি তাঁর বিশেষ অবদান। তিনি বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন করেন। তাদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওই অঞ্চলের অত্যাচারী জোতদার সুরেশ রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

নির্মল বর্মণ—ছাত্র কর্মী। গাইবান্ধা কৃষক আন্দোলন ও পার্টি গঠনে বিশেষ ভূমিকা ছিল।

অবনী বাগচী—জন্ম ১৯০৯ সালে। পিতা যামিনীকান্ত বাগচী, মা শৈলবালা বাগচী। জন্মস্থান রংপুর। শৈশবে মাতুলালয়ে রাজনীতির প্রেরণা পান। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে নীলফামারি ট্রেন ডাকাতির অভিযোগে বন্দি হন। ১৯৩৬ সালে জেলেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। রংপুর জেলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সদস্য ও জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে রংপুর জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান সংগঠকরূপে দীনেশ লাহিড়ী, আবু হোসেন সরকার, শচীন ঘোষ, শিবদাস লাহিড়ী, বিনয় বাগচী, সুরেশ রায়চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে তিনিও ছিলেন। '৯০-এর দশকে তিনি প্রয়াত হন।

মনোমোহন বর্মণ—একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। দায়িত্বশীল নেতা। উড়িয়া ইউনিয়নের অধিবাসী।

খেয়াজপীর—আসল ধর্মীয় পীর নন। বৃদ্ধ গরিব চাষি। অফুরন্ত উদ্যোগী, সৎ, নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল, কৃষক নেতা। তাই তাঁকে বলা হত কৃষক সমিতির পীর। তাঁর এক কথা ছিল—"রক্ত পতাকার মান রাখো।"

আবুল মোকসেদ—গাইবান্ধা থানার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা। গাইবান্ধা লোকাল পার্টির কৃষক নেতা।

কুতুবউদ্দিন—পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। যাঁর কাছে পার্টির নির্দেশ সংসার অপেক্ষা বড় ছিল।

নারায়ণ মোদক—১৯২১-১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। থানা কৃষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। সাদুল্লাপুরের বাসিন্দা।

রমেশ বর্মণ—পার্টি অন্ত প্রাণ। এর বাড়িতে এক সময় পার্টির গোপন জেলা কেন্দ্র ছিল।

যতীন বর্মণ—দায়িত্বশীল কর্মী। পার্টির গোপন দায়িত্ব পালনে ধরা পড়ে জেল খাটেন।

হরিকান্ত সরকার—মাঝারি জোতদার। কৃষক সমিতি গঠনের প্রথম যুগেই ইনি যোগদান করেন। আদর্শবান মানুষ হিসাবে খ্যাতি ছিল। কয়েক বছর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট

ছিলেন। ১৯৪৬ সালে আইন সভার নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। মাত্র আঠারশো ভোটের ব্যবধানে হেরে যান। তেভাগা আন্দোলনে তিনি ছিলেন কর্মীদের সর্বাধিনায়ক। তাঁর নির্দেশে ওখানকার কৃষক যে কোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে রাজি ছিলেন। ওই আন্দোলনে তিনি ও তাঁর নাবালক পুত্র কয়েক মাস বিনা বিচারে বন্দি ছিলেন। তিনি সমিতির জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সোমনাথ হোড় 'তেভাগার ডাইরি'তে তাঁর কথা অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

বাচ্চা মামুদ—ভাগচাষি। জোতদারের গুলিতে আহত হয়েছিলেন।

কপিজউদ্দিন—একজন খেতমজুর। কোতয়ালি থানার তপধন ইউনিয়নের বাসিন্দা। তেভাগা সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছিলেন।

জয়নাল বাদ্যকর—কুতুবপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। গরিব চাষি। পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াই করে চরম নির্যাতিত হয়ে কারাভোগ করেন, গরিব চাষির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

জিতেন দত্ত—যশোহর জেলার জোতদার সন্তান রংপুর জেলায় এসেছিলেন আখ মাড়াই কলের ব্যবসা করতে। এখানে এসে কৃষক আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে ওই অঞ্চলে কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নির্যাতন, কারাভোগ, আত্মগোপন করে কাজকে জীবনের সঙ্গী করে নেন। নেহালিপাড়া ইউনিয়নে তিনি বসবাস করেন।

দরাজউদ্দিন মণ্ডল—বাতাসন পরগনার রায়ত আন্দোলনের একজন অন্যতম নেতা। তিনি কৃষক সভার আন্দোলনকে সত্যিকারের পথ হিসাবে গ্রহণ করে নেন। প্রাদেশিক কৃষক সভার মহাসভাপতি ছিলেন ও পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। নেহালিপাড়া ইউনিয়নের অধিবাসী।

কালীচরণ বর্মণ—রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়নের এক বয়স্ক পার্টি সমর্থক। প্রথম থেকে সব সময়ের কর্মী। গরিব চাষি। কোনও সময় পার্টি ভাতা নেন নাই। টেকনিকাল কাজের দায়িত্বে ছিলেন।

অন্নদা রায়—যুবক, ধনী চাষি। তেভাগার নাটক রচনা করেছিলেন। সব সময়ের কর্মী, সংগ্রামী নেতা, গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী। যে কোনও সময়ে গোপনে থাকার জন্য তৈরি থাকতেন। রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

হারান চৌধুরী—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে কৃষকদের আন্দোলনমুখী করে তুলতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

মণীশ রায়—পার্টি অন্তপ্রাণ। কৃষক সমিতির জন্য তাঁর অবদান ভুলবার নয়।

রবি লাহিড়ী—পার্টি অন্তপ্রাণ। কৃষকদের সংগ্রামমুখী করে তুলতে তাঁর অনন্য উদ্যোগ স্মরণীয়।

জ্যোর্তিময় চক্রবর্তী—আদর্শবান পার্টি কর্মী। ৪৩ সালের মন্বন্তরে সমাজকল্যাণমূলক কাজে অপূর্ব অবদান রেখে গেছেন।

তুলসী লাহিড়ী—রংপুরে মহামারী প্রতিরোধে রিলিফ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পার্টি অন্তপ্রাণ। তাঁর রচিত 'ছেঁড়াতার' একটি বিখ্যাত নাটক।

ক্ষৌণীশ রায়—আদর্শবান পার্টি কর্মী।

সুনীল রায়—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী। রংপুরের ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্ব দেন।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষক নেতা। ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনে তার সাহসী নেতৃত্ব রংপুরের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল পর্ব।

ভাদু লাহিড়ী—পার্টির আদর্শবান কর্মী। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের কোনও এক সময় সারা রংপুর জেলার তেভাগা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য জেলার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ইসাহাকের নেতৃত্বে পুলিশি তাণ্ডব শুরু হয়। ওই সময় ভাদু লাহিড়ী গ্রেফতার হন।

বিজয় রায়—রংপুরের বদরগঞ্জের অধিবাসী। তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন গ্রেফতার হন।

সামসুদ্দিন আমিন—কৃষক সমিতির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন।

জিতেন দত্ত—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী।

অমর লাহিড়ী—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী।

শান্তি সান্যাল—পার্টি অন্তপ্রাণ। তেভাগার লড়াইয়ে কৃষকদের নেতৃত্ব দেন।

নাগেশ্বর—একজন বিহারি চাষি। তাঁর মা ছিলেন পার্টির মাসি। বাড়ির সবাই পার্টির পরিবারভুক্ত। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে তাঁর বাড়িটি ছিল জেলা পার্টি কেন্দ্র। ভুরাঘাট এলাকার অধিবাসী।

দয়েরউদ্দিন—ধনী চাষি ও একজন বিশিষ্ট কৃষক নেতা। প্রাণোচ্ছল যুবক, প্রথম শ্রেণীর পার্টি কর্মী। লেখালেখির চর্চা করতেন, গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী। শ্যামপুর থানার অধিবাসী।

জান বক্স—একজন বৃদ্ধ চাষি। গরিব। দৃঢ় সংগ্রামী কৃষক নেতা। শ্যামপুর থানার বাসিন্দা।

বিপিন ইশোর—মধ্যবিত্ত চাষি, সমস্ত রকম পর্যায়ে দায়িত্বশীল নেতা। ঘরিয়েলডাঙ্গা ইউনিয়নের বাসিন্দা।

সুধীর মুখার্জি—জন্ম ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯১২। পিতা সতীশচন্দ্র মুখার্জি, মা কুসুমকুমারী দেবী। জন্মস্থান ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল। স্কুল জীবন কেটেছে রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম পল্লী শহরে। ১৯২১ সালে বিপুল জাতীয় অভ্যুত্থান জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে কমরেড মোজাফফর আহ্‌মদের আবেদনে তিনি রংপুর কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পার্টির কাজ করেন। রংপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

হরচন্দ্র সরকার—কালীগঞ্জ থানার অন্যতম বিশিষ্ট কৃষক সমিতির নেতা। গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী। অবস্থাপন্ন চাষি। তিনি কালিগঞ্জ থানার প্রায় সমস্ত আন্দোলনেই নেতৃস্থানীয় ছিলেন। হাটের তোলা বন্ধ আন্দোলনে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

দেবাই বর্মণ—লালমণির হাট থানার মোগলহাট ইউনিয়নের বাসিন্দা। গরিব চাষি। পার্টির কাজে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সব সময়ের কর্মী ছিলেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে পার্টি সাহিত্য পড়বার, বুঝবার জ্ঞান অর্জন করেন।

রজনী রায়—কুলাঘাট ইউনিয়নের একজন ধনী কৃষক। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে তাঁর বাড়িটি গোপন কেন্দ্র ছিল।

ভবেশ সোয়ার—প্রাণবান ও গতিশীল। জনগণের নেতা ছিলেন। ভূমিহীন খেতমজুর। লিখতে, পড়তে জানতেন। আদর্শ সেবাপরায়ণ। বসন্ত মহামারীর মধ্যে কবিরাজ স্কোয়াডে বাড়ি বাড়ি সেবার কাজ করেছেন। পাঙ্গা ইউনিয়নের বাসিন্দা।

মহি বর্মণ—কৃষক আন্দোলনে একটি স্মরণীয় নাম। ১৯৪৯-৫০-এর যুগে গোপন কাজে পুলিশের তাড়ায় ট্রেনের তলায় পা কাটা যায়। ওই অবস্থাতেও সঙ্গের গোপন দলিল নষ্ট

করে দিয়েছিলেন। কুড়িগ্রাম মহকুমার পাঙ্গা ইউনিয়নের অধিবাসী।

বসন্তকুমার চক্রবর্তী—কুড়িগ্রাম মহকুমার সিনাই ইউনিয়নের ক্ষয়িষ্ণু জোতদার পরিবারের অভিভাবক। সপরিবারে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সহ পার্টির কাজে যোগ দেন। পরিবারটি হয় পার্টি পরিবার। তিনি ছিলেন স্থানীয় পার্টি নেতা। শিক্ষিত। একজন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শিক্ষা গ্রহণের এবং শিক্ষার জন্য ছিল অপরিসীম আগ্রহ। সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায় থাকতেন।

মণি চক্রবর্তী—একজন ছাত্রকর্মী।

ডা. ঈশ্বর চক্রবর্তী—ধনী চাষি, সামাজিক নেতা, অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাম্রাজ্যবাদী যুগ থেকে গোটা পরিবার নিয়েই পার্টিতে যোগ দেন। তাঁর বাড়ি ছিল পার্টির বাড়ি। সিনাই ইউনিয়নের অধিবাসী।

প্রেমানন্দ রায়—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী। জনপ্রিয় সংগঠক ও নেতা। নম্র, বিনয়ী কর্মী।

নীরদ রায়—তেভাগা লড়াইয়ের অগ্রণী কর্মী।

গণেশ ব্রজবাসী—সর্বজনশ্রদ্ধেয় কর্মী, নেতা ও গরিব চাষি। অবিচল সংগ্রামী, ত্যাগী। তাঁর সামান্য সাত বিঘা জমি থেকে সাত কাঠা পার্টিকে দান করেন। জমি তাঁর হেফাজতেই থাকে। বরাবর নিষ্ঠার সঙ্গে চাষ করে অর্ধেক ফসল পার্টিকে দিয়েছেন। সিনাই ইউনিয়নের অধিবাসী।

জগবন্ধু সরকার—গরিব চাষি। গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী। জনযুদ্ধ যুগে সক্রিয়ভাবে পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে ওয়ারেন্ট থাকা অবস্থায় আত্মগোপন করেন। ফলে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

ডাক্তার কমলাকান্ত রায়—একজন বয়স্ক অত্যন্ত জনপ্রিয় সামাজিক নেতা। তোলাবন্ধ আন্দোলনে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়েছিল। রতিপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

মজুম—গরিব চাষি। জঙ্গি কর্মী। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে কারা নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বর্মণ—গ্রাম্য গরিব ডাক্তার। পরিবারের প্রত্যেকেই পার্টির কাজে নিয়োজিত ছিলেন। রাজপুর ইউনিয়নের অধিবাসী।

মহিম কবিরাজ—রাজপুরের অবস্থাপন্ন চাষি। এখানে কৃষক সমিতির গোড়াপত্তন করেন। কারাভোগ করেন। কখনও লাল ঝান্ডা ত্যাগ করেন নাই।

লাল্টু বর্মণ—গরিব খেতমজুর। কারাভোগ করেন। দুর্ভিক্ষ মহামারীর যুগে যক্ষ্মা রোগে মারা যান। তাঁর আবেদন, “কমরেড, আমি বাঁচতে চাই, ব্যবস্থা করো।” রাজপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

জসিমউদ্দিন মুখী—১৯২১ সালের খিলাফতি নেতা। তিস্তা এলাকায় চার-পাঁচটি ইউনিয়নের কৃষক সমিতি সংগঠিত করেন।

শচীন বর্মণ—জনপ্রিয় নাম শচীন গান্ধী। সামাজিক বাধা অমান্য করে নিজ কন্যার বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। সমিতি গঠনের প্রথম যুগের উদ্যোগী নেতা। ওকরাবাড়ি এলাকার অধিবাসী।

টয়রা বর্মণ—তিনি বলতেন, “বিপ্লবের আগুন সারা জীবন জ্বেলে রাখব।” তিনি বাস্তবে

সে স্বাক্ষর রেখেছেন। খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের বাসিন্দা।

ধরণী কারজি—পার্টি ফান্ডে একটি ছোট সুপারি বাগান দান করেন। টেগেরাই হাটের অধিবাসী।

হরেন্দ্র বর্মণ—কুড়িগ্রাম থানার কাঠালবাড়ি এলাকার একজন মধ্য কৃষক। সমিতির জন্ম থেকে একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা।

দয়ামোহন—গরিব চাষি, খেতমজুর। ১৯৩৯ সালে গোপন পার্টি সংগঠন গড়ে তোলেন। যক্ষ্মা রোগের বলি হন।

পনিরউদ্দিন—মাঝারি কৃষক। ব্রহ্মপুত্র নদীর চর অঞ্চলে নাগেশ্বরী এবং ভুরুন্দামারি থানায় মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে মোকাবিলা করে সমিতি গঠনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা ভুলবার নয়।

তনিরউদ্দিন মিঞা—গদাই মিঞা নামে পরিচিত। লাল ঝান্ডায় পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরই হাতের অক্লান্ত, নিষ্ঠাবান কর্মী যোগেশ বর্মণ। দুর্ভিক্ষের যুগে ক্ষয় রোগে মারা যান এবং কত যে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ছিল। উলিপুর থানার বাসিন্দা।

তন্নারায়ণ রায়—মধ্য কৃষক। কবিরাজিও করতেন। প্রথম থেকেই সমিতির কর্মী। জোতদারের গুলিতে নিহত হন।

অশোক রায়—মধ্য কৃষকের ছেলে। স্থানীয় নেতা ছিলেন।

তাজেন রায়—মধ্য কৃষক। নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন।

চাটী মহম্মদ—বর্গাদার। সব সময়ের কর্মী ছিলেন। আত্মগোপন করে থাকার সময় তাঁকে স্ত্রী ও কন্যা হারাতে হয়। তবুও তিনি পার্টির কাজ ছাড়েননি। তেভাগার রক্ত-ঝরা দিনগুলিতে মণিকৃষ্ণ সেনের যখন মাথা ফাটিয়ে দেয় জোতদারের গুণ্ডারা, ওই সময় চাটী মহম্মদ গানের মাধ্যমে সেই চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। চাটী মহম্মদের কণ্ঠে সেই গান কৃষকদের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের যুগে তাঁর কণ্ঠে একটি বিখ্যাত গান— 'হায় রে কন্ট্রোলের কাপড় কী আগুন নাগালুরে নয়া জামাই মোর দেখিল রে ঢালুয়া খোঁপা।' এ গানের মাধ্যমে সেদিন গ্রাম্য রমণীর সকরুণ অভিব্যক্তি চোখের জলে ঝরে পড়েছিল। এ গান সেদিন রংপুরের আকাশে বাতাসে দুর্দশার আবহসংগীত হয়ে ভেসে বেড়াত।

নয়মুদ্দিন—বর্গাদার। পূর্বে ডাকাত ছিল। তেভাগা আন্দোলনের সময় তাঁর বিশ্বাস জন্মে যে, সমাজের পরিবর্তন হবে এবং তিনি সৎ জীবন যাপন করতে পারবেন। তেভাগা আন্দোলনে সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

তাহের মুন্সি—তেভাগা সংগ্রামের বীর কৃষক।

নীল বর্মণ—মধ্য কৃষক। সব আন্দোলনেই যোগদান করেছেন।

আলিমুদ্দিন—পার্টির সব সময়ের কর্মী ছিলেন।

মদিরউদ্দিন—পার্টির সব সময়ের কর্মী ছিলেন।

চিত্র পণ্ডিত—সচ্ছল গৃহস্থ। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। নিজের ইউনিয়নে তিনি নেতা ছিলেন।

কালাচাঁদ বর্মণ—১৯৪১ সালে জোতদাররা গুণ্ডা নিয়োগ করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। তিনি জখম হন। সেরে উঠে আবার তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

ভোটরো বর্মণ—বর্গাদার। প্রকৃষ্ট কর্মী।

দীনদয়াল বর্মণ—বর্গাদার, প্রকৃষ্ট কর্মী। কারাভোগ করেছেন।

অম্বিকা বর্মণ—দক্ষ কর্মী।

পোয়াতু পণ্ডিত—নিষ্ঠাবান নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন।

যতীন বর্মণ—ভাগচাষি। পার্টি অন্তপ্রাণ।

সতীশ বর্মণ—ভাগচাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।

খিনা মামুদ—খেতমজুর। প্রকৃষ্ট কর্মী।

বাচ্চা বর্মণ—ভাগচাষি। একজন সাচ্চা কর্মী।

হরিচরণ বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।

বাবু মিঞা—উচ্চ মধ্য কৃষক। সারা থানায় তাঁর সুনাম ছিল। ১৯২১ সালে ডিমলায় স্বাধীন সরকারের দফাদার ছিলেন। তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন, তখন তিনি বেশ বৃদ্ধ। কৃষকের মুক্তি আন্দোলন তাঁর জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

পার্বতী বিশ্বাস—তেভাগা সংগ্রামের বীর কৃষক।

গজেন রায়—একজন প্রকৃষ্ট কর্মী।

আলিমুদ্দিন—ভাগচাষি। দক্ষ কর্মী।

মদিরউদ্দিন—ভাগচাষি। দক্ষ কর্মী।

চিত্র বর্মণ—প্রকৃষ্ট কর্মী।

তারক বর্মণ—সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন।

নজম পণ্ডিত—মধ্য চাষি। তেভাগা আন্দোলনের সময় প্রচারে কমরেড মণিকৃষ্ণ সেনের সঙ্গে নীলফামারি বার লাইব্রেরিতে গেলে একজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "নজম, ষোলো আনার আন্দোলন ছেড়ে ছয় পয়সার আন্দোলন শুরু করলে কেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "আমরা কৃষক, আমাদের কাছে পরাধীনতার বড় নজির হচ্ছে ইংরেজদের দেওয়া পর্চা। আমরা সেই পর্চা ছিঁড়েছি। আপনারা আদালতের নথি ছিঁড়ে বের হয়ে আসুন। তবেই তো ষোলো আনা আন্দোলন হয়ে যাবে।" ডোমার থানার অধিবাসী।

হরি বর্মণ—সক্রিয় কর্মী। কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন।

প্রমথ বর্মণ—তেভাগা আন্দোলনে কারা নির্যাতন ভোগী।

সমসের মিঞা—জঙ্গি কর্মী। নির্যাতন ভোগ করেছেন।

সৌরেন ঘোষ—জলঢাকা থানার নির্যাতিত কর্মী।

অভয় বর্মণ—মধ্যচাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।

আব্দুল আজিজ—কিশোরগঞ্জ থানা এলাকার সর্বজনপ্রিয় কৃষক নেতা। খেতমজুর, বর্গাচাষি। পুলিশ ও জোতদারের হাতে অমানুষিক নির্যাতিত হন। দীর্ঘমেয়াদী কঠোর কারাভোগ করেন।

আব্দুল সামাদ—প্রকৃষ্ট কর্মী। অমানুষিক নির্যাতন ও কারাভোগ করেন।

জজ্ঞালু বর্মণ—প্রকৃষ্ট কর্মী। অমানুষিক নির্যাতন ও কারাভোগ করেন।

বিষাদু বর্মণ—খেতমজুর। বহু সংগ্রামের নেতা।

ধরণী বর্মণ—কৃষক সাংস্কৃতিক দলের নেতা। তাঁর স্বরচিত গানের প্রচণ্ড শক্তি। দশ হাজার মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে শুনেছে। কোনও মাইক ছিল না।

ধরণী বর্মণ (ছোট)—প্রকৃষ্ট কর্মী। কৃষক সাংস্কৃতিক দলের নেতা।

যোগেন বর্মণ—বৃদ্ধ। বহু সংগ্রামের নেতা।

আবদুল গফর—দিনমজুর। পার্টি অন্তপ্রাণ।

রিয়াজউদ্দিন—গরিব চাষি। কৃষক আন্দোলনের প্রকৃষ্ট কর্মী।

প্রভু দয়াল—একজন জঙ্গি কৃষক। তেভাগা সংগ্রামে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন।

বাহারউদ্দিন—একজন প্রকৃষ্ট কর্মী।

মদির মিঞা—দক্ষ কর্মী।

লাকু ওরাও—সাচ্চা কর্মী। মধ্যচাষি।

ভাওয়াই মিঞা—অবস্থাপন্ন চাষি। তেভাগা সংগ্রামের দক্ষ কর্মী।

আবদুল রহমান—গরিব চাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।

লালবিহারী দাস—মধ্যবিত্ত কৃষক। তেভাগার দক্ষ কর্মী।

লুৎফর রহমান—মাঝারি চাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।

উপেন বর্মণ—গরিব চাষি। দক্ষ কর্মী।

আখতার হোসেন—প্রকৃষ্ট কর্মী।

এরফান আলি—সাচ্চা কর্মী।

মুকবুল হোসেন—সাচ্চা কর্মী।

তায়েজউদ্দিন—বাদ্যকরের ছেলে। তেভাগা সংগ্রামের বীর কৃষক।

লক্ষ্মী টারি—সংগ্রামী জোয়ান। সাচ্চা কর্মী।

বৃন্দা বর্মণ—মাঝারি চাষি। ১৯৪৯ সালে জোতদার গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণ রুখে ওদের ঘায়েল করেন।

বিলায়েৎ হোসেন—সাচ্চা কর্মী।

ভরত বর্মণ—দুর্দান্ত সাহসী যুবক। প্রকৃষ্ট কর্মী।

শরৎ বর্মণ—দুঃস্থ কৃষক। দক্ষ কর্মী।

মথুর মিঞা—সাহসী যুবক। তেভাগা সংগ্রামের বীর কৃষক।

মহেশ বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।

ভোজন বর্মণ—সাচ্চা কর্মী। গঙ্গাচরা থানার কোনকোন্দ ইউনিয়নের বাসিন্দা।

সীতা কবিরাজ— দুর্ভিক্ষ মহামারীতে এঁর নিঃস্বার্থ সেবা ভুলবার নয়।

আষাঢু বর্মণ—খেতমজুর। তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।

টোকনা বর্মণ—খেতমজুর। তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।

যোগেশ বর্মণ—মধ্যচাষি। সাচ্চা কর্মী।

মহিম সরকার—মধ্যচাষি। সাচ্চা কর্মী।

বিপিন বর্মণ—সাধারণ চাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।

বেণীকান্ত বর্মণ—সাধারণ চাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।

ভুবন বর্মণ—চরতাবাড়ি এলাকার একজন কৃষক কর্মী। তেভাগার সৈনিক।

উপেন বর্মণ—চন্দনপাট গ্রামের কৃষক কর্মী। তেভাগার বীর সৈনিক।

প্রাণহরি বর্মণ—কমলাবাড়ি এলাকার কর্মী। তেভাগার বীর কৃষক।

ক্ষীরোদ বর্মণ—প্রকৃষ্ট কর্মী।

মুকুন্দ সরকার—সাচ্চা কর্মী।

কৈলাস বর্মণ—পার্টির নিষ্ঠাবান সেবক।

কামরূপী যজমানি ঠাকুর—সাচ্চা কর্মী।

দুর্গা ভগবতী—সাচ্চা কর্মী।

পুষ্প ঠাকুর—সাচ্চা কর্মী।
পয়রা বর্মণ—পার্টির নিষ্ঠাবান সেবক।
মথুর বর্মণ—প্রকৃষ্ট কর্মী।
কাশীকান্ত বর্মণ—গরিব চাষি। কৃষক সংগঠনে জঙ্গি বাহিনীব অন্যতম সদস্য।
সদানন্দ বর্মণ—প্রকৃষ্ট কর্মী। মধ্যচাষি।
যতীন দাস—মধ্যচাষি। দক্ষ কর্মী।
হরিমোহন বর্মণ—সাচ্চা কর্মী। পার্টির সব সময়ের কর্মী।
কেদার রায়—মধ্যচাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।
দোলগোবিন্দ বর্মণ—গবিব চাষি। সক্রিয় কর্মী।
যতীন মাস্টার—গরিব চাষি। গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী। সক্রিয় কর্মী।
শান্তনু কবিরাজ—মাঝারি কৃষক। প্রকৃষ্ট কর্মী।
খেরু বর্মণ—বর্গাচাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।
আয়ানউদ্দিন—গরিব চাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।
জমিরউদ্দিন—মাঝারি কৃষক। কুতুবপুর ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী।
তবারক আলি—প্রকৃষ্ট কর্মী।
নজরুল হোসেন— সাচ্চা কর্মী।
বানাবসী রায়—অবাঙালি চাষি। তেভাগার বীর সৈনিক।
মোহাম্মদ হোসেন—অবস্থাপন্ন চাষি। সাচ্চা কর্মী।
ওসমান আলি—খেতমজুর। প্রকৃষ্ট কর্মী।
ইদ্রিশ লোহানী—ছাত্র নেতা।
ক্ষিরোদ বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।
নন্দ বর্মণ— খেতমজুর। সাচ্চা কর্মী।
জনক ঠাকুর পুরোহিত—গরিব চাষি। তেভাগার বীর সৈনিক।
অভয় বর্মণ—প্রকৃষ্ট কর্মী। গরিব চাষি।
কামাখ্যা বর্মণ—গরিব চাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।
শরৎ রায়—ধনী চাষি। পার্টির একজন আদর্শবান কর্মী।
মিনহাজউদ্দিন চৌধুরী—অবস্থাপন্ন শিক্ষিত কর্মী।
কুতুবউদ্দিন চৌধুরী—মধুপুর এলাকার সাচ্চা কর্মী।
দেবেন্দ্র বর্মণ—স্থানীয় নেতা। মধ্যচাষি।
হরানন্দ বর্মণ—খেতমজুর নেতা।
ফাগুয়া বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।
বাণী বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।
কনক বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।
মহিম বর্মণ—পার্টির সক্রিয় সদস্য। একজন ধনী কৃষক।
হরচন্দ্র বর্মণ—পার্টির সক্রিয় সদস্য।
বিপিন বর্মণ—খেতমজুর। সাচ্চা কর্মী।
গোন্দা কবিরাজ—মাঝারি কৃষক। সাচ্চা কর্মী।
কমলা বর্মণ—মাঝারি কৃষক। সাচ্চা কর্মী।

গুরুচরণ শীল—মধ্য চাষি। কবিরাজ এবং দায়িত্বশীল নেতা।
ললিত শীল—প্রকৃষ্ট কর্মী।
হরিবোলা সরকার—ধনী কৃষক। সাচ্চা কর্মী।
স্বর্ণকার আবদুল আজিজ বানিয়া—সাচ্চা কর্মী। কুলাঘাট ইউনিয়নের অধিবাসী।
জব্বর আলি—গরিব চাষি। দায়িত্বশীল কর্মী।
তরণী বর্মণী—গরিব চাষি। প্রকৃষ্ট কর্মী।
মহেশ বর্মণ—মধ্য চাষি। দায়িত্বশীল কর্মী।
কামিনী দেউরি—ঘরিয়েলডাঙ্গা ইউনিয়নের অধিবাসী। প্রকৃষ্ট কর্মী।
গিরীশ সরকার—প্রকৃষ্ট কর্মী।
যতীন সরকার—অবস্থাপন্ন কৃষক। প্রকৃষ্ট কর্মী।
নৃপেন দেব—সাচ্চা কর্মী। মধ্য চাষি।
ত্রৈলোক্য রায়—মধ্য চাষি। সাচ্চা কর্মী।
সুখরঞ্জন দে—মধ্যবিত্ত কর্মী।
মণি দেও—গরিব চাষি। তেভাগার সৈনিক।
কেরু বর্মণ—তেভাগা সংগ্রামের সৈনিক। মধ্য চাষি।
বেণী বর্মণ—প্রকৃষ্ট কর্মী।
নীলচাঁদ বানিয়া—হিরামানিক এলাকার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা।
নিত্যানন্দ ব্রজবাসী—মৃত্তিঙ্গা এলাকার একজন সাচ্চা কর্মী।
নগেন সেন—প্রকৃষ্ট কর্মী।
নরেন্দ্র দেও—টোগরাই হাট সমিতির প্রতিষ্ঠাতা।
ডাক্তার সমসেরউদ্দিন—সাচ্চা কর্মী। ১৯২১ সালে কংগ্রেস খিলাফত কর্মী।
কিসমৎ মিঞা—কুড়িগ্রাম ইউনিয়নের অধিবাসী। সাচ্চা কর্মী।
বিশ্বম্ভর মিঞা—মোগলবাসা ইউনিয়নের দক্ষ কর্মী।
বিভূতি চক্রবর্তী—মধ্যবিত্ত। প্রকৃষ্ট কর্মী।
জহুরউদ্দিন—খেতমজুর, জঙ্গি কর্মী সংগঠক।
সুরেশ রায়—দুর্গাপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। ধনী কৃষক। নেতা।
প্রাণকৃষ্ণ বর্মণ—খেতমজুর। প্রকৃষ্ট কর্মী।
সূর্যকান্ত বিশ্বাস—প্রকৃষ্ট কর্মী।
কালিপদ বর্মণ—ছাত্র অবস্থায় দুর্ভিক্ষের যুগে পি. আর. সি. কেন্দ্রের একজন আন্তরিক কর্মী হিসাবে কাজ করেন।
গওছল হক—প্রকৃষ্ট কর্মী।
ফকিরউদ্দিন—সাচ্চা কর্মী।
মজিবর রহমান—সাচ্চা কর্মী।
উমর খান—প্রকৃষ্ট কর্মী।
ফারাজউদ্দিন—দায়িত্বশীল কর্মী।
কমিউল ইসলাম মণ্ডল—দায়িত্বশীল কর্মী।
আবুল বাসার মণ্ডল—সাচ্চা কর্মী।
রমজান আলি—সাচ্চা কর্মী।

ব্যাং শেখ—সাচ্চা কর্মী।
গিয়াসউদ্দিন—সাচ্চা কর্মী।
ললিত কর্মকার—তেভাগার সংগ্রামী কৃষক।
বোচা কর্মকার—সাচ্চা কর্মী।
জগন্নাথ চক্রবর্তী—মধ্যবিত্ত কর্মী।
মেহার শেখ—তেভাগার বীর কৃষক।
খোন্দকার আকতারউদ্দিন—তেভাগার বীর কৃষক।
নরেশ রায়—প্রকৃষ্ট কর্মী।
জগৎ বর্মণ—তেভাগার বীর কৃষক।
অমর রায়—সাচ্চা কর্মী।
জাফায়েৎ আলি—সাচ্চা কর্মী।
আস্থাফ আলি—সাচ্চা কর্মী।
দিদার মাহমুদ—দায়িত্বশীল কর্মী।
রইচউদ্দিন—দায়িত্বশীল কর্মী।
করমতুল্লা—দক্ষ কর্মী।
আবদুল রহিম—খেতমজুর। সাচ্চা কর্মী।
ভবেশচন্দ্র বর্মণ—একজন আদর্শবান পার্টি কর্মী।
প্রিয়নাথ বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।
টিকিন বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।
যতীন রায়—তেভাগার বীর কৃষক।
মুকুন্দলাল বর্মণ—তেভাগার বীর কৃষক।
আফানউদ্দিন—সাচ্চা কর্মী।
দেলেয়ার রহমান—দায়িত্বশীল কর্মী।
কচিনউদ্দিন—প্রকৃষ্ট কর্মী।
খেজেনউদ্দিন—সাচ্চা কর্মী।
মণীন্দ্রচন্দ্র বর্মণ—তেভাগার বীর কৃষক।
মফিজউদ্দিন—সাচ্চা কর্মী।
বেণীমাধব বর্মণ—তেভাগার বীর কৃষক।
মহঃ মহাসীন—তেভাগার বীর কৃষক।
বসরত মুন্সি—তেভাগার বীর কৃষক। ফুলঝুড়ি থানার অধিবাসী।
খাজের নীর (বড়)—সাচ্চা কর্মী।
হরেন্দ্র বর্মণ—পার্টির হোল টাইমার।
নয়ান বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।
বাদল ভট্টাচার্য—মধ্যবিত্ত কর্মী। নেতা।
জব্বার আলি—প্রকৃষ্ট কর্মী।
আবুল মহফুজ—প্রকৃষ্ট কর্মী।
আবুল ফজল—পার্টির সব সময়ের কর্মী।
আকবর আলি—প্রকৃষ্ট কর্মী। পার্টির নির্দেশ নিজের সংসার অপেক্ষা বড় ছিল।

আবতাজ আলি—পার্টির নির্দেশ নিজের সংসার অপেক্ষা বড় ছিল।
কুতুবউদ্দিন—সাচ্চা কর্মী।
আবদুল আজিদ—সাচ্চা কর্মী।
ভবেশ মহন্ত—সাচ্চা কর্মী।
আলতাফ আলি—সাচ্চা কর্মী।
ইয়াদিনউদ্দিন—প্রকৃষ্ট কর্মী।
জগৎ বর্মণ—সাচ্চা কর্মী।
যতীন রায়—সাচ্চা কর্মী।
নগেন রায়—তেভাগার বীর কৃষক।
যোগেশ বর্মণ—কাপসিয়া ইউনিয়নের অধিবাসী। প্রকৃষ্ট কর্মী।
যতীন্দ্রমোহন রায়—শ্রীপুর ইউনিয়নের প্রকৃষ্ট কর্মী।
কামিনীকুমার রায়—শ্রীপুর ইউনিয়নের প্রকৃষ্ট কর্মী।
আবদুল মজিদ—সাচ্চা কর্মী।
ললিতচন্দ্র বর্মণ—প্রকৃষ্ট কর্মী।
নগেন্দ্রনারায়ণ রায়—একজন দায়িত্বশীল কর্মী।
অমরেন্দ্র রায়—প্রকৃষ্ট কর্মী।
মহিম বৈরাগী—সাচ্চা কর্মী।
মহিমরঞ্জন মহন্ত—সাচ্চা কর্মী।
হেমন্তকুমার রায়—একজন দায়িত্বশীল কর্মী।
ডাক্তার কালিকান্ত রায়—তেভাগার বীর সৈনিক।

জীবন দে—রংপুর জেলার এবং পরবর্তী সময়ে কুচবিহার জেলার কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষ কর্মী ও নেতা। প্রাক্তন এম.এল.এ., পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। মন্বন্তর, মহামারী ও তেভাগা আন্দোলনে তাঁর অবদান ভুলবার নয়।

নৃপেন ঘোষ—জন্ম ৬ মার্চ, ১৯১৫। পিতা ললিতমোহন ঘোষ, মা সরোজবাসিনী দেবী। জন্মস্থান রংপুর। মাত্র এগারো বছর বয়সে যুগান্তর পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩২ সালে আই.এস.সি. ক্লাসে কেবল প্রবেশ করেছেন, সে সময়ে আত্মগোপন করেন। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ধরা পড়ে বিনা বিচারে আটক থাকেন। ১৯৩৭ সালে মুক্তি পান এবং কৃষক আন্দোলন ও রংপুর শহরের মেথর আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৪২ সালে লোকাল কমিটির সদস্য হন এবং ওই বছরেই জেলা পার্টির প্রকাশ্য সম্মেলনে ডি.সি.ও. নির্বাচিত হন। কিছুদিন জেলা কমিটির সম্পাদকও ছিলেন। রংপুর জেলার ডিমলায় তিনি তেভাগা সংগ্রাম পরিচালনা করেন। প্রশ্ন রেখেছিলাম, রাজনীতির শিক্ষা লাভ করেছেন কার কাছে? উত্তরে বলেন, 'যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেন, তুমি রাজনীতি শিখেছ কার কাছে? আমি উত্তর দেব, অর্ধেক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতাদের বই থেকে আর অর্ধেক কৃষক মজুরের কাছ থেকে।'

পরেশ মজুমদার—জন্ম ১৯০৯ সালে। পিতা অম্বিকারঞ্জন মজুমদার, মা অরুণবালা দেবী। জন্মস্থান রংপুর। জমিদার আশুতোষ মজুমদারের নাম বললে এক সময়ে বহু দূরদূরান্তের মানুষেরাও চিনতেন। রংপুরের জমিদার বাড়ির ছেলে পরেশ মজুমদার, যিনি মণ্টু মজুমদার ডাকনামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে যুগান্তর পার্টির সংস্পর্শে

আসেন, পরে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। তেভাগা আন্দোলনের সময় কালীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও জলঢাকা এলাকায় নেতৃত্ব দেন।

বলরাম সাহা—জন্ম ১৯০৯ সাল। পিতা তারিণীমোহন সাহা, মা যশোদা দেবী। জন্মস্থান ডোমার, রংপুর। শৈশবে যদুনাথ সাহার কাছে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের জীবনকাহিনীর প্রভাব, বিশেষ করে হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রহ্লাদের দ্বারা প্রজার পক্ষে গোপনে প্রতিরোধ সংগঠন, অত্যাচারী রাজা পিতার বিনাশ, এ সব কাহিনী তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় শিক্ষক ভবতোষ রায়ের কাছে, ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে বিবেকানন্দের জীবনের ব্রহ্মচর্য পালন, জনসেবা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা শুনে মনে গভীর রেখাপাত করে। যার সুদূর প্রভাবে পরবর্তী জীবনে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, সামন্তবাদী তথা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ঠিক ঠিক ও পুরোপুরি জনসেবা ও জনস্বার্থ রক্ষা করা যায় না, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেই তা সম্ভব। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের উপর নির্ভর করেই। ১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্যের আন্দোলনে জড়িত হওয়ায় কলেজে পড়ায় বিঘ্ন হয়। ওই সময় তাঁকে সাত দিনের জন্য জেল খাটতে হয়। ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে অন্তরিন ও এক মাস জেলা থেকে বহিষ্কার হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই ১৯৩৩-৩৪ সাল থেকেই তিনি সোসালিস্ট কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের সমর্থক হয়ে পড়েন। গোটা রংপুর জেলাতেই কংগ্রেস ছিল তখন প্রায় টেরারিস্ট ও কমিউনিস্ট পন্থীদের প্রভাবাধীন। ফলশ্রুতিতে, অন্যান্য স্থানের মতো রংপুরেও শ্রেণীস্বার্থে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী গ্রুপ সৃষ্টি হলে অন্যান্য অনেক সমভাবাপন্নের মতো তিনি কমিউনিস্ট গ্রুপে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। দুর্ভিক্ষকালে জনসেবার মাধ্যমে তৎকালীন জেলা কমিউনিস্ট নেতা রথীন গাঙ্গুলীর বিশেষ প্রেরণায় ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ছ' মাস কারাবরণ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পূর্বে মুক্তি পান।

পানু পাল—পার্টির আদর্শবান কর্মী। রংপুরের সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের অন্যতম সংগঠক। চল্লিশের দশকে মজুতদার-চোরাকারবারি বিরোধী নৃত্যনাট্য উপস্থাপন করে তিনি অগণিত কৃষককে আলোড়িত করেছিলেন। কয়েক বছর কেন্দ্রীয় গণনাট্য সংঘেও তিনি কাজ করেছিলেন। গাইবান্ধার বাসিন্দা।

মহিলা কর্মী

লিলি দে—ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তেভাগার লড়াইয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে নারীদের উৎসাহিত করে তুলতেন।

দীপ্তি দে—পার্টি অন্তপ্রাণ। দক্ষ কর্মী।

দীপ্তি রায়চৌধুরী—গাইবান্ধা মহকুমায় পার্টি ও কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

বিজলীপ্রভা গোস্বামী—পার্টি অন্তপ্রাণ। প্রকৃষ্ট কর্মী।

রেবা রায়চৌধুরী—দুর্ভিক্ষের সময় রিলিফের কাজে সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠিত হয়। ওই দলের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। দক্ষ কর্মী।

মহাশ্বেতা দেবী—সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের কর্মী ছিলেন।

বেগম কাইয়ুম— ফুলঝুড়ি থানার কবিপাড়া ইউনিয়নের ডাক্তার কাইয়ুমের স্ত্রী.. কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

লক্ষ্মী বর্মণী—রতিপুর ইউনিয়নের ডাক্তার কমলাকান্ত বর্মণের স্ত্রী। তিনি ছিলেন পার্টির বউদি।

দয়াময়ী বর্মণী—রাজপুর ইউনিয়নের মধুরাম এলাকার গ্রাম্য ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর বর্মণের স্ত্রী। পার্টির সব সময়ের কর্মী।

অন্নপূর্ণা দেবী—সিনাই ইউনিয়নের অধিবাসী। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যুগের একজন দায়িত্বশীল কর্মী। মহিলা সমিতির নেত্রী ছিলেন।

মাধবী রায়—সিনাই ইউনিয়নের বৈদ্যের বাজার এলাকার ডা. ঈশ্বর রায়ের স্ত্রী। পার্টির সব সময়ের কর্মী।

খরকি বর্মণী—বদরগঞ্জ থানার হারিয়াকুটি এলাকায় জঙ্গি খেতমজুর নারী কর্মী বাহিনীর অন্যতম সংগঠক।

রাজবালা বর্মণী—পার্টি অন্তপ্রাণ।

মোহিনী বর্মণী—সংগ্রামী জঙ্গি মহিলা কর্মী।

নিরোদা বর্মণী—সংগ্রামী জঙ্গি মহিলা কর্মী।

রানী মুখার্জি—পার্টি অন্তপ্রাণ। দায়িত্বশীল কর্মী। তেভাগার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

শচীরানী দেবী—সুন্দরগঞ্জ থানার বাসিন্দা। দক্ষ কর্মী।
